সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

ড. জয়িতা দত্ত

বিভাগীয় প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

— পরিবেশক —
পুস্তক বিপণী
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা -৯

Samakaler Prekshapate Ashtadash
Satabdir Bangla Sahitya
By Dr. Jayita Dutta. *(M. A., Ph. D.)*

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০০০

প্রকাশক :
শ্রী বীরেন্দ্রমোহন গুহ
নূতনপল্লী, বালিয়া, গড়িয়া।
কলিকাতা-৮৪

মুদ্রক :
সমীর দাশগুপ্ত
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট,
কলকাতা-১৬

প্রচ্ছদ : কৌশিক ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্ত
শ্রীমতী অর্চনা গুহ
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন গুহ

যাঁদের মনের আলোয় জীবনের পথ চলা .

সূচি

পরিচায়িকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি হাজার বছরের ইতিহাস। সাধারণভাবে প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্বে সে ইতিহাসকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এক একটি পর্বের আড়ালে রয়েছে এক একটি যুগ। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ। মধ্যযুগের সূচনা পঞ্চদশ শতাব্দীতে, সমাপ্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ঘটলো। আধুনিকতার হাওয়া বইলো। পাশ্চাত্য সাহিত্যের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও রূপগত পরিবর্তন দেখা দিলো।

পালাবদলের আভাস অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পাওয়া যাচ্ছিল। পুরনো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনার দিন যে শেষ হতে চলেছে, তা বেশ অনুভূত হচ্ছিল। এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র তো সে কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন : 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নয় তাহা, আমি যা খেলিতে চাহি, সে খেলা খেলাও হে'।

আভাস একটা পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু পালাবদলটা সম্পূর্ণ ঘটে নি। তার জন্যে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। পুরনো ঐতিহ্য তখনও বহমান ছিল। চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কালিকামঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদি লেখা হচ্ছিল। লেখা হচ্ছিল সত্যনারায়ণ-পাঁচালি। বৈষ্ণব পদকর্তারা পদ রচনা করছিলেন। পাশাপাশি বৈষ্ণব মহাপুরুষদের জীবনী, বৈষ্ণব সমাজ-বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনাতেও ঘাটতি ছিল না। কিন্তু কী মঙ্গলকাব্যে, কী বৈষ্ণব সাহিত্যে, পূর্ববর্তী কবিদের প্রতিভা, মেধা, দীপ্তি, আবেগ, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনাশক্তি ও রসবোধের অভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। ব্যতিক্রম ভারতচন্দ্র, ঘনরাম ও রামেশ্বর। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কাব্যে তাঁর কালের জীবনপিপাসা বাঙ্ময় হয়ে উঠলো। 'অন্নদামঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের আদলে লেখা, কিন্তু রসাবেদনে ভিন্ন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল এক বিশাল আয়তনের কাব্য, যাতে বহু বিচিত্র ঘটনার সমারোহ, অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ, যুদ্ধের ঘনঘটা আর বীররসের স্ফুরণ। এ কাব্য যেন রাঢ় বাংলার জীবনযাত্রার চিত্রশালা। মধ্যযুগের বাঙালি-জীবন মূলত কৃষিনির্ভর। অথচ সে যুগের বাংলা সাহিত্যে কৃষক সমাজ কোনও গুরুত্বই পায় নি। বণিক-সমাজ আর ব্যাধ সমাজের নানা প্রসঙ্গ এসেছে মঙ্গলকাব্যে। কিন্তু কৃষক-সমাজ উপেক্ষিত। সেদিক থেকে রামেশ্বরের শিবায়ন এক হিসেবে ব্যতিক্রমী রচনা। দেবতা শিবকে উপলক্ষ করে

তাতে কৃষিনির্ভর গ্রাম বাংলার জীবন-চিত্র পরিস্ফুট। অনুবাদ সাহিত্যের ধারাটিও এ শতাব্দীতে রুদ্ধ হয় নি। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু তাতে জীবনের তাপ-উত্তাপ নেই।

অন্যদিকে নতুন কোনও কোনও ধারার আবির্ভাবও ঘটেছে। যেমন শক্তিগীতি পদাবলীর ধারা। রামপ্রসাদ সেন এই ধারার উদ্গাতা। কমলাকান্ত তাঁর অনুবর্তী। উদ্ভব ঘটলো বাউল গীতির। লালন শাহ্ এ ধারার সূচনা করলেন। গঙ্গারাম দত্ত লিখলেন 'মহারাষ্টা পুরাণ'। স্বরূপত ঐতিহাসিক কাব্য। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' আর 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'-র পালাগুলিতে মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবন রসের সন্ধান মিললো। পল্লীকেন্দ্রিক এ সব সাহিত্য ধারার পাশাপাশি গড়ে উঠলো নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য ধারা। কবিগীতি টপ্পাগীতির ধারা। এ সব দিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভেদ অবশ্য স্বীকার্য।

......২......

সাহিত্য দেশকাল নির্ভর। সাহিত্য বিচারে দেশকালের প্রেক্ষিত সম্পর্কে তাই ধারণা থাকা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা সমান প্রযোজ্য।

শুধু বাংলা নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেই অষ্টাদশ শতাব্দী অস্থিরতার কাল। সতেরো শো সাত খ্রিস্টাব্দে প্রবল প্রতাপশালী বাদশা ঔরংজেবের মৃত্যুতে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলো। মারাঠা শক্তির জাগরণ বাদশা আলমগীরের রাজত্বকালেই শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সে শক্তি ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। অন্য দিকে শিখ শক্তির উত্থান ঘটলো। ঔরংজেব-পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতা আর অপদার্থতাহেতু কেন্দ্রীয় শাসনে শিথিলতা দেখা গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ দানা বাঁধলো। বারংবার বিদেশীদের আক্রমণে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলো। সতেরো শো আটচল্লিশ থেকে সতেরো শো সাতষট্টি পর্যন্ত সময়কালে আহমদ শাহ্ আবদালি সাত-সাতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতাটুকু প্রকট হয়ে উঠলো। অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করলো। এর ফলে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমিও একটু একটু করে তৈরি হতে থাকলো।

ভারতব্যাপী সেই বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার ঢেউ বঙ্গভূমিকে পরোক্ষভাবে স্পর্শ করলো বৈকি। ইংরেজ বণিকেরা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম ঘাঁটি হিসেবে বঙ্গভূমিকেই বেছে নিলো। তাদের পরিকল্পনা ও উদ্যম ফলপ্রসূও হয়ে উঠলো।

ঔরংজেবের রাজত্বকালে সতেরো শো খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সতেরো শো তিনে দেওয়ান পদের অতিরিক্ত সহকারী সুবেদারের পদও লাভ করলেন তিনি। সতেরো শো তের-তে হলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

সুবেদার। বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন, কার্যত স্বাধীন বাংলায় নবাবী শাসনের সূচনা করলেন তিনি। রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়ে জায়গীরদার প্রথার পরিবর্তে যে ইজারাদারী প্রথার প্রবর্তন করলেন তার প্রভাব পড়লো অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। ইংরেজ বণিকদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন তিনি। স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হয় এবং এর জের চলে অনেক দিন।

সতেরো শো সাতাশে তাঁর মৃত্যু ঘটলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার হলেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন। তাঁর মৃত্যু সতেরো শো উনচল্লিশে। সুজাউদ্দিনের কার্যকালের শেষভাগে একদিকে দেখা দেয় পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, অন্যদিকে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা। জমিদারদের একটা অংশও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাংলায় সুস্থিতির দিন শেষ হলো।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ মসনদে বসলেন। সতেরো শো উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ মাত্র এক বছর তাঁর শাসনকাল। শাসক হিসেবে অপদার্থ। বিলাস-ব্যসনে মগ্ন। ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত। আমীর ওমরাহ্ জমিদার বণিক ও রাজকর্মচারীদের অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার সূচনা। জনজীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ।

আলিবর্দি খাঁ অরাজকতার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি সুজাউদ্দিনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাঁর আসল নাম মির্জা মহম্মদ আলি। আলিবর্দি খাঁ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেছিলেন স্বয়ং সুজাউদ্দিন। শুধু তাই নয়, বিহারের সহকারী সুবেদারও নিযুক্ত করেছিলেন। আলিবর্দি পাটনা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে সরফরাজকে আক্রমণ ও হত্যা করে তিনটি সুবার সুবেদার হয়ে বসলেন। দিল্লির বাদশা মহম্মদ শাহকে ঘুষ দিয়ে সুবেদারীর ফারমানও লাভ করলে প্রভুপুত্রকে হত্যা, ঘুষ দিয়ে সুবেদারী লাভ, এ সব থেকে বেশ বোঝা যায় যে দেশে নৈতিকতার মান তলানিতে ঠেকেছিল। আলিবর্দি দক্ষ শাসক, কিন্তু একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত হলেন তিনি। মসনদে বসতে না বসতেই উড়িষ্যার সহকারী সুবেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তার বিদ্রোহ দমনে বহু শ্রম সময় ও অর্থ ব্যয় হয়ে গেল। এরপর মারাঠা বর্গীবাহিনী বাংলা আক্রমণ করলো। একটানা দশ বছর চললো সেই হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১)। বর্গী-হাঙ্গামায় বাংলার একটি অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হলো। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হলো, অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটলো, প্রভূত বিত্ত সম্পত্তি নাশ হলো। হাঙ্গামা দমন করতে গিয়ে আলিবর্দি প্রায় সর্বস্বান্ত হলেন। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যেরা বেতন পায় না, দু দু-বার আফগান সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দমন করলেন আলিবর্দি (১৭৪৫, ১৭৪৮)। যুদ্ধ ব্যয় নির্বাহের জন্যে জমিদার, ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত আবওয়াব

আদায় করলেন। স্বভাবতই তারা ক্ষুব্ধ হলো। শেষ রক্ষা কিন্তু হলো না। উড়িষ্যা সুবা আর প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বর্গী হাঙ্গামা থেকে নিস্তার পেতে চাইলেন আলিবর্দি। আপসে শান্তি কিনলেন। এবার অশান্তি শুরু হলো অন্য দিক থেকে। কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র আর আত্মীয় মীরজাফর ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লার চক্রান্তে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেন আলিবর্দি। এর প্রভাব পড়লো প্রশাসনে, অর্থনীতিতে। সাহিত্যে তার পরিচয় রয়ে গেল। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্রা পুরাণ'-এ (১৭৫১) পাই বর্গী হাঙ্গামার চিত্র :

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।।
ব্রাহ্মণ পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি -হড়পি লইয়া।।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।।
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক-নড়ি।
জাউলা মাউছ্যা পলাএ লইয়া জাল-দড়ি।।
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে।।

আর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ (১৭৫১) বর্গীদের পাশাপাশি সুযোগ-সন্ধানীদের তস্করবৃত্তিও চিত্রিত, দেশব্যাপী অরাজকতার পরিচয় তাতে পরিস্ফুট :

বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন।।

সতেরো শো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দের দশ এপ্রিল আলিবর্দি মারা গেলেন। সুবা বাংলা বিহারের সুবেদার হলেন তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। তেইশ বছরের এক অশিক্ষিত অপরিণামদর্শী স্বেচ্ছাচারী যুবক। প্রথম থেকেই নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিরোধ বাধলো, বিরোধ বাধলো সেনা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ মীরজাফরের সঙ্গে। ইংরেজদের সঙ্গেও বিরোধ দেখা দিলো। অশান্তি আর দুশ্চিন্তা তাঁর সঙ্গী হয়ে রইলো। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদের প্রথম পর্যায়ে তিনি জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হলেন। (২৩ জুন ১৭৫৭)। পলাতক অবস্থায় বন্দী হলেন এবং ২ জুলাই তাঁকে হত্যা করা হলো। তারপর কিছুদিন চললো পুতুল নবাবদের লীলা। ইংরেজরা তাদের ইচ্ছামতো কখনও মীরজাফরকে মসনদে বসালো, কখনও বা মীরকাশিমকে। সতেরো শো পঁয়ষট্টি থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত চললো দ্বৈত শাসন। প্রশাসনিক দায়িত্বে নবাব, রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজদের ওপর। এই পর্বেই ঘটলো এগারো শো ছিয়াত্তরের (১৭৬৯) ভয়াবহ মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটলো, অসংখ্য জনপদ নিশ্চিহ্ন হলো। বঙ্গভূমি

যেন এক বিশাল শ্মশানে পর্যবসিত, আর সেই শ্মশানভূমিতে রামপ্রসাদ সেন দেবী কালিকার আরাধনায় রত। একসময় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটলো। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নিলো। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলো। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসতে আসতে শতাব্দী প্রায় শেষ।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র 'মলুয়া' পালায় প্রশাসনিক অচলাবস্থার চিত্র আছে। দেওয়ান ও কাজীর স্বৈরাচারিতায় জনজীবন যেখানে বিপর্যস্ত। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র 'কাফেনচোরা' এবং 'মানিকতারা ডাকাইতের পালা'য় অরাজকতার যে বিবরণ আছে তাতে যুগচিত্রই প্রতিফলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত দুখানি কাব্যে অরাজকতা-চিত্রণে প্রজাদের দুরবস্থার মর্মস্পর্শী পরিচয় লভ্য:

১। এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলা মন।।
(ঘনরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল: ১৭১১)
২। রাজকর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হল দেশছাড়া।।
(ঘনরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল: ১৭১১)
৩। অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাৎ বিপরীত।।
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার কর্য্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।।
(রামেশ্বর ভট্টাচার্য: শিবায়ন: ১৭১১)

ঘনরাম জানাচ্ছেন, রাজা কর্ণসেন রাজ্যশাসনে উদাসীন। গ্রামের সাধারণ প্রজাদের দুরবস্থার সংবাদ তিনি রাখেন না। অমাত্য মহামদের স্বৈরাচারিতার শিকার তারা। মহামদের হাতে নিগৃহীত হয়ে দেশ ছেড়ে তাই পালাতে থাকে। রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে মহামদ অতিরিক্ত তিন বছরের খাজনা দাবি করে। অসহায় প্রজারা তা দিতে অসমর্থ হয় এবং ভয়ে দেশ ছেড়ে পালায়। রামেশ্বর লিখছেন, অনেক পরিশ্রমে শস্য উৎপাদন করতে হয় প্রজাদের। অজন্মা হলে দুঃখের সীমা থাকেনা। আবার শস্য ভালো হলে রাজা সব কেড়ে নেয়। এসব উক্তিতে সাধারণ প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়।

..........৩.........

জনগণ শোষিত। প্রজা সাধারণের আর্থিক সুখ-স্বস্তির পরিচয় এ শতাব্দীর কাব্য-কবিতায় পাওয়া যায় না। কবিরা বারংবার শুনিয়েছেন দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। শতাব্দীর সূচনায় রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে জননী মেনকা সদ্য বিবাহিতা কন্যার জন্যে জামাতা শিবের কাছে যে প্রার্থনা জানিয়েছেন তা এমন কিছু আহামরি নয়:

আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।
প্রীতি কর‍্য যেমন জানকী রঘুনাথ।।

হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে এমন বস্ত্রখণ্ড আমার মেয়েকে দিও, আর আমার মেয়েটি যেন পেটভরা ভাত খেতে পায়। চাহিদা সামান্যই। জননী মেনকার এই করুণ আর্তিটুকু আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। জননী মেনকা যেন এখানে তৎকালীন গ্রামবাংলার লক্ষ লক্ষ জননীরই প্রতিনিধি। রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের শিব তো দরিদ্র কৃষক। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের নাম দেন 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যনাম তাৎপর্যপূর্ণ। বর্গী-হাঙ্গামা-বিধ্বস্ত বাংলায় অন্নদাত্রী অন্নদারই কৃপাপ্রার্থী হয়ে উঠেছিল বাঙালি সমাজ। স্বয়ং অন্নপূর্ণা-পতি দেবাদিদেব শিব এ কাব্যে অন্নের ভিখারী:

অন্নপূর্ণা যার ঘরে
সে কাঁদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।

বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এ শিব সমকালীন অন্নবঞ্চিত সাধারণ বাঙালিরই প্রতিভূ। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে শিব পল্লীর পথে পথে ভিক্ষার প্রত্যাশায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু ভিক্ষা মেলে না। শিবের ভিক্ষা-প্রার্থনার উত্তরে গৃহস্থেরা তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেয়:

কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়্যাছি আকুল।।
কান্দিছে আপনা শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া।।

'অন্নদামঙ্গল'-এর পদ্মিনীর 'অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্মসার'। হরিহোড়ের দারিদ্র্য তো সীমাহীন:

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে
বৃদ্ধপিতামাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে।

সন্তানের জন্যে ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা—

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'

এ-যুগের সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রার্থনা। যুগ-প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকও। আর কবিপত্নীর জবানীতে কবি স্বয়ং নিজের দারিদ্র্য নিয়ে উপহাস করেন:

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।।
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু।।

'মহারাষ্টা পুরাণ'-এর কবি গঙ্গারাম দত্তের অভিজ্ঞতাও বেদনাদায়ক:

টাকার সের হৈল আনাজ কিনতে নাই পাএ।
ক্ষুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ।।

রামপ্রসাদের পদেও দুঃখ-দৈন্যের উপস্থিতি গোপন থাকেনি। তা নিছক ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত:

১। দারুণ পেটের জ্বালায় পরের বোঝা মাথায় কবে বই
২। মরিগো এই মনের দুঃখে।.............
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।।

তাঁর 'অন্ন দেগো অন্ন দেগো অন্নদে' পদে মন্বন্তর-পীড়িত বাংলার কাতর আর্তনাদ যেন প্রতিধ্বনিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা দারুনভাবে বিপর্যস্ত। সুবেদারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজস্ব বাবদ দিল্লিতে প্রেরিত হয়। সে অর্থ প্রধানত সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়। রাজকর্মচারী, জমিদার-ইজারাদার, বণিকের দলও সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। বর্গী-হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১), অতিবৃষ্টি (১৭৫২), মন্বন্তর (১৭৬৯) ইত্যাদি সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলে। এ শতাব্দীর কবিরা তা গোপন করেন নি।

শুধু তাই? না, পাশাপাশি বিলাস-ব্যসনে মত্ত বিত্তবান অভিজাত শ্রেণীর কথাও উচ্চারিত হয়। নবাব, নবাব দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, ইজারাদার-জমিদারকুল, বণিকসম্প্রদায়, এঁদের বিত্তবৈভব চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বৈকি! ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনী-দরিদ্রে কী বিপুল ব্যবধান। 'রামায়ণ'-এর অনুবাদক রামানন্দ ঘোষের চোখ এড়িয়ে যায় নি তা। সমাজ-সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন:

ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল।
নাহি মিলে কাঙালের কড়ার সম্বল।।
ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী।
মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবস-রজনী।।

সাধক কবি রামপ্রসাদ জগজ্জননীর কাছে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর ক্ষোভটুকু তিনি গোপন করেন নি:

কারেও দিলে ধনজন মা হয় হস্তী রথী জয়ী।
আর কারও ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মেলে কই।।
কারও অঙ্গে শাল দোশালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই।।

............৪..........

সন্দেহ নেই, এ শতাব্দীর অধিকাংশ কবি পুরনো ধর্মবিশ্বাসকে সম্বল করেই কাব্য লিখেছেন। পার্থিব এবং পারমার্থিক মঙ্গল-কল্যাণের জন্যে দেব-দেবীর শরণ নিয়েছেন। দেবতার প্রতি এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা বহু কালাগত, স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু লক্ষণীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মবিশ্বাস নিতান্ত একমাত্রিক নয়। একদিকে মঙ্গলকাব্যের কবিরা যেমন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনে নিছক পুরনো ঐতিহ্যের অনুবর্তী হন, অন্যদিকে তেমনি ভারতচন্দ্রের মতো কবি আবার স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মঙ্গলকাব্যের আশ্রয় নেয়। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অন্নদা-মাহাত্ম্য গৌণ, আশ্রয়দাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের প্রশস্তি-কীর্তনই মুখ্য। ভক্তিরস নয়, তাঁর কাব্যে আদিরস ও কৌতুক রসেরই প্রাধান্য। অন্নদামঙ্গলের মোড়কে তিনি বিদ্যাসুন্দরের কামলীলা পরিবেশন করেন। 'অন্নদামঙ্গল'-এ ভিখারীরূপী দেবাদিদেব মহাদেবকে নিয়ে গ্রাম্য বালকেরা উপহাস করে:

কেহ বলে জটা হৈতে বারি কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি দেয় কেহ গায় ফেলাইয়া।।

এই ছাই মাটি তো সংশয় আর অবিশ্বাসের ছাই মাটি। দেবতার প্রতি সংশয় অবিশ্বাস অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম দেখা গেল। বেশ বোঝা যায় কালের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশের সত্যতা নিয়ে তাঁর 'শ্যামারসঙ্গীত'-এ-প্রশ্ন তোলেন রাধাকান্ত মিশ্র :

কেহ বলে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিল দেখা ধরি নিজ বেশ।।
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্যমিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়।।

কবির সন্দেহ-সংশয়টুকু এখানে গোপন থাকে না। ধর্মের নামে দীর্ঘকালব্যাপী যে ভণ্ডামি ও ছলনা চলেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান কবি। রামানন্দ ঘোষ তাঁর 'রামায়ণ'-এ ব্রহ্মজ্ঞানে কাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহ পুজোয় কোনও সার্থকতা খুঁজে পান না। এর অন্তঃসারশূন্যতাটুকু বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন:

দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল।।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ।।

বেশ বোঝা যায় ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং প্রশ্নহীন নির্ভরতায় চিড় ধরেছে। ভক্তির স্থান অধিকার করেছে যুক্তি। এখানেই আধুনিকতার আবির্ভাব।

রামপ্রসাদ দেবী কালিকার আরাধনা করেছেন। দেবী কালিকার নিষ্ঠাবান ভক্ত তিনি। তাই তিনি বলতে পারেন:

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে।।

দেবী-আরাধনার নামে বাহ্যিক জাঁক-জমক আড়ম্বরের বিরোধী তিনি। আত্ম সম্বোধন-সহায়তায় এ সবের অসারতাটুকু স্মরণ করিয়ে দেন। বাহ্য উপচার, নৈবেদ্য, জীববলি ইত্যাদি তাঁর কাছে দেবীকে ঘুষ দিয়ে তুষ্ট করার হাস্যকর চেষ্টা বলে মনে হয়:

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কী মন তাই জান না।।
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা
মা তো আমার ঘুষ খাবে না।

ধর্মের নামে ভড়ং-ভণ্ডামির সমালোচনা করেন তিনি। এখানে যেমন তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তেমনি স্বাতন্ত্র্য দেবীর প্রতি অভাব-অভিযোগ নিবেদনে; নানাবিধ বৈষম্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে। রামপ্রসাদ ভক্ত কবি, একথা সত্য, কিন্তু অর্ধ সত্য। বাকি অর্ধ সত্য হলো, তিনি প্রতিবাদী কবি।

প্রসঙ্গত বলতে হয় সাম্প্রদায়িক ঔদার্য ও ধর্ম-সমন্বয়ের কথা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি বাতাবরণ এ যুগে সৃষ্টি হয়েছে। মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি সকলেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বহু হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছেন। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফর কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করেছেন রোগমুক্তির প্রত্যাশায়। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে সরফরাজ, আলিবর্দি ও মীরকাশিমের ছিল অগাধ আস্থা। হিন্দুদের দোলোৎসব মুসলমান আমীর-ওমরাহদের খুব প্রিয় ছিল। সমসের গাজী হিন্দু দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সহায়তায় হিন্দুরীতিতে নিয়মিত দেবীর পুজোর ব্যবস্থা করেন। বহু মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। আবার মুসলমান পীর-ফকিরদের প্রতিও হিন্দুদের শ্রদ্ধা ছিল। সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ জ্ঞানে তারা শিরনি দিয়েছে। রামেশ্বর, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মানসিংহ অংশে ভবানন্দ মজুমদারের উক্তিতে ধর্ম-সমন্বয় ভাবনা প্রকাশিত:

মজুন্দার কহে জাঁহাপনা সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।।
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।।

রামপ্রসাদ 'কালিকামঙ্গল'-এ লিখেছেন:

অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।।

আর তাঁর পদে ধর্ম-সহিষ্ণুতা ও ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ভাষারূপ প্রাপ্ত:

মগে বলে ফারাতারা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।

এ শতাব্দীতেই বাউলগীতির আবির্ভাব। বাউলেরা লোকপ্রচলিত ধর্মের অনুসারী নন। তাঁদের ধর্ম মানুষের ধর্ম। দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের অনুসন্ধান তাঁদের। অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে নতুন একটি দৃষ্টিকোণ তাঁদের গীতিতে পাওয়া গেল। বাউল মতবাদ অবশ্য পুরনো।

'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র পালাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ রচনা। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টি। দেবদেবীর পরিবর্তে রক্ত-মাংসের মানব-মানবীর কাহিনী। সাহিত্যের বাঁক ফেরার ইঙ্গিত এ গুলিতে আছে। কবিগীতি ও টপ্পাগীতিতেও সাহিত্য ধর্মের খোলস মুক্ত।

.......৫.......

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দূষিত। সংস্কৃতিচর্চার উন্নত পরিবেশের অভাব দেখা যায়। নতুন ধনী ইজারাদার ও বানিয়াকুল বিত্তবান, কিন্তু কৌলীন্য বঞ্চিত।

সস্তা আমোদ ও উত্তেজনা উপভোগই তাঁদের লক্ষ্য। বিদ্যাসুন্দরের কামকথার জনপ্রিয়তায় যুগরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে ভারতচন্দ্র অবৈধ প্রেমের সুড়ঙ্গপথ খনন করেছেন, এ অভিযোগ সত্য নয়। সুড়ঙ্গটা খোঁড়াই ছিল, ভারতচন্দ্র শুধু তা দেখিয়ে দিয়েছেন। অভিজাত সমাজের বাহ্য চাকচিক্যময়তার আড়ালে কামপঙ্কিল জীবনের যে ধারাটি বহমান ছিল তার নগ্ন স্বরূপটি তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। যুগরুচির আকর্ষণেই রামপ্রসাদের মতো সাধক কবিকেও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লিখতে হয়েছে। কবিগীতির উদ্ভব একালেই। 'হঠাৎ বড়োলোক'দের সান্ধ্য মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে আয়োজিত কবিগীতির আসরে প্রেমের নামে চলেছে ন্যাকামি ছলনা আর ভণ্ডামির সমারোহ। স্থূলরুচিসর্বস্ব হুজুগমত্ত জনসাধারণ কবিগীতির জনপ্রিয়তায় সহায়তা করেছে। অবশ্য ব্যতিক্রমী রচনা কিছু আছে। পরিমাণে সামান্য। উমা-মেনকা প্রসঙ্গাশ্রিত গীতিগুলির মানবিক আবেদন অনস্বীকার্য। কবিগীতির রচয়িতা-পরিবেশকেরা মূলত কবিওয়ালা, কবিগীতি তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। মূলত আমোদ ও উত্তেজনা জোগানোই তাঁদের লক্ষ্য। সস্তা খ্যাতির মোহে তাঁরা আচ্ছন্ন। নগদ বিদায়েই সন্তুষ্ট। কবিগীতির উদ্ভব নাগরিক সমাজে। নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে কবিগীতির উদ্ভব প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। টপ্পা ও পাঁচালি গীতিও নাগরিক সমাজে উদ্ভূত। এভাবেই নাগরিক সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটলো। পরবর্তী শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য প্রধানত নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য। সাহিত্যের মানচিত্র বদলের ইঙ্গিত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সূচিত হলো। স্মরণযোগ্য, কলকাতার তখন ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির আধুনিক কেন্দ্রের পত্তন হচ্ছে। ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে যে কলকাতার লোক সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার, ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তা হলো এক লক্ষ।

শিক্ষার বেহাল অবস্থা। হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে ছিল পাঠশালা, পরবর্তী স্তরের সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে ছিল টোল-চতুষ্পাঠী। এগুলির পরিচালনা-ভার বহন করতেন সামন্ত ও জমিদার সম্প্রদায়। টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা, ভট্টি, কালিদাস ও ন্যায় শাস্ত্রাদির চর্চা হতো। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা হতো মক্তবে। শাস্ত্রজ্ঞ উলেমারা সরকারী ব্যয়ে মসজিদ বা ইমামবাড়ায় প্রতিপালিত হতেন। আজিমাবাদ (অর্থাৎ এ কালের পটনা) ছিল ফারসি শিক্ষা ও ইসলামি

তমদ্দুনের কেন্দ্র। সরকারী কর্মলাভের উদ্দেশ্যে হিন্দুরাও ফারসি শিখতো। এ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ফারসি ভাষার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

প্রশ্ন হলো, অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব উপযোগিতা ছিল কতটুকু? জীবনের সঙ্গেই বা যোগ ছিল কতটুকু?

.....৬.......

আমাদের পরম সৌভাগ্য, অধ্যাপিকা জয়িতা দত্ত আলোচ্য গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে এ শতাব্দীর বাংলা সহিত্যের অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। শতাব্দীর কণ্ঠস্বর এবং মানসিকতার নির্ভুল ও যথাযথ পরিচয় তাঁর গ্রন্থে লভ্য। এ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি যেমন বিস্তৃতভাবে তিনি প্রদর্শন করেছেন, তেমনি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় ও শিক্ষাগত পরিমণ্ডলসূত্রে এ শতাব্দীর সাহিত্যের স্বরূপটি নির্ধারণ করেছেন। কোনও প্রকার বাঁধা বুলির আনুগত্য স্বীকার করেন নি তিনি। লব্ধ তথ্যসমূহের যাচাই বিচার করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিস্ময়কর তাঁর পঠন-প্রাচুর্য, বিশ্লেষণশক্তি প্রশংসাযোগ্য, পরিবেশনরীতি আকর্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর গুরুত্ব সৃষ্টি-প্রাচুর্যে নয়, গুরুত্ব অন্যত্র। বিগত ও আগত দুটি কালের সন্ধিকাল হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। উভয়কালের লক্ষণই এ শতাব্দীর সাহিত্যে লভ্য এবং অধ্যাপিকা দত্ত তা সযত্নে দেখিয়েছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী, অধ্যাপিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর গবেষণাকর্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয এই গবেষণাকর্মের জন্যে তাঁকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রিতে ভূষিত করেছেন। স্বদেশ ও বিদেশের বিদগ্ধ পরীক্ষকদের কাছে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ উচ্চ প্রশংসিত। বৃহত্তর পাঠক-সম্প্রদায় অবশ্যই এ গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করবেন। মনে হয়, তুষ্টই হবেন। কারণ, এ ধরনের একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপিকা দত্ত বিরল নৈপুণ্যে সে প্রয়োজন পূরণ করেছেন। প্রার্থনা করি, তাঁর গবেষণাকর্ম অব্যাহত থাক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে তিনি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করুন। তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য আমি স্বীকার করি। অভিনন্দন জানাই।

মানস মজুমদার

নিবেদন

স্বীকরণের অনাবিল আনন্দে যে কোনো সৃষ্টি, যে কোনো মহৎ প্রয়াস পরিপূর্ণতা পেতে পারে। ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় ছড়িয়ে যেতে পারে তার ব্যাপ্তি। 'সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' - নামক গবেষণা গ্রন্থটির সাফল্য এটুকুই। বিশেষ যুগের কাছে তার ঋণগ্রহণ। সেই যুগের প্রতিটি ঘটনা-বলয়ের সঙ্গে, ঘটন-পটুয়া সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তার আঁতের যোগ। ফলে গোটা গ্রন্থ জুড়েই চলেছে ফেলে আসা একটা শতাব্দীর প্রতি স্বীকৃতি। আবার সেই সুদূর অতীতের সন্ধানে, আরাধনায় যে শ্রম দিতে হয়েছে, শিক্ষাগুরু থেকে গ্রন্থাগার আর আত্মীয়বন্ধুর সহৃদয়তায় তার উত্তাপ শীতল হয়েছে। সুতরাং একটা বিশেষ যুগই নয়, যুগাতিক্রান্তি চলমান জীবন-পারিপার্শ্বের প্রতিও নিবেদিত আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গ্রন্থটিঅষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রচিত। এই ক্রান্তিকালের চালচিত্রে ফুটে উঠেছে সমকালীন সাহিত্যের থেকে পাওয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা বা ধর্মসংক্রান্ত প্রতিমাগুলো। আলোচ্য শতাব্দীর বহুমাত্রিক বিপন্নতা সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কীভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করেছে তার মূল্য-নির্ধারণই এই গ্রন্থের উপজীব্য।

প্রস্তাবনা ছাড়া গ্রন্থটির অধ্যায় সংখ্যা সাত। প্রথম অধ্যায়ে শুধুই ইতিহাসের দুর্যোগপূর্ণ বাতাবরণের বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু সাহিত্যের সঙ্গে সমকালের সংযোগ সাধন। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের স্বরূপটি নির্দেশিত। তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন বিশ্লেষিত। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে সাহিত্যে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা। পঞ্চম অধ্যায়টি ধর্ম-সংক্রান্ত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয়। পরিশেষে উপসংহার। সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে এই শতাব্দী অনাধুনিকের সঙ্গে সমাসন্ন নবীন শতাব্দীর মেলবন্ধন ঘটালো কীভাবে — এ অধ্যায়ে রয়েছে তারই বিবরণ। আসলে আধুনিক আর প্রাগাধুনিকের মধ্যে তফাৎটা ততটা গুণগত নয়, যতটা মাত্রাগত। জীবন-চেতনায়, ভাবের আন্দোলনে পরিশীলিত শিক্ষিত মনের অনাদর-যোগ্য যে মধ্যযুগ নয়, বা হওয়া উচিৎ নয় — পালাবদল-ক্ষণের বাংলা সাহিত্য-চর্চা করে তাই অনুভব করেছি।

অনুভব করলাম আমি। তাকে বাস্তবরূপ দিলাম আমি। কলকাতা বিশ্ববিদালয় প্রদত্ত পি. এইচ. ডি. ডিগ্রিতে সম্মানিত-ও হলাম আমি। কিন্তু ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯-এই দীর্ঘ সময়সীমায় আমার এই 'আমি'-কে অনুপ্রেরণা দিয়ে নির্মাণ করলেন যাঁরা, এই সিদ্ধির অন্তরতম নির্যাসটুকু আদতে তাঁদেরই পাওনা। বিষয়-নির্বাচন থেকে শুরু করে

গবেষণার শেষ দিনটি পর্যন্ত অকাতরে পরামর্শ দিয়ে গেছেন আমার পরম পূজনীয় গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মানস মজুমদার। আলোচ্য গ্রন্থের পরিচায়িকা রচনা করে দিয়ে তিনি গ্রন্থটির মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছেন অনেকখানি। আমার পরম সৌভাগ্য যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আমার মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম। কর্ম-রূপায়ণের প্রতি পলে, চিন্তায়-শঙ্কায়-আনন্দে-উদ্দীপনায় নিয়ত সাহচর্য দিয়ে গেছেন আমার বাবা-মা, আমার স্বামী এবং পরিবারের সকল শুভানুধ্যায়ী। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আমার কর্মক্ষেত্র, হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেক সহকর্মীর আন্তরিক শুভেচ্ছাও ভোলার নয়। প্রচ্ছদটি নির্মাণ করে দিয়েছেন অধ্যাপক কৌশিক ভট্টাচার্য। তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। গবেষণাকালে যে পাঁচটি গ্রন্থাগারের সহায়তা গ্রহণ করেছি সেগুলি হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগাব ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরী এবং হলদিয়া কলেজ লাইব্রেরী। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অগ্রজপ্রতিম গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মুদ্রকরূপে পেয়েছি গণশক্তি প্রিন্টার্সকে। এই প্রসঙ্গে আমার মামা শ্রী সমীর দাশগুপ্তের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা স্বীকার কবতেই হয়। পুস্তক বিপণী পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেও আমাকে বাধিত করেছেন। চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। এজন্য আমি আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী।

এই সামান্য গ্রন্থটিকে রসভোক্তা পাঠকের দরবার সঁপে দিয়ে তাঁদের সুচিন্তিত সমালোচনার প্রত্যাশায় রইলাম।

বিনীতা

প্রস্তাবনা

ইতিহাস সত্যদ্রষ্টা, সংযতবাক এবং অমোঘ। নির্বিকার এবং অনাদ্যন্ত। নিরেট বাস্তবের চলৎ মূর্তি। কালের তথ্যবাহক। যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহের মহাসমগ্রতা ঘটে ইতিহাসে। মহাকালের বিরাট প্রবাহ অনুভূত হয় তার প্রতি বাঁকে। সর্বোপরি ইতিহাস জ্ঞানাত্মক।

অন্যদিকে ইতিহাসের সত্য জীবনরসায়িত হবার পরে তা আর ঐতিহাসিক সত্য থাকে না। যে সত্য কল্পনার সঙ্গে রফা করে - শুধু রফা নয়, যে সত্য কল্পনার নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়, তার নাম সাহিত্য। নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী এই সাহিত্য নামক দুঃসাহসী কল্পনার উদ্বাহু বন্ধনে ধরা দেয় সাগ্রহে। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, ইতিহাসের তথ্যগত সত্য হল বিশেষ সত্য; আর কাব্যাদির সত্য হল কল্পনার সত্য । অর্থাৎ 'সত্য' থাকবেই শুধু তার মাত্রা বদল ঘটবে। কারণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সর্বস্তরেই তন্ময় বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত। একটা পরিকল্পনা থেকে তার শৈল্পিক উপলব্ধি পর্যন্ত। সামাজিক জীবনের প্রতি নিষ্ঠায় ও সত্য দর্শনে একজন ঐতিহাসিকের সঙ্গে একজন শিল্পীর বিষয়, উদ্দেশ্য এবং আদর্শবোধগত ততটা ফারাক নেই; এরই মধ্যে তাঁরা যথাক্রমে তথ্যের আকর এবং সৃষ্টির স্বাধীনতা খুঁজে পান।

তবুও ইতিহাসের তথ্য আর শিল্পের বাস্তব তুল্যমূল্য হতে পারে না। সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও সুখ হল জীবনচিত্র রচনায়। এই চিত্রমালা লাখো মানুষের অন্তরে দোলা লাগায়। সামান্যের মধ্যে অসামান্য, সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে সন্ধান করেন তিনি। প্রতিদিনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে নবীনতা এবং অজানাকে খোঁজেন। তাঁর অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা, সজ্ঞা, কল্পনা এবং উৎসাহ সঞ্চারিত হয় জীবন থেকে। সামাজিক ধারণা, স্বার্থ এবং অনুভূতি যেভাবে তিনি নিজের মধ্যে আহরণ করতে পারবেন, সাহিত্য হবে তেমনই। সুতরাং সাহিত্য কল্পনানির্ভর হলেও জীবন-অতিশায়ী নয়, বরং জীবন-অভিচারী। শুধু ইতিহাসের কঠোর সত্যোচ্চারণের যন্ত্রণা বা তথ্যস্বীকৃতির পরাধীনতাকে সাহিত্যিক অতিক্রম করতে পারেন অনায়াসে। আর তখনই বাঞ্ছিত শিল্পসুখ এবং প্রমুক্তির আনন্দে লেখকের সতীর্থ হন পাঠকও । সুতরাং একটা বিষয় পরিষ্কার। ইতিহাসের কাছে পাঠক যদি খাঁটি সত্য চায় তবে সাহিত্যের কাছে চাইবে সত্য ও কল্পনা বিমিশ্র আনন্দকে । স্বভাবতই ইতিহাস আর সাহিত্যের মেলবন্ধনের কাজ সহজ নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আর বাংলা সাহিত্যকে সামনে রেখে সেই মিশেলের কাজটাই করতে চেয়েছি। ইতিহাসের বিচারে অষ্টাদশ শতাব্দী গুরুত্বপূর্ণ। সময়টা সন্ধিক্ষণ। রাষ্ট্রবিপ্লব আর রাষ্ট্রপরিবর্তনজনিত পালাবদলের সাক্ষী। সেই শঙ্কাদোলায়িত শতবর্ষের উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের অবস্থান ও ভূমিকা নিরূপিত হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে । নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করে দেখা হয়েছে তাকে। বাস্তব সময়কালের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি প্রকোষ্ঠে কিভাবে সন্ধানী রশ্মি নিক্ষেপ

করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, সাহিত্যিকের জীবনালোকে তমাসাচ্ছন্ন কালের রূপ কতখানি স্পষ্টতা পেয়েছে - তারই অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচিত হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আর পঙ্গুতার পরিপ্রেক্ষিতে। শতাব্দী-সূচনায় ঔরঙ্গজেবই দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই আক্ষরিক অর্থে মুঘলসাম্রাজ্যে ধস নামে। ভাঙনের এই দুর্বল জমিতেই বঙ্গভূমিতে নবাবী আমলের প্রতিষ্ঠা। নেতৃত্বে মুর্শিদকুলি খান। এই মুর্শিদকুলি থেকে জিনুদ্দিন আলি খান পর্যন্ত মোট চোদ্দজন নবাব বাংলার মসনদে বসেছেন। কিন্তু সম্ভ্রমের অস্তিত্বে ঢের ফারাক ঘটে গেছে। ফারাক দেখা দিয়েছে যোগ্যতার মানদণ্ডেও। মুর্শিদকুলির মত সক্রিয়তা বাকিদের মধ্যে দেখা যায়নি, এমন কি আলিবর্দ্দীর মধ্যেও নয়। স্নেহের বশীকরণ এর কারণ হতে পারে। নতুবা সিরাজ-উদ্-দৌল্লার মত হঠকারী বিপথগামী ব্যক্তি নবাব হতে পারেন না। পলাশীর যুদ্ধও হয়ত তাহলে প্রচ্ছন্ন ঠাণ্ডা লড়াই হয়েই থাকে। বস্তুত, ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্রের অন্তরালে নরগণের প্রভুত্ব আদায়ের পরিকল্পিত কাঠামো অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল। সমৃদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসকে। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রের এই পরিকাঠামো উদ্ভূত হয়েছিল মুর্শিদকুলির আমল থেকেই। বাংলার প্রথম স্বাধীন এই নবাবের নিজামতে সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ছকে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, তা মোটামুটিভাবে অক্ষুন্ন ছিল পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত। বস্তুত, মুর্শিদকুলির নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রজা শোষণ বেড়েছিল। মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিযুক্তিই এর কারণ। পরবর্তী দু'জন অর্থাৎ জামাতা সুজাউদ্দিন এবং দৌহিত্র সরফরাজ ছিলেন শিথিল শাসক। সামন্তরা এই সুযোগে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এদের ষড়যন্ত্রের সম্মিলিত ফল - আলিবর্দীর নবাবী। স্বভাবতই একদা উপকৃত আলিবর্দী এদের শাসনে রাখতে পারেননি। তাছাড়া ষোল বছরের নবাবীকালে বারটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাঁকে। দেশে শোষণ-পীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল, মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সেদিন আলিবর্দী একজন সেনাপতিও পেলেন না তাঁর সামন্ত-সিপাহীর মধ্য থেকে। অপ্রাপ্তবয়স্ক সিরাজকে করতে হল সেনাপ্রধান। যুদ্ধ প্রহসনের পরে আলিবর্দীকে উড়িষ্যা ছাড়তে হল, বার্ষিক বারলক্ষ টাকা চৌথ প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। মারাঠা শক্তিকে কোনক্রমে ঠেকিয়ে নবাবীর স্বস্তিহীন রোশনাই আরও কিছুকাল ভোগ করলেন আলিবর্দী। তাঁর মৃত্যুর পর নবাবীর অধিকার বর্তালো সিরাজের ওপর।

কালের চাকা স্থির ছিল না। সমাজের সর্বস্তরে এই কুশাসন ও চরিত্রহীনতার পরিণামে দেখা দিল অজস্র দুষ্ট ক্ষত। যুদ্ধ-ছল-প্রতারণা আর লুণ্ঠন-শোষণে মানুষের জীবন-জীবিকা নিরাপত্তা হারিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, বর্ধিত রাজস্ব হার আর বেণিয়া-দালালদের দৌরাত্ম্যে ঘরেও শান্তি ছিল না বাঙালীর। অভাব, পীড়ন আর অনিশ্চয়তায় জনগণের জীবন হয়েছিল দুর্বিষহ।

এরই মধ্যে ঘটে গেল পলাশীর প্রহসন। শাসক বদল হল। পালটে গেল নীতি, পরিবর্তিত হল রীতি, জয়যাত্রা আরম্ভ হল বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির। বিশ্বাস ভঙ্গে মীরজাফরের সহযোগী,সমকক্ষ ও পরিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী মীরকাশিম ঘুষে লব্ধ নবাবী করতে গিয়ে টের পেলেন নিজের অবস্থা। জাল ততক্ষণে ইংরেজ প্রায় গুটিয়ে এনেছে। ফাঁদ পাতার দ্বার বন্ধ। পরিণাম স্বভাবতই মৃত্যু।

ইংরেজ বণিক শক্তি পঁচিশ রছর ধরে স্থির করতে পারছিল না শাসন করবে না শোষণ করবে। ফলে ১৭৯৩খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলল এক প্রকারের দ্বৈত শাসনের সংকর প্রয়োগ। শাসন ও লুণ্ঠন যাতে সমান হারেই বজায় ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়াবতে সেই শোষণ চূড়ান্ত রূপ নেয়। ফলশ্রুতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। পুরুষ ও প্রকৃতির এমন নির্মম যোগসাজশ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এ কেবল দুর্ভিক্ষ নয়, মহামারী, যা অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল দেহের-মনের-আত্মার। পুনর্বার ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক ভূমি বা রাজস্ব ব্যবস্থায় বর্ধিষ্ণু হিন্দুর সর্বস্ব গেল। জমিদারী নিলাম হল, ক্রেতা যার গোমস্তা-বাণিয়া-ফড়িয়া। আর এই ভূমি ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে মহাজন ও দুর্ভিক্ষ কবলিত চাষীরা বাঁচার তাগিদে মরিয়া হয়ে স্থানিকভাবে দস্যুতার ছদ্মবেশে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের জন্ম দিতে লাগল একের পর এক। জীবনের অপচয়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল একটা শতাব্দী।

লেখক কখনই বিমুক্ত নন। তিনি যখন অসম্ভব-অঘটনের শোভাযাত্রা কাহিনীভূমিতে প্রবেশ কবান, সেখানেও একটা বাস্তব বোধ কাজ করে। শিল্পী তাঁর কৃতকর্মের জন্য পাঠক বা শ্রোতার কাছে প্রার্থী হয়েই থাকেন। তাঁকে যুগের লক্ষ্মণরেখা মানতেই হয়। ফলে পাঠক, শ্রোতা ও লিপিকরের সংখ্যাধিক্যে জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। নিজের কথা, দেশের কথা পাঁচজনকে শুনিয়ে তৃপ্তি আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে সেই তৃপ্তিটুকুই সন্ধান করা হয়েছে। সমকালকে তাঁরা কতটা অনুভব করেছেন এবং শৈল্পিক সাধনায় বাঙ্ময়তা দিয়েছেন তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এমনিতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বহিরাবরণিক প্রথা মেনে একটা দৈবী প্রচ্ছদ এই শতাব্দীর আপামর সব সাহিত্যেই অটুট ছিল। তবু বিষয়ের দৈন্য কিংবা আঙ্গিকের একঘেয়েমির মধ্যে অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যেই লক্ষ্য করা গেল যুগ-স্বীকৃতির তাড়না। এযুগের সব সাহিত্যিকই যে যুগ-সচেতন ছিলেন তা নয়, কিন্তু অনেকেই ছিলেন অব্যবস্থিত-চিত্ত যুগের শিকার। তাই ব্যক্তিগত জীবনের অশ্লেষা নিজেদের স্বরচিত কাব্যে উল্কা পতনের গ্লানিময় চমক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে ক'জন সাহিত্যিকই বা সমকালীন ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত ? বিশ্বস্ত হলে তার নজির এত বিরল কেন ? উত্তরে বলতে পারি, প্রথমত, ব্যাপ্ত চরাচর ইতিহাসের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনাবলী যেমন সমসাময়িক সাহিত্যের কোনো কোনো অংশে আছে, তেমনি আছে ইতিহাসের অকথিত কিছু ইন্দ্রিয়বেদ্য ঘটনা। রাজকীয় বর্ণচ্ছটার আড়ালে যার উদ্ভব ও বিকাশ। যা শুধুই লোকজীবন সম্ভূত। তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ইতিহাসের

যে প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যকে অবলোকন করেছি তার স্বরূপটি দ্বৈত। একদিকে সে ইতিহাস রাজ-রাজড়ার উত্থান - পতনের ইতিবৃত্ত রচয়িতা। ষড়যন্ত্র-লালসা-প্রভুত্বের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। মহাবিপ্লব-মহামন্বন্তরের কাহিনী-কথক। অন্যদিকে সে শুধু গণমানুষের চারণ কবি। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন সন্ধানের পাশাপাশি জনগণের অনুচ্চ-অনুভূত প্রতিক্রিয়াহীন জীবনযাপনের অন্তর্লীন ছন্দকেও বোঝার চেষ্টা চলেছে। সমকালীন সাহিত্যের আশ্রয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব বা রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের সার্বজনিক ছবি এখানে যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি ক্ষীণ মন্থরা লোকজীবনের ঢিমে তালটুকুও তুচ্ছ করা হয়নি। সাধাবণ মানুষের রাজনৈতিক বিপন্নতা, আর্থিক শোষণ-পীড়ন ও বুভুক্ষা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতার লড়াই, তাদের প্রথা-সংস্কার, আলস্য, উদ্দীপনা — এক কথায় গণ জীবনের সরলরৈখিক কালযাপনের নিহিত বিস্তারকেও রাষ্ট্রীয় উত্তাল পালাবদলের সমগ্রামে সুরারোপ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভেব বিশিষ্টতা এখানেই।

প্রথম অধ্যায়
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমির ইতিহাস বেদনাভারাক্রান্ত। গোটা শতাব্দী ধরেই চলেছে ষড়যন্ত্র, লালসা, ক্ষমতার লড়াই আর নির্বিচার শোষণ। ভারতবর্ষে বিদেশীর আগমন নতুন নয়, বরং বাঙালীরা চিরকালই বিদেশী ও বিজাতি-শাসিত। সপ্তম শতাব্দীর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর যদু জালালুদ্দীন ছাড়া বঙ্গভূমিব কোনো শাসকই এদেশীয় ছিলেন না। তবুও ইংরেজ আগমনেব পূর্ব পর্যন্ত যে মুসলমানেরা এদেশে এসেছিলেন তাঁরা শুধুই বাণিজ্যের পথ ধরে বিনীত মুখেশের অন্তরালে আততায়ীর ভূমিকায় আসেননি। ফলে বঙ্গভূমির জনগণের পক্ষেও এঁদেব স্বরূপ নির্নয় করা কঠিন হয়নি। এমনকি ক্রমশঃ এদেশের মানুষদের সঙ্গে এঁবা একাত্ম হয়ে পড়তে চেয়েছেন। অন্যদিকে ইংরেজরা শুধুই বণিক; ছলনা - শঠতা-প্রতারণার দ্বারা ভারতবর্ষের নিহিত ঐশ্বর্যের সর্বস্বাপহরণকারী। পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে মুসলমান এবং ইংরেজ - এই দুই শাসকশক্তির সঙ্গেই পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়।

প্রথম মুঘল বিজয়ের সময় বঙ্গভূমির রাজধানী ছিল তাঁড়ায়। দূষিত আবহাওয়ার জন্য ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় (সুলতানি আমলের লখনৌতি) আগেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ তাঁড়া থেকে রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে আনেন। আবুল ফজল তাঁর 'আকবরনামায়' বলেছেন যে, মানসিংহ বাংলায় এসে রাজধানী স্থাপনের জন্য এমন একটি স্থানের কথা চিন্তা করেছিলেন যা নৌ-আক্রমণ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত হবে। এবং সেইকারণে তিনি আকমহল (রাজমহল) কে নির্বাচিত করেন। শীঘ্রই এখানে একটি সুন্দর শহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানসিংহ এর নাম দেন 'আকবর নগর'। কিন্তু ইসলাম খান চিশ্‌তি আবার সামরিক কারণে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঢাকা প্রায় একশ বছর ধরে রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে।

এই সময় পর্বের মধ্যেই প্রথমে শাহসুজা এবং পরে শাহাজাদা আজিমউদ্দিন যথাক্রমে রাজমহলে এবং পাটনায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে সুজা রাজমহলে গেলেও সেখানে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাটনার কিছু অংশের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাদশাহ তাঁর এ সাধ পূর্ণ করেননি। অন্যদিকে শাহজাদা আজিমউদ্দিন (আজিম-উশ-শান) ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বঙ্গভূমির শাসনভার গ্রহণ করলেন। পরবর্তী তিন বছর তিনি স্বাধীনভাবে শাসন করলেও ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। ইনিই

নতুন প্রাদেশিক দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ - নবাবী যুগের কর্ণধার। এর পূর্বনাম ছিল মহম্মদ হাদী। হাজি শাফি ইসপাহানি নামক এক মুসলমানের কাছে তিনি শিশুকাল থেকে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শাফি ইস্‌পাহানির মৃত্যুর পর মহম্মদ হাদী বেরার প্রদেশের দেওয়ান হাজী আবদুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে নিযুক্ত হন। খোরাসানীর অধীনে কর্মে নিযুক্ত থাকাকালে হাদী দেওয়ানী সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর খ্যাতি অবশেষে ঔরঙ্গজেবের কাছেও পৌঁছায়। ঔরঙ্গজেব হাদীকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন (১৬৯৬), এবং অতঃপর তাঁর দূরদর্শিতা ও কর্মনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্গঠিন ও রাজস্ব সংস্কারের জন্য বাংলার দেওয়ান করে দেন (১৭০০)।

দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা এবং তাঁর কার্যাদির জন্য তিনি একমাত্র সম্রাটের নিকট দায়ী থাকতেন। বস্তুত, শাসনবিভাগে সুবাদারের পরেই ছিল দেওয়ানের স্থান। কিন্তু দেওয়ানের উপর তিনি কোনো কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে এলে বঙ্গভূমির সুবাদার আজিম-উস-শান ও অপরাপর কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল। সম্রাটের অনুগ্রহ ও সমর্থনপুষ্ট মুর্শিদকুলি এককথায় বাংলার মোগল কর্মচারীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা নানাভাবে তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন। এইসময় ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে শুধুই বিশৃঙ্খলা আর ষড়যন্ত্রের ঘনঘটা। আজিমউদ্দিন বাংলার সুবাদারিলাভের পর থেকেই এই সমৃদ্ধশালী প্রদেশে অর্থোপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানিকে একটি নিশান বা অনুমতি পত্র দেন, যার দ্বারা কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা নামক গ্রাম তিনটি খরিদ করার অধিকার লাভ করে।[১] ইংরেজরা এই তিনটি গ্রামের খরিদাস্বত্বকে সর্বদা জমিদারিস্বত্বরূপে অভিহিত করতো। অল্পদিন আগে শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ এবং এখন তিনটি গ্রাম ক্রয় করার ফলে ইংরেজরা বাংলায় নিরাপদে থাকতে শুরু করে। নিছক ব্যবসায়ী থেকে তারা এখন মুঘল শাসনের অংশীদারে পরিণত হয় এবং মুঘল প্রজাদের মতো তাদেরও সুযোগ-সুবিধালাভের পথ প্রশস্ত হয়। যদিও আজিম-উশ-শানের পুত্র ফারুকশিয়র ১৭১৭ সালে এক ফরমানবলে (এই ফরমানের একখানি ফার্সি নকল পাওয়া যায়) ইংরেজ কোম্পানিকে আরো অনেক সুযোগ -সুবিধা প্রদান করেন, তথাপি মুর্শিদকুলি খাঁ এই সুযোগ-সুবিধার অনেক কিছুই ইংরেজদের দিতে অস্বীকৃত হন। তাঁর এই অস্বীকৃতি প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধকে জিইয়ে রাখে। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংরেজেরা সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যার সূত্রপাত আজিমউদ্দিনের সুবাদারির সময় হয়েছিল।

সুযোগ দেবার বিনিময়ে বণিকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা ছাড়াও শাহাজাদা তাঁর অনুচরদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ব্যবসার নামে একচেটিয়া স্বৈরাচার আরম্ভ করেন। এর বৈশিষ্ট্য হলো পণ্য-দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্থানে বা আমদানির পর বন্দরে খরিদ করে চড়াদামে বিক্রি করা হত। ফলে মুনাফার হার ছিল বেশি। তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত ব্যবসার নাম দেন 'সাওদা-ই-খাস' বা শাহ্জাদার ব্যক্তিগত ব্যবসা। পূর্ববর্তী সুবাদারগণ (শাহসুজা, মীর-জুমলা, সায়েস্তা খাঁ প্রমুখ) অবশ্য এই জাতীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশের কৃষক-বণিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। তিনি এই সব সংবাদ এবং তাঁর প্রতি সুবাদার ও তাঁর সহযোগীদের ঈর্ষাতুর মানসিকতার কথা জানান ঔরঙ্গজেবকে। বাদশাহ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে শাহজাদা আজিমউদ্দিনকে ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তাঁর মনসব বা পদমর্যাদাও এক হাজার কমিয়ে দেওয়া হয়।[২] শাহাজাদা আজিমউদ্দিনের সন্দেহ থাকে না যে দেওয়ানই তাঁর কর্মকান্ড বাদশাহের গোচরে এনেছেন। তাছাড়া মুর্শিদকুলি, রাজস্ব এবং অর্থসংক্রান্ত আইন-কানুনও কড়াকড়িভাবে আরোপ করেন। ফলে এই ব্যাপারে সুবাদারের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায়। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সুবাদার ও দেওয়ানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনাই আজিমউদ্দিনের স্বার্থ ও অহমিকায় চূড়ান্ত আঘাত হানে। তিনি মুর্শিদকুলিকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন রেসেলদার সেনানীর অধীনস্থ একদল দুর্বৃত্ত নগদী সৈন্যের সহায়তায় মুর্শিদকুলিকে হত্যার নাটকীয় পরিবেশও সৃষ্টি হল। কিন্তু বাধ সাধলেন স্বয়ং মুর্শিদকুলি। আজিমুদ্দিনকে হাতে-নাতে ধরে তাঁকে ক্ষমাপ্রার্থী হতে বাধ্য করলেন।[৩]

প্রদেশের সর্বোচ্চ পদধারী দুই কর্মকর্তার এই বিবাদের দুটি সুদূরপ্রসারী ফল দেখা যায়। প্রথমত মুর্শিদকুলি খান এই ঘটনার কথা সম্রাটকে জানালে সম্রাট শাহজাহাকে ঢাকা ছেড়ে পাটনায় চলে যাবার নির্দেশ দেন।[৪] সুবাদার পাটনায় স্থানান্তরিত হলে বাংলায় সুবাদারের অনুপস্থিতির যুগ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়ত, দেওয়ান ও তাঁর দেওয়ানী দফতর ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। এই মকসুদাবাদই পরে মুর্শিদকুলির নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হয়। বাংলার ইতিহাসে দেওয়ানী দফতরের এই স্থান পরিবর্তনের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসনতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডও ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। কারণ শেষোক্ত শহরটি প্রথমে দেওয়ানের কর্মস্থল হলেও অল্পদিনের মধ্যে সুবাদারের কর্মস্থলে অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হয়। এই নতুন রাজধানী ছিল হুগলী বন্দরের সন্নিকটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ অংশ এই হুগলী

বন্দর নিয়ন্ত্রণ করত। তাছাড়া উড়িষ্যা এবং বিহারের শাসনক্ষমতা পরবর্তীকালে বাংলার সুবাদারের উপর ন্যস্ত হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে তিনটি প্রদেশ এবং হুগলী বন্দরের প্রতি লক্ষ্য রাখা সুবাদারের পক্ষে সহজ হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খান এবং পরবর্তী সুবাদারদের সময় মুর্শিদাবাদ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এবং এই রাজধানীতেই মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

আগেই বলেছি, এই প্রদেশে সুবাদারের অনুপস্থিতির ফলে দেওয়ান মুর্শিদকুলি প্রদেশে সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ সর্বদা অক্ষুন্ন ছিল। ফলে উত্তরোত্তর তাঁর দায়িত্বও বাড়তে থাকে। প্রথমে তিনি বঙ্গভূমির দেওয়ান এবং একই সঙ্গে মকসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন। এর পাশাপাশি তাঁকে সুবাদারের সঙ্গে জায়গীরের দেওয়ানও নিযুক্ত করা হয়। ১৭০৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং কিছুদিনের মধ্যে ঐ প্রদেশের সুবাদারীও লাভ করেন। তাঁর মনসব বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিহারের দেওয়ানীও লাভ করেন। 'আহ্‌কাম-ই-আলমগীরী' থেকে জানতে পারি যে, এইসব দায়িত্ব তিনি একসঙ্গে পালন করতেন। সুতরাং মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর নিযুক্তির প্রথম চার বছরের মধ্যে উড়িষ্যার সুবাদার, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান এবং পাঁচটি সরকারের ফৌজদারের পদ অর্জন করেছিলেন। এই নিযুক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব কতটা সুনজরে তাঁকে দেখতেন।

শুধু নিজের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেই মুর্শিদকুলি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদেরও সুযোগ্য পদ দান করতেন বাদ্‌শাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। যেমন মুর্শিদকুলিব অনুরোধে সৈয়দ আকরাম খান এবং শুজাউদ্দিন মহম্মদ খানকে যথাক্রমে বাংলা ও উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। বিহারেও তিনি স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এছাড়া তারই সুপারিশে আবদুর রহিমকে নৌয়ারা বিভাগের দারোগা নিযুক্ত করা হয় এবং সলিমুল্লাহ ও মহম্মদ খলিল নামক দুজন ওয়াকিয়ানবিশকে বরখাস্ত করা হয়।১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানের কয়েকজন আত্মীয় ইরান থেকে দিল্লীতে আসেন; এবং মুর্শিদকুলির আবেদনে সম্রাট তাঁদের প্রত্যেককে বাংলায় বিভিন্ন পদে নিযুক্তি দান করেন।

ঔরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আজিমউদ্দিনকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান এবং আজিমের দুই পুত্র ফারুখশিয়র ও করিমউদ্দিনকে যথাক্রমে বাংলা ও বিহারে থাকার নির্দেশ দেন। মুর্শিদকুলির মর্যাদা এতে আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ, সুবাদারের অনুপস্থিতিতে তাঁকে সুবাদারের দায়িত্ব পালন করার এবং ফারুখশিয়ব ও করিমউদ্দিনকে তাঁর পরামর্শমাফিক কাজ করাব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং,

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর আগেই মুর্শিদকুলি খাঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ঔরঙ্গজেব ১৭০৭ খ্রীঃ ৩রা মার্চ দাক্ষিণাত্যের শিবিরে পরলোক গমন করেন।

এর পরেই শুরু হয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ। ঔরঙ্গজেবের তিন পুত্রই যুদ্ধে অংশ নেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মুয়াজ্জম জয়লাভ করেন এবং শাহআলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন। নতুন সম্রাটের পুত্র হবার সুবাদে শাহজাদা আজিমউদ্দিন পুনরায় প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁর মনসববৃদ্ধি করা হয় এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের সুবাদারের পদও দেওযা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই পূর্ব প্রতিশোধের জের তুলতে আজিম-উদ-দিন মুর্শিদকুলিকে বঙ্গভূমি থেকে অপসারণ করিয়ে সুদুর দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। প্রায় দু-বছর (১৭০৮-৯) মুর্শিদকুলি সেখানে কাটান। তবে শীঘ্রই তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় কাটে।

আজিমউদ্দিন যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হলেও পূর্বের মতই প্রদেশগুলিতে অনুপস্থিত থেকে প্রতিনিধি মারফত প্রদেশগুলি শাসন করতে থাকেন। কিন্তু শাহজাদার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সফল হয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে নতুন করে দলাদলি এবং ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক রাজপুত্রই অন্য ভাইদের বিরুদ্ধে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে দু'জন -- মুইজউদ্দিন এবং আজিমউদ্দিন তাঁদের পিতামহের সময় দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এঁরা সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দলভুক্ত করতে সচেষ্ট হন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের বৃদ্ধ পিতার আসন্ন মৃতুর পরেই আবার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বাঁধবে এবং তখন ঐ সব কর্মকর্তাদের সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এই একই কারণে, আজিমউদ্দিম মুর্শিদকুলির সঙ্গে তাঁর পূর্ব শত্রুতার অবসান কামনা করেন এবং তাঁকে পূর্বের সকল পদে বহাল রেখেই বঙ্গভূমিতে ফিরিয়ে আনেন।

মুর্শিদকুলি খানের সৌভাগ্য দেখে আবার আগের মতই তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার তোড়জোর চলে। বিশেষ করে হুগলীব ফৌজদার জিয়াউদ্দিন খাঁ তাঁকে সরিয়ে দেবার সর্ববিধ চেষ্টা করেন। জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে মুর্শিদকুলির বিরোধ পর্বেই দিল্লীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সূত্রপাত হয়। সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ ১৭১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে পরলোক গমন করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর যথারীতি মসনদের লড়াই শুরু হয় এবং যুদ্ধে তাঁর চার পুত্রই অংশগ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় বঙ্গভূমিতে মুর্শিদকুলি খাঁ তৎক্ষণাৎ আজিমউদ্দিনকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন এবং খোৎবা পাঠ করেন। মুর্শিদিকুলি খাঁ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদকেও সুরক্ষিত করেন এবং ইংরেজ কোম্পানীর উক্ত প্রতিবেদনেই জানা যায় যে, তিনি কামান, ঘোড়া ও হাতিগুলিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখেন। সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করেদেন এবং নিজের

নিরাপত্তার জন্য রাজধানী ছাড়াও কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত করেন।

কিন্তু এত প্রস্তুতি সত্ত্বেও উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজিমউদ্দিন পরাজিত হন এবং পরলোকগত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুইজউদ্দিন জাহান্দার শাহ যুদ্ধে জয়লাভ করে সিংহাসনে বসেন। মুর্শিদকুলি খাঁ যুদ্ধের ফলাফল মেনে নেন এবং নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলার রাজস্ব তাঁর কাছে পাঠান। সকলেই যখন আশা করছিল যে, যুদ্ধের অবসানে বঙ্গভূমিসহ সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে, ঠিক তখনই আজিমউদ্দিনের পুত্র ফারুখশিয়র পাটনার সিংহাসনে বসেন এবং সম্রাট জাহান্দার শাহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বে দুটি উত্তরাধিকারের যুদ্ধে বাংলা প্রদেশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না। কিন্তু এবার মুর্শিদকুলি ফারুখশিয়রের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হন। ফলে সবদিক থেকেই ফারুখশিয়রের সিংহাসনে আরোহন ছিল অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার মত। তাঁর না ছিল লোকবল, না ছিল অর্থবল। পিতা আজিমউদ্দিনের পরাজয়ের পর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই নিজেকে নিরাপদ করার জন্য তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেন। অনেক সাধ্য সাধনার পর ফারুখশিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় -- সৈয়দ আবদুল্লাহ খান এবং সৈযদ হোসেন আলি খানকে নিজ সমর্থনে আনেন। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে এলাহাবাদ ও বিহারের ডেপুটি গর্ভনর। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থসংগ্রহ করা ফারুখশিয়রের পক্ষে এক বিরাট সমস্যা হযে দাঁড়ায়। মুর্শিদকুলির কাছে তিনি বাংলা এবং বিহারের রাজস্ব দাবিকবেন; কিন্তু পান না। কারণ মুর্শিদকুলিব অভিমত হল, তৈমুর বংশের যিনিই দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তিনি তাঁর প্রতিই অনুগত থাকবেন — কিন্তু ফারুখশিয়র এখন সিংহাসনের দাবিদার মাত্র। ফলে মুর্শিদকুলির সঙ্গে ফারুখশিয়রের বিবাদ ঘনীভূত হয়।[৫]

মুইজউদ্দিন জাহান্দার শাহকে পরাজিত ক'রে ১৭১৩ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন ফারুখশিয়র। মুর্শিদকুলি খাঁও সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাদ্‌শাহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। আর অন্যদিকে ফারুখশিয়রের উত্তরাধিকারের যুদ্ধে মুর্শিদকুলি কোনো সহায়তা না করলেও তিনি মুর্শিদকুলিকে অপসারণ করার মনোভাব আদৌ স্থাপন করলেন না। বরং জাফর খাঁ নাসিরী উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে বাংলার দেওয়ান এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও দেওয়ান পদে পুনর্বহাল করলেন। স্বভাবতই মনে হতে পারে, এর কারণ কি ? আসলে ফারুখশিয়র সিংহাসনে বসার পর দিল্লীতে রাজনীতি নতুন মোড় নিয়েছিল। প্রাক্তন উজির ও উচ্চপদস্ত কর্মকর্তারা পদচ্যুত হয়েছিলেন এবং উত্তরাধিকারের যুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য- কারী এবং সম্রাটের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই নতুন কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিলনা। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে দলাদলি আরম্ভ করেন। একদিকে ছিলেন সৈযদ ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁদের সমরনৈপুণ্যে ফারুখশিয়র ক্ষমতা লাভ করেন, অন্য দিকে ছিলেন খাজা আসেম (খান-ই-দৌরান) এবং কাজি ইবাদুল্লাহ (মীর জুমলা)।

এঁরা ছিলেন ফারুখশিয়রের বন্ধুস্থানীয়। এছাড়া আরো ছিল তুরাণী কর্মকর্তা, যাদের নেতা নিজাম-উল্-মুল্‌ক মুহাম্মদ আজিম খান। এঁরা প্রত্যেকেই প্রচুর লোকবল ও সৈন্যসহ কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ যথার্থই নিরপেক্ষ, দিল্লীর মসনদের তথা তৈমুর বংশের একান্ত অনুগত এবং দক্ষ কর্মকর্তা, যিনি নিয়মিত হারে মোটা রাজস্ব প্রেরণ ক'রে সম্রাটকে বিশেষ সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া সম্রাট নিজেও তেরো বছর বয়স থেকে বঙ্গভূমিতে ছিলেন এবং কিছু সময় মুর্শিদকুলির তত্ত্বাবধানে কাজও করে ছিলেন। এই কারণে বুদ্ধিমান ফারুখশিয়র তাঁর প্রতি সুবিচার করেন এবং তাঁকে পদোন্নতি দেন। সম্রাটের শিশুপুত্র ফরখুন্দাশিয়র নামেমাত্র বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং মুর্শিদকুলি তাঁর প্রতিনিধিরূপে সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ফরখুন্দাশিয়রের মৃত্যু হলে মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি কর্মস্থলে বেশীরভাগ দিনই অনুপস্থিত থাকায় মুর্শিদকুলি খাঁই তাঁর পক্ষে ডেপুটি সুবাদারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ে মুর্শিদকুলি খানের ভাগ্য আরো সুপ্রসন্ন হয়। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মনে করতেন যে, বাংলায় অনুপস্থিত সুবাদার মীরজুমলাই ছিলেন তাদের প্রধান শত্রু। তাই তাঁরা সম্রাটের কাছে মীরজুমলাকে রাজধানী থেকে অপসারণের দাবি জানান। ফারুখশিয়র এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। তিনি মীর জুমলাকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করে পাটনায় যাবার নির্দেশ দেন। ১৭১৫ সালের এপ্রিল মাসে মীর জুমলা পাটনার দিকে যাত্রা করেন কিন্তু রাজধানীর বাইরে থাকতে অপছন্দ করায় আবার দিল্লী ফিরে আসেন। যাবার পথে বাংলা থেকে প্রেরিত রাজস্ব তিনি বলপূর্বক নষ্ট করেন এবং আত্মসাৎ করেন। ঘটনাটি সম্রাটের গোচরীভূত হলে মীর জুমলাকে তিনি বাংলার, সুবাদারী থেকে অপসারণ করেন এবং পরিবর্তে মুর্শিদকুলি খানকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি সম্রাট কর্তৃক 'মুতাসিনউল মুল্‌ক আলাউদ্দৌলা জাফরখান বাহাদুর নাসিরী নাসিরজঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হন এবং তার মনসব সাত হাজারে উন্নীত করা হয়। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় অবশ্য অন্য কথা বলেন -- '১৭১৭ সালের ১৯ শে অক্টোবর মুর্শিদকুলী খাঁ বাদশা ফররুখসিয়রকে এক লাখ টাকা নজরানা দিয়ে বাংলার সুবেদারি পদের পরোয়ানা আনিয়ে নিলেন। তখন থেকে নবাবের সরকারি নাম হল জাফর খাঁ।' যাইহোক এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত স্মরণীয় ঘটনা।

মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারি লাভের মধ্যে দিয়ে বঙ্গভূমিতে অনুপস্থিত সুবাদারের ঐতিহ্য শেষ হয়। এছাড়া এই সময় থেকে ধীরে ধীরে কেন্দ্র বাংলায় কর্মকর্তা নিয়োগ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে গোটা প্রাদেশিক শাসন সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের কুক্ষিগত

হয়। সূত্রপাত হয় 'নবাবী আমল' এর। বাংলার প্রশাসনিক কর্মকান্ড নবাবকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। মুর্শিদকুলি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর নিকট আত্মীয়দের এবং অন্যান্য পদে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের নিযুক্তি দেন। প্রথমত, জামাতা শুজাউদ্দিনকে তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম করেন। মুর্শিদকুলির মৃত্যু পর্যন্ত শুজাউদ্দিন এই পদে বহাল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঢাকায়ও তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এখানকার নায়েব নাজিমদের মধ্যে খান মেনদী (মুহাম্মদ) আলী খান এবং ইহতিশাম খানের নাম পাওয়া যায়। ইহতিশাম খানের পর তাঁর পুত্র (নাম পাওয়া যায় না) নিযুক্ত হন। এই ইহতিশাম মুর্শিদকুলির আত্মীয় ছিলেন। তৃতীয়ত, ফৌজদাররাও নিযুক্ত হয়েছিলেন মুর্শিদকুলির ইচ্ছানুসারে। যেমন শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের পুত্র মুহম্মদ তকী এবং অপর পুত্র, মুর্শিদকুলির দৌহিত্র সরফরাজ খান (বৈমাত্রেয় ভাই) ১৭১৩ সাল থেকে মুর্শিদকুলির মৃত্যু পর্যন্ত বালেশ্বরের ফৌজদার ছিলেন। মুর্শিদাবাদের ফৌজদার মুহম্মদজান (আনুঃ ১৭১৩-১৭২০ খ্রীঃ) এবং হুগলীর আহসানউল্লাহ খান মুর্শিদকুলির অত্যন্ত প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন কর্মকর্তা ছিলেন। এছাড়া হুগলীতে ওয়ালী বেগ, মীর আবু তালিব এবং মীর নাসির মুর্শিদকুলি খানের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে ফৌজদারের দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ণিয়ার ফৌজদার সাইফ খানকেও নবাবের সুপারিশে নিযুক্ত করা হয়। ভূষণায় প্রথমে আবু তোরাব এবং তাঁর মৃত্যুর পর বখশ আলি খানকে ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি মুর্শিদকুলি খানের ভগ্নিপতি ছিলেন।

এই সময় প্রশাসনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা হল হিন্দু কর্মকর্তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। উচ্চতর পদগুলি মুসলমানদের মধ্যে সংরক্ষিত থাকলেও নিম্ন ও মধ্যস্তরে, বিশেষ করে দেওয়ানী বিভাগে হিন্দু কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রাধান্য দেখা যায়। রাজস্ব সংগ্রহের কর্মকর্তা বা আমিনদের মধ্যে লাহোরী মল, মৃত্যুঞ্জয় এবং রঘুনন্দনের নাম বার বার পাওয়া যায়। সলিমুল্লার 'তারিখ ই বঙ্গালা' এবং যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'এ এর সমর্থন পাই। এছাড়া ১৭৮৭ সালের কানুনগো রিপোর্টে যে সব কানুনগোর নাম পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু।[১১] কানুনগো যেহেতু উত্তরাধিকারসূত্রে নিযুক্ত হত, সেহেতু বলাযায় যে, আঠারো শতকের প্রথমদিকে বা মুসলিম আমলে সকল কানুনগোই ছিলেন হিন্দু। ফলে মুর্শিদকুলি খানের সময়ে প্রশাসন হিন্দুদের সমর্থন লাভ করে। হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে মুর্শিদকুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

মুঘল প্রাদেশিক শাসনের মূলনীতি অনুযায়ী প্রদেশে দুজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তার নিযুক্তি হত, যাঁদের একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতেন। এ দু'জন হলেন সুবাদার বা নাজিম এবং দেওয়ান। সুবাদার ছিলেন

প্রশাসনিক এবং সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা এবং দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের প্রধান। এঁরা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালীবিধিসহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। সম্রাট আকবর সর্বপ্রথম এই নীতি প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজত্বের ৪০তম বর্ষে তিনি দেওয়ানকে সুবাদারের অধীনতা থেকে মুক্ত করে প্রাদেশিক দেওয়ানকে কেন্দ্রীয় দেওয়ানী দফতরের সরাসরি অধীনস্থ করেন। ঔরঙ্গজেবের সময় সুবাদার এবং দেওয়ানের ক্ষমতা ও দায়িত্বের পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয় এবং এঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই নীতির মূলকথা ছিল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ প্রদেশের দুই প্রধান কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এক-কে দিয়ে অন্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখানো। এছাড়া ঔরঙ্গজেব সদর কানুনগোর পদ সৃষ্টি করেন প্রাদেশিক দেওয়ানের আচার-আচরণ লক্ষ্য করার জন্য। কিন্তু শাসন ব্যবস্থার এই হিতকর নীতি ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অপসৃত হয় এবং দেখা যায় ১৭০৭-এর মাত্র কয়েক বছর পরেই মুর্শিদকুলি খান সুবা বাংলার সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেছেন। বাংলার নবাবি আমলের রাজনীতির এটাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়।

এই বিরাট পদাধিকারের বলেই বোধ হয় মুর্শিদকুলি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ কোম্পানী সতেরো শতকের শেষ পাদ থেকে ক্রমে ক্রমে তাদের প্রতিরক্ষা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। প্রথমে তারা শোভাসিংহ এবং রহিম খানের বিদ্রোহের সুযোগে তাদের কুঠিতে দুর্গ তৈরি করে। এরপর সুবাদার আজিমউদ্দিনকে প্রভূত অর্থ দিয়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং কলকাতা গ্রাম তিনটি খরিদ করার অনুমতি লাভ করে। আরো পরে, ১৭১৭ সালের জুন মাসে সুরম্যান সাহেবের প্রতিনিধিত্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ ফারুখশিয়রের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করে। এর দ্বারা কোম্পানী বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী হয়। যেমন - (ক) বিনা শুল্কে টাকশাল ব্যবহার করা, (খ) কলকাতার চতুর্দিকে আরো আটত্রিশটি গ্রাম খরিদ করা ইত্যাদি। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান কোম্পানীকে সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতে অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সুখপাঠ্য ঐতিহাসিক কাহিনীর অবতারনা করেছেন।

আসলে, বিচক্ষণ মুর্শিদকুলি বোধহয় উপলব্ধি করেছিলেন এদেশে ইংরেজ আধিপত্যের স্বরূপ কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই তিনি কোম্পানীর সমস্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে ইংরেজ কোম্পানীও নবাবের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আবদুল করিম তাই বলেছেন যে, 'মুর্শিদকুলির আচরণই প্রাদেশিক সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'[৯] মুর্শিদকুলির সময় এই শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও তিনি সুকৌশলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে এরা সকলেই প্রাদেশিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে বাংলার রাজনীতিতে যুগান্তকারী ভূমিকা নেয়।

মুর্শিদকুলি খান ১৭২৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিলনা। এই কারণে এবং বিশেষ করে মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণে এই সময় থেকেই বঙ্গভূমিতে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়। মুর্শিদকুলি অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে। নিজের মৃত্যু আসন্ন উপলব্ধি করে তিনি সরফরাজ খানকে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিয়োগের জন্য সম্রাটের কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাদশাহী অনুমোদন লাভের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে মুর্শিদকুলির জামাতা তথা সরফরাজের পিতা এবং উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর শুজাউদ্দিন মহম্মদ খানও নবাবী লাভের আশা রাখতেন। শুজাউদ্দিন তুর্কী বংশোদ্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইরানে উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর পিতা মুঘল সাম্রাজ্যের বুরহানপুরে চাকরি করতেন। বুরহানপুরেই ইনি মুর্শিদকুলির সঙ্গে পরিচিত হন, এবং তাঁর কন্যা জিনাত-উন-নিসাকে বিবাহ করেন। তাঁদেরই সন্তান সরফরাজ খান। আমরা জানি, মুর্শিদকুলি বাংলা ও উড়িষ্যার নাজিম এবং দেওয়ান নিযুক্ত হলে তাঁর জামাতাকে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণরের পদটি দেন। তখন থেকেই শুজাউদ্দিন উড়িষ্যায় ছিলেন। কিন্তু শ্বশুর জামাতার মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। মুর্শিদকুলি ছিলেন অসম্ভব মিতাচারী এবং সংযতচরিত্র, অন্যদিকে শুজাউদ্দিন অতিশয় আড়ম্বরপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিলাসী। এছাড়া জিনাত-উন-নিসার সঙ্গে শুজাউদ্দিনের দাম্পত্য সম্পর্কও খুব সুখের ছিল না। এমতাবস্থায় অপুত্রক মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকে সুবাদার নিযুক্ত না করেই মৃত্যুবরণ করলে শুজাউদ্দিন বাংলা-উড়িষ্যার সুবাদারি লাভের জন্য তৎপর হন।

পূর্ব থেকেই সুবাদারির দিকে শুজাউদ্দিনের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। তিনি ডেপুটি থাকাকালে বেশ কয়েকজন দক্ষ ব্যক্তিকে কাজে লাগান এবং তাদের বিভিন্নভাবে পদোন্নতি দিয়ে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। এই বিশ্বস্ত কর্মচারীদের দ্বারা তিনি দক্ষতার সঙ্গে শাসন পরিচালনাও করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁর পরামর্শকদের মধ্যে দুজন ছিলেন প্রধান — আলিবর্দী খাঁ এবং তাঁর ভাই হাজি আহমদ। প্রথমজন দুর্ধর্ষ সৈনিক, এবং অপরজন অসাধারণ কূটনীতিক। এঁদের সুচতুর এবং কূটকৌশলী পরামর্শে শুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করার পরিকল্পনা করেন। প্রথমেই তিনি তদ্বির করতে দিল্লীতে তার প্রতিনিধি পাঠান যাতে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁকেই সুবাদার নিযুক্ত করেন সম্রাট। আর মুর্শিদাবাদে প্রতিনিধি পাঠান মুর্শিদকুলির শারীরিক খবরাখবর পাবার জন্য। অতঃপর মুর্শিদকুলির মৃত্যু নিকটবর্তী জেনেই

শুজাউদ্দিন বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদেব দিকে যাত্রা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি স্পষ্ট - সম্রাটের অনুমোদন পান বা না পান, মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করতেই হবে। অবশ্য উড়িষ্যায় তিনি তাঁর আরেক পুত্র মহম্মদতকীকে (সরফরাজের বৈমাত্রের ভাই) প্রতিনিধি নিযুক্ত করে আসেন।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেদিনীপুরের কাছে পৌছলে তিনি মুর্শিদকুলিব মৃত্যু সংবাদ পান এবং প্রায় একই সময় সম্রাট কর্তৃক তাঁকে সুবাদার হিসাবে (বাংলা ও উড়িষ্যা) নিযুক্তিব খবরও শোনেন। যে স্থানে শুজাউদ্দিনের এরূপ ভাগ্যোদয়ের সূচনা, সেই স্থানের নাম দেওয়া হয় 'মুবারকমঞ্জিল' বা শুভস্থান। দু-এক দিন বাদেই তিনি দ্রুত মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌছেই সরাসরি 'চেহল সিতুন' প্রাসাদে (সুবাদারের দফতর) উপস্থিত হয়ে মসনদে বসার কথা ঘোষণা করেন। আকস্মিক এই ঘটনায় সরফরাজ স্তম্ভিত হয়ে যায়; কারণ নবাবী তাঁরই প্রাপ্য ছিল। ফলে বিশ্বাসহন্তা পিতার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধসজ্জা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা, বিশেষ করে স্নেহময়ী নানী (মুর্শিদকুলির স্ত্রী) তাঁকে পিতার বিপক্ষে অস্ত্রধাবণ না করে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপদেশ দেন। সরফরাজ সম্মত হন।

ষড়যন্ত্র করে মসনদ দখল করলেও শুজাউদ্দিন কিন্তু সুশাসক ছিলেন। প্রায় সব ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে সহমত। ইনি প্রথমেই শাসনযন্ত্র পুনর্গঠন করেন এবং তাঁর আত্মীয়, পরামর্শক ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। সরফবাজ খানকে বাংলার দেওযান পদে এবং অপর পুত্র মহম্মদ তকীকে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। জামাতা মুর্শিদকুলি খাঁ (আসল নাম মির্জা লুৎ ফুল্লাহ্, পরে রুস্তম জঙ্গ উপাধিও পান) আগে থেকেই ঢাকার (জাহাঙ্গীরনগর) ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। তাঁকে ঐ পদে বহাল রাখা হয়। পরামর্শক আলিবর্দী খান, হাজি আহমদ এবং শেষোক্ত ব্যক্তির তিন পুত্রকেও উচ্চপদ দেওয়া হয। এঁরা সবাই অবশ্য পরবর্তী কালে শুজাউদ্দিনের বংশকে উৎখাত করে সেইস্থলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। আরো এক ব্যক্তিকে শুজাউদ্দিন উচ্চপদ দান করেন। ইনি আলমচাঁদ। যদুনাথ সরকার বলেছেন, "Alamchand, previously Shuja-ud-din's diwan in the Orissa government. was now appointed diwan of the Khalsa at Murshidabad and received from the imperial court at personal mansab of 1000 with the title of Ray-i-rayan. which had not been conferred so long on any officer of the Bengal government."[১০]

শুজাউদ্দিন সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত

ক্ষমতাকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে যত্নবান হন। প্রথমেই তিনি মুর্শিদকুলির আমলে নিগৃহীত জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হন, এবং রাজস্ব না দেবার কারণে কারাগারবদ্ধ জমিদারদের মুক্তি দেন। অবশ্য তাঁদের থেকে সরকারের প্রতি অনুগত থাকার এবং সময়মত রাজস্বদানের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ মুচলেকা আদায় করতে ভোলেন না। এছাড়া জমিদারদের নজরানা স্বরূপ গৃহীত এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন এবং বাংলা ও উড়িষ্যার রাজস্ব সময় মত পাঠিয়ে তিনি সম্রাটের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। অনুকূল মনোভাবাপন্ন সম্রাটও এর বিনিময়ে শুজাউদ্দিনকে 'মুতামিনুল মুল্‌ক আলাউদ্দৌলা আসদ জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে বাংলা ও উড়িষ্যা ছাড়াও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। বস্তুত, এই জন্যই শুজাউদ্দিন জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার বজায় রেখেছিলেন; কারণ তিনি জানতেন যে, এঁদের সময়মতো রাজস্ব প্রদানের উপরই তাঁর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আর এই হেতুতেই তিনি মুর্শিদকুলির আমলের দুই অত্যাচারী কর্মচারী - মুরাদ ফরাস এবং নাজিব আহম্মদকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। শুজাউদ্দিনের শাসনকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিখিলনাথ রায় বলেছেন — " সুজা উদ্দিনের তুল্য ন্যায়পর নবাব অল্পই দৃষ্টি হইয়া থাকে। .... তাঁহার শাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ প্রজাই প্রীত ছিল।"[১১]

বাদশাহ মহম্মদ শাহের নির্দেশে ১৭৩৩ সালে বিহার প্রদেশটি বাংলা সুবার সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনটি প্রদেশের সুবাদার হয়ে শুজাউদ্দিন প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। প্রথমে তিনটি প্রদেশকে চারটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করে (মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বিহার এবং উড়িষ্যা) নিজে মুর্শিদাবাদে অবস্থান নেন এবং একে রাজধানী করে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলার কতক অংশের শাসনভার নিজের আয়ত্তে রাখেন। অতঃপর একটি উপদেষ্টা কাউন্সিলের সহায়তায় সরকার পরিচালনা করতে মনস্থ ক'রে অন্য তিন বিভাগেও তাঁর প্রতিনিধি বা ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ডেপুটি সুবাদারের তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ বিভাগ বা প্রদেশ শাসন করতে থাকেন। আলিবর্দী খানকে বিহারে, মুহম্মদ তকীকে উড়িষ্যায় এবং মুর্শিদকুলী খান (২য়) কে ঢাকায় ডেপুটি গভর্ণরের পদ দেওয়া হয় (শেষোক্ত দুজন আগে থেকেই ঐ দুটি পদে বহাল ছিলেন)। ১৭৩৪ সালে মুহম্মদ তকীর মৃত্যু হলে মুর্শিদকুলি খান (২য়) কে উড়িষ্যায় বদলি করা হয় এবং সরফরাজ খানকে ঢাকায় ডেপুটি গভর্ণর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সরফরাজ বোধহয় রাজধানী ছেড়ে যাওয়াকে সমীচীন মনে করলেন না। তাই, ঢাকায় না গিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধিত্রয়ের মাধ্যমে বিভাগ শাসন করতে লাগলেন। এই প্রতি নিধিরা হলেন যথাক্রমে গালিব আলি (ডেপুটি গভর্ণর), যশোবন্ত রায় (দেওয়ান), এবং মুরাদ আলি খান (নৌয়াবা বিভাগের দারোগা)। প্রথম দু'জন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ

করেছিলেন, ফলে তাঁদের এলাকা থেকে রাজস্ব-আদায়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মুরাদ আলি খান সরফারাজ খানের কন্যাকে বিবাহ করায় তিনি অদূরদর্শী হয়ে গালিব আলি খানকে পদচ্যুত করে জামাতা মুরাদকে ডেপুটি গভর্ণরের পদটি দেন। কিন্তু মুরাদ আলি ছিলেন অত্যন্ত হঠকারী ও স্বেচ্ছাচারী যুবক। জমিদার রায়তদের সুখশান্তি দেখার পরিবর্তে ইনি শোষণের দিকে মনোনিবেশ করেন। রাজবল্লভ নামক একজন বৈদ্যবংশীয়কে নৌয়ারা বিভাগের কেরানি থেকে পেশকারের পদে উন্নীত করেন। এই রাজবল্লভই ছিলেন মুরাদ আলির শোষণের হাতিয়ার। যশোবন্ত রায় ক্ষুব্ধ হয়ে কর্মে ইস্তফা দেন। ঢাকা বিভাগ প্রশাসনে সরফরাজ খানের এই পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। শাসন ব্যাপারে মুরাদ আলির কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, শাসন কৌশল তাঁর অজানা ছিল, দয়া ধর্ম ছিল অনুপস্থিত। জমিদার এবং রায়তেরা তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ফলে কৃষিকাজ কমে যায় এবং ঢাকার রাজস্ব বহুল পরিমানে হ্রাস পায়।[২]

প্রশাসনে শুজাউদ্দিনের সর্বাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন। এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন আলিবর্দী খান, হাজি আহমদ, জগৎ শেঠ এবং আলমচাঁদ। আলিবর্দী এবং হাজির জন্ম ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। এঁদের পিতা ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজিমউদ্দিনের অধীনে চাকুরি করতেন। পরে এঁরা দুই ভাই ও চাকরি পান ঐ একই জায়গায়। কিন্তু উত্তরাধিকারের যুদ্ধে আজিমউদ্দিন পরাজিত ও নিহত হলে এদের পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে। আলিবর্দী ভ্রাতৃদ্বয় তখন এই দুঃস্থ ও সহায় - সম্বলহীন অবস্থায় উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর শুজাউদ্দিনের শরণাগত হন। মাতৃ সম্পর্কে এঁরা শুজাউদ্দিনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়ও ছিলেন। ১৭২০ সালে আলিবর্দী খান স্ত্রী ও তিন কন্যাসহ শুজাউদ্দিনের কর্মস্থল কটকে উপস্থিত হন, এবং শুজাউদ্দিনও তাদের সাদর অভ্যথনা জানান। মির্জা মুহাম্মদ আলি (আলিবর্দী খা - শুজাউদ্দিন প্রদত্ত উপাধি) অত্যন্ত চতুর, কুশলী এবং সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। শীঘ্রই তিনি শুজাউদ্দিনের একজন বিশ্বস্ত সভাসদে পরিণত হন শুজাউদ্দিন নবাব হয়ে আলিবর্দীকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

অল্পকাল পরে হাজি আহমদও উপস্থিত হন তিন পুত্র সহ। এঁরা হলেন - মুহম্মদ রেজা, সাইদ আহমদ এবং মুহম্মদ হাশিম। শুজাউদ্দিন হাজির জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজাকে (পরে নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান) সেনাবাহিনীর বকশী এবং মুর্শিদাবাদের শুল্কভবনের তত্ত্বাবধায়ক রূপে, মধ্যম পুত্র সাঈদ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার রূপে নিযুক্ত করেন। আর হাজি আহমদ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন শুজাউদ্দিনের প্রধান পরামর্শক রূপে।

আলমচাঁদ দেওয়ানী বিভাগের একজন দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁকে এক হাজারী মনসবদার করে 'রায় রায়ান' উপাধি দেওয়া হয়। যদিও মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে হিন্দুরা অধিক সংখ্যক উচ্চপদ লাভ করতে থাকে, তথাপি আলমচাঁদই প্রথম যিনি এত উচ্চপদে আসীন হন।

জগৎ শেঠ ফতেহচাঁদ ছিলেন ব্যাঙ্কার বা বিখ্যাত অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তা, যিনি মুর্শিদকুলি খানের সময় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। বর্তমান নবাবের আমলেও উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে তিনি নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তাছাড়া রাজকীয় টাকশালের কর্তৃত্বও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ব্যাঙ্কার হিসাবে ইওরোপীয় কোম্পানির উপরে জগৎ শেঠের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান তাঁর অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যথার্থই করেছিলেন। প্রথমদিকে তিনি নিজে সরকারি কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন, এবং জনগণের কল্যাণের প্রতিও সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বুঝতে পারেননি যে, যাঁদের উপর অগাধ আস্থা রেখে এই উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত, তাঁরা আদৌ তাঁর বা তাঁর পরিবারের সুহৃদ নন; বরং স্বার্থপর, তোষামুদে ও চুড়ান্ত ষড়যন্ত্রী একদল ছদ্মবেশী শত্রু। তাই বৃদ্ধ বয়সে উচ্ছৃঙ্খলতা আর ব্যভিচারের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে যখন তিনি ক্রমশঃ রাজ্যশাসন বিষয় ঊদাসীন হয়ে পড়ছেন, তখন এরাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথে আরো অনেকদূর এগিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ তাঁর 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা'য় এবং স্ক্র্যাফটন ও হলওয়েল প্রমুখ ইংরেজ লেখক তাঁদের চিঠিপত্রে জানান, আলিবর্দী ও হাজি আহমদ ভ্রাতৃদ্বয় কতখানি নিন্দনীয় কদর্যপথে শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খানের দরবারে বসে নিজেদের স্বার্থপূরণ করে। যদুনাথ সরকার এই বিষয়টিই সমর্থন করেছেন।[১৩]

নবাবের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অভাবে লাগামছাড়া কাউন্সিলের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম দেশের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। কুচক্রী কাউন্সিল সদস্যারা প্রথমে শুজাউদ্দিন এবং তাঁর পুত্র সরফরাজের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সৌভাগ্যবশত পিতা-পুত্রে মতানৈক্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি একেবারেই। এই ষড়যন্ত্রে বিফল হয়ে কুচক্রীরা সরফরাজ খান এবং মুহম্মদ তকী এই দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করেন। ফলে বিবাদমান দুই ভাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু শুজাউদ্দিন এই সময় অতিশয় দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর (সরফরাজের মা) মধ্যস্থতায় এঁরা দুজন যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন।[১৪]

১৭৩৯ সালের ১৩ই মার্চ মৃত্যুবরণ করলেন শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান। পরিবারে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, অতএব এবার নির্বিঘ্নেই মসনদে আরোহন করলেন সরফরাজ খাঁ। তাঁর উপাধি হল আলাউদ্দৌলা হায়দার জঙ্গ। মৃত্যুশয্যায় শুজাউদ্দিন সরফরাজকে শাসন ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল - বিভিন্ন বিভাগের প্রবীণ কর্মকর্তাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখার নির্দেশ। প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন - আলিবর্দী খান, হাজি আহমদ, আলমচাঁদ এবং জগৎ শেঠ ফতেহ্ চাঁদ। সরফরাজ পিতার কথা অমান্য করেননি। আসলে এঁরা দুজনেই এই প্রবীণ গোষ্ঠীর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন। তাছাড়া শক্তিশালী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মত যোগ্যতা বা রাজোচিত বুদ্ধিমত্তা ছিল না নতুন নবাবের। শাসন কার্যে মনোনিবেশের পরিবর্তে তিনি হয় ধর্মকর্মের ব্যবহারিক আচার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন অথবা হারেমের মহিলাদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হয়ে অলস জীবন কাটাতেন।[১৭]

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যগণ। তাঁরা সরফরাজের পতন ঘটানোর জন্য গোপনে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হাজি আহমদ। তিনি রাজধানীতে সর্বদা তাঁর ভাই আলিবর্দীর এজেন্টরূপে কাজ করতেন। অন্যদিকে আলিবর্দীও ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক, চতুর ও সাহসী যোদ্ধা এবং কূটনীতিজ্ঞ। শুজাউদ্দিনের আমলে তিনি বিহারের বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করেন, চোর ডাকাতের উপদ্রব ও রাহাজানি বন্ধ করেন, এবং অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ রোধ করে প্রদেশে শান্তি স্থাপন করেন। ফলে শুজাউদ্দিন তাঁর প্রতি আরও প্রীত হন, এবং আলিবর্দীর সুনাম, ক্ষমতা ও মর্যাদাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

সরফরাজ খানের মতো একজন অযোগ্য ব্যক্তির সুবাদারি লাভ আলিবর্দীর উচ্চাভিলাষের বীজ উপ্ত করে। কারণ, তাঁর চারিত্রিক শৈথিল্যের কথা কারোর অজানা ছিলনা। আলিবর্দী সরফরাজকে সরিয়ে নিজেকে মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেন। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসেন হাজি আহমদ, জগৎশেঠ, আলমচাঁদ এবং আরো কেউ কেউ। জগৎ শেঠ ব্যক্তিগত কারণেও সরফরাজকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁদের মনোবিবাদের প্রকৃত কারণ নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। এই প্রসঙ্গে 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি —

" ...... মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময়ে শেঠদিগের নিকট তাঁহার নিজের যে ৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল, এ পর্যন্ত তাহা প্রত্যর্পিত না হওয়ায় সরফরাজ ফতেচাঁদকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন; এমনকি, তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য পর্যন্ত

প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠ দুর্নীতি নবাবকে পদচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিবাদের অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বৃদ্ধ ফতেচাঁদ স্বীয় পৌত্র মহাতপ রায়ের সহিত একটি কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় প্রদান করিয়াছিলেন। ..... তাহার সৌন্দর্যের কথা সরফরাজের কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া সেই বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ..... নবাবের অনুরোধ শুনিয়া, সেই অশীতিপর বৃদ্ধের মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। তিনি নবাবকে বিরত হইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। ..... কিন্তু অবশেষে অদমনীয় কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, লোক পাঠাইয়া জগৎ শেঠের বাটী অবরোধপূর্বক সেই বালিকাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, এবং দর্শন পিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই। ....[১১]

স্বয়ং নিখিলনাথ অবশ্য দ্বিতীয় কারণটিকে আদৌ সত্য বলে মনে করেননি। সঠিক কারণটা যাই হোক, তারই ফলে ফতেচাঁদের ষড়যন্ত্রী দৃষ্টি পড়ল আলিবর্দীর ওপর। এছাড়া, এই সময় (১৭৩৯ খ্রীঃ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ ষড়যন্ত্রকারীদের পথ আরো প্রশস্ত করে দিল। তাঁরা বুঝলেন যে, দুর্বল ও অকর্মণ্য নবাব বৈদেশিক আক্রমণে বিধ্বস্ত মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাবেন না।

তাঁদের ষড়যন্ত্রের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ গোপন থাকেনি। সরফরাজের কয়েকজন কর্মকর্তা - হাজি লুৎফে আলি, মীর মর্তুজা, মর্দান আলি খান এবং আরো কয়েকজন এই বিষয়টি নবাবের দৃষ্টি গোচর করান। অবশ্য আলিবর্দী খান এবং হাজি আহমদের সঙ্গে অসদ্ভাব থাকায় এঁদের কথাই শুধু বলেন সরফরাজের মিত্র পক্ষ। তিনিও তাদের কথামতো পদক্ষেপ নেন। এবং আলিবর্দীকে বিহারের ডেপুটি গভনরের পদ থেকে অপসারণ করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু উপদেষ্টা কাউন্সিল তাঁকে পরামর্শ দেন এই সিধান্তটি পুনর্বিবেচনা করতে। গোলামহোসেন সলীম এই প্রসঙ্গে বলেছেন —

" ....এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পূর্বেই ত্রয়ী কাউন্সিল-সদস্য কৌশলে নিজেদের দীর্ঘকালের চাকরি, বাদশাহী রাজস্বের বিপুল বকেয়া অনাদায়ী এবং তাদের নিজেদের ক্ষতির কথা বলে বাৎসরিক হিসাব নিকাশ তৈরি ও শেষ করার জন্য তিনমাস সময় প্রার্থনা করেন। সরফরাজ খান তাঁদের এই ফাঁদে পা দিলেন এবং তাঁদের কূটকৌশলে প্রতারিত হলেন।"[১২]

ষড়যন্ত্রকারীরা সরফরাজকে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করতে সম্মত করান। তাঁদের

যুক্তি ছিল, রাজ্যের রাজস্ব সম্পদ সীমিত অথচ ব্যয় অনেক বেশি, তাই অধিক সৈন্য পোষণ করা তাঁর পক্ষে অনুচিত। নির্বোধ নবাব এঁদের কথায় সৈন্য সংখ্যা কমাতে থাকেন, অবং ছাটাইকৃত সৈন্যদের নিয়ে নিজ সৈন্যদল আরো সমৃদ্ধ করতে থাকেন আলিবর্দী। সরফরাজ খানের সর্বপ্রধান দুর্বলতা ছিল অদূরদর্শিতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব। তাই যদুনাথ সরকার বলেছেন, ১৭৩৯-৪০ সালের ষড়যন্ত্র ছিল একদিকে উচ্চাভিলাষ ও অকৃতজ্ঞতার ফল এবং অন্যদিকে অবমাননাকর অকর্মণ্যতার পরিণতি। কুচক্রীরা নিজেরা ঠিক করেন যে তাঁরা আলিবর্দীকে পাটনা থেকে ডেকে এনে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাবেন। হাজি আহমদ কোনো সুযোগ হেলায় হারান নি, আলিবর্দীর উচ্চাভিলাষে এবং সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে শত্রুতায় তিনি সতত মদত যুগিয়েছেন। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি সরফরাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ফলাও করে আলিবর্দীর কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে কালক্ষেপ করেন নি। রাজধানীতে আলিবর্দীর প্রতি অনুকূল জনমতও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। অবশ্য তাঁর শত্রুতা এখন আর একদম প্রকাশ্য ছিল না। ফলে সরফরাজ পুনরায় ভুল করেন এবং অসম্ভব মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়ে বৃদ্ধ উপদেষ্টাকে সবকথা খুলে বলেন। কালীকিঙ্কর দত্তের মতে 'It was a tactical blunder on his part.' এবং এইভাবে "Haji Ahmad indulged in this despicable game of villainy against his master in the garb of friendship."[১৮]

অন্যদিকে আলিবর্দী পাটনাতেই কিছুদিন অবস্থান করতে মনস্থ করলেন। সেই সঙ্গে দিল্লীকোটের আইনানুগ সম্মতিরও প্রত্যাশা করতে লাগলেন। আর এই জন্যই আলিবর্দী নবাব সরফরাজের উকিলকে এক পত্র লিখছেন, যার ভাবার্থ হল,

"....... If he was confirmed in the government of Bihar, then being comparatively safe and free he would turn his attention to remove the disorders at Murshidabad."[১৯] কিন্তু পারস্পরিক অসদ্ভাবের কারণে যুগলকিশোর সমস্ত ঘটনা জানান সরফরাজকে।

নবাব, আলিবর্দী এবং হাজি আহমদের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং কিছুটা সক্রিয়ও হয়ে ওঠেন। তিনি হাজিকে প্রকাশ্যে অপমান করেন, বিহারের রাজস্ব বিষয়ে দ্রুত অনুসন্ধান শুরু করেন, এবং শুজাউদ্দিনের আমল থেকেই যে সেনাদল আলিবর্দীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাদের পুনরাহ্বান জানান। সেনাবাহিনীও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কারণ, শুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের প্রথমার্ধে তারা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, তা থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থেকে তাদের মধ্যেও ক্ষোভ জমে উঠেছিল। এই সমস্ত সংবাদই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাটনায় পৌঁছে যায়

আলিবর্দী এবং হাজির পুত্র সৈয়দ আহমদ খানের কাছে। চতুর আলিবর্দী তখন বিপদ বুঝে ব্যক্তিগত ভাবে ইউসুফ আলিকে জানান যে, তিনি নিজে থেকে কখনই সরফরাজের বিরুদ্ধাচারণ করেননি; বরং বাধ্য হয়েছেন ভাই আহমদ এবং ভাইপো সৈয়দ আহমদের দ্বারা। বলাই বাহুল্য, এটাও কূটনীতিবিদ আলিবর্দীর আর একটা চাল।

তৎকালীন মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের উজির মহম্মদ ইশহাক খান (মুতামন-উদ-দৌল্লা) ছিলেন আলিবর্দীর পুরোনো বন্ধু এবং সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত অনুচর। আলিবর্দী এঁরই মাধ্যমে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। বিনিময়ে তিনি সম্রাটকে দেয় রাজস্বের অতিরিক্ত এককোটি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। বন্ধু ইসহাককে এক পত্রে জানান, সম্রাটের অনুমোদন লাভ করলে, এমনকি বলপ্রয়োগ করেও তিনি সরফরাজকে হটিয়ে মসনদ দখল করবেন। ১৭৪০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি বাদশাহী অনুমতি লাভ করলেন আলিবর্দী।

অতঃপর সকল প্রকার সতর্কতা ও প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ হলে আলিবর্দী এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন ১৭৪০ সালের মার্চের শেষে দিকে। তাঁর বাহিনীতে প্রচুর আফগান, রোহিঙ্গা এবং ভালিয়া সৈন্য ছিল যারা সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাত। অবশ্য আলিবর্দী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদের দমনচ্ছলেই তিনি সসৈন্যে পাটনা ছেড়েছেন। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

"গোপনে জগৎ শেঠকে এক পত্র প্রেরিত হইল; এই সঙ্গে সরফরাজকে লিখিত আর এক পত্র ছিল। বিশ্বস্ত দূত-হস্তে পত্র এইভাবে প্রেরিত হইল, যেন আলিবর্দী রাজমহলে পৌঁছিলে পত্র মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের হস্তে প্রদত্ত হয়। হাজির জামাতা রাজমহলের ফৌজদাব আতাউল্লা খাঁর বন্দোবস্তে তেহায় হইতে শাকড়ীগলি পর্যন্ত স্থান দিয়া কোন লোক বাঙ্গলা যাইতে পাইল না; পাছে এই সংবাদ পূর্বে প্রচারিত হইয়া পড়ে। পাটনা হইতে কিয়দ্দুরে উপনীত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ প্রধান সামন্তবর্গকে একত্র করিয়া, তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে সকলেই প্রাণপনে সাহায্য করিবেন, এইরূপ শপথ করাইয়া লইলেন। পরে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা প্রচারিত হইল; ইহাতে অনেকেই ভয়চকিত হইল; কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নানাভাবে সরফরাজের অত্যাচার কাহিনী বর্ণন করিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে শপথ করিয়াছেন বলিয়া, আর কোন আপত্তি উঠিল না।"[২০]

সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ; কাজেই আলিবর্দীর তেলিয়াগড এবং সিকরিগলি অতিক্রমের সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছযনি। অবশেষে বিশাল সেনাবাহিনী গিরিপথ

অতিক্রম করে বাংলার মাটিতে পা দিলে মুর্শিদাবাদে সেই সংবাদ পৌঁছায়, এবং গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আলিবর্দীর লেখা পত্রটিও এই সময় সরফরাজের হাতে আসে —

"Since, after the many offronts heaped upon my brother, Haji Ahmad, attempts have been made upon the honour and chastity of our family, your servant, inorder to save that family from further disgrace, has been obliged to come so far, but with no other sentiments than those of fidelity and submission. Your servant hopes, therefore, that Haji Ahmad should be permitted to come to him with his family and dependants."[১১]

এখনও দুর্বলচিত্ত সরফরাজ দৃঢ়ভাবে কর্তব্য স্থির কবতে পারলেন না। মিত্রপক্ষ হাজিকে কারারুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হাজি শপথ করে বললেন, 'প্রভু পুত্রের প্রতি আলিবর্দী খাঁর অন্যরূপ ব্যবহার হতেহ পারেনা। আমাকে আলিবর্দীর কাছে পাঠালে আমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বা আজ্ঞা করলে নিকটে এনে উপস্থিত করব।' পরিশেষে, প্রাজ্ঞ সেনাপতি ঘৌস্ খাঁর কথামত হাজিকে যেতে দেওয়াই স্থির হল। অবশ্য শিবির হালচাল পর্যবেক্ষণ করার জন্য শুজাকুলী ও খাজাবসন্ত নামে দুজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ও সঙ্গে প্রেরিত হল।

সরফরাজ এরপর কালবিলম্ব না করে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হলেন। আলিবর্দীর তুলনায় তাঁর বাহিনী কোনো অংশে হীনবল ছিল না। চারহাজার সৈন্যসহ সরফরাজ অগ্রসর হলেন; অন্যান্য সেনাপতির অধীনে চলল অবশিষ্ট সৈন্যদল। মুর্শিদাবাদ শহরের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গিরিয়াব সন্নিকটে পৌঁছে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ষড়যন্ত্রকারীদের যোগসাজসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অস্ত্রাগারে গোলার পরিবর্তে ইটের টুকরো এবং কামানের ভিতরে ধুলোবালি ভরে রেখেছে। গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হাজি আহমদের ভাই শাহরিয়ার খান। তাঁকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত এবং বন্দী করা হল এবং সেই স্থলে পর্তুগীজ এন্টনীর পুত্র পাঞ্চু নিযুক্ত হলেন।

গিরিয়া প্রান্তরে যুদ্ধ সংঘটিত হল। শুরুতেই আলিবর্দীর বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। বিপদ বুঝে অন্যতম ষড়যন্ত্রী রায় রায়ান আলমচাঁদ সরফরাজকে পরবর্তী দিন পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার পরামর্শ দিলেন।[১২]নির্বোধ সরফরাজ যুদ্ধ বন্ধেব নির্দেশ দেন। কিন্তু সেনাপতিরা এই সিদ্ধান্ত

মানতে অস্বীকৃত হল বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব বুঝে। তবু সরফরাজ তাঁদের কথায় কর্ণপাতও করলেন না, উপরন্তু শাস্তির ভয় দেখালেন। ফলে যুদ্ধ স্থগিত রইল এবং প্রত্যাশিত বিজয় নবাবের হাতছাড়া হয়ে গেল।

এই সুযোগে আলিবর্দী আর এক নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। নবাবপ্রেরিত দুই দূত - শুজাকুলী খান এবং খাজাবসন্তের সামনে পবিত্র কোরাণে হাত রেখে শপথ করলেন যে, পরবর্তী সকালে তিনি নবাবের কাছে আত্মসমর্পন করবেন এবং তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। পরমানন্দে বিশ্বস্ত-দূতেরা আলিবর্দীর শিবির থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন সরফরাজের প্রতি আলিবর্দীর একনিষ্ঠ আনুগত্যের সংবাদ দিয়ে।

আবার সরফরাজ শিকার হলেন আলিবর্দীর কদর্য ছলনার। পরদিন ভোররাতের আগেই আলিবর্দী খান সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ১৭৪০ সালের ৯ এপিল তারিখে রাত্রি ২টার সময়ে সদলে সরফরাজের শিবিরের দিকে যাত্রা করেন। ১০ই এপ্রিল কাকভোরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুদলের উপর। সরফরাজ খান এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের আদেশ দিতে বাধ্য হন। যদিও পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত, তবু সরফরাজ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হতে থাকে দ্রুতগতিতে এবং নবাব পক্ষের অধিকাংশ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা গুলি এসে নবাবের কপালে বিদ্ধ হয়। গিরিয়ার প্রান্তরে মৃত্যুবরণ করেন সরফরাজ খান। পরে তাঁর মরদেহ মুর্শিদাবাদে এনে সমাহিত করা হয়। সরফরাজের কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনাপতি তাঁর মৃত্যুর পরেও যুদ্ধ অব্যহত রাখেন প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নিতে। এঁদের মধ্যে মন্ত্রী আলমচাঁদ, সেনাপতি ঘৌস্ খাঁ ও তাঁর পুত্রদ্বয়, শরীফউদ্দিন এবং জমাদার বিজয় সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।[২৫]

কালীকিঙ্কর দত্ত তাই মন্তব্য করেছেন —

"A Nemesis followed it when his favourite grandson Siraj-ud-daulah, fell a victim to the same forces that had been used by him to overthrow Sarfaraz. It might be very well said that the battle of plassey was the replay of historical justice to the battle of Giria."[২৮]

গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে আলিবর্দী খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারি পেয়ে গেলেন; মুর্শিদাবাদের মসনদে এখন তাঁর একচ্ছত্র অধিকার। দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে চুরাশি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়ে নবাবি পরোওয়ানাও আদায় করলেন

কিছু দিনের মধ্যে (এই বিপুল অর্থ অবশ্য ছিল মৃত সরফরাজের পরিত্যক্ত সম্পত্তি) । লাভ করলেন বাদশাহ প্রদত্ত উপাধি – সুজাউল মুল্ক্ হেসামউদ্দৌল্লা। এছাড়া তাঁর তিন ভাইপো তথা জামাতাও উপাধি প্রাপ্ত হলেন সম্রাটের নিযুক্তিপত্রের সঙ্গে সঙ্গে। নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান শাহামত জঙ্গ নামে, সৈয়দ আহমদ খান সওলৎ জঙ্গ নামে, এবং জৈনুদ্দিন আহমদ খান হজরত জঙ্গ নামে পরিচিত হন। আমরা আগেই বলেছি, আলিবর্দী ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, বিচক্ষণ শাসক এবং কূট রাজনীতিবিদ্। কাজেই 'আলিবর্দী খাঁর আচরণটা অতিশয় গর্হিত হলেও সরফরাজ খাঁর বদলে তাঁকে বাংলার নবাব পেয়ে দেশের মঙ্গলই হল।'[২৩] টানা ষোল বছর রাজত্ব করলেন তিনি (১৭৪০-৫৬), যেখানে সরফরাজের নবাবিব কাল মাত্র একবছর আঠাশদিন।

মুর্শিদাবাদে উপনীত হয়ে আলিবর্দী পরলোকগত সরফরাজের খানের আত্মীয়দের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। সরফরাজের ভগ্নী নফিসাবেগমকে খাস তালুকের এক অংশ দেন, পরিবারকে উপযুক্ত ভাতাদি এবং শিশুপুত্র আকা-বাবাকে ভরণ-পোষণের সুবন্দোবস্ত করেন।[২৪]

অতঃপর আলিবর্দী মনোযোগী হলেন প্রশাসন পুনর্গঠনে। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে খালিসা বিভাগের দেওয়ান এবং ঢাকার ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। নওয়াজিশ মুহম্মদ হোসেনকুলী খানকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে ঢাকা শাসন করতে থাকেন। আলিবর্দীর অপর ভাইপো এবং কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিন খানকে (সিরাজউদ্দৌলার পিতা) বিহারের ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন তাবাতাবেয়ীর মামা আবদুল আলি ত্রিহুতের শাসক এবং কয়েকটি পরগণার রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। আলিবর্দীর শ্যালক কাসিম আলি খানকে রংপুরের ফৌজদার এবং ভগ্নীপতি মীরজাফর আলি খানকে পুরাতন সৈন্যবাহিনীর বকশী নিযুক্ত করা হয়। নতুন সৈন্যবাহিনীর বকশী হন নসরউল্লাহ বেগ খান। রায় রায়ান আলম চাঁদের মৃত্যু হয় গিরিয়ার যুদ্ধে। রাজস্ববিভাগের কাজে অভিজ্ঞ নায়েব দেওয়ান চিন্ময় রায়কে খালিসা বিভাগের সহকারী দেওয়ান নিযুক্ত করে তাঁকে 'রায়-রায়ান' উপাধি দেওয়া হয় (গোলামহোসেন ও অজ্ঞাতনামা লেখক একে 'চীনরায়' বলেছেন)।[২৫] রাজস্বদফতরের দেওয়ান নিযুক্ত হন জানকীরাম, রাজমহলের ফৌজদার এবং হাজি আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খানকে একই সঙ্গে ভাগলপুরের ফৌজদারীও দেওয়া হল। আলিবর্দীর এক প্রবীণ অনুচর গোলাম হোসেন মীর মর্তুজার স্থলে হাকিম নিযুক্ত হলেন।

কিন্তু মুর্শিদাবাদের মসনদ আলিবর্দীকে প্রায় কোনো দিনই স্বস্তি দেয়নি। তাঁর নবাবী আমল অতিবাহিত হয়ে গেছে মূলত সমর ক্ষেত্রেই। প্রথমেই উড়িষ্যা হয়ে

ওঠে আলিবর্দীর শান্তিভঙ্গকারী। শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানের সময় থেকেই তাঁর জামাতা ২য় মুর্শিদকুলি খান (রুস্তম জঙ্গ) উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর ছিলেন। সরফরাজের মৃত্যুর পর তিনি জবরদখলকারী আলিবর্দীর কর্তৃত্ব কিছুতেই মেনে নিতে চাননি। শুজাউদ্দিনের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই শুজাউদ্দিনের জামাতারূপে তিনিই ছিলেন আইনত মসনদের উত্তরাধিকারী। তাঁর স্ত্রী সাহসী দুর্দানা বেগমও স্বামীকে মসনদ লাভের জন্য, এবং প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। রুস্তমজঙ্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, এবং দুর্বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কটক থেকে সসৈন্যে বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করেন ১৭৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে। জামাতা মির্জা এবং স্থানীয় জমিদাররাও রুস্তম জঙ্গের সঙ্গী হন। এদিকে আলিবর্দী নীরব ছিলেন না। তিনি জানতেন, পরলোকগত সুবাদারের নিকট আত্মীয়, উড়িষ্যায় ডেপুটি গভর্ণর পদে বহাল আছেন। তাই উড়িষ্যার ঘটনাবলীর দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই রুস্তম জঙ্গের অভিযানের সংবাদ পেয়ে আলিবর্দ্দী ভাইপো সওলত জঙ্গ ও বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করলেন ১৭৪১ সালের জানুয়ারি মাসে। বালাসোর শহরের চার মাইল উত্তরে অবস্থিত 'ফুলওয়ারি' নামক স্থানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় ৩রা মার্চ, ১৭৪১-এ। রুস্তম জঙ্গ পরাজিত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন, এবং মির্জা বাকেরও নিদারুণ আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে যদুনাথ সরকারের 'হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল'[২৮] এবং কালীকিঙ্কর দত্তের 'আলিবর্দী এণ্ড হিস টাইম্‌স্'-এ[২৯]।

সওলত জঙ্গকে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত করে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সওলত জঙ্গের নিযুক্তি একদমই শুভ হয়নি। কারণ, তাঁর মতো অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে একটি নতুন বিজিত এলাকা শাসন অসম্ভব ছিল। ফলে নিজের হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য শীঘ্রই সওলত জনপ্রিয়তা হারান এবং পূর্ববর্তী আমলের প্রবীণ কর্মকর্তারা তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে মির্জা বাকেরকে উড়িষ্যা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। মির্জা বাকের একদল মারাঠা পদাতিক বাহিনী নিয়ে উড়িষ্যায় পৌঁছলে সওলত জঙ্গের নিজের বাহিনীর সৈন্যরাও বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দেয়। সওলত জঙ্গ পরিবার-পরিজনসহ বন্দী হন, এবং উড়িষ্যা পুনরায় আলিবর্দীর হাতছাড়া হয়ে যায়। এটা ছিল তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদায় এক বিরাট আঘাত। এদিকে হাজি আহমদ তাঁর পুত্রের মুক্তির জন্য আলিবর্দীকে চাপ দিতে থাকেন। তাঁর অভিপ্রায়, উড়িষ্যাপ্রদেশটি মির্জা বাকেরকে ছেড়ে দিতে হলেও সওলতকে মুক্ত করা হোক। কিন্তু আলিবর্দী রাজি হলেন না। তিনি স্বয়ং বিরাট বাহিনী নিয়ে পুনরায় উড়িষ্যা গমন করেন। তাঁর উপস্থিতিতে মির্জা বাকের মারাঠা বাহিনীসহ উড়িষ্যা ছেড়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যান। সওলত জঙ্গকে মুক্ত করে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হয়।

উড়িষ্যা জয় করার পর আলিবর্দী এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করার সংকল্পে উড়িষ্যার অন্তভাগে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পান নাগপুর থেকে ভোঁসলারাজের মারাঠা সৈন্য বাংলাদেশের অভিমুখে আসছে। বিহারিলাল সরকার আলিবর্দীর বর্তমান অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

"..... আলিবর্দ্দী খাঁ চারিদিকে বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিপ্লাবিত হইয়াছিলেন। এই সময়, এই মাহেন্দ্র যোগে, মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া এবং পাচেত ও ময়ূরভঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়া সহসা মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়। এই সময় আলিবর্দ্দী খাঁ পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য সহ মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হইতেছিলেন, উড়িষ্যার জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, তিনি কখন মৃগয়া করিতে ছিলেন, কখন রাজ্যের শোভা সন্দর্শন করিতে ছিলেন বা বিবিধ আমোদ প্রমোদে নৃত্য-গীতে জয়োৎসবের সার্থকতা সাধন করিতে ছিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি মেদিনীপুরের নিকট একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় একজন বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান তহশিলদার আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, -- 'মহারাষ্ট্রীয়েরা এইস্থান হইতে প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছে; ভাস্কর পণ্ডিত চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসিয়াছে তাহারা ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে; আগামী কল্য সন্ধ্যার সময়েই হউক, কিম্বা পরদিন প্রাতেই হউক, সম্ভবতঃ তাহাবা এই স্থানে অসিয়া উপস্থিত হইবে।'

আলিবর্দ্দী খাঁ এই সময় মধ্যাহ্নে নমাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অল্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য ছিল। তবুও তিনি এই সংবাদ পাইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত না হইয়া, জলদগাম্ভীর স্বরে, নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, 'তাহার কি হইয়াছে ? সে সকল কাফের এখন কোথায় ? যেখানে তাহারা যাউক বা থাকুক, আমি তাহাদিগকে শাসন করিব।'[৩৩] সত্যিই অসাধারণ দৃঢ়তায় আলিবর্দী দুদমনীয় মারাঠাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন।

মারাঠা সৈন্য ততক্ষণে পাঁচেতের মধ্য দিয়ে বর্ধমান জেলায় পৌঁছে লুঠপাট আরম্ভ করেছে। নবাব দ্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌঁছলেন (১৫ই এপ্রিল, ১৭৪২ খ্রীঃ) , কিন্তু অসংখ্য মারাঠা সৈন্যের ব্যূহে তিনি বন্দী হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক - বাকি সৈন্য পূর্বেই মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়েছিল। আলিবর্দী বর্ধমানে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন এবং মারাঠারা তাঁর রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। আসলে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত দশলাখ টাকা আলিবর্দীর কাছে চেয়েছিলেন; কিন্তু নবাব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি অলিবর্দীকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেন। এই দঃখজনক অবস্থার বর্ণনা পাই 'Alivardi and His Times' এ [৩৪]। অবশেষে আলিবর্দী বহু কষ্টে মুস্তাফা খান এবং তাঁর অন্যান্য সেনাপতিদের সহযোগিতায় সাময়িকভাবে এই বিপদমুক্ত হয়ে কোনমতে কাটোয়ায় পৌঁছলেন।

মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এই সময় ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত ও বিতাড়িত রুস্তম জঙ্গের বিচক্ষণ নায়েব মীর হবীরের পারমর্শ ও সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ চালালেন। একদল মারাঠা নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করল — অবশিষ্টেরা চতুর্দিকে গ্রাম জ্বালিয়ে ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে লাগল। মীর হবীরের সহায়তায় মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য সহ ৪০ মাইল পার হয়ে মুর্শিদাবাদ শহর আক্রমণ করে সারাদিন লুটতরাজ করলেন। পরদিন সকালে (৭ই মে, ১৯৪২) আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে পৌছলে, মারাঠা সৈন্য কাটোয়া অধিকার করল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড মারাঠাদের শাসনাধীন হল। অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতে লাগল তারা। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প লুপ্তপ্রায় হল। সমসাময়িক ইংরেজ ও বাঙালী লেখকেরা এই বীভৎস নির্যাতনের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তা চিরদিন মারাঠাজাতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রাখবে।

বাঙালীরা মারাঠা সৈন্যদের 'বর্গী' বলত। বাংলাদেশে মারাঠা সৈন্যদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। এরা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। নিম্নশ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠা সরকার দিতেন তাদের নাম ছিল বার্গীর। 'বর্গী' এই 'বার্গীর'-ই অপভ্রংশ।

আলিবর্দীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বর্ষাকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে বর্ষাশেষে তিনি কাটোয়া আক্রমণ করলেন। মারাঠারা লুঠপাটের টাকায় তখন খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করছিল। সারারাত্রি ধরে ঘোরা পথে এসে আলিবর্দীর সৈন্য সহসা নবমী পূজার দিন সকালবেলা নিদ্রিত মারাঠাবাহিনীকে আক্রমণ করল। মারাঠারা পালিয়ে গেল বিনাযুদ্ধে। ভাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈন্য সংগ্রহ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে লুঠপাঠ আরম্ভ করলেন এবং কটক অধিকার করলেন। আলিবর্দী স্বসৈন্যে অগ্রসর হয়ে কটক পুনরাধিকার করলেন এবং মারাঠারা চিল্কাহ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে গেল (ডিসেম্বর, ১৭৪২ খ্রীঃ)।

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠারাজ সাহুকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার চৌথ আদায় করার অধিকার দেবেন - এরূপ প্রতিশ্রুতি করেছিলেন এবং সাহু নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলাকে ঐ অধিকার প্রত্যর্পণ করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পেশোয়া বালাজী রাওর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সুতরাং বালাজী অভয় দিলেন যে, ভোঁসলার মারাঠা সৈন্যদের তিনি বঙ্গভূমি থেকে বিতাড়িত করবেন (নভেম্বর ১৭৪২ খ্রীঃ)।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রঘুজী ভোঁসলা ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা দেশ অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌঁছলেন। ওদিকে পেশোয়া বালাজী রাও বিহারের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাত্রা করলেন। সারাপথ তাঁর সৈন্যরা লুঠতরাজ চালাল, ঘর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করল। যাঁরা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা বা মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে খুশী করতে পারল, তারাই রক্ষা পেল।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলিবর্দী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সাক্ষাৎ হল (৩০শে মার্চ, ১৭৪৩ খ্রীঃ)। স্থির হল যে, বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে বাৎসরিক চৌথ দেবেন এবং বালাজী রাওকে তাঁর সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দেবেন। পেশোয়া কথা দিলেন যে, ভোঁসলার অত্যাচার থেকে বাংলাদেশকে তিনি রক্ষা করবেন।

রঘুজী ভোঁসলা এই সংবাদ পেয়ে কাটোয়া পরিত্যাগ কবে বীরভূমে গেলেন। বালাজী রাও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং ১৭৪৩ সালের ১০ই এপ্রিল রঘুজীকে বঙ্গভূমির সীমার বাইরে বিতাড়ন করলেন। নবাব দিগনগর থেকে ২৪শে এপ্রিল কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এই মারাঠা অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কলকাতার বণিকগণ ২৫,০০০ টাকা চাঁদা তুলে কলকাতা রক্ষাব জন্য 'মারাঠা ডিচ' নামে খ্যাত পয়ঃ প্রণালী কাটিয়েছিলেন।১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশ মারাঠা উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেল।

ইতিমধ্যে মারাঠারাজ সাহু ভোঁসলা ও পেশোয়াকে ডেকে উভয়ের মধ্যে কলহ মিটিয়ে দিলেন (৩১শে ১৭৪৩ খ্রীঃ)। বাংলার চৌথ আদায়ের বাঁটোয়ারা হল। বিহারের পশ্চিমাঞ্চল পড়ল পেশোয়ার ভাগে, আর বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহারের পূর্বভাগ পড়ল ভোঁসলার অধীনে, সিদ্ধান্ত হল, উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ শোষণ করতে পারবেন; কিন্তু কেউ কারোর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

রাজা শাহুর ছাড়পত্র পেয়ে পূর্ব বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করলেন (মার্চ, ১৭৪৪ খ্রীঃ)। সমস্ত ব্যাপার শুনে আলিবর্দী প্রমাদ গণলেন। প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন দিয়েও নবাব পেশোয়ার কাছ থেকে কোনো নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাননি, উপরন্তু দুটি রক্তপিপাসু মারাঠা বাহিনী কর্তৃক পুনরাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এদিকে রাজকোষ শূন্য। বারবার বর্গী আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈন্যদল অবসাদ গ্রস্ত। সর্বোপরি নবাব নিজেও গুরুতর পীড়ায় প্রায় শয্যাশায়ী।

মারাঠা যথারীতি অত্যাচার শুরু করল। বিশেষত মেদিনীপুর বর্ধমান ও

বীরভূমের জনগণের দুর্দশা অবর্ণনীয় অবস্থায় পৌছল। নবাব তখন তাঁর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খানের সঙ্গে পরামর্শ করে মারাঠা সর্দারদের গুপ্তভাবে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হলওয়েলের মতে, বর্গীদের দমনের জন্য বেগম শরফ-উন-নিসার পরামর্শ গ্রহণ করে ভাস্করকে নিরস্ত করতে এরূপ চক্রান্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন নবাব।[৫১]

তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ করলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের তাঁবুতে পৌছলে তাঁর ২১ জন সেনানায়ক ও অনুচর সহ তাঁকে হত্যা করা হল (৩১শে মার্চ, ১৭৪৪ খ্রীঃ)। অমনি মারাঠা সৈন্য বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গেল। এই হত্যাকান্ডের বিস্তৃত বিবরণ পাই -- 'ALIVARDI AND HIS TIMES'-এ [৫২]।

বিজয়ী আলিবর্দী নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন এবং তাঁরই অনুরোধে বাদশাহ মুস্তাফা খানকে 'বাবর জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'মজফ্‌ফরনামা'য় পাওয়া যায় দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হাজি আহমদ নবাবকে এহেন গর্হিত কাজের জন্য তিরস্কার করেছিলেন — "You have today created enemies for yourself till Doomsday"[৫৩]।

ভাস্কর নিহত হবার পর প্রায় পনের মাস নিরুপদ্রবে কাটে। কিন্তু যুদ্ধের দুশ্চিন্তা থেকে অবকাশ পেলেও নবাব নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়েন। গঙ্গার পশ্চিমে অধিকাংশ গ্রামে দাহ ও লুণ্ঠনের ফলে অধিবাসীগণ স্থান ত্যাগ করেছে। ফলে কৃষিকাজ ও শিল্পবাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় রাজকোষে প্রচণ্ড অর্থ সংকট দেখা দিয়েছে। অর্থাভাবের জন্য সৈন্যদল বেতন পাচ্ছে না। এই অবস্থায় নবাব ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকদের অর্থসাহায্য করতে বাধ্য করেছিলেন। বাংলার জমিদাররাও তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এক নতুন বিপদ দেখা দেয়। ভাস্কর হত্যার পুরস্কার স্বরূপ মুস্তাফা খান নবাবের কাছে বিহার প্রদেশের শাসনকর্তার পদ প্রার্থনা করেছিলেন। নবাবও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু পরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় মুস্তাফা বিহারে বিদ্রোহ করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫ খ্রীঃ), এবং রঘুজী ভোঁসলেকে সুবা-বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান জানালেন। নবাব মুস্তাফাকে দমনের জন্য বিহার যাত্রা করলেই রঘুজী উড়িষ্যা অধিকার করে বসে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে রঘুজী বর্ধমান অধিকারপূর্বক আদায়ী রাজস্বের সাত লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন।[৫৪] বিহার থেকে আলিবর্দীর মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন ও মুস্তাফা খানের নিধনের সংবাদ পেয়ে নিরুপদ্রবে বর্ষাকাল কাটাবার জন্য মারাঠারা ২০শে জুলাই বর্ধমান ত্যাগ করে বীরভূম

যাত্রা করে। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে মারাঠারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করায় নবাবের প্রবল বাধাদানের ফলে তারা কাটোয়ায় পলায়ণ করে। নবাব কাটোয়া আক্রমণ করেন। শহরের পশ্চিম প্রান্তে রাণি দিঘির পারে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত রঘুজী বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে নাগপুরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মীরহাবিব পুনরায় কাটোয়া অধিকার করেন। অবশেষে পর বৎসর এপ্রিল মাসে (১৭৪৬) নবাব মারাঠাদের কাটো থেকে বিতাড়িত করেন এবং মারাঠাদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুজন আফগান সেনানায়ককেও বাংলাদেশের সীমার বাইরে বের করে দেন।[৩৫]

১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সম্রাট মহম্মদ শাহের মধ্যস্থতায় রাজা সাহুকে ৩৫ লক্ষ (বাংলার জন্য ২৫ লক্ষ ও বিহারের জন্য ১০ লাক্ষ) টাকা চৌথ প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে আলিবর্দ্দী এই সন্ধি চুক্তির সময় প্রতিবাদ করেন যে, রাজাসাহু ও পেশোয়া তাঁর অধঃস্তন কর্মচারী রঘুজী ভোঁসলেকে সংযত করতে ব্যর্থ; অতএব বাৎসরিক এই বিপুল পরিমান অর্থ উৎকোচ দেওয়া নিরর্থক।

যাইহোক, বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নতুন সৈন্য নিযুক্ত করে আলিবর্দী উড়িষ্যা পুনরাধিকার করার জন্য সেনাপতি মীরজাফরকে প্রেরণ করেন। মীরজাফর মীর হবীবের এক সেনানায়ককে মেদিনীপুরের কাছে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর, ১৭৪৬ খ্রীঃ)। কিন্তু বালেশ্বর থেকে মীর হবীব একদল মারাঠা সৈন্যসহ অগ্রসর হলে মীরজাফর বর্ধমানে পালিয়ে যান (১৭৪৭ -এর জানুয়ারী মাসে)। মার্চমাসে নবাব সসৈন্যে বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয়ে শহরের সন্নিকটে মারাঠাদের প্রবলভাবে বাধাদানের ফলে তারা বিধ্বস্ত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করে এবং সাময়িকভাবে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম মারাঠা দস্যুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। করম আলির 'মজফ্ফরনামা'য় বর্ণিত আছে যে, বর্ধমানে অবস্থানের সময়ে মীরজাফর, আতাউল্লা খান ও ফকির-উল্লা বেগ নবাবকে পদচ্যুত করার চক্রান্ত করে। নুরউল্লা বেগ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলে নবাব তাঁদের পদচ্যুত করেন[৩৬] তারপর ৭১ বছরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর হয়ে মারাঠা সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং বর্ধমান জেলা মারাঠাদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন (মার্চ, ১৭৪৭ খ্রীঃ)। কিন্তু উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর মারাঠাদের হাতেই রইল।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সূচনায় আফগান সেনাপতি আহমদ শাহ দুররাণী পাঞ্জাব আক্রমণ করলেন। এই সুযোগে আলিবর্দীর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদল তাদের বাসস্থান দ্বারভাঙা জেলা থেকে অগ্রসর হয়ে পাটনা অধিকার করল। আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈনুদ্দীন আহমদ বিহারের নায়েব নাজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈনুদ্দীন ও হাজি আহমদ উভয়কেই বধ

করে এবং আলিবর্দীর কন্যাকে বন্দী করে দলে দলে আফগান সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। উড়িষ্যা থেকে মীর হবীবের অধীন একদল মারাঠা সৈন্যও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলিবর্দী তখন ভাগলপুরের কাছে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে আফগান ও তার সাহায্যকারী মারাঠা সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করে পাটনা অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্যাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আলিবর্দী উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং একপ্রকার বিনাবাধায় তাকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি ফিরে এলেই মীর হবীবের মারাঠা সৈন্যদল পুনরায় তা অধিকার করে। অতঃপর উড়িষ্যা থেকে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আলিবর্দী স্থায়িভাবে মেদিনীপুরে শিবির সন্নিবেশ করলেন (অক্টোবর, ১৭৪৯ খ্রীঃ)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে আবার বাংলাদেশে লুঠপাট আরম্ভ করলেন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদের কাছে পৌঁছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর হলেই মীর হবীব পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন — আলিবর্দী মেদিনীপুরে ফিরেগেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০ খ্রীঃ) এবং সেখানে স্থায়িভাবে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ এল যে, মৃত জৈনুদ্দীনের পুত্র নবাবের প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা পাটনা দখল করাব জন্য সেখানে পৌঁছেছেন। আলিবর্দী পাটনায় গেলেন এবং সিরাজকে স্ববশে এনে গুরুতর পীড়িত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ভয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই আবার তাঁকে কাটোয়া যেতে হল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ)।

বিশ্বাসঘাতকতা করে মসনদ দখল করেছিলেন আলিবর্দী। তাই রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, 'বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবর্দীকে মীর হবীব ও মারাঠাদের সঙ্গে যে অবিশ্রাম যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা তাঁহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে।'[৩৭] যদুনাথ সরকার বলেছেন — "Thus Alivardi was not destined to enjoy peacefully the Kingdom which he had gained by his cleverly engineered plots and hard fightings."[৩৮]

অসামান্য রণকুশলী আলিবর্দী কিন্তু তাঁর ৭৫ বছর বয়সের পর আর যুদ্ধ চালাতে পারলেন না। মারাঠারাও রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

১) মীর হবীব নবাবের অধীনস্থ হয়ে উড়িষ্যাব নায়েব নাজিমরূপে ঐ প্রদেশ শাসন করবে, এবং ঐ অঞ্চলের রাজস্ব রঘুজীর সৈন্যবাহিনীব ব্যয় বাবদ নাগপুরে প্রেরিত হবে।

২) প্রতি বছর চৌথ বাবদ বাংলার রাজস্ব থেকে ১২ লক্ষ টাকা রঘুজীকে দিতে হবে বিনিময়ে মারাঠারা ভবিষ্যতে বাংলার সীমানা অতিক্রম করবে না।

৩) সুবর্ণরেখা নদীর প্রবাহ পথ মারাঠা রাজ্যের উত্তর সীমারূপে নিরূপিত হয় এবং বাংলার সীমান্ত বালেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখা নদীর অপর তীরে নির্ধারিত হয়। ফলে মেদিনীপুর সুবা কটক থেকে পৃথক হয়ে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

সন্ধির প্রায় ১৫ মাস পরে বহু পাপকর্ম ও অত্যাচারের নায়ক মীর হবীবের বিরুদ্ধে জানোজী ষড়যন্ত্র করে অর্থ

তছরূপের অজুহাতে তাঁকে নিজের শিবিরে আহ্বান করেন এবং পরিকল্পনা ম্যফিক হত্যা করেন।

মীর হবীবের স্থানে রঘুজী উড়িষ্যার নায়েব নাজিম করলেন তাঁর এক সভাসদকে (২৪শে আগস্ট, ১৭৫২ খ্রীঃ)। ফলে উড়িষ্যা কার্যতঃ আলিবর্দীর হাতছাড়া হয়ে মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি পেল।

বাংলাদেশে শান্তি ফিরে এল দীর্ঘদিন বাদে। যদিও বিগত দশ-বারো বছর যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্তর্ধানের পরিণামে এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন প্রায় ভাঙনের মুখে। আলিবর্দী এই কারণেই তাঁর শাসন সংক্রান্ত সংস্কারগুলোকে ঠিক কাজে পরিণত করতে পারেননি। তারপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এক দৌহিত্র ইকরামউদ্দৌলা বসন্ত রোগে মারা যায়, পরের বছর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান (শাহামত জঙ্গ) এবং তারও পরের বছর সাঈদ আহমদ খান (সওলত জঙ্গ) -এর মৃত্যু হয়। এর আগে ১৭৪৮ সালে আলিবর্দীর কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিন আহমদ খানও (হজরত জঙ্গ) আফগানদের দ্বারা নিহত হন। এত গুলো মৃত্যুর আঘাত সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ বয়সে শোকে দুঃখে নবাবের শরীর ও মন একদম ভেঙে যায়। তিনিও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল, আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলিবর্দী খান দুজন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী রেখে যান -- সিরাজউদ্দৌলা এবং শওকত জঙ্গ। দুজনেই ছিলেন অনভিজ্ঞ, উচ্চাকাঙ্খী এবং অসম্ভব উগ্র প্রকৃতির। তবে মৃত নবাবের ইচ্ছানুসারে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসলেন সিরাজই। নবাব আলিবর্দীর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর তিনকন্যা। কনিষ্ঠা আমিনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে আলিবর্দী পুত্রাধিক স্নেহে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন।[৩]

আলিবর্দীর অতিরিক্ত প্রশ্রয় সিরাজকে শুধু যে উচ্ছৃঙ্খল করেছিল তাই নয়, সামরিক দক্ষতা বা উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁর হয়নি। সেই সঙ্গে চারিত্রিক অসংযম

তথা নৈতিক অধঃপতন তো ছিলই। নবাবী লাভের পূর্ব থেকেই তাঁর অত্যাচারে মুর্শিদাবাদের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল - জমিদার, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, এমনকি পরিবারের লোকজনও বাদ পড়েনি। শেষে নবাব বুঝতে পেরেছিলেন, সিরাজকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে না তুলে তিনি চূড়ান্ত ভুল করেছেন। তাই মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কিছু উপদেশ দিয়ে যান —

"My darling! my last words to you are that you should try to suppress the enemies of the kingdom and to elevate its friends, and that you should devote yourself to securing the wellbeing of your subjects removing all evils and disorders. Union brings forth prosperity and disunion causes misery. Your government would be stable if its foundation is laid in the goodwill of the governed. If you take to the ways of malice and hostility, the garden of your prosperity will wither away."[৪১]

কিন্তু আলিবর্দী খানই তাঁর প্রিয় সিরাজের জন্য অনেক সমস্যা রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল অনৈক্য এবং সর্বোপরি সিরাজের বিরুদ্ধে হিংসা ও ক্ষোভ। আবার সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেও তাঁর শত্রুর অভাব ছিলনা। সিরাজউদ্দৌলার শত্রু তালিকায় প্রথমেই ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই, পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ। নতুন নবাবরূপে মসনদে বসার পরেও শওকত সিরাজকে অভিনন্দন বাণী পাঠাননি। অতএব নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্যহীনতা স্পষ্ট। দ্বিতীয়, ঘসেটি বেগম। সিরাজের মা আমিনার জ্যেষ্ঠা সহোদরা ও নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের বিধবা ঘসেটি অপুত্রক ছিলেন। সিরাজের ছোট ভাই ইকরামউদ্দৌলাকে তিনি প্রতিপালন করেছিলেন; কিন্তু মসনদ দখলে সিরাজের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার আগেই ইকরামউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। পিতা আলিবর্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করে তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল সিরাজের প্রতি ঘসেটি সর্বদা বিরূপ ছিলেন। অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে তাই তিনি শওকত জঙ্গকে নিজপক্ষে আকর্ষণ করেন এবং তাঁকে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দেন। সিরাজউদ্দৌলার তৃতীয় তথা সর্বপ্রধান শত্রু ছিলেন মীরমুহাম্মদ জাফর খান। ইনি আলিবর্দীর বৈমাত্রেয় বোন শাহ্ খানমকে বিয়ে করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান, এবং পুরাতন সেনাবাহিনীর বকশী থেকে ক্রমে আলিবর্দীর প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। যোদ্ধা হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিলেও ইনি বরাবর অকৃতজ্ঞ ছিলেন। অন্নদাতা আলিবর্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেও তাঁর বাধেনি। মীরজাফরের যুক্তি ছিল, যদি আলিবর্দী তাঁর প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক শুজাউদ্দিনের ছেলে সরফরাজকে হত্যা করে মসনদ দখল করতে পারেন, তবে

তাঁরও অধিকার আছে আলিবর্দীর উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে মসনদে বসার। প্রকৃতপক্ষে সারাদেশ তখন এই জাতীয় ষড়যন্ত্রী, অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকে ভরে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই এমন নৈতিকতা-বর্জিত কলুষ আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত ছিল আলিবর্দীর আমলের অকৃতজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ। তাঁরা সর্বদা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে যেতেন। আর সর্বোপরি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠ। ঘসেটির মত ইনিও সর্বদা সিরাজের অমঙ্গলাকাঙ্খী। এই সময় মাহতাব চাঁদ ছিলেন জগৎশেঠ উপাধিধারী এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বময়কর্তা। যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন —

"Thus Siraj-ud-daulah came to his long assigned throne in a house divided against itself. with a hostile faction in the army and a disaffected subject population."[৩:]

নবাব হয়েই সিরাজ প্রথমে শত্রুদলনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। প্রথমে ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সিরাজের অন্তঃ পুরে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হল। অতঃপর মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের পরিণামস্বরূপ তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসাবণ করিয়ে মীরমদন নামক একজন বিশ্বস্ত যোদ্ধাকে ঐ পদে নিয়োগ করা হল।[৪:] (ক)

ঘসেটি বেগম এবং মীরজাফরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পর সিরাজ শওকত জঙ্গকে দমন করার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়া যাত্রা করেন ১৭৫৬ সালের ১৬ই মে। রাজমহলে পৌঁছে ২২শে মে তিনি শওকতের থেকে দায়পাটসারা গোছের হলেও আনুগত্য সূচক একটি চিঠি পান। কাজেই আপাতত যুদ্ধে বিরতি দিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নেন। ঠিক সময়ে নবাবের কলকাতায় প্রেরিত গুপ্তচর নারানসিং এসে ইংরেজ বণিকদেব ঔদ্ধত্য ও সিরাজের আদেশ অমান্য করার কথা জানান।

এই প্রসঙ্গে জেনে নেওয়া প্রযোজন কি বিষয়ে নবাবী হুকুম লঙ্ঘন করে ইংরেজরা সিরাজের রোষানলে পড়েছিল। বস্তুত পক্ষে বিরোধের একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, মসনদে আরোহণের পর কোম্পানির প্রধান মিঃ ড্রেক নতুন নবাবের সম্মানার্থে অভিনন্দনবাণী কিংবা কোনো উপহার সামগ্রী পাঠাননি, যা ছিল প্রচলিত রীতি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে সিরাজউদ্দৌলা একবার কাশিমবাজারে ইংরেজদের বাগান বাড়িতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তাঁর কুক্রিয়াসক্ত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ইংরেজদের অবগত থাকায় তাঁরা অনুমতি দেননি। তৃতীয়ত, নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারাম

সিং তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, কলকাতার উত্তরে বাগবাজার অঞ্চলে ইংরেজরা আত্মরক্ষার্থে নতুন গড় নির্মাণ করছে। কিন্তু সেটা নবাবের প্রতি কোনরকম বিরুদ্ধ আচরণ করার জন্য নয়, চন্দননগরে অবস্থানরত ফরাসীদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য। অথচ নবাব তাঁদের আদেশ দেন, কলকাতায় কোনো গড় নির্মাণ করা চলবে না। আর সর্বশেষ কারণ হল, নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইন অমান্য করে তাঁরই বিচারাধীন প্রজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও তার পরিবারকে ইংরেজরা কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল।

১৭৫৬ সালের ৫ই জুন সিরাজউদ্দৌল্লা কলকাতা যাত্রা করলেন। ১১ দিনে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে তিনি সেখানে পৌঁছলেন ১৬ই জুন। তখন কলকাতা দুর্গের সৈন্যসংখ্যা খুবই অল্প - কার্যক্ষম ইওরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা তিনশরও কম এবং আর্মেনিয়ান ও ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল দেড়শ'র মত। সুতরাং নবাব সহজেই এই অরক্ষিত কলকাতা অধিকার করলেন। গভর্ণর নিজে ও অন্যান্য অনেকেই নৌকাযোগে পলায়ন করে ফলতায় আশ্রয় নিলেন। ২০-শে জুন কলকাতার নতুন গভর্ণর হলওয়েল আত্মসমর্পণ করলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলকাতা দুর্গে প্রবেশ করলেন। এইখানেই ঘটেছে সেই ঐতিহাসিক কলঙ্কিত ও বিতর্কিত 'অন্ধকূপহত্যা'। এই হত্যাকাহিনীর প্রামাণ্য বিবরণ এবং সেক্ষেত্রে সিরাজের দায়িত্ব বা ভূমিকা সম্পর্কে নানাজনে নানা মন্তব্য করেছেন। তবে এটা সত্য যে, ১৮ফুট দীর্ঘ ও ১৪ফুট ১০ইঞ্চির একটি অপ্রশস্ত বদ্ধ কুঠুরীতে ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করে রাখা হয় এবং তাদের মধ্যে শ্বাসরোধে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়।[৪২] যাই হোক নবাব মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন (১১ই জুলাই, ১৭৫৬)।

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এককোটি টাকা ঘুষ দিয়ে সুবাদারীর ফরমান এবং সিরাজকে বিতাড়িত করার জন্য বাদশাহী অনুমোদন পেয়ে গেছেন। শওকৎ মীরজাফরের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন, এবং মীরজাফর তাঁকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিলেন যাতে শওকৎকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে পৌঁছে সব সংবাদই শুনলেন। অতঃপর তিনি শওকৎকে একটি চিঠি লিখে তাঁর প্রতিনিধির কাছে শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ণিয়ার শাসনভার হস্তান্তর করার আদেশ দিলেন। প্রত্যুত্তরে শওকৎ জঙ্গ নবাবকে মুর্শিদাবাদের মসনদ ছেড়ে ঢাকার ডেপুটি গভর্ণরের পদ গ্রহণ করতে বললেন।[৪৩]

স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল। ১৬ই অক্টোবর, ১৭৫৬-তে নবাবগঞ্জের কাছে মনিহারী গ্রামে উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলেন। এই যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটল (১৭৫৬, ১৬ই অক্টোবর)।

১৭৫৬ সালের জুনমাসে কলকাতা এবং অক্টোবর মাসে পূর্ণিয়া জয় করে সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতার উচ্চশিখরে পৌঁছে গেলেন। মুর্শিদাবাদের মসনদের অধিকারী রূপে সম্রাটের অনুমোদনপত্রও এই সময় পেলেন। কিন্তু এরপর থেকে নবাবের সক্রিয়তা ক্রমশঃ কমে যেতে লাগল।

কলকাতা জয়ের পর এর রক্ষণাবেক্ষণের কোনো উপযুক্ত বন্দোবস্ত তিনি করেননি। অথচ ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করার পর যাতে তারা পুনরায় বাংলাদেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে না পারে তার সুব্যবস্থা করা আবশ্যিক ছিল। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের অধীনে এক নৌবহর কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠাল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন বিনাবাধায় ফলতায় উদ্বাস্তু ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হলেন (১৫ই ডিসেম্বর ১৭৫৬ খ্রীঃ)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করল। বজবজ ও তার সন্নিকটবর্তী স্থানে নবাবের দুটি দুর্গ ছিল। মাণিকচাঁদ এই দুটি দুর্গ রক্ষার্থে অগ্রসর হচ্ছিলেন; কিন্তু ক্লাইভের মুখোমুখি হতেই তিনি পলায়ন করলেন। ইংরেজরা বজবজ দুর্গ ধ্বংস করল এবং বিনা যুদ্ধে কলকাতা অধিকার করল (২রা জানুয়ারী, ১৭৫৭খ্রীঃ)। ইতিমধ্যে মাণিকচাঁদ নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজপক্ষে যোগ দিয়েছে। অর্থের অভাব ছাড়া এর আর কোনো কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ সালে মাণিকচাঁদের পুত্রকে ইংরেজ কোম্পানী উচ্চপদে নিযুক্ত করলেন কারণ, মাণিকচাঁদ ত্রিশবছর যাবৎ ইংরেজদের প্রভূত উপকার করেছেন।

কলকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (৩রা জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। ওদিকে সিরাজও কলকাতা অধিকারের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১০ই জানুযারী ক্লাইভ হুগলী অধিকার করে লুঠতরাজ চালালেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পুড়িয়ে দিলেন। সিরাজ ১৯শে জানুয়ারী হুগলী পৌঁছলে ইংরেজরা কলকাতায় প্রস্থান করল। ৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলকাতায় পৌঁছে আমীর চাঁদের বাগানবাড়িতে শিবির স্থাপন করলেন।

৪ঠা জুন ইংরেজরা সন্ধি প্রস্তাব পাঠাল দুজন দূত মারফৎ - ওয়ালশ আর স্ক্রাফটন। নবাব সন্ধ্যার সময় তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, এবং পরদিন পর্যন্ত আলোচনা মুলতুবী রইল। কিন্তু ইংরেজ দূতেরা রাতে গোপনে নবাবের শিবির থেকে চলে গেল। শেষরাতে অকস্মাৎ ক্লাইভ নবাবের শিবির আক্রমণ করলেন। অতর্কিত আক্রমণে নবাবপক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক হত হল; কিন্তু প্রাতঃকালে নবাবের একদল সৈন্য সুসজ্জিত হতেই ক্লাইভ প্রস্থান করলেন। আসলে দূত মারফৎ সংবাদ পেয়ে ক্লাইভ সিরাজকে বন্দী বা নিহত করার উদ্দেশ্যেই হয়ত এসেছিলেন, কিন্তু কুয়াশায় পথভ্রষ্ট হওয়ায় নবাবের তাঁবুতে তাঁদের পৌঁছতে অনেক দেরী হল। এই সুযোগে সিরাজও তাঁর তাবু ত্যাগ করে গেলেন।

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যেসব দাবি তুলেছিল নবাব তার সবই মেনে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি করলেন ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭তে। এই সন্ধিপ্রস্তাবের গোড়াতেই ছিল যে, নবাবকে তখনি কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা মুলুকের বিভিন্ন জায়গায় ঠিক পূর্বের মতই কুঠিবাড়ি নির্মাণ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা চালাবে। তৃতীয়ত, বাদশাহ্ ফারুখশিয়র যে ফর্মান দিয়েছিলেন ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তার সব শর্তগুলো পুরোপুরি বজায় থাকবে। চতুর্থত, ইংরেজদের যা যা ক্ষতি হয়েছে তার খেসারত দেবেন নবাব। পঞ্চমত, ইংরেজরা নিজেদের ইচ্ছেমত কলকাতায় কেল্লা বানাবে, এবং ষষ্ঠত, কলকাতাতে একটা টাকশাল বসিয়ে হিন্দুস্থানি সিক্কাটাকা ছেপে বার করতে পারবেন।[৪৪]

নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেকবেশি থাকা সত্ত্বেও এরূপ হীনতা স্বীকার করে ইংরেজদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করেছিলেন মুখ্যত দুটি কারণে —

প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ এসেছিল যে আফগান রাজ আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত করে বিহার ও বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এতে নবাব অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন এবং যে কোনো উপায়ে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই সন্ধি করতে উপদেশ দিলেন। এঁরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এবং নবাব তা উপলব্ধিও করেছিলেন।

আর এই সুযোগটাই নিয়েছিল ইংরেজরা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে তারা বুঝেছিল যে, সরকার ঘুণধরা; নবাবের বিরুদ্ধে প্রধান কর্মকর্তারা সব জোটবদ্ধ।

এই সময় ইওরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংরেজরা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করে বাংলার ফরাসী শক্তি নির্মূল করতে মনস্থ করল। সিরাজউদ্দৌলা এতে আপত্তি করলেন এবং হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করলে তাদের বাধা দিতে আদেশ করলেন। উমিচাঁদ ইংরেজদের পক্ষ থেকে ঘুষ দিয়ে নন্দকুমারকে হাত করলেন এবং ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করলেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ)।

এইসময় থেকে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি ক্লাইভকে একসময় হুমকি দিয়েছিলেন যে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা

যুদ্ধ করলে তিনি নিজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন। ক্লাইভ তাতে বিচলিত না হয়ে চন্দননগর আক্রমণ করলেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। তাঁরা কোনো বাধা দিলেন না এবং নবাবও এজন্য কোনো কৈফিয়ৎ তলব করলেন না। তিনি নিজে তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেনই না, বরং চন্দননগরের পতন হলে ক্লাইভকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর ক্লাইভ যখন পলাতক ফরাসী ও তাদের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে তুলে দেবার জন্য সিরাজকে চাপ দিলেন তখন তিনি প্রথম ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন। এমনকি কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জ্যাঁল সাহেবকে অনুচরসহ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আশ্রয়ও দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক অমাত্যদের পরামর্শে জ্যাঁ ল সাহেব সিরাজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হল। সম্ভবত এর অন্য আর একটি কারণ ছিল। নবাব জানতেন ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে কর্তা হয়ে বসেছেন। বাংলাদেশে যাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোনো পক্ষই এরূপ প্রভুত্ব করতে না পারে, তার জন্য তিনি এদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এইজন্য তিনি যখন শুনলেন যে, ফরাসী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাত্য থেকে একদল সৈন্য নিয়ে বাংলার অভিমুখে যাত্রা করেছেন, তখন তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আবার ইংরেজ যখন ফরাসীদের চন্দননগর অধিকার করল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সৈন্য পাঠালেন এবং বুসীকে দু-হাজার সৈন্যপ্রেরণ করতে লিখলেন। এই সময় (১০ই মে, ১৭৫৭ খ্রীঃ) পেশোয়া বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানির কলকাতার গভর্ণরকে লিখলেন যে তিনি ইংরেজকে ১,২০,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন এবং বঙ্গভূমিকে দ্বিভাজিত করে ইংরেজ ও পেশোয়া এক এক ভাগ দখল করবেন। ক্লাইভ সিরাজকে একথা জানালে তিনি ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সৈন্য ফিরিয়ে আনলেন।

ইতিমধ্যে সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৭৫৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিক থেকে ইংরেজরা রাজধানীর বিভিন্ন পদস্থ লোকদের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেতে থাকে। গোলাম হোসেন সলীম পরিস্কার বলেছেন, মীরজাফর ইংরেজদের সিরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাববার অনুরোধ করেছিল ।[৪৫]

কিন্তু ইংরেজরা শুধু মীরজাফর ও অন্যদের আমন্ত্রণের উপর নির্ভর করে এত বড় ঝুঁকি নেবার মত কাঁচা ব্যবসায়ী ছিলনা। ১লা মে তারিখে কলকাতা কাউন্সিল মীরজাফরের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে নিম্নরূপ শর্তে ইংরেজরা মীরজাফরকে মসনদে বসাবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়।

১) ফরাসীদের বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করতে হবে।

২) সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলকাতার অধিবাসীদের যা ক্ষতি হয়েছিল, তা পূরণ করতে হবে। এর জন্য কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীদের পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্যান্য অধিবাসীদের সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হবে।

৩) সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধির সব শর্ত এবং পূর্ববর্তী নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদের যে সমুদায় সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা বলবৎ থাকবে।

৪) কলকাতার সীমানা ৬০০ গজ বাড়ানো হবে এবং এই বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীরা সর্ববিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হবে। কলকাতা থেকে দক্ষিণে কুলটি পর্যন্ত ইংরেজ জমিদারী স্বত্ব লাভ করবে।

৫) ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছেমত সুদৃঢ় করতে এবং সেখানে যত খুশী সৈন্য রাখতে পারবে।

৬) সুবাবাংলাকে ফরাসী ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করবে এবং তার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হবে।

৭) কোম্পানীর সৈন্য তাদের পক্ষভুক্ত নবাবকে সাহায্য করবে, কিন্তু যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয়ভার নবাব দিতে বাধ্য থাকবেন।

৮) কোম্পানীর একজন দূত নবাবের দরবারে থাকবেন, তিনি যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন এবং তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখাতে হবে।

৯) ইংরেজের মিত্র ও শত্রুকে নবাবের মিত্র ও শত্রু বলে পরিগণিত করতে হবে।

১০) হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোনো নতুন দুর্গ নির্মাণ করতে পারবেন না।

১১) কলকাতার সীমায় নবাব ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবেন।

১২) মীরজাফর যদি উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করতে স্বীকৃত হন, তবে ইংরেজরা তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে।[৪৬]

এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বে সেনানায়ক ইয়ারলতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাব করা হবে স্থির হয়েছিল। ইংরেজরা জানত যে, সিরাজের রাজত্ব তাদের পক্ষে কোনোমতেই নিরাপদ নয়। তাই তারা নিজেদের অনুগত কোন ব্যক্তিকে নবাব করে বাংলাদেশে প্রতিপত্তি লাভের বাসনা করেছিলেন। ইংরেজদের অভিপ্রায় জেনে মীরজাফর স্বয়ং নবাব পদের প্রার্থী হলেন। তিনি নবাবের সেনাপ্রধান অতএব ইংরেজদের সৈন্য দিয়ে তিনিই সবচেয়ে সাহায্য করতে পারবেন। এইজন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে মনোনীত করল। প্রধানত মীরজাফর ও জগৎ শেঠ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ সাহেবের মারফৎ কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিলের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিচাঁদ আর রায়দুর্লভও ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতেন এবং এর পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজদের সামান্য একটু বিপদে ফেলেছিলেন উমিচাঁদ। মুর্শিদাবাদের রাজকোষে যত অর্থ আছে তার শতকরা পাঁচভাগ তাঁকে না দিলে তিনি এই গোপন সন্ধির কথা নবাবের কাছে ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন। উমিচাঁদকে নিরস্ত করার জন্য একটা জাল সন্ধিপত্র প্রস্তুত হল - তাতে তাঁকে পুরস্কৃত করার শর্ত মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু মূলসন্ধিপত্রে এরূপ কোনো শর্তের উল্লেখ রইল না। ওয়াটসন এই জাল সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে গররাজী হওয়ায় ক্লাইভ নিজে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করলেন। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক হুইলার মন্তব্য করেছেন, "This trick has done more harm to his (clive's) reputation than any other charge that has been brought against him." [৪৭] অর্থাৎ, উমিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভের প্রবঞ্চনা তাঁর মর্যাদাকে সর্বাধিক ক্ষুন্ন করেছিল। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পরে চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াট্স মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং উভয় পক্ষ শর্তাবলী গ্রহণ করতে সম্মত হন। সমস্ত রকমের গোপনীয়তা বজায় রেখে অতন্ত কৌশলে এবং সাহসের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। মীরজাফর ৫ই জুন তারিখে শপথ নেন এবং তাঁর নিজস্ব মোহর অঙ্কিত করে চুক্তির শর্তগুলি গ্রহণ করেন। ১১ জুন চুক্তির কপি কলকাতার সিলেক্ট কমিটিতে হস্তান্তর করা হয় এবং ১৩ জুন ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

ইতিপূর্বেই বলেছি, মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য মীরজাফর ক্লাইভকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। এটি পেয়ে ক্লাইভ ঐ তারিখেই নবাবকেও একটি পত্র লেখেন। তাতে বলা হয়েছিল ইংরেজদের তাঁর সঙ্গে যে সববিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পাঁচজন কর্মচারীর উপর তার মীমাংসার ভার দেওয়া হোক। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করছেন। অতঃপর ক্লাইভ যে পাঁচজন কর্মচারীর নাম করলেন, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরাজদের পক্ষভুক্ত।

ছলনার অভিনয়ের শেষ অংক বোধহয় এখানেই হয়ে গেল; কারণ, পর্দার আড়ালে থাকা কলাকুশলীদের কদর্য মূর্তি এবার আর নবাবের কাছে গোপন থাকার কথা নয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় আবার রুখে দাঁড়ালেন সিরাজ। কিন্তু অদূরদর্শিতা তাঁকে পদে পদে পতনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ বিশ্বস্ত অনুচরেরা অবিলম্বে মীরজাফরকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অথচ বহু হত্যাকাণ্ডের নায়ক সিরাজ কোরাণ হাতে ক্ষমাপ্রার্থী মীরজাফরকে পুনর্বার বিশ্বাস করলেন। মীরজাফর অবশ্য তিনটি শর্তে নবাব পক্ষে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন —

১) সমূহ বিপদ কেটে গেলে তিনি আর নবাবের অধীনে চাকরি করবেন না।

২) তিনি দরবারে যাবেন না।

৩) আসন্ন যুদ্ধে মীরজাফর কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সিরাজ এই সমুদয় শর্ত মেনে নিয়েও (বিশেষত তৃতীয় শর্তটি) মীরজাফরকে আসন্ন যুদ্ধের সেনাপতি করলেন।

অতঃপর পলাশীর প্রান্তে ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুখোমুখি হলেন। আসলে, সম্মুখীন হল মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ। পলাশীর ধূ ধূ মাঠ সেই সন্ধিক্ষণের একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল। আধুনিক যুগ তার সমস্ত কৌশল, কাপট্য, আর সক্রিয়তা নিয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধির অস্ত্রে খান খান করে দিল বিলম্বিত, বিলাসী মধ্যযুগকে। শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্তনের সূচনা হয়ে গেল। সমালোচকের ভাষায় 'যে শক্তি ধীরে ধীরে দক্ষিণাপথের পূর্বসাগর তীরে আপনার বিস্ময়করী ক্রীড়া দেখাইতেছিল, পলাশী প্রান্তরে সেই শক্তি অসিয়া কেন্দ্রস্থ হয়। অবশেষে তাহার প্রবল প্রবাহে সমগ্র বঙ্গরাজ্য প্লাবিত হইয়া আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র ভারতবর্ষ ভাসিতে থাকে।'[৪৮]

ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট তিন হাজার। ২২০০ সিপাই, ৮০০ ইউরোপিয়ান পদাতিক ও গোলন্দাজ। নবাবের মোট সৈন্য ছিল ৫০,০০০ । ১৫,০০০ অশ্বরোহী আর ৩৫,০০০ পদাতিক। কামান ছিল ৫৩টি। সিনফ্রে নামক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনে আরো কয়েকটি কামান ছিল। ২৩ - শে জুন প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ হল। নবাবের পক্ষে সিন্‌ফ্রে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন, ইংরেজ সৈন্যও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে লাগল। কিন্তু ক্রমে তারা পিছু হটে আম্রকাননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করল। এতে উৎসাহিত হয়ে সিন্‌ফ্রে, মোহনলাল ও মীরমদন বিশাল

সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষকে আক্রমণ করলেন। অন্যদিকে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের অধীনস্থ বিপুল সৈন্যদল নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল। তাসত্ত্বেও নবাবপক্ষ ভালোই এগোচ্ছিলেন। অকস্মাৎ একটি গোলার আঘাতে মীরমদনের মৃত্যু হল। নির্বোধ নবাব অতিশয় বিচলিত হয়ে তখন মীরজাফরের শরণাপন্ন হলেন। প্রথমে তিনি আসেননি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্বানের পর সশস্ত্র দেহরক্ষী সহ নবাবের শিবিরে পা দিলেন। নবাব দীনভাবে নিজের পাগড়ী খুলে মীরজাফরের পদতলে রাখলেন এবং আলিবর্দীর উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে নিজ প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের কাছে করুণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। মীরজাফর আবার কোরাণ স্পর্শ করে, সিরাজকে অভয় দিলেন এবং আসন্ন সন্ধ্যায় সেদিনের মত যুদ্ধবিরতির পরামর্শ দিয়ে মোহনলালকে সসৈন্যে ফিরিয়ে আনতে বললেন। অভিজ্ঞ মোহনলাল এই সময় যুদ্ধক্ষেত্র কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, কিন্তু কুমন্ত্রণাদাতা মীরজাফরের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত সিরাজ তাঁকে বাধ্য করলেন। সেই মুহূর্তে সিরাজের পরাজয় ঘটল। নবাবের সৈন্যরা ভাবল তাদের পরাজয় হয়েছে, এবং তারা চতুর্দিকে পালিয়ে যেতে লাগল। এই সংবাদ পেয়ে নবাব অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্তকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন এবং দুই হাজার অশ্বারোহী সহ নিজেও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ণ করলেন। এইবার মীরজাফর তাঁর বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিনফ্রে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যুদ্ধ করে অবশেষে প্রান্তর ত্যাগ করলেন। ইংরেজসৈন্য নবাবের শিবির লুঠ করল। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাতজন গোরা, ষোলে জন সেপাই মরেছে, তেরো জন গোরা আর ছত্রিশ জন সেপাই জখম হয়েছে। একটা ছোটখাটো দাঙ্গায় এর চেয়ে ঢের বেশি লোক মরে।'[১২]

এই হল পলাশীর যুদ্ধ। পরদিন (২৪শে জুন ১৭৫৭) দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলে সংবর্ধনা জানালেন ক্লাইভ। মীরজাফর মুর্শিদাবাদে পৌঁছেই শুনলেন সিরাজ পলাতক। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে লোক ছুটল তাঁকে কয়েদ করতে। ২৬শে জুন মর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিষেক হল। আর ২৯শে জুন সিংহাসনে বসলেন তিনি। রজতকান্ত রায় লিখেছেন —

"মসনদে বসলেন সুবাহ্ বাংলা-বিহার-ওড়িশার নতুন নবাব সুজা-উল-মুল্‌ক হিসামুদ্দৌলাহ্ মীর জাফর আলি খান বাহাদুর মহাবৎ জঙ্গ। মহাবৎ জঙ্গ তাঁর প্রভু আলিবর্দিখানের উপাধি — মানে যুদ্ধে প্রচণ্ড। কিন্তু মসনদে উঠতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। ক্লাইভ নিজের হাতে তাঁকে তখ্‌তে তুলে দিলে তবে তিনি নির্ভয় হয়ে বসলেন।"[১৩]

ক্লাইভ যেদিন বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন লক্ষ লক্ষ জনতা সমবেত হয়েছিল পথের পাশে। ক্লাইভ নিজেই লিখেছেন যে, তারা ইচ্ছে করলে লাঠি আর ঢিল দিয়েই তাঁদের শেষ করে ফেলতে পারত। 'কিন্তু বাঙ্গালীরা তাহা করে নাই। কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিত ছিল যে —

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে।
বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।'[৫১]

৩০শে জুন সিরাজউদ্দৌলা ধরা পড়লেন রাজমহলের কাছে। ২রা জুলাই রাতে তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হলে মীরজাফরের পুত্র মীরনের হাতে তুলে দিলেন সিরাজকে। মীরন সেই রাতেই তাঁকে হত্যা করলো। এখানেই শেষ হল পলাশীর ষড়যন্ত্র — আর সুবাহ্ বাংলায় এবার যা শুরু হল, তদানীন্তন ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খানের ভাষায় তার নাম 'ইনকিলাব', অর্থাৎ আক্ষরিক এবং অনিষ্টকর অর্থে 'revolution'। সেই উত্থান-পতনের তরঙ্গে সমাজের শীর্ষস্থানীয় যাঁরা ষড়যন্ত্রী, তাঁরা একে একে ভূপাতিত হলেন। সাধারণ মানুষও বাদ পড়ল না। ইনকিলাবের অর্থই তাই। উপরের স্তর এর ধাক্কায় অতলে তলিয়ে যায়। অথচ চক্রান্তকারীরা তলিয়ে যাবার বুদ্ধি খাটাননি — কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকে অনেকে 'নবাবী আমল' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গোপাল হালদারের অভিমত উদ্ধৃত করে বলতে পারি --

"রাজা-রাজ্যের ইতিহাসের দিক থেকে তা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, সে গণনায় নবাবী আমল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরই স্থায়ী হয়েছিল, খ্রীঃ ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় খ্রীঃ ১৭০৭ অব্দে, তার পূর্বে বাঙলার নবাবদের স্বতন্ত্র শাসনের কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। আর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর পরে মীরজাফর নামেই হয়েছিল নবাব। নবাবী শাসনের পরিবর্তে খ্রীঃ ১৭৫৭ থেকে 'ইংরাজ রাজত্বের' আরম্ভ হয়। কিন্তু তা শুধু পুর্বেকার মতো রাজা বা রাজবংশের পরিবর্তন নয়, বিদেশীয় এক বণিক শক্তির রাজ্য লাভ।"[৫২]

আসন্ন এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায় সমগ্র বঙ্গসমাজ। কিন্তু 'প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল সমাজ জীবনে নূতন কালের প্রারম্ভ নিশ্চিত হয় না।'[৫৩]

মুঘল রাজনৈতিক দর্শনে অগ্রাধিকার পেয়েছিল সামরিক আভিজাত্য। আনুগত্য প্রদর্শন করলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন সমরনায়ক মুঘল সামরিক অভিজাত শ্রেণীর সদস্যপদ লাভ করতে পারতেন। মুঘল আভিজাত্যের দৃষ্টিতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিল বণিক, অতএব নিম্নশ্রেনীর। মুঘল সরকার কখনো এদের

সমকক্ষ গণ্য করেনি। কারণ এদের মাপকাঠিতে বীর বড়, বণিক ছোট, বীরের সঙ্গে বণিককে সমপর্যায়ে দেখা যায়না। কিন্তু ব্রিটিশ রয়েল অফিসার হিসাবে কর্নেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন ছিলেন সামরিক নেতা। অতএব সমকক্ষ হিসাবে তাঁদেরকে মুঘল আভিজাত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা ছিল না। হুগলী দখলকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাই ক্লাইভকে লিখেছিলেন, ' আমি অবগত আছি যে আপনি একজন যোদ্ধা, সমরবীর, সুতরাং আপনার সঙ্গে সমপর্যায়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার কোনই আপত্তি নেই।'[২৪]

নবাব মীরজাফরের সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহ কর্ণেল ক্লাইভ, কর্ণেল কুট ও এডমিরাল ওয়াটসনকে সম্মান সূচক সামরিক উপাধিতে ভূষিত করেন। যেমন, ক্লাইভকে উপাধি দেওয়া হয় সাবুদ জং (সমরে শক্ত) মুইনুদ্দৌলা (রাষ্ট্রের সেরা), ওয়াটসনকে দেওয়া হয় দিলীর জং (সমরে সাহসী) এবং কুটকে দেওয়া হয় সাইফ জং (যুদ্ধের তলোয়ার) ইত্যাদি। অধিকন্তু বাদসাহ ক্লাইভকে ছয় হাজারী জাত ও পাঁচ হাজারী ঘেড়ার মনসবদার পদে অলঙ্কৃত করেন। ক্লাইভের পর ফোর্ট উইলিয়মের সব গভর্নর ও কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মুঘল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এসবের পিছনে তাত্ত্বিক যুক্তি এই যে, মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিদেশীদের অংশগ্রহণে কোন বাধা নেই যদি এরা অভিজাত হয়ে থাকে এবং মুঘল সরকাবের প্রতি অনুগত থাকে। আর উপাধি তো আনুগত্যেরই পুরস্কার।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওসব উপাধি প্রদান ছিল সুবা বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য সসম্মানে মেনে নেবার ছল মাত্র। যদিও কোম্পানির বিঘোষিত লক্ষ্য ছিল একজন মিত্র নবাবের অধীনে ১৭১৭ সালের ফরমান মোতাবেক শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য করা, তথাপি পলাশী যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্মচারীদের বৃহদংশ রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করে। ১৭৫৭-১৭৬৫ সময়কালের ঘটনা প্রবাহ এই হস্তক্ষেপের সরাসরি ফল।

বাংলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে অনেকেই কন্টকাকীর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে মীরজাফর-আলী খান সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রমী। অদূরদর্শী মীরজাফর নগরচুক্তি (১৭৫৬) -তে স্বাক্ষর করার সময় ভেবেছিলেন যে, কোম্পানীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে তিনি স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী নবাব হিসাবে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হবেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্খা একেবারেই অবাস্তব। সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের পর তিনি সগৌরবে ও স্বনির্ভয়ে সিংহাসনে পর্যন্ত বসতে পারেননি। পলাশী যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর ক্লাইভ তাঁকে গদিতে বসান (২৯জুন,

১৭৫৭)। আর সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক লুটপাট হয়। প্রত্যক্ষদর্শী স্ক্র্যাফটনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'নবাবের হারেমের মাইলারা বিপুল পরিমানে সোনা, হীরা-মুক্তা ও নগদ অর্থ নিয়ে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নেয়, সিপাহীরা কোষাগার ভেঙে যা কিছু সামনে পায় লুট করে নিয়ে যায়।'[৫৫]

কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী (১৫ই জুলাই, ১৭৫৭) সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ মীরজাফর কোম্পানীকে ২২৭ লক্ষ সিক্কা টাকা পরিশোধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নবাবী লাভ করার পর দেখা গেল রাজকোষে তত টাকা নেই। জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হল যে, আপাতত দাবির অর্ধেক টাকা দেওয়া হবে। অবশিষ্টাংশ তিন বছরে সমান কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দু'কোটি পঁচিশ লক্ষটাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীকে আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ক্লাইভকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হয়েছিল, তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ৩রা জুলাই, ১৭৫৭ খ্রীঃ সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করে প্রথম কিস্তির টাকা দু'শ নৌকায় বোঝাই করে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হল। ঐ দিনই সিরাজউদ্দৌলার শবদেহকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে আর একদল লোক শোভাযাত্রা করে নগর প্রদক্ষিণ করল।

কঠিন আর্থিক সমস্যা ছাড়াও মীরজাফর জটিল রাজনৈতিক সমস্যারও সম্মুখীন হলেন। বিহারের নায়েব সুবা রামনারায়ণ রায় ছিলেন সিরাজের অনুগত। তিনি মীরজাফরের সিংহাসনলাভের বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেন। অনুরূপ ভাবে পূর্ণিয়া ও মেদিনীপুরের জমিদারদ্বয় (যথাক্রমে হাজীর আলি খাঁ ও রাজারাম সিংহ) মীরজাফরকে নবাবরূপে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃত হলেন। আর এই তিনটি নবাব-বিরোধী চক্রকে আরো শক্তিশালী করে তুললেন মীরজাফরের দেওয়ান (অর্থমন্ত্রী) তথা পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক রায়দুর্লভ। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে মীরজাফর রায়দুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু অন্যান্য মীরজাফর বিরোধীদের মত রায়দুর্লভকেও রক্ষা করলেন ক্লাইভ। আসলে দূরদর্শী ক্লাইভ বুঝেছিলেন যে, মীরজাফর ইংরেজদের সহায়তায় নবাব হলেও তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্ব খর্ব করতে সর্বদা চেষ্টা করবেন। তাই তিনিও রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে নিয়ে স্বপক্ষীয় একটা দল গড়ে তুলতে চাইলেন। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মীরজাফরের পুত্র মীরন রায়দুর্লভকে দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে তাঁর স্থানে নিযুক্ত করলেন। এদিকে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি না পেয়ে সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক সৈন্য বরখাস্ত করলেন। মীরজাফরের দুর্ব্যবহারে বিহারের দুইজন জমিদার সুন্দর সিংহ ও বলবন্ত সিংহ বিদ্রোহ করলেন।

গোলেম হোসেন তাবাতবাই মন্তব্য করেছেন যে, মীরজাফর বৈরী পরিস্থিতির এমন এক অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিলেন যে, সবাই এই সুযোগে নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে আবার এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হল। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর নামমাত্র শাসকে পর্যবসিত হয়েছিলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁর উজীর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আফগান সুলতান আহমদ শাহ্ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করলেন। উজীর গাজীউদ্দিন ইমাদ-উল-মুল্‌ক্ বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। আবদালী তখন নাজিরউদ্দৌল্লাকে দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে প্রস্থান করলেন। কিন্তু আবদালীর প্রস্থানের পরেই মারাঠারা দিল্লী আক্রমণ করল (আগস্ট, ১৭৫৭ খ্রীঃ) এবং নাজিরউদ্দৌল্লাকে হটিয়ে গাজীউদ্দিনকে উজীরী দিল। শাহাজাদা তখন উজীরের নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রান পেতে আশ্রয় নিলেন নাজিরউদ্দৌল্লার কাছে(মে, ১৭৫৮)। বাদ্‌শাহ তাঁর পুত্রকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সুযোগে অকর্মণ্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করে বাংলার মসনদে বাদশাহ্‌জাদাকে বসাবার জন্য এলাহাবাদের সুবাদার মুহম্মদকুলী খান ও অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লা শাহজাদাকে সামনে রেখে বিহার আক্রমণ করতে মনস্থ করলেন। পূর্বোক্ত বিহারের বিদ্রোহী জমিদার দু'জনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হলেন, কারণ তাঁর সৈন্যেরা পূর্ব থেকেই বিদ্রোহী ছিল। এছাড়া জমিদারদের মধ্যে অনেকেই শাহজাদার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। নবাব অনন্যোপায় হয়ে সোনা-রূপার তৈজসপত্র প্রভৃতি বিক্রি করে সৈন্যদের বাকিবেতন কিছুটা পরিশোধ করলেন এবং ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। শাহজাদাও ক্লাইভের সাহায্য চাইলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উজীরের চাপে পড়ে মীরজাফরকে অদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী করা হয়। শাহজাদা পাটনা দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন (মার্চ, ১৭৫৯ খ্রীঃ)। কিন্তু ক্লাইভের হাতে তিনি পরাজিত হলেন। তখন শাহজাদা ইংরেজদের কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাইলেন। ক্লাইভ তাঁকে দশহাজার টাকা দিলে তিনি বিহার ছেড়ে চলে গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহাজাদার পরাজয়ে খুশী হয়ে বাংলায় মীরজাফরের কর্তৃত্ব অনুমোদন করলেন এবং মীরজাফরের অনুরোধে ক্লাইভকে একটি সম্মানসূচক পদবী দিলেন। মীরজাফরও ক্লাইভকে এই পদের উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করলেন।

ইতিমধ্যে আবার মীরজাফর পুত্র মীরনের দুর্ব্যবহারে বেশকিছু জমিদার একজোট হন, এবং তাঁদেরই প্ররোচনায় ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে

শাহজাদা পুনরায় বিহার আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। শোন নদের নিকটবর্তী হয়ে তিনি সংবাদ পেলেন যে তাঁর পিতা উজীর কর্তৃক নিহত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দ্বিতীয় শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন এবং অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লাকে উজীর নিযুক্ত করলেন। এই অবসরে রামনারায়ণ পাটনায় দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত করে বাদশাহী ফৌজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করলেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ খ্রীঃ)। অতঃপর শাহআলম মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিষ্ণুপুর পৌঁছলেন। এইখানে একদল মারাঠা সৈন্যও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এখন মীরজাফরের নবাবীর অস্তোন্মুখ অবস্থা এবং বাংলাদেশেরও চরম দুরবস্থা। সম্ভবত এই সব শুনেই শাহ-আলম বঙ্গভূমি আক্রমণ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হল না। ইংরেজরা তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করল (আগস্ট, ১৭৬০ খ্রীঃ)।

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের সুযোগ নিয়ে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট বৃহৎ একদল সৈন্যসহ কটক আক্রমণ করলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মেদিনীপুর অধিকার করলেন। বীরভূমের জমিদাররাও তাঁর দলভুক্ত হলেন। মীরজাফর পুনরায় ইংরেজের দ্বারস্থ হলেন। ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র শিবভট্ট বিনাযুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে প্রস্থান করল।

এই সময়ে পূর্ণিয়ার নায়েব নাজিম খাদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হয়ে শাহ আলমের সঙ্গে যোগদান করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মীরন ও ইংরেজ সেনাপতি ক্যাইলোড দুটি সেনাদল নিয়ে তাঁকে বাধাদান করলেন। ১৬ই জুন খাদিমহোসেন পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং নবাবসৈন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু ৩রা জুলাই অকস্মাৎ শিবিরে বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় নবাব বাহিনীর প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় রহল না।

এইভাবে মীরজাফরের আমলে শত্রুর আক্রমণ, নবাব বিরোধী অভ্যুত্থান এবং অরাজকতায় বাংলাদেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গদিরক্ষার জন্য মীরজাফরের পক্ষে কোম্পানীর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিলনা। কিন্তু আমরা দেখি রবার্ট ক্লাইভ একদিকে যেমন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করে মীরজাফরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছেন, তেমনি অপরদিকে মীরজাফরের ওপর চাপসৃষ্টি করেছেন বিদ্রোহী নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত না করার জন্য। ক্লাইভের হস্তক্ষেপের কারণেই নবাব রামনারায়ণ রায়, রায়দুর্লভ প্রমুখ শত্রুদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। তাঁরা নবাবের শত্রু বটে, কিন্তু কোম্পানীর বন্ধু। দেশের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের চুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন। কিন্তু মীরজাফর নিরুপায়। আসলে, মিত্র হিসাবে মীরজাফরকে

গদিতে রাখা কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূল হলেও তিনি সম্পূর্ণ আপদ মুক্ত হয়ে যেন শক্তিশালী শাসকে পরিণত হন — সেটাও ছিল কোম্পানীর রাজনৈতিক বিবেচনার বিষয়।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার নতুন বিপদের সম্মুখীন হলেন মীরজাফর। ইংরেজ ও ফরাসীদের মত ওলন্দাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করত এবং হুগলীর নিকটবর্ত্তী চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। মীরজাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠাকরে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল এবং মীরজাফরকে নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাল না। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইলেন। কিন্তু তারা ত্রুটি স্বীকার না করে লম্বা এক দাবি-দাওয়ার ফর্দ পেশ করল। ক্লাইভের পরামর্শমত নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করার পরওয়ানা বের করামাত্র তারা মীরজাফরের প্রাপ্য সম্মান দিল।

কিন্তু ইংরেজদের সন্দেহ হল যে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সাহায়তা করছেন। আর এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করছেন মহারাজা নন্দকুমার। ক্লাইভ নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখে জানালেন ওলন্দাজদের সঙ্গে মিত্রতা করলে ভবিষ্যতে তিনি মীরজাফরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। নবাব প্রতিবাদ করে বললেন ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সদা প্রস্তুত। অথচ ব্রিটিশদের প্রতি নতজানুনীতি সত্ত্বেও অচিরেই নবাব মীরজাফর তাদের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠলেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করেছিল যে, মীরজাফর ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ শোধ করবে এবং আভ্যন্তরীন বাণিজ্য থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা দিয়ে বাংলায় কোম্পানীব পুঁজি যোগানো ছাড়াও দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহ করা, বাংলায় শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন এবং দূর প্রাচ্যে বাণিজ্যের পুঁজি বিনিয়োগ সবই সম্ভব হবে।

কিন্তু ইংরেজদের সে প্রত্যাশা মীরজাফর পূরণ করেন নি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ, কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে সরকারের রাজস্বহার এমন হ্রাস পায় যে, তাঁর পক্ষে ক্ষতি পূরণ দেওয়া দূরে থাক, সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতাদি দেওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মীরজাফর যেহেতু ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগ সেহেতু এর পরিবর্তে সরকারের উচিত কোম্পানীকে কতকগুলো জেলা স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেওয়া। গভর্ণর ভান্সিটার্ট এরূপ অভিমত জানালেন মীরজাফরকে।[৫৬]

প্রাক-পলাশী যুগে যখন কোম্পানী শুধুই বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠির সঙ্গে

প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় লিপ্ত ছিল, দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলাবার চেষ্টা করত না, তখন কিন্তু সে মুনাফা অনেক বেশী পেত। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর সুযোগ সুবিধা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর ক্রমাগত লোকসানের ফলে প্রায় দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এর কারণ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি এবং অব্যবসায়ী খাতে ব্যয়বৃদ্ধি। কোম্পানীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্মকতারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে মেতে ওঠে এবং ঐ ব্যবসার নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর মত অব্যবসায়ী খাতে খরচ বাড়িয়ে চলে। স্বভাবতই কোর্ট অব ডিরেক্টর্স এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ এদের পক্ষে এমনভাবে জনমত তৈরী করে যে, ডিরেক্টরদের পক্ষে তা নীরবে অনুমোদন করা ছাড়া দ্বিতীয় উপায় থাকে না। কোম্পানীর অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে রাজ্যের কিছু ভূমি দখল করার পরিকল্পনা আসলে দুর্নীতিবাজ ও উচ্চাভিলাষী ফোর্ট উইলিয়ম কর্মকর্তাদের ধাপে ধাপে রাজ্যস্থাপনের বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ।

ভূমি দখল বিষয়টি মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানীর সমস্ত চুক্তি ও মিত্রতার পরিপন্থী। কিন্তু এরই মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ বণিকের অবস্থান থেকে প্রধানতম রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে তৎপর হয়। মীরজাফর সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে আরো সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী করার সংকল্প নেন এবং একই সময়ে ইংরেজদের আধিপত্যে ঈর্ষান্বিত ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিসন্ধি গোপন থাকেনি। মুর্শিদাবাদের ঐ ষড়যন্ত্রমূলক পরিবেশে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়। কাউন্সিল মনে করে যে, ইংরেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে মীরজাফরকে অপসারণ একান্ত জরুরী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, চুক্তি মোতাবেক ১৭৫৭ থেকে তিন বছরের মধ্যে কোম্পানীর সমস্ত দেনা শোধ করার চুক্তি তিনি লঙ্ঘন করেছেন। গভর্ণর ভান্সিটার্ট দাবি জানান , মীরজাফর যেহেতু কোম্পানীকে প্রদেয় দেনা শোধ করতে অপারগ, সেহেতু ২৪ পরগণা ছাড়া আরো তিনটি জেলা (বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম) কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হোক। ভান্সিটার্ট হুমকি দেন যে, প্রস্তাবিত জেলা হস্তান্তর না করলে নবাবের প্রতি কোম্পানির সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। নবাব মীরজাফর তিনটি জেলা হস্তান্তর করার প্রস্তাবকে তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত কোম্পানীর মৈত্রী চুক্তির নগ্ন লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের এক পর্যায়ে কোম্পানী মীরজাফরকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের সঙ্গে আঁতাত করে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০)। চুক্তি অনুসারে সিংহাসনের বদলে

মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম — এই তিনটি বিস্তীর্ণ জেলা কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে রাজী হন। কোম্পানী তিনটি জেলা-প্রাপ্তির বিনিময়ে নবাবের কাছে সকল পাওনা পরিশোধিত বলে ঘোষণা করে।"

২০শে অক্টোবর, ১৭৬০ -এ মীরকাশিম নবাব বলে ঘোষিত হন। ইংরেজদের সাহায্যে মীরজাফর যেমন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উৎখাত করেছিলেন, তেমনি মীরকাশিমও ইংরেজেদের হাত ধরে নবাব হন। পার্থক্য শুধু এই - সিরাজ ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে পরাস্ত হন, আর মীরজাফর গদি ছাড়েন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই। আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়া যে নিষ্ফল, এই বাস্তবতাকে মানার মত বুদ্ধি মীরজাফরের ছিল।

ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের আঁতাত অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। ক্ষমতালাভের জন্য ষড়যন্ত্র ও ঝুঁকিপূর্ণ আঁতাত তো মুঘল সামরিক আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের একটি অতিপ্রচলিত বৈশিষ্ট্য। মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর (১৭২৭) থেকে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। মীরকাশিমের উত্থান এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ঝুঁকির দিক থেকে পূর্ববর্তী সমস্ত আঁতাতকে অতিক্রম করে গেছে মীরকাশিমের চুক্তি। এর ফলে তাঁর নিজের জীবনই শুধু বিনষ্ট হয়নি, এদেশের মুঘল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও তরান্বিত হয়েছে।

কিন্তু কেন তিনি এই পদক্ষেপ নির্যেছিলেন ? এক কথায় কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি সত্ত্বেও মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন কয়েকটি অবাস্তব ধারণার বশবর্তী হয়ে। এগুলো হল প্রথমত, কলকাতায় ব্রিটিশ বসতিকে কেন্দ্র করে হুগলী-ভাগীরথী অববাহিকায় কোম্পানী ১৬৯০ সাল থেকে বিগত পঞ্চাশ বছরে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাববিস্তার করেছে তা এতই ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী যে, তার প্রভাব বলয়ের ভিতর কোনো শাসকের পক্ষেই সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় মীরকাশিম মনে করেছিলেন, অন্তত কিছুকাল গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে কোম্পানীর তৎপরতা রাজনৈতিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে গঙ্গার উজানে এদের প্রভাব বিস্তার রোধ করে সেখানে নবাবের ক্ষমতাকে অটুট করে তুলবেন, এবং পরে ধীরে ধীরে নিম্নাঞ্চলের প্রতি শক্তিবিস্তার করে কোম্পনীকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনবেন।

দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদ থেকে সুদুর মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে ইংরেজদের প্রভাব-বলয়কে অকার্যকর করে দেওয়া, নতুন রাজধানীতে কোনো ইংরেজ বা ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাসের অনুমতি প্রদান না করা, ইংরেজদের সঙ্গে ভবিষ্যতে মোকাবিলার জন্য সরকারের অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং সেনাবাহিনীকে আধুনিক

করা। এছাড়া, প্রশাসন থেকে সমস্ত নবাব-বিরোধী ও ব্রিটিশপন্থী দালালদের বরখাস্ত করে একটি দক্ষ ও অনুগত আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এককথায়, কৌশলগতভাবে একটা সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে একটা পেশাদার সেনাবাহিনী ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে সমৃদ্ধ করে আচিরেই ইংরেজদের হাত ধরে সুবার পুনরুদ্ধার — এই ছিল মীরকাশিমের স্বপ্ন।

এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য মীরকাশিম প্রথমেই রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন মুঙ্গেরে। আর সেইসব আমলা, আমির ও অমাত্যরাই সেখানে গেল, যাঁরা প্রকৃতই নবাবের অনুগত এবং ইংরেজের অভিসন্ধি সম্পর্কে সচেতন। মুঙ্গেরে কোনো ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে তিনি প্রবেশাধিকার দেননি, তাই কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকতেন মুর্শিদাবাদে। প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য মীরকাশিম দরবারের বেশ কিছু সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দিলেন, এবং সন্দেহজনক কয়েকজন আমলা-মুৎসুদ্দিকে বরখাস্ত করলেন। এরপর সরকারের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ ভুয়া লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করে নতুন জরিপের মাধ্যমে বর্ধিত হারে জমিদারদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হল। স্বভাবতই, এই নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার সরকারের ভঙ্গুর আর্থিক ভিত্তিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করল। ফলে নবাবের পক্ষেও যাবতীয় ঋণ পরিশোধ এবং সেনাবহিনীর সমস্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করে মীরকাশিম একটি নতুন আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করলেন, অবশ্য সেক্ষেত্রেও অব্রিটিশ ইউরেপীয় সেনা-প্রাশক্ষক নিয়োগ করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'নবাবের সৈন্যদল তিনভাগে বিভক্ত হয় — অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ। প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনানায়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ আর্মানী, জার্মান, পর্তুগীজ ও ফরাসী নায়কদের অধীনে পরিচালিত হইত।'[৬৬]

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করা, আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা এবং আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নবাব মীরকাশিমের অসাধারণ যোগ্যতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় মেলে। কিন্তু সাফল্যের জন্য যে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে যে সুযোগ্য নেতৃত্বকেও অনেক সময় পরাভূত হতে হয়, মীরকাশিমের জীবন তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

ইংরেজদের অনধিকার চর্চা থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কতকগুলো আমূল সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। এই সংস্কার নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল, কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের দেশী গোমস্তাদের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা। বাদশাহি ফরমান অনুযায়ী শুধু কোম্পানীই নিজের মোহরাঙ্কিত 'দস্তক' দেখিয়ে বিনা শুল্কে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে যোগদানের অধিকারী ছিল, তার কর্মচারীরা

নয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরাও বিনাশুল্কে বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে, এমনকি তার গোমস্তারাও অবাধে এই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। এর ফলে দেশী ব্যবসা মার খায়, এবং স্বাভাবিক কারণেই শুল্ক বাবদ সরকারের আয় প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এদেব অত্যাচার মীরজাফর নীরবে সহ্য করতেন, কারণ তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সত্তা ছিল কোম্পানীর কাছে দায়বদ্ধ। সে দায়বদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচাবী এবং দেশী গোমস্তাদের বেআইনি ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। অপরদিকে কর্মচাবীরাও বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য কবার অধিকার আদায়ের দাবিতে অটল। এর অনিবার্য ফল কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে যুদ্ধ।

নবাবের সঙ্গে স্বাভবিক সম্পর্ক রক্ষা করে আইনানুগভাবে বাণিজ্য করার পক্ষে যাঁরা মত পোষণ করতেন তাঁবা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য। গর্ভণব ভ্যান্সিটার্ট এঁদেরই একজন। ইনি ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নবাবের অভিযোগের প্রতিবিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নবাবের নতুন রাজধানী মুঙ্গেরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভ্যান্সিটার্ট এক নতুন সন্ধি করলেন। স্থির হলযে, ভবিষ্যতে ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুল্ক দেবে। এদেশীয় বণিকেরা শতকরা ৪০ টাকা শুল্ক দিত। সুতরাং নির্ধারিত শুল্ক দিয়েও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকত। কিন্তু এই সুবিধার পবিবর্তে সন্ধিব আর একটি শর্তে স্থির হল যে, অতঃপর নবাবের কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজ বণিক বা তাব গোমস্তাব কোনো বিবাদ বাধলে নবাবের আদালতেই তাব বিচার হবে। ভ্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতা কাউন্সিল এই মীমাংসা গ্রহণ করার আগেই নবাব তাঁর কর্মচারীদের এই বিষয় জানালেন এবং তদনুরূপ শুল্ক আদায় করাতে নির্দেশ দিলেন।

এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত কবায় ইংরেজ বণিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা বোর্ডের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল এবং বোর্ড সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে গিয়ে এই নতুন বন্দোবস্ত নাকচ করেদিল। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের সদস্যদের স্মরণ করাতে বললেন যে, বাদশাহী ফরমানে এরূপ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেব অধিকার দেওয়া হয় নি, এবং কোম্পানীর ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবাব নির্দেশ দিয়েছেন যে, লবণ, সুপারি প্রভৃতি যে সমুদয় দ্রব্যের বেচা-কেনা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তার জন্য শুল্ক দিতে হবে নতুবা নবাবের রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হবে। কিন্তু ভ্যান্সিটার্টের সৎ পরামর্শ গ্রাহ্য হলনা।

কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের বিবাদের কারণ ব্যাখ্যায় ভ্যান্সিটার্ট মন্তবা করেছিলে —

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি নবাবের (মীরকাশিম) অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি এবং তাঁর সরকারকে নানাভাবে হয়রানি না করি, তাহলে তিনিও আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। ...... এমন কোন দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না যে নবাব আমাদের বৈধ্য ব্যবসায়ে বিঘ্নসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের কর্মচারী ও গোমাস্তারা আইন লঙ্ঘন করছেন। এদের অন্যায় ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চুক্তি বহির্ভূত অযৌক্তিক দাবি-দাওয়াই নবাবকে বিবাদে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে।"[২১]

কলকাতা কাউন্সিল ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে নবাবের নতুন বন্দোবস্ত নাকচ করে দেওয়ায় দেশ ও সরকারের অর্থনীতির উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে অবশেষে মীরকাশিম সকলের জন্যই শুল্কপ্রথা রহিত করে প্রতিযোগিতায় সমতা ফিরিয়ে আনলেন (১৭ই মার্চ, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। সমস্ত শুল্ক তুলে দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্ধেক কমে গেল। অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এ ক্ষতিও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের প্রস্তাবে অমত করলেন। তাঁরা বললেন, ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই শুল্ক আদায় করতে হবে - কারণ তা না হলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত মুনাফা বন্ধ হয়ে যাবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল লিখেছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হতে পারে, এ তার একটি চরম দৃষ্টান্ত। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কলকাতা কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট অ্যামিয়ট ও হে নামক দুই সাহেবকে পাঠিয়ে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উপস্থাপিত করলেন।

১) নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারীদের যেসব আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা এবং এর জন্য ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা।

২) শুল্করহিত করার আদেশ প্রত্যাহার করা।

৩) নবাবের কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের বা তাদের গোমস্তার এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে কোম্পানীর কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষের হাতেই তার বিচারের ভার দেওয়া।

৪) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া।

৫) দেশীয় মহাজনেরা যাতে কোম্পানীর টাকা বিনাবাধায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরী করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

৬) নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখা।

নবাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "ইংরেজরা বহু সন্ধি করিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়াছে — আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। সুতরাং নতুন সন্ধির কোন অর্থ হয় না।"[৬০] তারপর একখানি সাদা কাগজ তাদের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা ইহাতে লিখিয়া দাও, আমি সই করিব — কিন্তু আমার কেবল একটি দাবি — তাহা এই যে দেশের যেখানে যত সৈন্য আছে তাহাদিগকে সরাইয়া নিবে।"[৬১]

নবাব নতুন সন্ধির শর্ত না মানায় অ্যামিয়ট এবং হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের ত্যাগ করলেন। ২৭শে জুন রাতে এলিস পাটনা আক্রমণ করলেন। মীরকাশিমও এই আকস্মিক আক্রমণে ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। ডড্ওয়েল বলেন, "It was a war of circumstances rather than of intentions." একথা অনস্বীকার্য যে, পলাশীর পর থেকে ইংরেজগণ যে নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে আসছিল, তাতে কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবের মৈত্রী স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল।

মীরকাশিম পাটনা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে তাকে পুনরাধিকার করেন। এদিকে মেজর অ্যাডামস দশ হাজার ইওরোপীয় ও চারশ দেশীয় সৈন্য নিয়ে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মীরকাশিমের অধীনে পনের থেকে কুড়ি হাজার সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু তাদের সামরিক দক্ষতা ছিল না। তিনি ক্রমান্বয়ে কাটোয়া (১৯ শে জুলাই, ১৭৬৩), গিরিয়া (২রা আগস্ট, ১৭৬৩) এবং উদয়নালার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন।

ইতিমধ্যে অ্যাডাম্স্ মুঙ্গের দুর্গ দখল করে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হলে মীরকাশিম উপায়ান্তর না দেখে অযোধ্যায় পলায়ন করেন এবং নবাব শুজাউদ্দৌল্লার সাহায্যপ্রার্থী হন। অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম যৌথভাবে মীরকাশিমের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। কিন্তু 'বক্সার যুদ্ধে' (২২ শে অক্টোবর, ১৭৬৪) ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মুন্রোর কাছে সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক অযোধ্যা বিধ্বস্ত হল এবং শাহ আলম ইংরেজপক্ষে যোগদান করলেন। পলাতক মীরকাশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন - তারপর সম্ভবত ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পলাশী আর বক্সার - বাংলার ইতিহাসে দুটি যুদ্ধই অসাধরণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার সৈন্য ষড়যন্ত্রীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু

বক্সাব যুদ্ধে নবাব মীবকাশিম এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে পরাজয় বরণ করেছিল। নবাবপক্ষের সৈন্যসংখ্যাও ছিল ইংরেজ সৈন্যের তুলনায় তিন-চারগুণ বেশী। সুতরাং তাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন করে যে, ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও বুদ্ধিনৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।

মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলকাতা কাউন্সিল তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ হন। তদনুসারে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই মীরজাফরের সঙ্গে ইংবেজদের এক নতুন সন্ধি হয় (মুর্শিদাবাদ চুক্তি)। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর আর চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের দিলেন। সেইসঙ্গে ইংরেজরা বিনাশুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতিও পেল। অন্যদিকে নবাব ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাতিকের বেশি সৈন্য নিজপক্ষে না রাখতে স্বীকৃত হলেন। ইংরেজদের একজন প্রতিনিধিকে মুর্শিদাবাদে স্থায়ীরূপে বসবাস করতে অনুমতি দিলেন, এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশলক্ষ টাকা দিতেও অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। এই সমুদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীরকাশিমকে পদচ্যুত করে মীবজাফরকে পুনারায় নবাব করতে প্রতিশ্রুত হল।

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অনুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

১) মীরজাফর খোজা পিদ্রুকে সৈন্যবিভাগে ওবং মহারাজা নন্দকুমারকে দেওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করতে পারবেন।

২) যদি নবাবের কোনো প্রজা বা কর্মচারী কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে নবাব দাবি করলে তাকে (নবাবের নিকট) ফেরত পাঠাতে হবে।

৩) নবাবের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে ইংরেজরা সরাসরি তার বিচার করতে পারবেন না।

৪) নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সৈন্যসাহায্য চাইলে অবিলম্বে তা পাঠাতে হবে এবং এর ব্যয়বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হবে না।

বলাবাহুল্য, এই দ্বিতীয়বাব নবাবী লাভের জন্যও মীরজাফরকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ছাড়া আরও অনেক টাকা দিতে হল।[৬২]

মীরজাফর মেজর অ্যাডাম্‌সের সৈন্যদলের সঙ্গে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই মুর্শিদাবাদে পৌছে প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। নগরে কিছু গোলযোগ, মারামারি

ও লুঠপাট আরম্ভ হল। কিন্তু ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং যথারীতি নতুন নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে পাটনায় পৌঁছলেন এবং সুবাদারীর সনদ পাবার জন্য শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। বাদশাহকে বার্ষিক ২৭ লক্ষ এবং উজীরকে ২লক্ষ টাকা দেবার শর্তে তিনি প্রার্থিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু ইংরেজ কাউন্সিল এটা অনুমোদন করলেন না। শুজাউদ্দৌল্লা ও বাদশাহের সঙ্গে এরূপ গোপন কথাবার্তায় সন্দিহান হয়ে ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে পাটনা ত্যাগ করে কলকাতায় আসতে বাধ্য করল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর শাহ্আলম যখন উজীরের সঙ্গ ত্যাগ করে বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, তখন মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে সুবাদারীর আবেদন জানিয়ে লোক পাঠালেন। বাদশাহ্ এই আবেদন মঞ্জুর করে সুবাদারীর সনদ ও খিলাৎ পাঠালেন (জানুযারী, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

বক্সারের যুদ্ধে সম্মিলিত মুঘল বাহিনী পরাজিত হলেও তা ইংরেজ মহলে দারুণ সংশয়ের সৃষ্টি করে। আগে এরা মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ভাণ করে প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দ্বিধা করেনি, কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর এই ছলের আশ্রয় নেওয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এরপর কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কাছে বিকল্প ছিল দুটি ঃ হয় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা, নয় যুদ্ধাবস্থা ও নৈরাজ্য পরিহার করার জন্য মুঘল সরকারকে মেনে নেওয়া। পরিস্থিতি এমন যে, এই দুই বিকল্প পন্থার কোনটাই তারা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল পরিচালক মণ্ডলীর বিঘোষিত নীতির পরিপন্থী। তাছাড়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইওরোপীয় বণিকশক্তি ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সামরিক সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, যা বাণিজ্যিক দিক থেকেও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অনুরূপ মারাত্মক অবস্থা ছিল দেশকে সরকারহীনতায় ঠেলে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই ব্যাহত হত।

এমতাবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলেন। সেটি হচ্ছে তাত্ত্বিকভাবে মুঘল সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা। এরই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এলাহাবাদ চুক্তি (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। এই চুক্তির নায়ক রবার্ট ক্লাইভ দিল্লীতে গমন করে প্রচুর নজরানা, পেশকাশ ও ভবিষ্যতে বিপুল রাজস্ব আয়ের লোভ দেখিয়ে বাদশাহ শাহআলমের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে নিলেন। আর এই চুক্তি অনুসারে বাদশাহ ফরমানজারি করলেন,

"পরম পরাক্রমশালী যোদ্ধা এবং সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী

হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে আলতামগা বা চিরস্থায়ী দান হিসেবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি মঞ্জুর করা হলো। শর্ত এই যে, বাদশাহি রাজস্ব হিসেবে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা পরিশোধে কোম্পানি জামিন থাকবে। সুবার রাজস্ব তহবিল থেকে নবাবের নিজামত খরচ বাবদ যা প্রয়োজন তা নবাবকে প্রদান করে সংগৃহীত রাজস্বের বাদবাকি কোম্পানি এর সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইচ্ছামাফিক ব্যয় করতে পারবে।"[২২]

মুঘল কানুনমতে দেওয়ানী পদটি প্রশাসনিক, রাজনৈতিক নয়। অতএব, এলাহাবাদ চুক্তি অনুসারে কোম্পানী মুঘল সরকারের অধীনে দেওয়ান মাত্র, কোনো রাজনৈতিক শক্তি নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ সবই ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি রবার্ট ক্লাইভের সুচতুর কূট-কৌশল। আসলে দেওযানীর মোড়কে তিনি সংগোপনে লুকিয়েছেন সুবা বাংলায় কোম্পানীর রাজনৈতিক আধিপত্যকে।

এলাহাবাদ চুক্তির অংশরূপে মুর্শিদাবাদে নবাবের সঙ্গে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই সময় নবাব হয়েছিলেন মীরজাফর। এই চুক্তি অনুসারে দেওয়ান হিসাবে কোম্পানী সুবা বাংলার রাজস্ব থেকে নবাবকে বার্ষিক ৫৩, ৮৬, ১৩১ সিক্কা টাকা প্রদান করবে। সংক্ষেপে, কোম্পানি সুবা বাংলা থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করবে সে রাজস্বের লভ্যাংশ হিসাবে সম্রাট পাবেন বার্ষিক ২৬ লক্ষ সিক্কা টাকা, নবাব তাঁর নিজামত শাসন পরিচালনা বাবদ পাবেন ৫৩, ৮৬, ১৩১ সিক্কা টাকা আর অবশিষ্টাংশ ভোগ করবে কোম্পানি।

কিন্তু মীরজাফর এবারও মসনদে বেশী দিন স্থায়ী হতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গুরুতর অসুখে পড়লেন। মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান ব্যক্তির সামনে ষোল বছর বয়স্ক পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাকে মসনদে বসালেন এবং নন্দকুমারকে তার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু হল।

এলাহাবাদ ও মুর্শিদাবাদ চুক্তির শর্তগুলি আক্ষরিকভাবে দেখলে মনে হবে, সুবাবাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব বোধহয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ মুর্শিদকুলি খানকে দেওয়ান হিসাবে নিযুক্তির পর (১৭০৪) বাদশাহ কখনো আর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি যদিও নিয়মানুসারে সুবাদার ও দেওয়ানকে নিযুক্ত করার অধিকারী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারই। এখন তিনি 'অনুগত' কোম্পানীকে সুবাবাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করতে সক্ষম হলেন। সুবাদার ও দেওয়ান সরাসরি নিযুক্ত করার ক্ষমতা এবং নিয়মিত সে প্রদেশ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করে মুঘল সম্রাট মনে করলেন, সুবাবাংলার উপর দিল্লীর আধিপত্য আবার একচেটিয়া হয়ে গেল।

আর সেইসঙ্গে কোম্পানীও হয়ে পড়ল বাদশাহের মনোনীত মুৎসুদ্দি স্থানীয়। মুঘল বাদশা শাহআলমের এই চিন্তাই প্রমাণ করে যে, তিনি কতখানি অদূরদর্শী, অবিমৃষ্যকারী এবং ইংরেজের ক্ষমতা ও কার্য সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, কোম্পানী দেওযানী চুক্তির মাধ্যমে প্রকারান্তরে নিজেদের সার্বভৌমত্বই প্রতিষ্ঠা করল, বাংলাদেশে কায়েম হল ব্রিটিশের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য।

এই প্রসঙ্গে দুটি-সন্ধির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। একটি হল অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে কোম্পানীর সন্ধি (জুন, ১৭৬৫), এবং অপরটি বাদশাহ শাহআলমের সঙ্গে (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)।

বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের সঙ্গে জোটবদ্ধ অযোধ্যার নবাব ও মোঘল সম্রাট পরাজিত হলে উভয়েই কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়েছিলেন। ক্লাইভ ইচ্ছা করলেই অযোধ্যা ও দিল্লী অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তদানীন্তন গোলযোগের সময় দূর প্রদেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত কঠিন বিবেচনা করেই ক্লাইভ আপাতত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশেই কোম্পানীর অধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে যত্নবান হল। তাই তিনি শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে সন্ধি করেন। নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, কারা ও এলাহাবাদ কোম্পানীকে প্রদান করতে স্বীকৃত হন এবং ইংরেজের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। অযোধ্যার উপর কোনো শত্রুর আক্রমণ ঘটলে সেক্ষেত্রে কোম্পানী নবাবকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে কোম্পানীর ব্যয় পূরণ করতে নবাব প্রতিশ্রুত হন। বলাই বাহুল্য এই 'অধীনতা মূলক মিত্রতা' নবাবকে কোম্পানীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলে।

এরপর ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহআলমের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হন। এই চুক্তি বা সন্ধির শর্তানুসারে (১) শাহআলমের মর্যাদা ও ক্ষমতা স্বীকৃত হল, (২) সম্রাটের সম্মান রক্ষার্থে শুজাউদ্দৌল্লার কাছ থেকে প্রাপ্ত কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি সম্রাটকে দেওয়া হল, (৩) এর বিনিময়ে সম্রাটের কাছ থেকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দানের শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করা হল এবং (৪) কোম্পানী সম্রাটকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হল।

আগেই বলেছি, ইঙ্গ ভারতীয় ইতিহাসে এই দেওয়ানীর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, এর দ্বারাই কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ বাংলাদেশে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেছিলেন (১৭৬৫)। তবে, দেওয়ানী ও সামরিক ক্ষমতায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও

কোম্পানী এই কার্যভার স্বহস্তে না রেখে দেশীয় কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করছেন। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ছিল এর সময়কাল। এসময়ে নবাব ও ইংরেজ উভয়েব প্রতিনিধিরূপে দেশ শাসন করতেন সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান। ১৭৭২-এ গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস এই দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

যাই হোক, দেওয়ানী লাভ করলেও নানা কাবণে ক্লাইভ সরাসরি রাজস্ব পরিচালনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ, তাঁর দেওয়ানী লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয়ভাবে কোম্পানীর জন্য পুঁজি সংগ্রহ কবা। এ দেশের রপ্তানিপণ্য ক্রয় করাব জন্য কোম্পানীকে ইওরোপ থেকে রূপা আমদানি করতে হতো, যেহেতু বাংলাদেশ তখন আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো বেশী। বস্তুত, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ইওবোপীয়রা রজত আমদানী করত। কিন্তু বেণেবাদের যুগে রজত-বপ্তানী ছিল সম্পদ পাচারের সামিল। অতএব দেশ থেকে মূল্যবান ধাতব আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে পুজি সংগ্রহ করা ছিল দেওয়ানী অর্জনের অন্যতম লক্ষ্য। তাই দেশ শাসনের অভিলাষ নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়েছিল, এবং এ বিষয়ে সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন একাধারে নায়েব-নাজিম ও নায়েব-দেওয়ান রেজা খান। নবাবের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নায়েব-নাজিম বা নিজামত শাসনকর্তা, আর কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি হলেন দেওযানী-শাসনকর্তা। কোম্পানীব সমর্থনও তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ছিল। পূর্ণমর্যাদায় রেজা খান যাতে দেওয়ানী ও নিজামত পরিচালনা করতে পারেন, সেজন্য ক্লাইভ বাদশাহের কাছে থেকে তাঁর জন্য একাধিক বাজকীয় উপাধি আদায় করেন, যেমন - বাহাদুর (সাহসী), মুজাফফব জং (সমরবিজয়ী), মুঈন-উদ-দোলা (রাজ্যের সেরা), মুবারিজ-উল-মুলক (বাজ্যের প্রথম) ইত্যাদি।

কোম্পানীব মনোনীত এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও রেজা খান কখনো তাদের অন্ধ তাঁবেদার হিসাবে কাজ করেননি। রাষ্ট্রকাঠামোয় তাঁর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। কোম্পানীকে তিনি দেখেছেন বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সবকারেব অধীনস্থ হিসাবে। তাই নিজের ভূমিকাকে যথাযথভাবে পালন করতে তিনি সদাসতর্ক ছিলেন। বাষ্ট্রচিন্তায় রেজা খান পলাশীপূর্ব যুগের মুঘল শাসনব্যবস্থাকে আদর্শ সরকার বলে গণ্য করতেন এবং সরকার পরিচালনায় যথাসম্ভব ঐ ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কবাই ছিল তাঁব প্রধান লক্ষ্য। ববার্ট ক্লাইভেরও কৌশল ছিল পূর্বব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি আবার সচল করা এবং মুনাফাব সঙ্গে ব্যবসা করা।

বৃদ্ধ মীরজাফব মৃত্যুশয্যায় নাজিম-উদ-দৌল্লাকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান। মীবজাফরেব মৃত্যু ঘটনায় পুনর্বাব নিয়োগে মুর্শিদাবাদেব রাজকোষ কোম্পানীব

কর্মচারীদের সামনে পুনরায় উন্মুক্ত হল। ইংরেজদল অসীম উৎসাহে কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হলেন। গর্ভণর স্পেন্সার এ দেশের চক্রকৌটিল্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। ভাগ্য প্রসন্ন বলেই সুসময়ে মাদ্রাজ থেকে আগমন করে কলকাতায় কর্ণধার হয়ে বসেছেন। সুতরাং হলওয়েলের মত অভিজ্ঞ জনস্টোনই এক্ষেত্রে নায়ক নির্বাচিত হলেন। নাজিম-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের খস্‌ড়া প্রস্তুত করে নিয়ে কাউন্সিলের চারজন ধনুর্দ্ধর মুর্শিদাবাদে এলেন। নানা যড়যন্ত্র ও ভয় প্রদর্শনের পরে, শূন্যপ্রায় রাজকোষ থেকে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা বেরোল। এখনও রেজা খাঁ পূর্ববর্ণিত মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট হননি। কিন্তু ইংরেজদের প্রভূত অর্থ পাইয়ে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পুরো চেষ্টা চালালেন। দুর্লভরাম এবং নন্দকুমারকেও নায়েব-সুবাদারের পদ প্রাপ্তির আশা দিয়ে কোম্পানীর লোকজন কয়েক লক্ষ মুদ্রা পকেটস্থ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিক দানে সমর্থ রেজা খাঁই মনোনীত হলেন।

১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উভয়পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এতে সৈন্যাদির সাহায্যে দেশরক্ষার ভার কোম্পানী স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। মীরজাফর স্বীকৃত সেনাদলের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মাসিক পাঁচ লক্ষ টাকা এখন একপ্রকার স্থায়ী ভাবেই নবাবী তহবিল থেকে দেবার কথা স্থির হল। মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিপত্রের অন্যান্য সবকথা বিস্তৃত ভাবে স্বীকৃত হয়ে মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগ ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার উল্লেখসহ উভয় পক্ষের সই মোহর সংযুক্ত হল।[১]

পিতার প্রিয়পাত্র নন্দকুমারের নিয়োগ নাজিম-উদ্-দৌল্লার বা মনিবেগমের (মীরজাফরের স্ত্রী) অভিপ্রেত ছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর পরেই নন্দকুমার নাজিম-উদ্-দৌল্লার পক্ষ থেকে বাদশাহী সনদ আনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বদা ইংরেজের ছন্দানুবর্তন না করায় নন্দকুমারের প্রতি তাঁদের তীব্রদৃষ্টি ছিল। এখন কলকাতা বোর্ডকে উল্লঙ্ঘন করে সনদ পাবার প্রয়াস প্রকাশিত হলে নন্দকুমারকে আর মুর্শিদাবাদে থাকতে দেওয়া নিরাপদ বিবেচিত হল না। নবীন নবাবের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও নন্দকুমার কলকাতায় আনীত হয়ে জামাতা জগচ্চন্দ্রের সঙ্গে প্রহরী বেষ্টিত রইলেন।

ইতিমধ্যে ক্লাইভ শাহআলমের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করেছেন। অতঃপর ক্লাইভের কমিটি বাংলায় আগমন করে নবাবের সঙ্গে আর একটি সন্ধিপত্র স্থির করল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫-তে।[১]

এতে বলা হল, নাজিম-উদ-দৌল্লাকে নিজামতী ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১-৯ আঃ প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত সেনাদির ব্যয়ভার পূর্বসন্ধিমত কোম্পানীই বহন করবেন। এই ভাবে অতিসহজে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক আড়াই

কোটি টাকা রাজস্বের অধিকারী হলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে বাংলা-বিহারের রাজকর তিন কোটিরও ওপর প্রদর্শিত হয়েছে। নবাব নাজিম-উদ-দৌল্লা অগত্যা এই অধিকার ত্যাগ করলেন।[২২]

ক্লাইভ ইতিপূর্বে মীরজাফরের ভাই কাজেম খাঁ-কে পাটনার নায়েব-নাজিম ও রাম নারায়ণের কনিষ্ঠ ধীরাজ নারায়ণকে দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের অকর্মণ্যতা লক্ষ্য করে দেওয়ানী গ্রহণের পর রাজা সেতাব রায়ের হাতে ঐ সুবার সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হল। ঢাকায় জসরৎ খাঁ রইলেন। উভয় স্থানেই অবশ্য কোম্পানীর পক্ষে একজন করে ইংরেজ প্রতিনিধি রইলেন।

১৭৬৬ সালের ২৯শে এপ্রিল রেজা খাঁর প্রশাসনের প্রথম পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদ দরবারে। বাংলা ফসলি পঞ্জিকা অনুযায়ী পুণ্যাহ ছিল বাংলার নতুন বছরের খাজনা আদায় উৎসব। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিনে সারা বছরের জন্য নতুন খাজনা বন্দোবস্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হতো এবং একই সময়ে দেওয়ান কর্তৃক বিগত বছরের খাজনার লক্ষ্যমাত্রা, খাজনা আদায় ও উদ্বৃত্ত সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো। সব জমিদারি কাছারিতেই পয়লা বৈশাখ অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। নাজিমউদ্দৌল্লা মসনদে উপবিষ্ট, দক্ষিণে দেওয়ান কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইভ আসন গ্রহণ করেছেন। মহাসমারোহে পুণ্যাহ ও খেলাৎ বিতরণ সম্পন্ন হল। পুণ্যাহ মজলিশে বহুটাকা রাজস্ব জমা হল এবং ছ'মাস মাত্র দেওয়ানীলাভ করলেও এককোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আদায় হল বলে বিলাতে পত্র গেল।

পুণ্যাহের পর পনেরো দিনও কাটল না। ১৭৬৬-র ৮ই মে, প্রবল জ্বরে নাজিমউদ্-দৌল্লার মৃত্যু হল। তাঁর নাবালক সহোদর সইফ-উদ্দৌল্লা মসনদে বসলেন। মাতা মনিবেগমের হাতে কর্তৃত্ব পড়ল। সিলেক্ট কমিটি কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর-কে এই সম্পর্কে একটি চিঠি লিখলেন ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৬৬ তে —

"As he was a prince of mean capasity, bred up in total ignorance of public affair, this event, which formerly might have produced important consequences in the provinces can at present have no other effect than at exhibiting in the eyes of the people a mere change of persons in the Nizamt"[২৩]

এই অবসরে নাবালক নবাবের রাজকীয় ব্যয় কমিয়ে ৪১,৮৬,১৩১ করা হল। নাজিম-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে সন্ধি পত্রের শেষ পংক্তির মত - 'যতদিন বাঙলায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি থাকবে ততদিন সন্ধিশর্ত পালিত হবে' ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হল।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে[২০] এই সন্ধিপত্রটি সংযোজিত হয়েছে। এটি লিখিত হয়েছে ১৯ শে মে, ১৭৬৬ তে। এই সময়েই, মীরজাফরের অন্তিমকালে, ক্লাইভের নামে প্রদত্ত পাঁচলক্ষ টাকার সঙ্গে সইফ-উদ্দৌল্লা আরও তিনলক্ষ যোগ করলে ক্লাইভ আহত ইংরেজ সেনাদলের সাহায্যার্থে বিলেতে একটি দাতব্য ভাণ্ডার স্থাপন করলেন।

ক্রমশ স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ক্লাইভের পর প্রথমে ভেরেলস্ট এবং পরে কার্টিয়ার ১৭৬৯ সালে ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর হলেন। এই সময় ইংরেজ কর্মচারীরা নানা অসৎ উপায়ে প্রজাদের উৎপীড়িত করে নিজেদের জন্য বহু অর্থ উপার্জন করতে ব্যস্ত ছিলেন - দেশ শাসনের কোনো দায়িত্বই তাঁরা পালন করত না। একদিকে রেজা খাঁ-র শোষণ, অন্যদিকে কোম্পানীর। বাঙালীর দুঃখ দুর্দশা চরমে পৌঁছল, কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রিচার্ডবেচার ১৭৬৯ সালের ২৪ শে মে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন —

"কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের ফলে প্রজা সাধারণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছে ইহার পূর্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। বহু স্বেচ্ছাচারী নবাবের আমলেও যেদেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল তাহা ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছিয়াছে।"[২১]

এই উক্তির সত্যতা শীঘ্রই প্রমাণিত হল। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ) এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল বঙ্গবাসী। প্রায় এক কোটি মানুষের, অর্থাৎ মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশের অনাহারে মৃত্যু হল, আর কৃষিযোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশ পরিণত হল জঙ্গলে। অথচ এই সময়েও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের থেকে জোর করে খাজনা আদায় করা হত। চরম দুরবস্থার মধ্যে শতকরা পাঁচটাকার বেশী খাজনা মাপ করা হয়নি এবং পরের বছর শতকরা দশটাকা হারে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

মন্বন্তরের বছরে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে) বসন্ত রোগে সইফ-উদ্-দৌল্লার মৃত্যু হল। নবাব হলেন মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র বব্বু বেগমের গর্ভজাত ১২ বছরের মুবারক-উদ্-দৌল্লা। পূর্ববর্তী সন্ধির মর্মে পুনরায় এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হল।[২২] মুবারকের আমলে নিজামত ভাতা আরেক দফা হ্রাস করা হল। দেওয়ানি চুক্তি অনুযায়ী এই ভাতা বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকায় কমিয়ে আনা হয়। ফলে নবাব সিপাহী এবং প্রাসাদ-আমলা আনুপাতিক হারে ছাঁটাই করতে বাধ্য হন। অসন্তোষ নিবারণের জন্য ছাঁটাইকৃত সেনাদের অধিকাংশকেই কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়। নিয়মিত এবং অধিক বেতন লাভের আকর্ষণে

তারাও নির্দ্বিধায় কোম্পানীর বাহিনীতে যোগদান করে। ফলে অনেকটা অলক্ষ্যে ও অননুভবণীয় ভাবে নবাবী সেনাবাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানী কর্তৃক সিপাহী ব্যাটেলিয়ন গঠনে কোনো জাতিভেদ নীতি অনুসৃত হয়েছে এমন অভিযোগ ওঠেনি। কারণ মুঘলদের মতো প্রাথমিকভাবে কোম্পানীরও নীতি ছিল সেনাবাহিনীতে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষা করা। প্রতিটি নতুন ব্রিগেড গঠিত হয় যথাসম্ভব সমান সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু সিপাহী নিয়ে।[৭১] খান মহম্মদ মহসিন বিস্তৃত ভাবে নতুন নবাবের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।[৭২]

অতঃপর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় স্থান থেকে উন্নীত হয়ে কার্টিয়ারের পরবর্তী বাংলাদেশের গভর্ণর হয়ে এলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গভূমি থেকে আশানুরূপ অর্থাগম কথামাত্রে পর্যবসিত হচ্ছে দেখে কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ চারদিকে ব্যয়-সংকোচের ব্যবস্থা করলেন। জগৎ শেঠের বাকি টাকা, ইংরেজের ক্ষতিপূরণ, মনরোর প্রাপ্য ও সেনাদলের প্রতিশ্রুত টাকা পরিশোধের জন্য অক্ষম নাবালক নবাবের উপর বিরাট চাপ এল। অতঃপর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগস্টের পত্রে দেওয়ানী কার্যভার কোম্পানী রীতিমত স্বহস্তে গ্রহণ করে রাজস্ব আদায়ের আদেশ প্রেরণ করল। সেই সঙ্গে মহম্মদ রেজা খাঁকে সঙ্গোপনে কারারুদ্ধ করে নন্দকুমারের সাহায্যে তাঁর দোষ উদ্‌ঘাটন এবং হিসাব নিকাশ নেবার জন্য সিলেক্ট কমিটি এক পত্র লিখলেন। ১৭৭২ সালের ২৭ এপ্রিল দুর্নীতির দায়ে রেসিডেন্ট্ মিডলটনের সাহায্যে গোপনে মহম্মদ রেজা খাঁ কারারুদ্ধ হয়ে কলকাতায় আনীত হলেন। নায়েব সুবাদারের কাজ দ্বিধাবিভক্ত হল। নন্দকুমারের মুখবন্ধের উদ্দেশ্যে তাঁর ২২ বছরের ছেলে গুরুদাসকে 'রাজা গৌরপৎ' উপাধিসহ নবাবের দেওয়ান ও হিসাবরক্ষক হিসাবে এবং নবাবের বিমাতা মণি বেগমকে অভিভাবিকা হিসাবে নির্বাচিত করা হল। পাটনার নায়েব সেতাব রায়ও রেজা খাঁ-র মত কলকাতায় আনীত হলেন। খালসা দপ্তর (রাজস্ব বিভাগ) মুর্শিদাবাদ থেকে উঠিয়ে আনা হল কলকাতায় এবং খাস্ গভর্ণর ও কাউন্সিলের অধীনে কার্য-পর্যবেক্ষণের জন্য একজন রায়-রায়ান নিযুক্ত হলেন। দুর্লভ রামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ কোম্পানীর প্রথম রায়রায়ান। ফৌজদারী বিচারের ভারও গভর্ণর হেস্টিংস স্বহস্তে নিলেন।

বস্তুত, ১৭৭২ সাল থেকে মুর্শিদাবাদের মসনদ এমনই একটি নামমাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যে, দেশ শাসন সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তই এখন আর নবাবের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৭৭২ সালে হেস্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নবাবের অন্তিম শক্তিটুকুরও বিলোপ ঘটান। তাই হেস্টিংসের মতে - 'এমন নবাব একজন শাসন ক্ষমতাচ্যুত সাজসর্বস্ব শিখণ্ডীমাত্র।'[৭৩]

এর প্রমাণ মেলে হেস্টিংসের নিজের শাসন থেকেই। ১৭৭২-৭৩ সালে তিনি প্রশাসনের ইউরোপীয়করণ করে একটি ব্যাপক শাসনকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে কখনো নবাবের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেননি। অন্যদিকে নবাবও কখনও গভর্ণরের কার্যকলাপের আইনগত বৈধ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। নবাব বরঞ্চ নিজেকে কোম্পানীর পেনশনগ্রহিতা হিসাবেই গণ্য করেছেন।

১৭৭২ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের অধীনে ভারতে কোম্পানীর বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল আসেন এবং তাঁকে সভাপতি করে চারসদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হয়। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঘটনাক্রমে প্রথম কাউন্সিলের চারজন সদস্যের তিনজনই ছিলেন হেস্টিংস বিরোধী। অতএব রাজনৈতিক আধিপত্যবাদ নীতিকে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্য নবাবের সঙ্গে চুক্তির বিরোধী বলে, তাকে বর্জনপূর্বক আগের যৌথ ব্যবস্থায় ফিরে যাবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ফলে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে হেস্টিংসের অভিমত কাউন্সিলে বাতিল হয়ে যায়। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের এই সিদ্ধান্ত কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীও মেনে নেয়, এবং হেস্টিংসের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ইঙ্গ-মুঘল যৌথ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দেন (৩রা মার্চ, ১৭৭৫)। একই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষকেও নির্দেশ দেওয়া হয় রেজা খানকে মুক্তি দিয়ে পুনর্বার তাঁকে নায়েব-নাজিম এবং নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করার জন্য। নতুন পরিকল্পনা অচিরেই কার্যে পরিণত হয়। এছাড়া, ফৌজদারি আদালত কলকাতা থেকে পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তবিত করা হয় এবং মুর্শিদাবাদকে সুবার রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

কিন্তু সৈয়দ মহম্মদ রেজা খান নায়েব সুবা ও নায়েব দেওয়ানরূপে পুনর্নিযুক্ত (১৭৭৫) হলেও তিনি আর আগের মতো স্বাধীনচেতা শাসকের পরিচয় দেননি, মুঘল সরকারের শাসনতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার হননি, নীরবে বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছেন। আইনগতভাবে না হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে ইংরেজরাই দেশের সার্বভৌম কর্তা - এ সত্য তিনি আর অস্বীকার করেননি। বিশেষ করে রাজস্ব শাসন বিষয়ে যৌথ ক্ষমতা পুনঃপ্রবর্তনকে রেজা খাঁ একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব পদক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। ১৭৭৫ থেকে ১৭৭৮ পর্যন্ত সময়কালে ফিলিপ ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে হেস্টিং সবিরোধী দল সংখ্যা গরিষ্ঠতাবলে মুঘল সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার পক্ষে রায় দিলেও রেজা খান ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্যকে মেনে নিলেন এবং ফৌজদারি ক্ষমতা ছাড়া দেওয়ানী ক্ষমতাকেও তিনি প্রায় সম্পূর্ণ কোম্পানীর ইচ্ছামাফিক প্রয়োগ করতে থাকলেন। ১৭৮০ সালে ফ্রান্সিসের দলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং এর সঙ্গে বিলুপ্ত হয় নবাবি ক্ষমতা। হেস্টিংস পূর্ণ দাপটে দেওয়ানি ও নিজামত ক্ষমতা প্রয়োগ

করতে থাকেন। একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ করেন তিনি। আর এই রাজনৈতিক অবকাঠামো ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্বীকৃতি লাভ করে পিটস-ইণ্ডিয়া-অ্যাক্ট (১৭৮৪)-এর মাধ্যমে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলোর প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

ক) বাণিজ্যিক সংস্কার : ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বোর্ড-অফ-রেভিনিউয়ের নির্দেশানুসারে হেস্টিংস এযাবৎ প্রচলিত 'দস্তক' বা ছাড়পত্র প্রথা বন্ধ করেন। এর ফলে কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের এজেন্টদের অবৈধভাবে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার প্রথা বিলুপ্ত হয়। এছাড়া হেস্টিংস জমিদারদের নিজস্ব চৌকি বা শুল্ক আদায়ের ঘাটিগুলো বন্ধ করে সমগ্র প্রদেশে বাণিজ্য চলাচল সহজ করেন। লবণ, সুপারি ও তামাকের ওপর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বজায় রাখা হয়। কিন্তু অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর উপর শতকরা ২টাকা হারে শুল্ক ধার্য করা হয় এবং স্থানীয় ও ইওরোপীয় সমস্ত বণিকের কাছ থেকেই তা আদায় করার ব্যবস্থা হয়।

খ) দ্বৈত-শাসনব্যবস্থার অবসান : ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান। এতে দেওয়ানী শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয় কোম্পানীর হাতেই। নায়েব-সুবার পদ বিলুপ্ত হয়।

গ) রাজস্ব সংস্কার : স্থানীয় আমিনদের দ্বারা প্রজাবর্গ শোষিত হচ্ছিল এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী কিছু সংখ্যক সুপারভাইজার নিযুক্ত করেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। রাজস্ব নির্ধারণ এবং তা আদায়ের জন্য হেস্টিংস কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি ভ্রাম্যমান কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠন করে তার হাতে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। জমিদারদের পাঁচবছরের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রত্যেক জেলায় সুপারভাইজার (কালেক্টর নামে পরিচিত) ও ভারতীয় দেওয়ান নিযুক্ত করে তাদের ওপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস বাৎসরিক জমি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 'আমিনি কমিশন' গঠন করে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে বিলুপ্ত করে রেভিনিউ কমিটির হাতে রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পুনরায় কালেক্টরগণ নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংসের রাজস্বব্যবস্থা সাফল্য মণ্ডিত হয়নি।

ঘ) বিচারবিভাগীয় সংস্কার : হেস্টিংস সর্বপ্রথম বাণিজ্য বিভাগ থেকে শাসন

বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দশজন হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দু আইনবিধি সংকলন করা হয়। Committee of circuit এর সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়ানী আদালত ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি কলকাতার সদর-দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুটি পৃথক বিচারালয়ও স্থাপন করেন। এই বিচারালয় দুটি যথাক্রমে মফঃস্বলদেওয়ানী আদালত ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত থেকে প্রেরিত আপীলগুলির মীমাংসা করত। গভর্ণর ও তাঁর কাউন্সিলের দু'জন সদস্যকে নিয়ে সদর নিজামত আদালত গঠিত ছিল এবং সদর-নিজামত আদালতের প্রধান বিচারপতি নবাব-কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এই বিচারালয়ের উপর ইংরেজ বিচারকের পরিদর্শনের অধিকার ছিল।

এক কথায় ইওরোপীয় কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে পূর্বতন জেলা-আদালতগুলি পুনর্গঠিত করা হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা উদ্ভূত হয় এবং ফৌজদারদের ক্ষমতাগুলি জেলা আদালতের বিচারকেরা লাভ করে। এইভাবে উচ্চ বিচারালয়গুলি কলকাতায় স্থাপন করে এবং দেওয়ানী কোষাগার মুর্শিদবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে হেস্টিংস কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেন।

ঙ) <u>আর্থিক বিধিব্যবস্থা</u> ঃ কোম্পানীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পুনরুদ্ধার করতে হেস্টিংস কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত, ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজদের আশ্রয় ত্যাগ করে সম্রাট মারাঠাদের আশ্রয় নিয়েছেন - এই অজুহাতে হেস্টিংস শাহ্আলমের বৃত্তি বন্ধ করে দেন। উপরন্তু শাহআলমের কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কারা প্রদেশ দুটি কেড়ে নিয়ে সেগুলি ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লাকে প্রত্যর্পণ করেন। দ্বিতীয়ত, দেওয়ানীর ভার কোম্পানীর হাতে অর্পন করার ফলে বাংলার নবাবের বাৎসরিক বৃত্তি অর্ধেক করে দেওয়া হয়।

অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কোম্পানীর কোষাগার শূন্য হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু সেই সময় ইংল্যাণ্ড, ইওরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ইংল্যাণ্ড থেকে অর্থসাহায্যের কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। তাই অর্থসংগ্রহের জন্য হেস্টিংস কয়েকটি গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন। এর মধ্যে প্রথম হল - বারানসীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার। দ্বিতীয় - অযোধ্যার বেগমদের থেকে বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন। এবং তৃতীয় - মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি। নন্দকুমার ছিলেন নবাবের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতা কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করেন যে হেস্টিংস মীরজাফর পত্নী মনিবেগমের কাছ থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ নিয়েছেন। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ

দল এই অভিযোগের তদন্ত করতে চাইলে হেস্টিংস কাউন্সিল সভা ভেঙে দেন। অতঃপর নন্দকুমারকে শাস্তিদেবার জন্য তিনি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দলিলজাল করার অভিযোগ আনেন। বিচারে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত রূপ দিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩)। হেস্টিংসের পদত্যাগের পর স্যার জন ম্যাকফারসন এক বছরের জন্য অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এলেন কর্ণওয়ালিশ। তিনি নবাবের ফৌজদারি ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে তাঁকে কোম্পানীর পেনশনভোগীতে পরিণত করেন। তাঁর বহুবিধ প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কর্ণওয়ালিশ এই প্রথা প্রবর্তন করলেও এর উদ্ভাবক কিন্তু তিনি নন। জমিদারদের সঙ্গে স্থায়ীভিত্তিক রাজস্ব নির্ধারণ করার ধারণা হেস্টিংসের সময় থেকেই ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা ডাইরেক্টর সভার নিকট জ্ঞাপন করে তাঁদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন। কর্ণওয়ালিশকে ভারতে পাঠাবার সময় ডাইরেক্টর সভা তাঁকে কতকগুলি নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ সম্বলিত পত্রে (২০শে এপ্রিল, ১৭৮৬ খ্রীঃ) বাংলার ঘন ঘন রাজস্বব্যবস্থা পরিবর্তনেব ও জমির খাজনা ক্রমাগত বৃদ্ধির তীব্রনিন্দা করে এর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক নীতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে জমিদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করার সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ ছিল, প্রথমে দশ বছরের মেয়াদে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার পর তা চিরস্থায়ী করা হবে। ডাইরেক্টর-সভার এই নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করাব মত দক্ষতা কর্ণওয়ালিশের ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, জমিদারের আদায়কৃত রাজস্বের নয়-দশমাংশ তারা কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত করবেন। এই হিসাব অনুসারে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধার্য হয় এবং পরবর্তী সময়ে চিরস্থায়ীভাবে এই অঙ্ক জমিদারের দেয়রূপে নির্দিষ্ট থাকে। বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই নির্দিষ্ট রাজস্ব কোম্পানীর ঘরে জমা দিলে বংশানুক্রমে জমিদারেরা জমির স্বত্বাধিকারী থাকবেন এবং ভবিষ্যতে জমির মূল্য যাইহোক তাতে তাঁদের সঙ্গে কোম্পানীর বন্দোবস্তের কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তিত এবং চিরস্থায়ী।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের ভূমিব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়ে গেল। পূর্বে যে জমির মালিক ছিল কৃষিকার্যরত খোদ কৃষক, সেই জমির মালিক এবার হলো পূর্ববর্তীকালের রাজস্ব আদায়কারী সরকারী এজেন্ট — জমিদার। এই মালিকানার ফলে জমিদারেরা ইচ্ছে মতো জমি ক্রয়-বিক্রয়, বিলিব্যবস্থা সবকিছু করার অধিকার লাভ করলো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে কোম্পানী দেশে কোনো জরিপ করেনি। কাজেই যে সমস্ত জমি তখনও পর্যন্ত অনাবাদী ছিল সেগুলো পর্যন্ত জমিদারদের দখলীভূক্ত হল এবং এর ফলে তারা ভালো আবাদযোগ্য জমি থেকে শুরু করে অনেক সমৃদ্ধ অরণ্য প্রদেশেরও মালিক হয়ে বসল।

এই বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানী জমির উপর তাদের দাবি চিরকালের মতো ছেড়ে দিলেও এর পর জমি থেকে একটা নির্দিষ্ট মুনাফা তাদের নিশ্চিত হল। একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান লভ্যাংশের দাবি, আর অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দমন এবং অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোম্পানীর চাহিদা — এ দুই মেটানোর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে রায়ত-শোষণ অনেকাংশে কার্যকরী হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হয় দু'কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা অর্থাৎ চৌত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। আর্থিক প্রয়োজনে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণওয়ালিশ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক ইংরেজ শাসক নিজেদের রিপোর্ট ও চিঠিপত্রে তা স্বীকার করেছেন। কর্ণওয়ালিশ এই সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এদেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তমনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোনোরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারেনা।'[১৪]

বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে কৃষকদের পঙ্গু করে দিয়েছিলো, এবং অন্যদিকে ভূমিরাজস্ব খাতে রাষ্ট্রের আয়কে চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল। এর ফলে উনিশ শতক ও বিশ শতকে মূল্যবৃদ্ধির ফলে জমি থেকে অতিরিক্ত মুনাফার সমগ্র অংশই জমিদারদের পকেটস্থ হয়, তার দ্বারা কৃষকসমাজ অথবা রাষ্ট্র কেউই উপকৃত হয় না। বিশেষত প্রজাদের দুর্দশাই চরমে উঠেছিল। জমির উপর প্রজাদের স্বত্ব সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে জমিদারেরা কারণে-অকারণে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করত। জমিতে প্রজাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় স্বভাবতই জমির উন্নয়নের কোনো চেষ্টা তারা করত না। দ্বিতীয়ত, জমিবন্দোবস্ত ও খাজনা নির্ধারণ করার অধিকার জমিদারদের দেওয়ায় বহুক্ষেত্রে জমিদারেরা উচ্চহারে খাজনা ও নানাভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। তৃতীয়ত, কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন যে, জমিদারেরা প্রজাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জমিদারেরা গ্রাম ত্যাগ করে শহরে বসবাস আরম্ভ করলে নায়েব-গোমস্তাদের হাতে প্রজাদের দুর্বিপাক অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু জমিদারদের অনুপস্থিতির ফলে গ্রামের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর হ্রাস পায়।

সর্বোপরি এই বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়ায় ঐতিহ্যশালী জমিদার শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই ধ্বংসস্তূপের উপর জন্ম নেয় নতুন এক নিলামদার বিত্তসর্বস্ব ভূস্বামী শ্রেণী। ক্রমে ক্রমে বিক্ষোভ এবং তার থেকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুতগতিতে জমিদার থেকে কৃষকে। এই সব বিদ্রোহ যদিও ছিল নেহাৎই আঞ্চলিক এবং অতিশয় অসংগঠিত, তবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দ্বৈতশাসন থেকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত — বাংলার মানুষকে নির্বিচারে মৃত্যুর পথে টেনে নিচ্ছিল। অসহায়তা আর শোষণ থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সব বিদ্রোহের জন্ম। যেমন ফকির বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৯০), রংপুর কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭০-১৭৮৭), বরিশালে বলাকী শাহর বিদ্রোহ (১৭৯২) ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের মোকাবিলার সময় জমিদারদের ভূমিকা সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাই বলেছেন, "আমি এটা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমনকি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও, এর ফলে এমন এক বিপুলসংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে, যারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ ভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের ওপর যাদের অখণ্ড প্রভুত্ব বজায় আছে।"[২৭]

শতবর্ষের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ঐতিহাসিক তথ্যের নির্যাস এটুকুই। এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাতময় রাজনৈতিক , আর্থ-সামজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সমকালীন সাহিত্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায় সমূহে পরিস্ফুট হবে।

উল্লেখপঞ্জী

১) C.R.Wilson, Old Fort William in Bengal, Vol. I, 1906. P-39.

২) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, 1948, P-401.

৩) Ibid, P-403.

৪) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol. II, 1948, P-404.

৫) Ibid, P-406-407.

৬) পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ ৫৫।

৭) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-413.

৮) পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ. ৫০-৫১।

৯) Murshid Quli Khan and His Times, 1963, P-166-192.

১০) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-423.
১১) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৮৮, পৃ. ২৫।
১২) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-429.
১৩) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-437-438.
১৪) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ৮৩।
১৫) K.K.Datta, Alivardi And His Times, 1989, P-14.
১৬) নিখিলনাথ রায়, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪-৩৫।
১৭) আকবরউদ্দিন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', ১৯৭৪, পৃ. ২৪২-২৪৩।
১৮) Ibid, P-16.
১৯) Ibid, P-17.
২০) বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ১৩৮।
২১) K.K.Datta, Alivardi And His Times, 1989, P-2.
২২) আকবর উদ্দিন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', ১৯৭৪, পৃ.২৪৪।
২৩) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-437-443.
২৪) Alivardi And His Times, 1989, P-33.
২৫) তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ ৭৮।
২৬) আবদুস সোবহান কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত ইউসুফ আলি খানের তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-শওকত জঙ্গী, ১৯৮২, পৃ. ১৭-১৮।
২৭) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ১৪৪।
২৮) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol.II, 1948, P-444.
২৯) K.K.Datta, Alivardi And His Times, 1939, P-36.
৩০) বঙ্গে বর্গী, ১৩১৪, পৃ. ৭-৮।
৩১) K.K.Datta, 1939, P-48.
৩২) K.K.Datta, 1939, P-71.
৩৩) Jadunath Sarkar, Bengal Nawabs, 1985, P-31.
৩৪) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol.II, 1948, P-462.
৩৫) K.K.Datta, Alivardi And His Times, 1939, P-76.
৩৬) Jadunath Sarkar, Bengal Nawabs, 1985, P-43-44.
৩৭) বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৪।
৩৮) History of Bengal, Vol.II, 1948, P-445.
৩৯) বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ১৭৪।

৪০) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol.II, P-447.
৪১) Ibid, P-470.
৪১ (ক) পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ. ১০৭-১০৮।
৪২) অতুল চন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ৮৫।
৪৩) আবদুস সোবহান কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত 'তারিখ-ই-বাঙ্গাল-ই-শওকত জঙ্গী', ১৯৮২, পৃ. ১২২।
৪৪) তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ. ১৫০।
৪৫) আকবরউদ্দিন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', ১৯৭৪, পৃ. ৩৭০-৩৭১।
৪৬) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭, পৃ ১৬৮-১৬৯।
৪৭) অতুলচন্দ্র রায়, ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ৮৮।
৪৮) নিখিলনাথরায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৮৮, পৃ. ১২৮।
৪৯) পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ. ১৭৩।
৫০) পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ১৯৪৮, পৃ. ২৪৬।
৫১) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭, পৃ. ১৭২।
৫২) বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৭।
৫৩) তদেব, পৃ. ১৭৮।
৫৪) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৪২।
৫৫) তদেব, পৃ. ১৪৩।
৫৬) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ১৯৯৩, পৃ. ১৪৫।
৫৭) তদেব, পৃ. ১৪৬।
৫৮) বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭, পৃ. ১৮৭।
৫৯) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ ১৪৯।
৬০) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৫।
৬১) তদেব, পৃ. ১৯৫।
৬২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ৪১৫-৪১৭।
৬৩) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
৬৪) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ১১ (পরিশিষ্ট)
৬৫) তদেব, পৃ. ১৭-১৮ (পরিশিষ্ট)।
৬৬) Khan Mohammad Mohsin, A Bengal District in Transition; Murshidabad, (1765-1793), 1973, P.158.

৬৭) Ibid, P-159.

৬৮) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০৮, পৃ. ১৮।

৬৯) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ১৯৮৭, পৃ. ৪।

৭০) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ. ২০ (পরিশিষ্ট)।

৭১) A. M. Khan, The Transition in Bengal (1756-1775), 1969, P.122.

৭২) Khan Mohammad Mohsin, A Bengal District in Transition: Murshidabad, (1765-1793), 1973, P.161-162.

৭৩) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৭।

৭৪) বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, ১৪০০, পৃ. ২১।

৭৫) তদেব, পৃ. ২১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

পুরাতন ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভাবী যুগোপযোগী ঐতিহ্য সৃজন - অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য অনুভূমিক। অবশ্য ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে ফারাক ততটা গুণগত নয়, যতটা মাত্রাগত। ঐতিহ্য রূপান্তরিত হতে হতেই আধুনিকতার মাত্রা পেতে পারে। যেমনটা লক্ষ্য করা যায় আমাদের আলোচ্য শতাব্দীতে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম লক্ষণ ধর্মমনস্কতা। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী বা পুরাণ অনুবাদের ধারায় তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধারাগুলোর সজীবতা ক্ষুণ্ন হলেও স্তব্ধ হয়নি। অন্যদিকে এই পর্বে নতুন বেশে হাজির হয়েছে অন্য কয়েকটি সাহিত্যিক শাখা। শাক্ত পদাবলী, বাউল গান, কবিগান প্রভৃতি। নতুন বেশে কারণ ধর্মের নিঃসার মুখোশটা শুধু তাতে খোয়া গেছে। আর তার বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে মুখোশের অন্তরালে থাকা জীবন্ত মুখমণ্ডল। তার অস্তিত্বের মধ্যে প্রাণের হিল্লোল, অবসন্ন চেতনার গুমোট পরিবেশে মুক্তির উত্তাল শিহরণ, চিন্তার অবদমিত দশার পরে মননের স্বাধীনতা। ফলে এই সব সাহিত্য কোনো না কোনো আঙ্গিকে অধ্যাত্মগন্ধী হলেও তাদের কখনই আরোপিত মনে হয় না। সাহিত্য যে জাতির আত্মপ্রকাশের প্রধানতম হাতিয়ার, সমাজের, যুগের, মানসিকতার প্রতিফলন যাতে পড়ে, যেখানে নিয়ত চলে জীবন-অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার কাজ — সেই অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান অনুষঙ্গ আর ভবিতব্যের রূপরেখার একটা অপূর্ব মিশ্রণে এই শতাব্দীর বেশ কিছু সৃষ্টি ধর্মীয় হয়েও জাতির অন্তরাত্মা হতে পেরেছে। আর অবশেষে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে বাংলা সাহিত্য। দেবতার বদলে মানুষকে করেছে উপাস্য। মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় চলেছে তার আরাধনা। এই মানবমুখিনতা, মানবসর্বস্বতা আসন্ন শতাব্দীকে মন্ত্রমুগ্ধের মত টেনেছে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগান্তকারী সাহিত্যচর্চার নেপথ্যে পূর্ববর্তী শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যই কোনো না কোনো প্রেরণা নিয়ে মাত্রাভেদের সূক্ষ্ম কারসাজিতে প্রচলিত সাহিত্য স্বভাবের মেজাজ বদলে দিয়েছে।

তাই পূর্ব ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণ আর নতুন ঐতিহ্য সৃজন - এই দ্বিধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে বিভাজিত করা যায়। প্রথম ধারার অন্তর্ভুক্ত হল মঙ্গলকাব্য, পুরাণ অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী, সূফী সাহিত্য, পীর পাঁচালী, ইসলামী প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারায় পাওয়া যায়, শাক্ত পদাবলী, কবিগান, বাউল গান, সমকালীন জীবন প্রবাহ অবলম্বনে রচিত ইতিহাসভিত্তিক কাব্য, ছড়া, দোভাষী পুথি আর গীতিকা সাহিত্য।

।। মঙ্গলকাব্য ।।

লোককথা, পুরাণ আর পুরাণে-লোককথায় মিশিয়ে মধ্যযুগের দেবদেবীরা সংখ্যাধিক্যে প্রায় অগণন। এঁদের মাহাত্ম্যকীর্তন আর পূজা প্রচারের বিশিষ্ট কাহিনী হল মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান চারটি ধারায় মনসা, চণ্ডী, শিব আর ধর্মঠাকুরের কীর্তন। অন্যদিকে শীতলা, কালিকা, ষষ্ঠী, সরস্বতী, সূর্য, গঙ্গা প্রভৃতি সমাজের গৌণ প্রভাব-সম্পন্ন দেবকুলও উপেক্ষিত থাকেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই উভয় সারির দেবতাকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হতে দেখা যায়। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবি ছাড়া প্রতিভার সাক্ষাৎ তেমন পাওয়া যায়না।

মঙ্গলকাব্য বাংলার নিজস্ব সম্পদ। কাব্যের বিষয় ও চরিত্রে, সমাজ-জীবন চিত্রণে কিংবা আচার-বিশ্বাস রূপায়নে খাঁটি বঙ্গীয় সৌরভ। অনগ্রসর বিজিত হিন্দু, তুর্কী পরাক্রমোত্তর রুদ্ধশ্বাস প্রহর, আর্ত-সঙ্কুল বিপন্ন আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ এর জন্মদাতা। বাঙালী চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৈব-নির্ভরতা, অদৃষ্টবাদ, সংস্কারের বীজ সুপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এর বিকাশ। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল সবচেয়ে জনপ্রিয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন মনসামঙ্গল রচয়িতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কালানুক্রমিকভাবে এঁরা হলেন —

ক) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি গ্রামের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণ। কাব্য রচনাকাল ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) পশ্চিমবঙ্গের কবি সীতারাম দাস। কাব্য রচনাকাল ১৭০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গ) রাইপুরের কবি বাণেশ্বর রায়। কাব্য রচনাকাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘ) বগুড়া জেলার লাহিড়ীপাড়া গ্রামের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। কাব্য রচনাকাল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ঙ) শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবর দত্ত। কাব্য রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

এই সমস্ত কবিদের মধ্যে একমাত্র স্মরণীয় জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। সময়-সচেতনতা আর সমাজ-সচেতনতা — দুটি গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান। ১১৫১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৬৬ শকে কিংবা ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মাপুরাণ' রচনার একাধিক ইঙ্গিত তাঁর কাব্যমধ্যে পাই। যেমন —

মহীপৃষ্ঠে পশি দিয়া   বাণ বিধু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ ।।[১]

অথবা,   অম্বুজের পৃষ্ঠে রস   ঋতু রিপু জান।
এই শকে জীবন মৈত্র মধুর রস গান ।।[২]

এছাড়া নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকান্ত, মহারাণী ভবানী এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের উল্লেখ থেকে তদানীন্তন রাজবংশের পরিচয়ও অব্যক্ত থাকেনা।

কাব্যপাঠে মনে হয় কবি জীবনকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃস্থ ছিলেন। উদরান্ন সংস্থানে তাঁর মর্মন্তুদ বেদনার কাহিনী এখানে বর্ণিত। সেই সঙ্গে সমসাময়িক কালের এক অদ্ভুত প্রথার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে; যার নাম বেগার প্রথা। রাজা রামকৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন —

রামকৃষ্ণ রায়ের বিভা তাতে বেগারের ধুম।
লেখা ছাড়ি রলাম পড়ি চক্ষে চাপিল ঘুম ।।[৩]

'পদ্মাপুরাণ' কাব্যটি দুখণ্ডে বিভক্ত — দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। দেবখণ্ডে কতিপয় দেবতার বন্দনা ও সৃষ্টি প্রকরণ, এবং বণিকখণ্ডে চাঁদ সদাগরের বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এবং কবির মতে কাব্যোক্ত স্থানগুলি বগুড়ারই অন্তর্বর্তী। ভাসানগান মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। লঘু ত্রিপদীর নমুনাও কিছু পাওয়া যায়। তবে বেশ কয়েকটি স্থানে ছন্দের অক্ষর বা সংখ্যার নির্দিষ্ট মাত্রা রক্ষিত হয়নি।

কবি জীবন মৈত্রের গ্রন্থে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতার নাম মেনকা, ভ্রাতার নাম শঙ্খধর। পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এছাড়া বিষয় সন্নিবেশের ব্যাপারেও কবি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন।

কবির রচনা প্রণালী অত্যন্ত প্রাঞ্জল। দুর্বোধ্য শব্দ বা জটিল চরণ তাঁর কাব্যে দুর্লভ। হাস্যরস সৃজনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যুবক লখীন্দর কর্তৃক কামগঞ্জ স্থাপনের বর্ণনায় তার প্রমান পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলের জনপ্রিয়তাও কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবী চণ্ডী, কিংবা চণ্ডীগোত্রের বিভিন্ন নামা দেবীকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কাব্য রচিত হয়েছে।

ক) হরিশচন্দ্র বসুর চণ্ডীবিজয়। স্থান অনুক্ত। রচনাকাল — ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলী মঙ্গল। কাব্য রচনাকাল — ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। বাসস্থান, বর্ধমান জেলার কোনো গ্রাম।

গ) মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী'। কবি চট্টগ্রাম জেলার দেয়াঙ্গ গ্রামের বাসিন্দা। কাব্যরচনাকাল ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘ) জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডীমঙ্গল। বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামের অধিবাসী এই কবি। কাব্য রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ঙ) রামানন্দ যতীর/যতির চণ্ডীমঙ্গল। কাব্য রচনাকাল — ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্যে দেশ বা গ্রামের উল্লেখ নেই।

চ) ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা। চট্টগ্রামের এই কবি ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচনা করেন।

ছ) কৃষ্ণজীবনের অভয়ামঙ্গল। রচনাকাল এবং স্থান-নাম দুই-ই এই কাব্যে অনুক্ত।

জ) দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। কবির পূর্বপুরুষের বাস ছিল বর্ধমান জেলার মোটরী গ্রামে। কিন্তু তাঁর পিতা সেই গ্রাম পরিত্যাগ করে শ্বশুরালয় বীরভূমের হস্তিকান্দায় বসবাস আরম্ভ করেন। কবির জন্ম এখানেই। সুতরাং তাঁকে বীরভূমের কবি বলাই সঙ্গত।

ঝ) অকিঞ্চন চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল। কবির আদিবাস মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা পরগণার বেঙ্গরাল গ্রামে। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনার সময় বর্ধমানের অধিবাসী রাজা তেজচন্দ্রের আমলে (১৭৭০-১৮৩২)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁর কাব্য রচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতারা প্রায় সকলেই মুকুন্দ চক্রবর্তীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছিলেন। ফলে মৌলিকতার স্বাদ কোনটিতেই পাওয়া যায় না। তবে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ লিখন সৌকুমার্যে কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন ভবানীশঙ্কর দাস ও অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

কবি ভবানীশঙ্করের ভাষা পরিপাটি ও শালীন। বহুদিনের পর গৃহে প্রত্যাগত স্বামীর সঙ্গে মিলনোপলক্ষে কবি মার্জিত ভাষায় খুল্লনার সাজসজ্জা বর্ণনা করেছেন —

কুন্তল করিল বদ্ধ উর্ধ্ব করি খোঁপা।
তাহার উপরে দিল চম্পকের থোপা।।
মালতীর মালা তাহে দিল বেড়াইয়া।
ভ্রমর রহিছে যেন মধুগন্ধ পাইয়া।।[৫]
— ইত্যাদি।

কবি মুকুন্দের ছত্রছায়ায় থাকা আর এক কবি পাঠকের নেকনজরে পড়েছেন। তিনি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। একাধিক কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত। প্রথমত, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলো খুবই প্রাণবন্ত। হরগৌরী আখ্যানাংশে কবি শিবঠাকুরের চরিত্রকে গ্রামের হতদরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। অলস নিঃসম্বল বৃদ্ধ অথচ লোভের পরিসীমা নেই। অন্যদিকে সেই বৃদ্ধের রসনা তৃপ্তিতে

পার্বতীর করুণ অবস্থাও রীতিমত মর্মস্পর্শী। এককথায় দরিদ্র বাঙালী ঘরের দৈনন্দিন ঘরকন্নাকে কবি জীবন্ত করে তুলেছেন। এছাড়া তাঁর ভাঁড়ু চরিত্রটিও সার্থক। কবি মুকুন্দের অনুসারী হলেও ভাঁড়ুর ভগিনী, পুত্র কিংবা জামাতার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তার অনুরূপ বৃত্তান্ত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে নেই। এছাড়া উৎপীড়িত গুজরাটবাসী কালকেতুর কাছে ভাঁড়ুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছে তার ছবিও বাস্তব ও করুণ—

মহাবীর নগর নিবাসে নাঞি সাদ।
শুন বীরশিরোমণি   নিবাসে বসিল ফণী
ভাঁড়ু দত্ত পাড়িল প্রমাদ।।
তোমার আশ্বাস পায়্যা   সর্বে ছিনু সুখী হৈয়া
অন্ন বস্ত্রে পরম কল্যাণে।
....
রাজার জয়ার্থ কড়ি   দিতে নাঞি করি দেরী
সেই বাটপাড় নগরের।
হিসাবি খাজনা লেয়   ফারখতি লিখিয়া দেয়
চরণে বিদায় মাগি তোর।। ..... [৬]

অকিঞ্চনের রচনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, মধুর মনোহর কাব্য রচনা। রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যকে তিনি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করেছেন। একদিকে তিনি যেমন নানা ছন্দ, অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দলঙ্কার ও বিভিন্ন অর্থালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন, অন্যদিকে প্রকৃত কাব্যরস সৃষ্টিতেও তাঁর পারদর্শিতা সমান। ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ণনায় তিনি ললিত ঝাঁপ ছন্দের সুন্দর প্রয়োগ করে কবিকঙ্কণকেও অতিক্রম করেছেন। যেমন, কলিঙ্গদেশে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনা। নিখুঁত ও বাস্তবধর্মী বর্ণনায় কবি কোনো এক বাইশে আশ্বিনের ঘনঘোর বর্ষার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। খাল-বিলপূর্ণ গ্রামবাংলার নিচু অংশ যেমন সহজেই বন্যার কবলে পড়ে, সুউচ্চ বাঁশের আগায় বন্যার জল ঠেকলে মহাসমুদ্রের মতো যেমন সেখানে অসীম জলরাশির উত্তাল প্লাবন ঘটে, মগরার বানেরও সেরূপ দৃশ্য হয়েছিল। পল্লীবাংলার বর্ষার সর্বগ্রাসী বন্যার ভয়াল রূপটিই মগরার বানের মধ্যে ধরা পড়েছে। সবার চেয়ে ক্ষতি হয়েছে পুজোর ধানের —

... খালি জুলি পুরিয়া ঃ নদনদি ভরিয়া ঃ তরঙ্গ হইল্যা বাণ।
কলিঙ্গ নগর ঃ ডুবিল্য বড়ঘর ঃ হাজিল্য পুজার ধান।।[৭]

ধান পল্লীর ঐশ্বর্য। এর বিনষ্টিতে পল্লীবাসীর হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। কবি সেই ব্যথার চিত্রটি গভীর আন্তরিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে অকিঞ্চনের মধ্যে দরদী পল্লী কবির অনুভূতি সহজেই পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে

যেখানে কবিদের উপর ভাব অপেক্ষা শব্দ ও ধ্বনির প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যেত, অকিঞ্চন সেখানে শব্দ ও ধ্বনি প্রয়োগের চমৎকারিত্বের মধ্যেও কাব্যরসকেই মুখ্য করে তুলেছেন।

ভবানীশঙ্কর ও অকিঞ্চনকে বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। ইনি রামানন্দ যতি। মুকুন্দ চক্রবর্তীকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও তাঁর মুকুন্দ-বিরোধিতার জন্যই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। মূর্খ জনসাধারণকে গ্রাম্যরসে মজিয়ে তাদের নৈতিক মান নামানোর দায়ে কবি রামানন্দ মুকুন্দরামকে অভিযুক্ত করেছেন। বিশেষত কবিকঙ্কণ প্রতিভাধর বলেই রামানন্দের ক্ষোভ আরো তীব্র। যে প্রতিভা দিয়ে মুকুন্দ উৎকৃষ্ট শালীন রুচিরম্য কাব্য লিখে জনকল্যাণ করতে পারতেন, জনমনোরঞ্জনের লোভে সস্তা খ্যাতির মোহে সেখানে ইতরগ্রাহ্য রসরচনায় বহুস্থানে সময় অপব্যয় করেছেন বলে রামানন্দের অভিযোগ। নিম্নোক্ত চরণগুলিতে কবির মুকুন্দ -বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —

মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কান্টাবন
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কন্টকে তাঁকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।
আরো শুন অদভুত জন্মিবে ব্যাধের সুত
সেখানে গেলেন ভগবতী।
কলিতে কলিঙ্গবনে কালকেতু সিংহাসনে
মল্লযুদ্ধ করিলেক কতি।।
কালীদহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালী
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর।।

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।
অনেক অনুরোধ কেহ না করিবে ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।।[৮]

এছাড়া মুকুন্দের চেয়ে দুই শতাব্দী পরবর্তী প্রজন্ম হবার সাহিত্যিক সুবিধাটুকু ভোগ করেছিলেন রামানন্দ। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় পালাবদলের দ্বৈরথ সমর তাঁর কাব্যেও ছায়া ফেলেছিল। লিখন কৌশলও দুশো বছরের চর্চায় আরো জোরালো, রসাল হয়ে উঠেছিল। জীবন-দৃষ্টিতে এসেছিল তির্যক সূক্ষ্মতা। সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনে তাঁর পর্যবেক্ষণী শক্তি প্রশংসনীয়। যেমন গৌরীর বিবাহ প্রসঙ্গে মেনকা যখন বলেন

পিতার ঘরেতে কন্যা থাকা ভাল নয়।
আপনি না দেখাইলে নরে নাহি লয়।।[৯]

তখন বুঝি সমাজে নারীর অবস্থান দেবী-মানবী নির্বিশেষে একই ছিল। বস্তুত, সন্ন্যাসী রামানন্দ কোনো রাজচ্ছত্র -ছায়ায় তাঁর কাব্য রচনা করেন নি, কোনো বাঁকুড়া বা রঘুনাথ রায় বা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর খ্যাতির পথ প্রস্তুত করেননি। তিনি তা চানও নি। ফলে রসনা রসিকজনের চিত্ত মনোহারী লক্ষণ বা স্থূলরুচি বিবর্জিত আদিরসের প্রকোপ তাঁর শিষ্ট, শালিন রচনায় অনুপস্থিত থেকেছে। জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে অনেকখানি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় ধর্মমঙ্গল শাখা তুলনায় অনেকটাই অর্বাচীন। সপ্তদশ শতাব্দীকে এর জন্মলগ্ন ধরা হলেও ধর্মমঙ্গলের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। এই শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল রচয়িতারা হলেন —

ক) ঘনরাম চক্রবর্তী। বাসস্থান - কৃষ্ণপুর (বর্ধমান)। কাব্য রচনাকাল - ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) নরসিংহ বসু। ইনি বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামের কবি। কাব্য রচনাকাল - ১৭১৪-১৭ খ্রীষ্টাব্দ। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গ) রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে বা দ্বিজ রামচন্দ্র। চামোট, বিষ্ণুপুরের কবি। কাব্য রচনাকাল - ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘ) সহদেব চক্রবর্তী। হুগলীর রাধানগরের কবি। কাব্য রচনাকাল - ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঙ) প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়। বাসস্থান - অনুক্ত। কাব্য রচনাকাল - ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

চ) হৃদয়রাম সাউ। আদিনিবাস - বর্ধমানের খুরুল গ্রাম। পরবর্ত্তী বাসস্থান বীরভূমের উচকরণ গ্রাম। কাব্য রচনাকাল - ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছ) মাণিকরাম গাঙ্গুলী। হুগলীর বেলডিহার গ্রামের কবি। কাব্য রচনাকাল - ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

জ) রামকান্ত রায়। বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রামের কবি। কাব্য রচনাকাল - ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে স্বল্প সংখ্যক প্রতিভাবান কবির সন্ধান পাওয়া যায় ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন। তাঁর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, 'ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি।'[১০] কাহিনী বয়ন, ঘটনাসংস্থাপন, ঘটনা পর্যায়ের গতি, সাবলীল কাব্যকুশলতা এবং নির্বাচিত শব্দপ্রয়োগ, পৌরাণিক উপমা ও সুষমা মণ্ডিত কাব্যরীতির জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট অবস্থান। বাইশটি পালায় বিভক্ত বিশাল এই কাব্যে সাহিত্যিক ব্যাপ্তির উদাত্ত স্পর্শ পেয়ে পরবর্তী

সমালোচকগণ ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। কথাটি আংশিক সত্য। কারণ, চরিত্রের মহত্ত্ব, আদর্শের সমুন্নতি, মানবমনের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির সংঘাত এবং আদর্শ ও মহত্ত্বের জয়, আদর্শের সংঘাত এবং বহু চরিত্র ও কাহিনীর বিকাশে জীবনের মহনীয় রূপের যে প্রকাশ মহাকাব্যে বাঞ্ছিত তা ধর্মমঙ্গল কাব্যে সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়নি। তথাপি, এই অপরিণতি সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসৃত হতে দেখা যায়। সমসাময়িক সমাজ এবং প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিকে অতিক্রম করতে পারেনি বলে ধর্মমঙ্গল মহাকাব্যের পরিণত রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণে এক বিরল বিশিষ্টতা আছে। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আদর্শ-বিশ্বাসের প্রতিফলনে এই কাব্য জীবনরসায়িত হয়ে উঠেছে। 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ/দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্নরস গান।[১১] রাজার মঙ্গল ও দেশের কল্যাণ চিন্তা ঘনরামের ছিল। এই জন্য কাব্যে বাহুবল ও নৈতিকবলের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্রুপদী সাহিত্য বলে পরিগণিত হতে পারে। সেই তুলনায় মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকটাই লঘু। তবু জনচিত্তরঞ্জক কিছু গুণ তাঁর কাব্যে থাকায় কাব্যটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রথমত, ধর্মপূজার এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। ধর্মের উৎসে বৌদ্ধ প্রভাবকে কবি স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে 'শূন্যমূর্তি' রূপে আখ্যায়িত করেছেন —

শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাতবার।
অশ্বে চেপে লাউসেন হল্য আগুসার।।[১২]

অথবা,
সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে।
তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহণ করে।।[১৩]

এই 'শূন্য মূর্তি' কোনো হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারেনা। ইনি বৌদ্ধদের 'শূন্য' বা 'মহাশূন্য'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রচার করেছিলেন যে, বঙ্গদেশের মুচি, চামার, হাড়ি,ডোম প্রভৃতি নীচ জাতিসমূহের মধ্যে যে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে, তা বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর' ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মের পুরোহিতগণও নীচজাতীয় —

কর্ম্মকার নাপিত কুলজ মালাকার।
কপিলা বাহতি বৃষ পুরোহিত আর।।[১৪]

ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধর্মপূজার বিবরণও মাণিক গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ করেছেন। মাণিকের ধর্মমঙ্গলে কালাচাঁদ ধর্মের কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎ পত্রিকায় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন যে, নুয়াদা ভাঙ্গা-মোড়ার পার্শ্ববর্তী শোয়ালু

গ্রামে কালাচাঁদ 'ধর্ম্মরাজ' প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত সেখানকার গোয়ালা পণ্ডিতগণ। মাণিকরামের কাব্যে এরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী যথার্থ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। ভাষায়, শব্দসম্ভারে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। যেমন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে কবির কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশে –

গজপতি গর্জ্জিয়া চলিল তর্জ্জিয়া সহ
তার কত শত বোল।
মল্ল শল্লিপুরা চলিল কেঁউঝুড়া কোপে
ধায় কর্পূরধল।।[১৫]

বিষয় সন্নিবেশে মৌলিকতার পরিচয়ও দুর্লক্ষ্য নয়। এছাড়া সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যে তাঁর ব্যাপক অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় সমগ্র কাব্য জুড়েই।[১৬]

তৃতীয়ত, চরিত্র-চিত্রণেও কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হরিহর বাইতি, কালুডোম, লখা প্রভৃতি নিম্নগোত্রের জীবনচিত্র অঙ্কনে কবি প্রকৃতই পারদর্শী ছিলেন। লাউসেন ধর্মের পূজা দিতে হাকণ্ডে গেলে রাজধানী ময়না রক্ষার ভার ন্যস্ত হল কালুর উপর। এইসময় গৌড়ের রাজা ময়না আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়ে উৎকোচের দ্বারা কালুকে বশীভূত করে লাউসেনের সর্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হলে লখার স্বামীর প্রতি যে তীব্র শ্লেষোক্তি তাতে চরিত্রটি মহণীয় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে –

এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে।
কাঞ্চন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে।।
ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক ধিক্।
ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক।।
সুধিব সেনের নুন সাধিব কামনা।।
মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না।।[১৭]

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় মাণিক গাঙ্গুলীর রচনার সেই দিকটি যা কাব্যটির জনপ্রিয়তার প্রধানতম কারণ। সেটি হল আদিরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ। বিশেষ করে 'সুরিক্ষা' পালায় তাঁর লেখনী শ্লীলতার সমস্ত সীমা অগ্রাহ্য করেছে।

মঙ্গলকাব্যে শিব চরিত্র অপরিহার্য। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রায় কোনো মঙ্গলকাব্যই সম্পূর্ণতা পায়নি। আবার এই শিবকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে 'শিবমঙ্গল' কাব্যও রচিত হতে দেখা যায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তবে এই শাখায় খুব বেশী সংখ্যক কবির আবির্ভাব ঘটেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাত্র একজন শিবমঙ্গল রচয়িতার সাক্ষাৎ পাওয়া

যায়। ইনি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ভট্টাচার্য)। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে এঁর 'শিবসঙ্কীর্তন' রচিত হয়। পৌরাণিক দেবতা শিব ও পার্বতীর পারিবারিক কাহিনী নিয়ে এটি রচিত। শিবের জীবিকা কৃষি ও ভিক্ষাবৃত্তি। নামেই তিনি দেবতা, কিন্তু কাব্যে তাঁর পরিচয় দরিদ্র কৃষিজীবীরূপে। বস্তুত, শিব পরিবারের আড়ালে নিঃসম্বল চাষীজীবনের গার্হস্থ্য রূপ চিত্রিত করাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।

মেদিনীপুরের যদুপুর গ্রামে কবির আদিনিবাস। তবে সামন্ত হেমৎসিংহের অত্যাচারে ছিন্নমূল কবি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোবন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। যশোবন্তের অনুরোধেই রচিত হয় 'শিবসঙ্কীর্তন'।

কবি রামেশ্বর নিজের কাব্য সম্পর্কে উক্তি করেছেন -- 'রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু'।[১৮] সত্যিই তাঁর কাব্যে ভাষার মাধুর্য প্রশংসনীয়। প্রতিটি পঙ্ক্তিকে সুমধুর ও সুললিত করে পরিবেশন করেছেন তিনি। ভদ্র পাঠক ও শ্রোতার উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্য— 'ভব্য ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।'[১৯] মূলতঃ তিন ধরণের শব্দসম্ভার তাঁর কাব্যে লক্ষিত হয়। এক, সংস্কৃত শব্দ বহুল মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের সমৃদ্ধ ভাষা। দুই, পল্লীগ্রামে প্রচলিত প্রাদেশিক কথ্য ভাষা। তিন, মুঘল আমলের প্রধান দরবারী ভাষা ফার্সী। তিন ধরনের ভাষাতেই কবির দক্ষতা প্রমাণিত। সেই সঙ্গে সার্থক অনুপ্রাস প্রয়োগে, তার শোভন, সংযত ব্যবহারে কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। যেমন --

সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণ অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে।।[২০]

বিত্তহীন কৃষক পরিবারের কাহিনী বয়ন শিবসঙ্কীর্তনের উপজীব্য হলেও এর মধ্যে পুরাণের প্রভাব কম নয়। উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কৃষিপরাশর এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কবি কালিদাসের ছায়া কাব্যের প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

কবি ভারতচন্দ্র রায় নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটি তিনখণ্ডে বিভক্ত : (ক) অন্নদামঙ্গল অর্থাৎ দেবখণ্ড, (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ লৌকিক আখ্যান, এবং (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাহিনী। এইভাবে পুরাণ, রোম্যান্টিক লোকগাথা এবং ইতিহাসের সহায়তায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় আবির্ভূত হয়েও কবি ভারতচন্দ্র 'নূতন মঙ্গল' রচনা করলেন। কাব্যটির তিনটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, পৃথক মর্যাদার অধিকারী। তবুও এই তিনটির মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্রগত আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।

ভারতচন্দ্র রায় বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে। অন্নদামঙ্গলের সূচনায় আর্থ-রাজনীতির বিপর্যয়ের চিত্র আছে। নবাব আলিবর্দীর অধীনস্থ বঙ্গভূমি বর্গী আক্রান্ত হলে দেশের রাজকোষ শূন্য হবার উপক্রম হয়। নবাব কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে জবরদস্তি মূলক ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করেন, এবং প্রভূত অর্থ যোগানে অসমর্থ মহারাজকে নির্দ্বিধায় কারারুদ্ধ করেন নবাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রাষ্ট্রিক অচলাবস্থা কবি ভারতচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত নয়, খাঁটি তথ্য সমৃদ্ধ। পরবর্তী অংশে আছে কল্পনার ছোঁয়া। বিপন্ন রাজা কারাকক্ষেই দেবী অন্নদাকে চৌত্রিশ অক্ষরে বন্দনা করলে দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন, অন্নদার মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করলে রাজা বিপন্মুক্ত হবেন —

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।[২১]

এবং তারপর,

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায়।[২২]

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনার পরেই কবি প্রথম উপাখ্যানে প্রবেশ করেছেন। সতীর দেহত্যাগ, উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সঙ্গে বিবাহ ও ঘরকন্না, অন্নপূর্ণার মূর্তিধারণ, ব্যাস প্রসঙ্গ, কাশী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত। এই অংশই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল। পরবর্তী দুটি অংশে রয়েছে দেবী অন্নদার অনুগ্রহ বিতরণের কাল্পনিক কাহিনী। প্রথমে গঙ্গার পশ্চিম ও গাঙ্গিনীর পূর্বতীরবর্ত্তী বড়গাছি গ্রামের অধিবাসী হতদরিদ্র বিষ্ণুহোড় ও পদ্মিনীর সন্তান হরি হোড়কে এবং দ্বিতীয়ে আন্দুলিয়া গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ রাম সমাদ্দার ও সীতা-র একমাত্র পুত্র ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী কৃপা করেন। বস্তুতপক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মহিমাকীর্তন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবংশের প্রশস্তি রচনাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনা উপলক্ষ মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হয়েছে মানসিংহের বর্ধমান আগমন দিয়ে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসেছেন। ভবানন্দ কানুনগো, তিনিও রসদ যোগাতে বর্ধমানে উপস্থিত। মানসিংহ বর্ধমানে বসবাসকালীন সুন্দরের কাটা সুড়ঙ্গ দেখে ভ বানন্দের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শুনতে চাইলেন। এই উপলক্ষে সবিস্তারে কাহিনী বর্ণিত। এই বিদ্যা-সুন্দরের উপাখ্যানই কাব্যের দ্বিতীয় অংশ।

কবি 'বিদ্যাসুন্দর' এর আখ্যান সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃত প্রেমকাব্য থেকে। সংস্কৃতে বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা, বররুচির নামে প্রচারিত 'বিদ্যাসুন্দরম্' ইত্যাদি থেকে এবং প্রাক-ভারতচন্দ্রীয় যুগে রচিত দু-একটি বাংলা গ্রন্থ থেকে এর উপাদান

সংগ্রহ করেছেন কবি। তবে সংস্কৃত কাব্যে দেবী কালিকার প্রসঙ্গ ছিল না। তাঁর আমদানি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য থেকে। দেবী কালিকার ভক্ত সুন্দর দেবীর কৃপাতেই গোপন সুড়ঙ্গ কেটে বিদ্যার শয়ন মন্দিরে উপস্থিত হয় এবং ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডের জন্য মশানে আনীত হয়। তার আকুল প্রার্থনায় দেবী কালিকা আবির্ভূত হয়ে তাঁর বন্ধন মোচন করেন এবং বর্দ্ধমানরাজকে দেবীদর্শন করিয়ে বিদ্যার সঙ্গে নিজের ভক্তের বিবাহ সমাধা করেন। পরে সুন্দর স্ত্রীকে দেশে ফিরে 'নানা মতে কালীরে পূজিলা।'[২২] দেবী বললেন —

তোরা মোর দাস-দাসী শাপেতে ভূতলে আসি
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হৈল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস
নানা মতে আমারে তুষিলা।।[২৩]

এইভাবে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে কালিকার প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে মানসিংহের যশোরে আগমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় এবং বাদশাহের কাছে খেলাৎ পাবার উদ্দেশ্যে ভবানন্দের দিল্লী গমন। দিল্লীতে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে তবেই ভবানন্দ 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি।

ব্যক্তিগত জীবনে ভারতচন্দ্র জমিদার পুত্র ছিলেন। তাঁর বংশ, বিত্ত, শিক্ষা, জীবিকা এবং অভিজ্ঞতা কবিকে নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অধিকারী করেছিল। তাঁর বাক্‌চাতুর্য, লিপিকুশলতা এর প্রমাণ দিচ্ছে। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সি ও হিন্দুস্থানী এই চারটি ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'[২৪] বলে ভারতচন্দ্র কাব্যরসের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ভাষার ব্যবহারে কখনও শৈথিল্য দেখাননি। অন্নদামঙ্গলের দেবলীলা, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ-ভবানন্দ এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানে নানা চরিত্র, নানা ঘটনা, নানা পরিবেশ ও অবস্থার বিবরণ আছে। ঝড়-বৃষ্টি-যুদ্ধের বর্ণনা, রূপবর্ণনা, প্রেমনিবেদন ও সম্ভোগের বর্ণনা, ঈশ্বরী পাটুনির নিষ্পাপ সারল্য, মালিনীর কুটনীবৃত্তি, নারীদের পতিনিন্দা, বারমাসী, রন্ধনবর্ণনা, কালীস্তুতি, দেববন্দনা, বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের বির্তক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ভাষা হয়েছে বিভিন্ন, বিচিত্র ও প্রাসঙ্গিক। কালীস্তুতির এক অর্থ দেবীপক্ষে, অপর অর্থ বিদ্যার পক্ষে গেছে। অন্নদার আত্মপরিচয়ও দ্ব্যর্থবোধক -- 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।/ কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।।'[২৫] .... ইত্যাদি একটি শব্দের মধ্যে একাধিক অর্থ প্রবেশ করিয়ে তিনি ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। বস্তুত কথ্য বাংলা ভারতচন্দ্রের রচনা চাতুর্যের ভিত্তি। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে,'[২৬] অথবা, 'কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গলায় এসে।'[২৭] অথবা, 'সুয়া যদি নিমদেয় সেহ হয় চিনি।'[২৮] ইত্যাদি বাক্যে কথাভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে।

অবশ্য, তাঁর কাব্যে সংস্কৃতানুসারী অলঙ্কৃত চরণও আছে। 'চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু।'[৩০] সেই সঙ্গে পাওয়া যায় যাবনী মিশাল ভাষার প্রশংসনীয় ব্যবহার -- 'অরে রে হিন্দুকে পুত / দেখলাও কাঁহাভূত / নহি তুঝে করুঙ্গা দোটুক / ন হোয় সুন্নত দেকে / কলেমা পড়াঁও লেকে / জাতি লেঁউ খেলায়াকে থুক।'[৩১] আর সর্বোপরি প্রোঢ়ক্তি ও প্রবাদ রচনা। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'[৩২], 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'[৩৩] ইত্যাদির দ্বারা ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার বাঁধুনিকে শক্ত করে দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহার দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য ও পারিপাট্যও বৃদ্ধি করেছেন চমৎকার কৌশলে।।

অন্নদামঙ্গলে ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মের বন্ধন শিথিল। তাঁর কাব্যে মানবজীবনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ধর্মের আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জীবন-কথাতে এসেছে তাঁর যুগের রস ও রুচি; যাকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করা হয়। রাজার ও সভাসদদের আনন্দ বিধানের জন্য রচিত এই কাব্যে ভোগ-বিলাস, অশ্লীলতা যেমন এসেছে, তেমনি রয়েছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, লিপিচাতুর্য। তিনি অশ্লীলতাকে এই বৈদগ্ধ্য দিয়ে আবৃত করেছেন। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ' — কবির এই উক্তিতে যুগের প্রতিধ্বনি আছে। কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে ব্যবসায় অর্থনীতির গৌরব-কীর্তন উদীয়মান বণিক শক্তির ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্র ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন কবি 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। এঁরা হলেন --

(ক) কবীন্দ্র। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এঁর 'কালিকামঙ্গল' রচিত হয়।

(খ) রামপ্রসাদ সেন। কবি আধুনিক হালিশহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দেবী কালিকার মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক দুটি কাব্য রচনা করেছিলেন ইনি— ১) বিদ্যাসুন্দর এবং ২) কালীকীর্তন। বিদ্যাসুন্দরের রচনাকাল অন্নদামঙ্গলের সমসাময়িক। এই কাহিনী রচনায় কবি বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। অনাবশ্যক অশ্লীলতা ও পাণ্ডিত্যের ভারে জর্জরিত করেছেন কাব্যকে। আসলে এটি তাঁর প্রথম বয়সের রচনা। তাই শুধু যে কৃষ্ণচন্দ্রের নাগরিক বিলাসকলাকুতূহলকে চরিতার্থ করতে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে কবির প্রথম বয়সোচিত ভাব ও রুচির অসংযত বিলাসের নিদর্শনও তাতে প্রকট হয়ে উঠেছে।

'কালীকীর্তন' ক্ষুদ্র রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কীর্তনগান ভেঙে যে নতুন পাঁচালী গানের সৃষ্টি হচ্ছিল সেই আদর্শ নিয়েই রচিত রামপ্রসাদের কালীকীর্তন। এতে কবির রচনা বিশিষ্টতার কোনো পরিচয় নেই। ব্রজলীলার অনুকরণে দেবলীলা পদ রচনার অসম্পন্ন নিদর্শন বলেই এই কাব্যটি কিছু ঐতিহাসিক মূল্য পেতে পারে

(গ) নিধিরাম আচার্য। চট্টগ্রামের এই কবি ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন।

নিধিরামের কাব্যের ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী। কাব্য বর্ণিত চরিত্রসমূহের নাম সম্পর্কে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত জনশ্রুতিকেই গ্রহণ করেছেন কবি। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও কবিত্ব তাতে দুর্লভই বলা চলে।

(ঘ) রাধাকান্ত মিশ্র। কলিকাতার বাসিন্দা রাধাকান্ত১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্যামাব মঙ্গল' নামে কালিকা মঙ্গল রচনা করেন।

রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, গ্রাম্যতা বর্জিত। বিষয়বস্তু গতানুগতিক হলেও চরিত্র-চিত্রণে মৌলিকতার ছাপা স্পষ্ট। বিশেষ করে বিদ্যা ও বিমলা মালিনীর চরিত্র দুটি চিত্রণে কবি সর্বাধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

রাধাকান্ত মিশ্রের কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় দৈবী স্বপ্নাদেশ প্রসঙ্গেব সমালোচনা। যুগ-সন্ধিক্ষণের সংশয় তাঁকে স্পর্শ করেছিল খুব বেশী। কলমের আঁচড়ে সেই দ্বিধা ও দোলাচলকে তিনি প্রচলিত রীতিতে দেবী মাহাত্ম্য রচনা করতে বসেও ফুটিয়ে তুলতে পিছপা হন নি।

।। বিবিধ দেব-দেবীকথা ।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো কিছু অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। বিষয়গুণ ও কাব্যগুণ কোনো ক্ষেত্রেই এই সমস্ত কাব্য স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করতে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শুধুমাত্র এগুলির নামোল্লেখ করা হল।

১) 'গঙ্গামঙ্গল' কাব্য। রচয়িতা - ক) দ্বিজ গৌরাঙ্গ, এবং খ) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

২) 'সূর্যমঙ্গল' কাব্য। রচয়িতা - মালাধর বসু। রচনাকাল ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩) 'সারদামঙ্গল' কাব্য। রচয়িতা - দয়ারাম দাস।

৪) 'ভারতীমঙ্গল' কাব্য। রচয়িতা - সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ। রচনাকাল ১৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৫)'লক্ষ্মীকথা'। রচয়িতা - দ্বিজ পঞ্চানন। রচনাকাল - ১৭৭০খ্রীষ্টাব্দ।

৬)'ষষ্ঠীমঙ্গল' ।রচয়িতা - রুদ্ররাম চক্রবর্তী। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

৭) 'শীতলামঙ্গল'। রচয়িতা - ক) নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতের দশক।

খ) মাণিকরাম গাঙ্গুলী। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

গ) অকিঞ্চন চক্রবর্তী। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

।। অনুবাদকাব্য ।।

অনুবাদ ভাষান্তর শিল্প। সমাজের চাহিদায় এই শিল্পের আবির্ভাব। মধ্যযুগে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত গ্রন্থের কাব্যানুবাদ এই চাহিদার ফসল। অনুরূপভাবে আরবি-ফার্সি গ্রন্থেরও কাব্যানুবাদ হয়। অনুবাদকর্মের মাধ্যমে ভারতীয় এবং আরবীয়, ইরানীয় ঐতিহ্য বাংলায় প্রবেশ করে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'matter of Sanskrit' (সংস্কৃতের উপাদান) এবং 'matter of Arabic-Persion' (আরবি-ফার্সির উপাদান) বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি এই তিনটি ধ্রুপদী ভাষা। ঐসব ভাষার মহাকাব্য, রোমান্স, ধর্ম ও জ্ঞানশাস্ত্রের অনুবাদকেই আলোচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান রামায়ণ অনুবাদকেরা হলেন --

ক) শঙ্কর কবিচন্দ্র। নিবাস - বাঁকুড়া জেলার পানুয়া গ্রাম। কাব্যের নাম বিষ্ণুপুরী রামায়ণ। রচনাকাল - ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ। বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত এই রামায়ণটির প্রধান উপজীব্য রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসন আরোহন।

খ) ফকিররাম কবিভূষণ। নিবাস - মল্লভূমি (বাঁকুড়া)। কাব্যের নাম - 'অঙ্গদ রায়বার'। অর্থাৎ লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত অঙ্গদ-বিভীষণ-কালনেমির রাজসভা কাহিনী। 'রায়বার' শব্দের অর্থ, রাজদ্বারের বা রাজসভার বর্ণনা ও রাজস্তুতি। কাব্য রচনাকাল - ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

গ) শিবচন্দ্র সেন। নিবাস - কাঁটাদিয়া। কাব্যের নাম - সারদামঙ্গল। কাব্য রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দী।

ঘ) গঙ্গারাম দত্ত। নিবাস - যশোর জেলার নড়াইল। কাব্যের নাম-রামকথা নিবন্ধ। কাব্য রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

ঙ) কৃষ্ণদাস পণ্ডিত। নিবাস - উত্তরবঙ্গ। কাব্যের নাম - শ্রীরাম পাঁচালী। কাব্য রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দী।

চ) রামানন্দ যতী। সুকুমার সেনের মতে ইনিই চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা রামানন্দ। কাব্যের নাম - রামতত্ত্ব। রচনাকাল - ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

ছ) রামানন্দ ঘোষ। নিবাস - বর্ধমান জেলার অম্বিকা গ্রাম। কাব্যের নাম - রামায়ণ, বা নূতন রামায়ণ। রচনাকাল - ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুঃ)।

এই দুই রামানন্দ একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবসান হয়নি। সুকুমার সেন স্বয়ং বলেছেন 'দুইজন বলিতেছি বটে, কিন্তু একজন হওয়াও অসম্ভব নয়।'[৩৩]

জ) গঙ্গারাম দত্ত। নিবাস - নড়াইল গ্রাম। কাব্যরচনাকাল - ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

ঝ) জগৎরাম রায়। নিবাস - রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী - দামোদর নদের দক্ষিণতীরস্থ ভুলুই গ্রাম। কাব্য রচনাকাল - ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে। কাব্যের নাম - অদ্ভুত রামায়ণ।

রামানন্দ ঘোষ ও জগৎরাম রায়ের কাব্য দুটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

কবি রামানন্দের 'নূতন রামায়ণ'-এর বিশিষ্টতা এখানেই যে গ্রন্থকার প্রতি উপাখ্যানের শেষে যে ভণিতা ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যেই তাঁর রচনার উদ্দেশ্য, ধর্মমত, তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ওজস্বী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোনো বাংলা রামায়ণে এইসব লক্ষণ অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত, কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। পুথির বিভিন্ন পাঠে 'বোদ্ধ', 'বোধ্ব', আবার 'বুদ্ধ' ভণিতা পাওয়া যায়। এ থেকে কখনও কখনও মনে হয় তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। এই ধর্মীয় তারতম্য সত্ত্বেও হিন্দুর আদি পুরাণ অনুবাদে তাঁর প্রয়াস প্রশংসনীয়। তাঁর গ্রন্থের আদি কাণ্ড, ১৪৪ পত্র, ১ম পৃষ্ঠায় তিনি নিজেকে 'বুদ্ধ' বলে প্রচার করেছেন —

বিশেষেব দ্বারে অন্তে এই পাই সার।
আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কাল্কি অবতার।।[৩৪]

এছাড়া আলোচ্য কাব্যের বিভিন্ন স্থানে এরূপ ব্যাখ্যা লক্ষিত হয়। কিন্তু ঘোষ পুত্র রামানন্দ কেন এই জাতীয় অবতারবাদ প্রচারে নেমেছিলেন? উত্তর একটাই। তিনি দারুব্রহ্ম ভক্ত ছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে ভ্রমণ করে জেনেছিলেন —

প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতারে। জ্ঞান বিস্তার্ণি এ সংসারে।।
বেদেব ধর্ম্ম ছড়াইবে। নির্গুণ ধর্ম্ম প্রচারিতে।[৩৫]

আসলে উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগান এইরূপ বহু বুদ্ধাবতারের কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের কাছে বুদ্ধ স্বযং শূন্য ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি তাঁরা দারু ব্রহ্মকেও বুদ্ধাবতার বলে জানতেন।[৩৬]

অন্যদিকে সুকুমার সেন মনে করেন, "উড়িষ্যার বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকেরা ঈশ্বর অর্থে 'বুদ্ধ' বা 'বউধ' নাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের কাছে এ নাম জগন্নাথের সমার্থক। 'বৌদ্ধরূপে জগন্নাথ অবতার' - এমন কথা পুরোনো বাঙ্গালা পাঁচালী রচনার দিগবন্দনায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং রামানন্দ নিজেকে যে বুদ্ধ অবতার বলিয়াছেন, তাহাতে উড়িষ্যার বুদ্ধমতের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রমাণ খোঁজা অনুচিত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগে বুদ্ধ অবতার বলিয়া গণ্য হন নাই বলিয়া মনে হয় - একথা স্মরণ

করিতে হইবে।"[৬৭] সুতরাং তিনি বৌদ্ধ হন, বা না হন, এই অবতারত্বের ভাব-কল্পনা গ্রহণ নিঃসন্দেহে অভিনব।

তৃতীয়তঃ, রামায়ণে রামানন্দ মসিজীবীদের গৌরবজনক আসন দান করেছেন। তাঁর মতে 'সূর্য্যকৃপা হইতে উঠে মসিজীবিগণে।'[৬৮] তিনি মসিজীবীদের 'বিপ্র ক্ষেত্রি শূদ্র বৈশ্য' - এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ধরেননি এবং তাঁদের চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বলে নির্দেশ করেছেন। এবং ভবিষ্যতে এই মসিজীবিরাই যে সংসারে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করবেন এরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। এখানেও কবির দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব প্রকাশিত।

জগৎরাম রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহায়তায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃহত্তম রামকথা নিবন্ধ বচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর 'অদ্ভুত রামায়ণ' নয় খণ্ডে বিভক্ত। আদি কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দর কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড, পুষ্কব কাণ্ড, রামবাস এবং উত্তরা কাণ্ড।

সামগ্রিকভাবে কাব্যটি বচনার পরে জগৎরাম পুত্রকে লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করতে আদেশ দেন। পুত্র বামপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন --

পিতা জগদ্রাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যেমতে।।

. . . .

লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ডে যেমত অমৃত ভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে।[৬৯]

কবি জগৎরাম তাঁর রামায়ণ বচনায় বহুল প্রচারিত বাল্মীকি রামায়ণের সহায়তা গ্রহণ করেন নি। ববং স্বল্প পরিচিত অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণকে অবলম্বন বরেছিলেন। তাঁব অদ্ভুত রামায়ণেব মূল উপজীব্য পৃথিবী ও দেবতাদের প্রার্থনায় রাবণবধেব জন্য নারায়ণের চার অংশে দশরথেব চারপুত্রের জন্মগ্রহণ, পুত্রদের বিকাশ ও সেতুবন্ধে শিবস্থাপনা। লঙ্কাকাণ্ড থেকে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত অংশ পুত্র রামপ্রসাদের রচনা। এব অবলম্বন অধ্যাত্ম বামাযণ। পুষ্কর কাণ্ডের কাহিনী জগৎরাম অদ্ভুত রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেন। বাকি অংশ সমূহে অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব লক্ষিত হয়।

তবে কাব্যটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য 'রামবাস' শীর্ষক মৌলিক উপচ্ছেদে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রগাঢ় ছায়া। এই অংশে শ্রীবামচন্দ্রেব মাধুর্য লীলা বর্ণিত হয়েছে। সরযূর তীরে সখীপরিবৃত রামচন্দ্রের বাসলীলার কাহিনী কথক হনুমান; শ্রোতা অগস্ত্য মুনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের অজস্র অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু সবগুলিই প্রায় আংশিক। গুণমানেও এগুলি অপকৃষ্ট। তাই এই শাখার কবিদেব শুধু নামোল্লেখই করা যায়।

ক) গঙ্গাধর / গঙ্গাদাস সেন। মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা।
খ) দ্বিজ গোবর্ধন। গদা পর্বের রচয়িতা।
গ) দ্বৈপায়ন দাস। অশ্বেমেধ পর্বের রচয়িতা।
ঘ) নন্দবাম। দ্রোণপর্বাদি রচনা করেন।
ঙ) কৃষ্ণানন্দ বসু। শান্তি পর্বের রচয়িতা।
চ) দ্বিজ কৃষ্ণরাম। অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা।
ছ) অনন্ত মিশ্র। ইনিও অশ্বমেধ পর্ব রচয়িতা।
জ) রামলোচন। নারী পর্ব রচনা করেন।
ঝ) রাজেন্দ্র দাস। আদি পর্ব রচয়িতা।
ঞ) রাজারাম দত্ত। দণ্ডী পর্ব রচয়িতা।
ট) শঙ্কর কবিচন্দ্র। সমগ্র মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করেন।

এই শেযোক্ত কবিই একমাত্র স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পাবেন। মল্লরাজ গোপাল সিংহের আদেশে পানুয়া গ্রামনিবাসী এই কবি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন (১৭৩৮-৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। কবিশঙ্কর তাঁর কাব্যের বহু স্থানে পৃষ্ঠপোষক মহারাজার প্রশস্তি রচনা করেছেন --

শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ।।

তারপর মহারাজ দিয়া ভূমিদান।
আদেশিলা বর্ণ মহাভারত পুরাণ।।[৪০]

গোপালচন্দ্রের আদেশে বৈয়াসকী মহাভারতের সারানুবাদরূপে যে সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কবি, সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীরাম দাস ছাড়া আর কেউই তা করতে সমর্থ হননি। কবিচন্দ্র সংক্ষেপে মূল সংস্কৃত মহাভারতকে প্রায় অবিকৃত ভাবেই প্রাদেশিক ভাষায় পরিবর্তিত করেছেন। অবশ্য অন্যান্য কবিদের মত মাঝে মাঝে নতুন আখ্যান গ্রহণ ও নীতি-উপদেশাদি নীরস ঘটনা বর্জনের চিরাচরিত আদর্শটিকে তিনিও উপেক্ষা করেননি। তবু এই গ্রন্থটিকে আমরা সহজেই মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কল্পিত বা লোক-প্রচলিত আখ্যান কবিচন্দ্র তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। এগুলি 'পালা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই জনপ্রিয় পালাগুলি কাশীরামের কাব্যের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। কবিচন্দ্র মুখ্যতঃ পাণ্ডব-কৌরব

কাহিনীকে তাঁর কাব্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। সেজন্য মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন উপাখ্যান তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে। কাশীরামের 'ভারত পাঁচালী' র কথা স্মরণ করে 'ভারত সাবিত্রী' অংশে তাই তিনি বলেছেন —

পূর্বে ভারত ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে।
গাইতে নারিল কেহ বাহুল্যের পাকে।।
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব করি রাত্রিদিনে।
নৃপ আজ্ঞায় দিলাং বসুদেব গায়নে।।[৬১]

সুতরাং কবি খুব সংক্ষেপে মূলানুগ কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গান করার জন্য অতিরিক্ত সরল করা হলেও কাহিনী গ্রহণ, বর্জন ও সংস্থাপনে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কবিচন্দ্রের মহাভারতের অধ্যায় সংখ্যা কুড়ি। এগুলি হল যথাক্রমে — আদি পর্ব, সভা পর্ব, বন পর্ব, বিরাট পর্ব, উদযোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, দ্রোণ পর্ব, শল্য পর্ব, সৌপ্তিকপর্ব, বা দ্রোণী পর্ব, ঐষিক পর্ব, শান্তি পর্ব, ভীষ্মযোগ বা অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধ পর্ব, আশ্রমবাসিক পর্ব, মৌষল পর্ব, মহাপ্রস্থান পর্ব, স্বর্গারোহন পর্ব, এবং ভারত সাবিত্রী।

ভাগবত অনুবাদের ধারাতে প্রতিভার ছাপ আরো নগণ্য। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই সম্প্রদায়গত চৈতন্যধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মরূপে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগবত অনুসারী পূর্ণাঙ্গ রচনা কিংবা কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যান রচিত হয়েছিল অজস্র। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই পর্বে উল্লেখযোগ্য কবিত্বের অধিকারী হিসাবে কাউকেই চিহ্নিত করা যায় না। বাছাই কয়েকজন কবিরই নামোল্লেখ করা চলে।

ক) বলরামদাস। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসরণে তিনি 'কৃষ্ণলীলামৃত' রচনা করেন। কাব্যটির রচনাকাল ১৭০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) মল্লভূম নিবাসী কবি অভিরাম দাস। ভাগবত অনুসরণে কৃষ্ণলীলা কাব্য 'গোবিন্দ বিজয় রচনা করে ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে সূচনায়।

গ) উত্তরবঙ্গের কবি দ্বিজ রামেশ্বব। কাব্যের নাম গোবিন্দ বিজয়।

ঘ) সিলেট অঞ্চলের কবি গঙ্গারাম। কাব্যের নাম গোপাল চরিত।

ঙ) সিলেট অঞ্চলের কবি রামদাস। কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণচরিত।

চ) সিলেট অঞ্চলের কবি রামানন্দ মিশ্র। কাব্যের নাম 'রসতত্ত্ববিলাস'।

ছ) দ্বিজ রমানাথ। কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। মূলত ভাগবত অনুসারে তিনি এই কাব্যটি রচনা করে ছিলেন।

জ) বিষ্ণুপুরের কবি শঙ্কর চক্রবর্তী। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনিভাগবতামৃত বা গোবিন্দ মঙ্গল রচনা করেন।

ঝ) পরাণ দাস। কাব্যের নাম - 'রসমাধুরী'। ব্রজলীলাবিষয়ক এই সুবৃহৎ রচনাটি তিনি সমাপ্ত করেন ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।

এঁরা ছাড়া আরো বেশ কয়েকজন ভাগবত অনুবাদক আছেন। নিছকই চর্বিতচর্বণ হবার আশঙ্কায় এঁদের নামোল্লেখ করা হল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনুবাদ চর্চায় শুধু হিন্দু পুরাণাদিই অবলম্বিত হয়নি, অবলম্বন করা হয়েছিল ইসলামী শাস্ত্র ও পুরাণকেও। বস্তুত, আরবি-ফার্সিতে অনভিজ্ঞ, কোরান-অজ্ঞানী পাঠকের কাছে ঐসলামিক ধর্ম ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য মূলত মুসলিম কবিগণ বাংলা নীতিশাস্ত্র রচনায় মনোযোগী হন। 'কিফাইতুল মুসলীন' (১৬৩৮) গ্রন্থে শেখ মুত্তালিব এই প্রসঙ্গে বলেছেন —

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল-মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ।।
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
এই পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু।।[৪২]

দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬৩) কোরানের ফার্সি অনুবাদ করলে মৌলবাদীরা তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান। পাপভয় ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ইসলামী ভাবান্তরের এই প্রয়াসের অন্তরালে আছে আরব-ইরানের ধর্মীয় ও সাহিত্যিক উপাদান এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। নবগঠিত মুসলিম সমাজকে আলোকিত করা, ধর্মের বন্ধন দৃঢ়তর করা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানত যে ক'জন ইসলামী শাস্ত্র প্রবক্তা ও পুরাণ অনুবাদককে পাওয়া যায় তাঁরা হলেন —

ক) শেখ মনসুর। তাঁর সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ক কাব্যটির নাম 'সিরনামা'। রচনাকাল - ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) কবি আশরাফ। বিভিন্ন নামাজের ফজলিয়ত অবলম্বনে নামাজের নিয়মাবলী সমন্বিত কাব্যটির নাম 'কিফায়তোল মুসলেমিন'। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

গ) শেখ পরাণ। কাব্যের নাম - 'কায়দানী কিতাব'। কোরাণ অবলম্বনে মুসলমানদের একশ তিরিশটি ফরজ বা আবশ্যিক কর্তব্য সমূহের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এতে। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

ঘ) হেয়াত মামুদ। রংপুর জেলার বাগদুয়ার পরগণার ঝাড়বিশিলা গ্রামের কবি

ইনি। হেয়াত মামুদের কাব্য সংখ্যা চার। - ১) জঙ্গনামা (১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে)। ২) চিত্তউত্থান বা সর্বভেদবাণী (১৭৩২ খ্রীঃ) ৩) হিতজ্ঞানবাণী (১৭৫৩ খ্রীঃ), এবং ৪) আম্বিয়াবানী (১৭৫৭ খ্রীঃ)।

ঙ) মুহম্মদ মুকিম। ইনি চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামের কবি। 'ফায়েদুল মুবতাদী' নামক শাস্ত্রগ্রন্থের ঐ নামীয় অনুবাদ করেন কবি।

চ) বালক ফকির। ইনিও চট্টগ্রামের কবি, এবং তাঁর গ্রন্থটিও সৈয়দ শাহাবুদ্দীনের ফারসী কাব্যগ্রন্থ 'ফায়েদুল মুবতাদী'-র তর্জমা। শরীয়ৎ সম্মত নিয়মাবলী বর্ণনা করেছেন কবি। কাব্যরচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ছ) মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক। নোয়াখালীর বেদরাবাদ গ্রামের কবি ইনি। কাব্যের নাম ফক্করনামা। কাল - অষ্টাদশ শতাব্দী।

জ) আলীরজা। চট্টগ্রামের ওশখাইন গ্রমের কবি। কাব্যনাম সিরাজকুলুব। কাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ঝ) মুহম্মদ আলী। চট্টগ্রামেব ইদিলপুর পরগার কবি। কাব্যনাম — হয়রতুল ফিকাহ। কাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

ঞ) মুহম্মদ কাসিম। যুগীদিয়াব (নোয়াখালী) কবি। দুটি কাব্য রচয়িতা — ১) সিরাজুলকুলব (১৭৯০), এবং ২) হিতোপদেশ (?)।

ট) সৈয়দ নুরুদ্দীন। চট্টগ্রামের কবি। দুটি বৃহদায়তন কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। — ১) বাহাতুল কুলুব (১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) এবং ২) দাকায়েকুল আখবার (১৭৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দে)। এছাড়া পরবর্তী কালে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক নুরুদ্দীনের আরো দুটি কাব্যের সন্ধান দিয়েছেন। ৩) দাকায়েকুল হাকায়েক এবং ৪) মুসাব সওয়াল।

মানব সমাজকে ইসলামী নীতির আলোয় সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত করার আন্তরিক প্রেরণা থেকেই কাব্যগুলি রচিত। বিশেষ করে দ্বিতীয় গ্রন্থটির নীতিকথা সমূহ ইসলামের মৌলিক প্রত্যয়ের ওপব প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু, কেয়ামত, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদি সম্পর্কে কোরাণের নির্দেশকে স্বচ্ছন্দ বাংলা ভাষায় তুলে ধরে মানুষকে নীতি কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন কবি।

ইসলামী অনুবাদের এই ধারায হেয়াত মামুদ ও সৈয়দ নুরুদ্দীন শ্রেষ্ঠ কবি। যদিও সমকালীন রাজনৈতিক উত্থান-পতন বা অর্থনৈতিক বিপর্যয় তাঁদের কাব্যগুলিকে স্পর্শ করেনি, তবু বিষয়গুণে ও কাব্যিক কুশলতায় এগুলি সুস্থ সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে।

।। বৈষ্ণব সাহিত্য ।।

ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের ফলে যে বিপুল ভাবের প্লাবন দেখা দিয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে তার প্রবাহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা সর্বতোভাবে দ্যুতিহীন হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শচ্যুতি ও লক্ষ্যভ্রষ্টতা বৈষ্ণব সাহিত্যের মানকে অবক্ষয়ের পথে দ্রুত ঠেলে দেয়। ফলে পদাবলী সাহিত্যে নতুন কোনো ভাবের উদ্দীপনা চোখে পড়ে না। চর্বিতচর্বণেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। তবে এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সে দুটি হল যথাক্রমে চৈতন্যজীবনী সাহিত্য রচনা এবং পদাবলী সঙ্কলন। বিশেষত এই সঙ্কলনগুলি বিস্মৃতি ও ধ্বংস থেকে বৈষ্ণব পদাবলীকে রক্ষা করেছে বলে তাদের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী। অবশ্য সেই সঙ্গে দু-একটি বৈষ্ণব তত্ত্ব কাব্য এবং কিছু কবিত্ব-বর্জিত বৈষ্ণব পদও এই শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি দাবি করতে পারে।

চৈতন্য ও মহান্ত জীবনী রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন —

ক) প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র)। বর্ধমান কুলনগরের কবি। তিনি চৈতন্যদেবের জীবন ও বৈষ্ণব সমাজ সম্পর্কে দুটি কাব্য রচনা করেন— ১) চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি কর্ণপুরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়', নামক সংস্কৃত রূপক নাটকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, এবং ২) বংশীশিক্ষা (১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ)। বৈষ্ণবতান্ত্রিক রসরাজ (অর্থাৎ রাগানুগা) সাধনা বিষয়ক রচনা। চারটি উল্লাসে সমাপ্ত। এর মধ্যে সাড়ে তিন উল্লাসে চৈতন্যদেব কর্তৃক বংশীবদনকে, শিক্ষাদান উপলক্ষে তত্ত্বকথার অবতারণা, এবং চতুর্থ উল্লাসের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ এবং বংশীবদন ও তাঁর বংশ পরিচিতি মূলক কিছু কাহিনী আছে। জাহ্নবাদেবী এবং বীরচন্দ্রের প্রসঙ্গেও নতুন সংবাদ পাওয়া যায়।

খ) অকিঞ্চন দাস। কাব্যের নাম 'বিবর্তবিলাস'। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। বিষয় — 'বংশীশিক্ষার অনুরূপ। তবে তান্ত্রিক আচারের ওপর ঝোঁক অনেক বেশি। বৈষ্ণব তাত্ত্বিক সাধনাঘটিত নিবন্ধগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটিই বিস্তৃত ও সুলিখিত। এখানে চণ্ডীদাসের ভণিতা সমৃদ্ধ বেশ কিছু পদ আছে, যেগুলি সবই রাগানুগা পদ্ধতির প্রসিদ্ধ পদ।

গ) ভগীরথ বন্ধু। খানাকুলের কবি। কাব্যের নাম — 'চৈতন্যসংহিতা'। 'আগম' জাতীয় এই রচনাটিতে বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী, বিষয় শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

ঘ) আনন্দচন্দ্র দাস। যশোরের কবি (আনু)। কাব্যের নাম 'জগদীশচরিত্র' (বা 'জগদীশচরিত্রবিজয়')। গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপের প্রতিবেশী এবং প্রধান ভক্ত জগদীশ পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী। বারটি 'বর্ণ' নামক অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত।

ঙ) নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস)। মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ পরগনার কবি। এঁর রচিত তিনটি জীবনীগ্রন্থ হল ১) ভক্তিরত্নাকর (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ) , ২) নরোত্তম বিলাস (ঐ) এবং ৩) শ্রীনিবাস চরিত্র (ঐ)।

'ভক্তিরত্নাকর' চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শে পরিকল্পিত। বইটি পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত। বৈষ্ণব সমাজ সম্প্রদায় ও আদর্শের একটি মূল্যবান দলিলরূপে একে গণ্য করা যায়। জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ, এবং জাহ্নবা দেবীর ভক্তিপ্লুত জীবন কাহিনীই এই গ্রন্থের উপজীব্য।

নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী সম্বলিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নরোত্তম বিলাস'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, 'বইটি ভক্তিরত্নাকরের পরিপূরক, আকারে অনেক ছোট এবং অধিকতর সুপাঠ্য রচনা।'[৪৩]

তৃতীয় জীবনীগ্রন্থ — 'শ্রীনিবাসচরিত্র' শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

বৈষ্ণবপদ সঙ্কলনগ্রন্থ রচয়িতারা হলেন —

ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। মুর্শিদাবাদ জেলার দেবগ্রামের কবি। সঙ্কলনগ্রন্থের নাম — 'ক্ষণদাগীত চিন্তামনি' (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। গ্রন্থটিতে পঁয়তাল্লিশজন কবির লেখা তিনশ'র অধিক পদ আছে। তবে চণ্ডীদাসের কোনো পদ এখানে পাওয়া যায় না।

খ) নরহরি চক্রবর্তী। সৈয়দাবাদের কবি। সঙ্কলন গ্রন্থের সংখ্যা দুটি। - ১) গৌরচরিত্রচিন্তামনি। পদসংখ্যা ৩৭১। সবগুলির রচয়িতাই সঙ্কলক নিজে, যার বিষয় শ্রীচৈতন্যকথা, এবং ২) গীতচন্দ্রোদয়। পদসংখ্যা - ১১৭১। নরহরি সমস্ত পদকে আট অংশে বিভক্ত করে নানা আস্বাদ ও উপবিভাগে বিন্যস্ত করে এই বিশাল সঙ্কলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিসহ প্রায় সব বৈষ্ণব কবিরই পদ পাওয়া যায়।

এই দুটি গ্রন্থের রচনাকাল আনু. অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

গ) রাধামোহন ঠাকুব। মুর্শিদাবাদ জেলার মালহাটি গ্রামের কবি। সঙ্কলন গ্রন্থ — 'পদামৃতসমুদ্র'। পদসংখ্যা ৭৪৬, যাতে তাঁর নিজের ২২৮ টি পদ আছে। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

ঘ) বৈষ্ণবদাস। মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামের কবি। সঙ্কলন গ্রন্থ - 'পদকল্পতরু' (মূল নাম 'গীতকল্পতরু'। পদসংখ্যা - ৩০০০ এর অধিক। রচনাকাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

ঙ) গৌরসুন্দর দাস। শ্রীখণ্ডের কবি। সঙ্কলনগ্রন্থ - 'সঙ্কীর্তনানন্দ' (বা 'কীর্তনানন্দ')। পদসংখ্যা - ৫১। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

চ)দীনবন্ধু। শ্রীখণ্ডের কবি। সঙ্কলনগ্রন্থ - সঙ্কীর্তনামৃত। দুইখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৪০জন মহাজনের লেখা ৪৯১ টি পদ আছে। তার মধ্যে কবির নিজস্ব পদ ২০০-র অধিক। এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এতে রসশাস্ত্রের লক্ষণ সমূহ সহজ-সরলভাবে দেওয়া আছে।

ছ) রাধামুকুন্দ দাস। সঙ্কলনগ্রন্থ - মুকুন্দানন্দ। পদসংখ্যা ৬৫৯। তার মধ্যে রাধামুকুন্দের পদ - ১৫টি। সঙ্কলনকাল —অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

জ) নটবর দাস। সঙ্কলনগ্রন্থ - রসকলিকা। এতে বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস বাসুদেব ঘোষ এবং শিবানন্দের দু-একটি করে পদ আছে। সঙ্কলন কাল - অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব ও রসসাধনা সম্বন্ধে বেশ কিছু নিবন্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল যেগুলির কাব্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর। তান্ত্রিক সহজ সাধন ঘটিত প্রক্রিয়ার নানা প্রয়োগ এই সব নিবন্ধের উপজীব্য। মাত্র একজন কবির কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। ইনি - জগৎরাম রায়। তাঁর পরিণত বয়সের এই আধ্যাত্মিক রূপক কাব্যের নাম 'আত্মবোধ'। কাব্যটির রচনাকাল ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

'আত্মবোধ' বার উল্লাসে বিভক্ত। কবি জগৎরাম রামায়েত বৈষ্ণব হয়েও যে রাগানুগা পদ্ধতির সাধক ছিলেন তার প্রমান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এটি বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশিষ্ট রচনা। বাংলা রাম তন্ত্রের একমাত্র 'সহজিয়া' নিবন্ধ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক ব্যক্তিই বৈষ্ণবপদ রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আবার সঙ্কলনগ্রন্থেরও রচয়িতা। প্রথমে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বল্লভ বা হরিবল্লভ ভণিতায় বেশ কিছু বৈষ্ণব পদরচনা করেন ইনি। শ্রীরাধার পূর্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোৎকণ্ঠা, কেলিবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের অভিসার প্রভৃতি পর্যায়ে তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

খ) নরহরি চক্রবর্তী। ইনি প্রচুর সংখ্যক পদ রচনা করেন। ছন্দোনির্মিতিতে কবি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।গৌর ও নিত্যানন্দ বন্দনার কিছু পদ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পূর্বরাগ ও রূপবর্ণনার পদে কবি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

গ) রাধামোহন ঠাকুর। এঁর বেশীর ভাগ পদই 'উজ্জ্বলনীলমনি'তে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনা করেছেন। শব্দের হিল্লোলিত বিলাস ছাড়া নতুনত্ব কিছু নেই। রাধার পূর্বরাগের দশ অবস্থা, মাথুর এবং কৃষ্ণেব রূপবর্ণনা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যাই বেশী।

ঘ) দীনবন্ধু দাস। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা বর্ণনায়, এবং বাৎসল্যের পদে কবির কৃতিত্ব লক্ষণীয়। এছাড়া শ্রীরাধার জন্ম, বয়ঃসন্ধি, অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্য এবং সখ্যরসের বেশ কিছু পদ তিনি রচনা করেছেন।

ঙ) যাদবেন্দ্র দাস। বীরভূমের এই কবি বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

চ) বৈষ্ণব দাস। রাধাকৃষ্ণের অভিসার, মিলনলীলা নিয়ে স্বল্পসংখ্যক এবং গৌরলীলা বিষয়ে অধিক সংখ্যক পদ রচনা করে ইনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

ছ) চন্দ্রশেখর। আধুনিক বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের কবি ইনি। বৈষ্ণব বস শাস্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে এঁকে পদ রচনা করতে দেখা যায়। যেমন— অভিসারিকা রাধার বর্ণনায় কবি শ্রীরাধার দিবাভিসার, কুজ্ঝটি-অভিসার, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অভিসার প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা এবং মানিনী রাধার বর্ণনায় তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর 'গীতাবলী'র পদ দ্বাবা প্রভাবিত হয়েছিলেন বোঝা যায়।

জ) শশিশেখর। পূর্ববর্তী কবি চন্দ্রশেখরের ভাই বলে এঁকে মনে করা হয়। এঁর গোষ্ঠবিহারের পদগুলি উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি সুবল, অর্জুন, অংশুমান, দাম, বসুদাম প্রমুখ ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণ সখাদের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া রাধার পূর্বরাগ, অভিসার, মান ও মাথুরের পদরচনায় কবির পারদর্শিতা লক্ষিত হয়।

ঝ) জগদানন্দ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদকর্তাদের তুলনায় ইনি শক্তিশালী কবি। শ্রীখণ্ডের এই কবি চৈতন্য পার্ষদ রঘুনন্দন ঠাকুরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পদাবলী রচনায় কবি জগদানন্দ গোবিন্দ দাসকে বেশীরভাগ সময়ে অনুসরণ করেছেন। গৌরচন্দ্রিকা, শ্রীরাধার পূর্বরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ ও বংশীধ্বনির পদসমূহ বচনায় কবির আন্তরিকতা লক্ষিত হয়।

জগদানন্দের বৈষ্ণব পদ আলোচনায় একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়। সেটি হল, রাধা-কৃষ্ণ মিলনের পর রসালসে নিদ্রার সময় রাধার অভিনব স্বপ্নদশন, যাতে আভাসিত হল কৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণের ইঙ্গিত। পদটির চমৎকৃতি এইখানে যে, রাধা এই অজ্ঞাত গৌরাঙ্গ পুরুষের প্রতি নিজের আকর্ষণে বিপন্নবোধ করেছেন এবং কৃষ্ণকেই এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন —

কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুব গৌরবরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন।।

চতুর্ভুজ আদি কত বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন না হইল কদাচন
গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে।[৪৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদ রচনায় মুসলমান কবিরাও অগ্রণী হয়েছিলেন। সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকজনের পরিচয়ও উদ্ধার করা হল।

ক) আকবর আলী। শ্রীহট্ট জেলার গুধরাইল পরগণার মামদপুর গ্রামের অধিবাসী। এই কবির রচিত 'ইস্কে দিওয়ানা', 'ফানায়েজান' ও 'যৌবনবাহার' নামক তিনখানি কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গযুক্ত মোট ২৯টি গান আছে। একটি রাধাবিরহের পদ উদ্ধৃত করছি —

অধম জানিয়া বা শ্যামচান্দ সঙ্গে নেও আমারে
লাগায়া পিরিতের আনল আমারি অন্তরে।।[৪৫]

খ) আবাল ফকির। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। অন্যান্য পরিচয় অজ্ঞাত। এঁর একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে। পদটি হল — 'মুড়রি আনিআ দে রাধা মোরে, (শ্যামের) মুরড়ি আনিয়া দে মোরে'[৪৬]......ইত্যাদি

গ) আলিমুদ্দিন। আহমদ্ শরীফের মতে ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। এঁরও একটিমাত্র পদ ছাড়া আর বিশেষ কোনো পরিচয় জানা যায় না।

ঘ) আইনুদ্দিন। ইনি পীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সাহ আকবর নামক জনৈক ফকিরের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। এঁর রচিত সাতটি পদের সন্ধান দিয়েছেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

ঙ) আসাউদ্দিন। পীর আইনুদ্দিনের সাক্ষাৎ শিষ্য।

চ) এতিম কাসেম। চট্টগ্রামের ফটিকছাড় থানার ঈসাপুরবাসী এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। 'আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি' নামের রচনায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামোল্লেখ তাই প্রমাণ করে। এঁর একটিই পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। পদটি বিরহের।

ছ) করম আলী। ইনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত 'করুলডেঙ্গা' গ্রামের অধিবাসী এক সঙ্গীত শিক্ষক। এই কবির রচিত বেশ কিছু বৈষ্ণব পদ এবং 'রাধার সংবাদ ঋতুর বারমাস' শীর্ষক বারমাসীটি উদ্ধার করা হয়েছে। কবি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই তিরোহিত হন।

জ) গেয়াস খান। ইনিও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কবি। এঁর রচিত একটি মাত্র প্রাপ্ত পদ নিম্নরূপ —

বন্ধু বিনে না রহে জীবন, আমার বন্ধু বিনে না রহে জীবন।[৪৭]

ঝ) গোলাম হোসেন। সম্ভবত শ্রীহট্টবাসী এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে অন্তিমের কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি।

ঞ) চম্পাগাজী। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সতরপটুয়া গ্রামের কবি। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ 'রাগনামা' ও 'তালনামা'য় বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়।

ট) চামারু। কবি নানা পুথির লিপিকর ছিলেন। সুলতানপুর গ্রামের এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। এঁর রচিত একটিমাত্র 'অনুরাগ' পর্যায়ের পদ উদ্ধার করেছেন শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। পদটি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ বিষয়ক —

'রাধার ভাবে কানুর মন বাহির হম বাহির হম করে।
যেখানে রাধিকার সনে দেখা হইল বৃন্দাবনে।
সে অবধি প্রানি না রয় ধড়ে।।'[৪৮] .... ইত্যাদি।

ঠ) সৈয়দ নাসিরুদ্দিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের 'সিরাজ সবিল' রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ নাসির, 'বিসমিল্লার বয়ান' রচয়িতা নাসিরুদ্দিন এবং পদকর্তা সৈয়দ নাসিরুদ্দিন একই ব্যক্তি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন আহমদ শরীফ। এঁর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণর রূপ বিষয়ক একটি পদ পাওয়া যায়।[৪৯]

কলা

।। সূফী সাহিত্য ।।

সূফীতত্ত্ব - প্রাচীন তত্ত্ব। সমন্বয়চিন্তা থেকেই এর উদ্ভব। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এর জন্ম। আরব-তুর্কী বিজয়ের পর হিন্দু-মুসলমানের বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতি সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, পরে উত্তর ভারতে এবং অবশেষে বঙ্গভূমিতে হিন্দু-মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নের বাহ্যরূপ ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রয়াস। হিন্দুর মায়াবাদ ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সূফী তত্ত্বই এই আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সূফীদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দজাত, তাঁর আমোদ উপভোগের জন্য নির্মিত। ফলে জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক মধুর রসায়িত হতে বাধ্য। নামাজ-রোজা বা যেকোনো আনুগত্যের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। শরীয়ৎ নিরর্থক। অনুরাগে যে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহবোধে পরম উপলব্ধি এবং মিলনে সার্থকতা সেখানে ঈশ্বর ও মানুষ আশুক-মাশুকের অখণ্ড বাঁধনে বাঁধা পড়তে বাধ্য।

সূফী ভাবধারায় এই আশুক-মাশুকের তত্ত্ব বৈষ্ণব চিন্তার জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের সমতুল্য। সূফীরা মুসলমান, দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী। আর বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায়ায় গড়া। তবু তাঁদের সাধনা চলে দ্বৈতবোধে এবং পরিণামে অদ্বৈতসত্তার প্রয়াসে। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী-বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। তাই সূফীগানে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাই।

সূফী-কবিদের মধ্যে অনেকেই রাধা-কৃষ্ণ রূপকে পদ রচনা করেছেন। আবার ফারসী গজলও লিখেছেন। আসলে সব কিছুর মূলেই সেই এক তত্ত্ব — জীবাত্মা-পরামাত্মার, দেহ ও প্রাণের, ভক্ত ও ভগবানের প্রেমতত্ত্ব। শুধু বাঙালী মুসলমানই নন, দাদু, কবীর, রজব, তাজ প্রমুখ সুখ্যাত অবাঙালী মুসলমানও রাধা-কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেননি। রাধা-কৃষ্ণ রূপক তাঁদের মনন প্রকাশের বাহন হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন সূফী-কবির সন্ধান পাওয়া যায়।

ক) কাজী শেখ মনসুর। রোসাঙ রাজ্যের কক্সবাজার মহকুমার রামু গ্রামের কাজী ছিলেন। ফারসী সূফীতত্ত্ব মূলক গ্রন্থ 'আহারলমসা' বা 'আসরারুলমসা' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন তিনি। গ্রন্থের নাম — 'ছিরি' বা 'শ্রী' বা 'সির'। কাব্যরচনাকাল ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) শেখ চাঁদ। কুমিল্লা জেলার কবি। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা তিন। ১) 'রসুল বিজয়' (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ) ২) 'হরগৌরী সম্বারদর' (১৭১৫-১৬) এবং ৩)

'তালিবনামা'। 'হরগৌরীসম্বারদর' কাব্যে সূফীর গুরুতত্ত্ব, শূন্যতত্ত্ব ইত্যাদির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৫০]

কায়াসিদ্ধির কথাও আছে। কবিব মতে সাধনার 'কায়াসিদ্ধি হৈলে তবে তারিবা যে ভবে।'[৫১]

গ) আলী রজা। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানার ওশখাইন গ্রামের কবি। 'কানু ফকির' নামে ইনি প্রসিদ্ধ। আলীরাজাব গুরুর নাম কেয়ামুদ্দিন। কবি আলীর পাঁচটি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১) ধ্যানমালা। এটি সঙ্গীতগ্রন্থ।
২) সিরাজ-কুলুপ। দরবেশী গ্রন্থ।
৩) জ্ঞানসাগব। দরবেশী গ্রন্থ।
৪) যোগকলন্দর। সূফী তান্ত্রিক মতের গ্রন্থ।
৫) ষটচক্রভেদ। কায়াসাধনার গ্রন্থ।

ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি ছিলেন।

ঘ) সিরতাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁর রচিত একটি পদ নিম্নরূপ —

সই সই কহিতে খাঁখার পিআর বেভার শুন প্রাণ সইরে। ধু ....[৫২]

ঙ) এর্শাদুল্লা। কবি আলিরাজার পুত্র ইনি। নিবাস চট্টগ্রামের ওশখাইন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কবি। এর্শাদুল্লা পিতার কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলি উল্লেখযোগ্য।[৫৩]

চ) সর্ফতোল্লা। আলিরাজার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান কবি সর্ফতোল্লা। ইনিও বহু সূফী সঙ্গীতের স্রষ্টা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের কবি হিসাবে এঁকে ধরা যায়।

।। পীর পাঁচালী ।।

মুসলমান পীরের উপর হিন্দু দেবতার মাহাত্ম্য আরোপ করে সত্যপীর, মাণিকপীর, বনবিবি ইত্যাদি লৌকিক পীরের উদ্ভব। মঙ্গল কাব্যের ধারায় তাঁদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক লোককাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়ে 'সত্যপীরের পাঁচালী', 'মাণিক পীরেব গীত', 'বনবিবির জহুরনামা' ইত্যাদি রচিত হয়। সত্যপীব ভক্তকে রোগ, শোক, দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারেন। মাণিক পীর গরুকে এবং বনবিবি বনের কাঠ-মাছ-মধু-

পাতা সংগ্রহকারীকে রক্ষা করেন। পাঁচালীর কাহিনী স্থানিক ও লৌকিক। পীর পাঁচালীব শিল্পমূল্য তুচ্ছ। তবে তা সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথেছে। এখানেই এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিহিত। এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ধারা লক্ষ্য করি — ১) মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। অনাথ ফকির রচিত মাণিক পীরের গীতে মাণিক পীর যেন শিবেরই ছদ্ম মূর্তি। পীর মছলন্দি (পূর্ববঙ্গের মোচরা পীর) যেন নাথ গুরু মৎস্যেন্দ্র ও যোদ্ধা পীর মসনদ আলির সংমিশ্রণ। বন বিবি বন-দুর্গারই রূপান্তর। বন বিবির মাহাত্ম্য পাঁচালী ('জহুরনামা') মঙ্গলচণ্ডীর কথার অনুরূপ। ২) একই কুম্ভীর দেবতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত। হিন্দুদের কালুরায়, মুসলমানদের মগরপীর কালুশাহা। ৩) হিন্দু ঠাকুর মুসলমান পীর হয়েও পূর্বেকার হিন্দু নামে পরিচিত। যেমন বর্ধমান ও ২৪ পরগনা জেলার পীর গোরাচাঁদ।

অবশ্য পীর পয়গম্বরকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের কথাও যে না পাওয়া যায় তা নয়। যথা দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণরায় হিন্দুদের ঠাকুর এবং বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বড়খাঁ গাজী দক্ষিণের অধীশ্বর। দক্ষিণরায়ের মিত্র কালু রায়, বড়খাঁ কালু শাহা। এই বিরোধ কাহিনী বন-বিবির উপাখ্যানেও অনুবৃত্ত হয়েছে। 'রায় মঙ্গলে' হিন্দু কবি প্রধান দুই নায়কের মধ্যে কারোর মাহাত্ম্যই খর্ব করেননি। কিন্তু গাজী সাহেবের গানে (অর্থাৎ 'গাজীমঙ্গল'এ) মুসলমান লেখক দক্ষিণরায়কে পরাজিত সুতরাং হীনতর বলেছেন। অবশ্য দুই মঙ্গলেই বিরোধের অবসান ঘটেছে মৈত্রীতে।

পীর পাঁচালী রচনার সূত্রপাত সপ্তদশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শাখার জনপ্রিয়তা বড় ছোট নির্বিশেষে অনেক কবিকেই আকৃষ্ট করে। কবিরা হলেন—

ক) ভৈরবচন্দ্র ঘটক। কাব্যের নাম — সত্যনারায়ণ পাঁচালী। রচনাকাল ১৭০০-০১ খ্রীষ্টাব্দ।

খ) বিকল চট্টোপাধ্যায়। সত্যনারায়ণ পাঁচালীর রচনাকাল ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

গ) রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য)। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত বরদা পরগনার যদুপুর গ্রামের কবি ইনি। কাব্যের নাম — 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'। এছাড়া 'আখোটী পালা' নামে দ্বিজ রামেশ্বর ভণিতাযুক্ত আর একটি কাব্যেও সত্যনারায়ণের মহিমার কথা ঘোষিত হয়েছে। কাব্যদুটির রচনাকাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একেবারে গোড়ায়।

ঘ) ঘনরাম চক্রবর্তী। বর্ধমান জেলার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামের এই কবি 'সত্যনারায়ণ সিন্ধু' নামে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটি পীর পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

ঙ) ফকিররাম কবিভূষণ। বাঁকুড়া জেলার কবি। কাব্যের নাম 'শশিসেনা' বা 'সখীসোনা'। রচনাকাল - ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ।

চ) ভারতচন্দ্র রায়। বর্ধমান জেলার ভূরশুট পরগণার পাণ্ডুয়া গ্রামের কবি। কাব্যের নাম — 'সত্যপীরের পাঁচালী'। রচনাকাল — ১৭৩৭খ্রীষ্টাব্দ।

ছ) শ্রীবল্লভ। কাব্য - 'মদন সুন্দরের পালা'। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দী।

জ) আরিফ। দক্ষিণরাঢ়ের তাজপুর গ্রামেব কবি। কাব্য — 'লালমোনের কেচ্ছা'। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দী।

ঝ) ফৈজুল্লা। হাওড়া জেলার পাচনা নিবাসী এই কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর অনুরূপ একটি 'সত্যপীর পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। রচনাকাল — অষ্টাদশ শেষার্ধ। ইনি একটি গাজীমঙ্গলও রচনা করেছিলেন। নাম 'গাজীবিজয়'। রচনাকাল — ১৭২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ঞ) দ্বিজ গিরিধর। বর্ধমান জেলার শাহবাদ পরগণার ভারুহা গ্রামবাসী এই কবি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন।

ট) শঙ্কর আচার্য। সত্যপীরের পাঁচালী। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

ঠ) ফকির মহম্মদ। আজিমাবাদ জেলার ধানশিষ্যা গ্রামের কবি। রচনা— 'মাণিকপীরের গীত'। কাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

।। প্রণয়োপাখ্যান ।।

মুসলমান কবির সৃজনশীল ধারা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা কাহিনী কাব্য। এগুলিকে রোমান্স বলেও অভিহিত করা যায়। প্রণয়োপাখ্যানের বিষয়বস্তু প্রেম। ভারত ও আরব-ইরান এসব আখ্যানের উৎসভূমি। এছাড়া ফার্সি ও হিন্দি ভাষায় রচিত মূল কাব্যে সূফীমতের আধ্যাত্মিক প্রেমেব রূপক আছে। বাংলায় তা লৌকিক প্রেমের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, বাংলার কবিগণ সাধক নন, পাঠকেরও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নেই। প্রেমকাহিনীতেই পাঠক আকৃষ্ট।

প্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। প্রেমকে সফল করে তোলার জন্য নায়কগণ সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে এবং সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। রোমান্টিক প্রেমকাব্য মিলনাত্মক, বিয়োগান্তক নয়। কবিদের জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমনটি হয়েছে।

শাস্ত্রকাব্য ও প্রণয়কাব্যের বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে একটি সত্য ধরা পড়ে যে, কবিগণ ভারত ও আরব-ইরানের ইসলামিক ও অনৈসলামিক উপাদান

ব্যবহার করে বাংলা কাব্যের দিগন্ত প্রসারিত করেন। হিন্দু কবিগণ হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির চর্চা করেন। মুসলমান কবিগণ মুসলিম সমাজ ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করেন। কেউ কারোর সীমানা ছাড়িয়ে যাননি। এজন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধও নেই। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে ঐকমত্য ছিল। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসারে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা দু'দলই।

বাংলা ভাষায় রচিত ইসলামী রোম্যান্টিক প্রণয়কাব্যের সুবর্ণযুগ বলা যায় সপ্তদশ শতাব্দীকে। ইউসুফ-জোলেখা প্রণেতা শাহ মুহম্মদ সগীর, লায়লী-মজনু প্রণেতা দৌলত উজির বাহরাম খান, সতীময়না-লোরচন্দ্রানী প্রণেতা কাজী দৌলত ও পদ্মাবতী প্রণেতা আলাওল হলেন এই ধারার প্রতিভাবান কবিবৃন্দ। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা কিন্তু সেই তুলনায় কৃতিত্বের নজির রাখতে পারেন নি। বরং বলা যায় তাঁরা পূর্বধারার উজ্জ্বলতাকে ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। তবে বিষয়বস্তুর আকর্ষণেই এই শতাব্দীর রোম্যান্টিক কাব্যগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে যথেষ্ট।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতারা হলেন —

ক) মুহম্মদ রজা। চট্টগ্রাম জেলার বখৎপুর গ্রামের কবি। কাব্য — 'তমীম গোলাল চতুর্থ ছিলাল'। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ।

খ) মুহম্মদ উজীর আলী। চট্টগ্রামের চাবিয়া গ্রামের কবি। কাব্য — 'শাহনামা'। রচনাকাল — ১৭১১-১৮।

গ) শেখসাদী। ত্রিপুরার কবি। 'গদামল্লিকা সংবাদ'। রচনাকাল — ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘ) শেরবাজ। ত্রিপুরার কবি। গ্রন্থ — 'মল্লিকার হাজার সওয়াল'। রচনাকাল — ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

ঙ) করিমুল্লাহ। চট্টগ্রামের মুরাদপুর গ্রামের কবি। কাব্য — মৃগাবতী। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

চ) মুহম্মদ মুকীম। চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ার কবি। কাব্য — 'গুলে বকাওলী'। রচনাকাল — ১৭৬০।

ছ) মুহম্মদ আলী। চট্টগ্রামের ইদিলপুরের কবি। কাব্য — 'শাহপরী মল্লিকাজাদা'। রচনাকাল — অষ্টাদশ শতাব্দী।

জ) শাহ গরীবুল্লাহ। হুগলী জেলার বালিয়াহাফেজপুরের কবি। কাব্য — 'ইউসুফ জোলেখা'। রচনাকাল — ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ঝ) মুহম্মদ আবদুর রজ্জাক। নোয়াখালীর বেদরাবাদের কবি। কাব্য — 'সয়ফুলমুলুক-লালবানু'। রচনাকাল — ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

ঞ) সৈয়দ হামজা। হাওড়া জেলার অদুনার কবি। কাব্য — 'মধুমালতী'। রচনাকাল — ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নতুন ঐতিহ্যবাহী যেসব সাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে এখন আলোচনায় আসাযাক।

।। শাক্ত পদাবলী ।।

শাক্তপদ বা শ্যামাসঙ্গীতে দেবী কালিকাব পূজা আরাধনা ও চরণাশ্রয় কামনা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামী বক্ষারূঢ়া, নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গধারিণী এই দেবী শক্তির প্রতীক। তাঁর কাছে ভক্তি নিবেদন এবং তাঁর কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-বাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিণাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভঙ্গুর অরাজকপূর্ণ জীবন সংঘাত থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় সর্বস্বান্ত মানবাত্মা আদ্যাশক্তির বিরাট ঐশ্বর্যরূপের শরণ নেওয়া ছাড়া গতান্তর দেখেনি। এই শরণাকৃতি থেকেই শাক্ত পদাবলীর জন্ম।

শাক্ত পদগুচ্ছকে প্রধানত দুটি শাখায় বিভাজিত করা যায়। এক, হর-পার্বতীর পারিবারিক জীবনাশ্রিত আগমনী -বিজয়া সঙ্গীত; এবং দুই, কালিকা বা শ্যামার মাতৃরূপের ভজন-পূজন বিষয়ক অধ্যাত্ম সঙ্গীত। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার দু'জন কবি। রামপ্রদাস সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হিসাবে আমরা একমাত্র রামপ্রসাদ সেনকেই পাই। কারণ কমলাকান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত হলেও কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৭৭২-১৮২১)। অন্যদিকে বর্ধমান জেলার কুমারহট্ট গ্রামের কবি রামপ্রসাদের আবির্ভাব ও তিরোধান দু'ই অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭২০-১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ)।

রামপ্রসাদ শাক্তপদাবলীর স্রষ্টা। শক্তিতত্ত্বের দুরূহ অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে বাস্তব পৃথিবীর শরীরী মায়ায় মুড়ে পরিবেশন করেছেন তিনি। ব্যক্তির হৃদয়মথিত আবেগ ও সুখ-দুঃখের অনুভূতিই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। মা ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন করে ভক্তিরসের গীতোচ্ছ্বাস এবং কাব্যাস্বাদন অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি রামপ্রসাদের অভিনব অবদান।

বিষয় অনুসারে প্রসাদ পদাবলীকে অনেক সংগ্রাহক নানা নামে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন - কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধক সঙ্গীত'এ প্রসাদ পদাবলী বিভাজন করেছেন এভাবে — ১) প্রার্থনা, স্তুতি ও অভিমান ২) মৃত্যুর প্রাক্কালে সঙ্গতি, ৩) ষট্‌চক্র বর্ণনা, ৪) ষট্‌চক্রভেদ, ৫) শবসাধনা, ৬) সমর বিষয়ক, ৭) আগমনী, ৮) বিজয়া।[৫৫(ক)] এর ওপরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ গ্রন্থের' আরও কয়েকটি উপবিভাগের

কল্পনা করেছেন। যথা - সংসার বিতৃষ্ণা, আত্মনির্ভরতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।[৫৩(খ)] এভাবে ভাব অনুসারে উপচ্ছেদে ভাগ করলে অসংখ্য শ্রেণী উপশ্রেনীব সারি দিয়ে সাজানো যায়। তাই অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে প্রসাদ পদাবলীকে এই ভাবে বিভক্ত করা যায়। — ক. উমা-বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), খ. সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), গ. দেবীর স্বরূপ বিষয়ক, ঘ. তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক এবং ঙ. কবিব ব্যক্তিগত অনুভূতি বিষয়ক। এই প্রত্যেকটি শাখার উদ্ভব তাঁর হাতে, এবং তিনি এর প্রতিটিতেই অবিসংবদী শ্রেষ্ঠত্বের আধিকারী। যেমন কবির ব্যক্তিক অনুভূতির প্রগাঢ়তা ধরা পড়েছে নিম্নোক্ত পদে —

সময় তো থাকবে না গো মা কেবল কথা রবে।
কথা রবে কথা রবে মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।।[৫৪]

।। কবিগান ।।

'কবি' শব্দের সঙ্গে বৃত্তিবাচক 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগ করে 'কবিওয়ালা' শব্দের উৎপত্তি। যাঁরা কবিতাকে জীবিকার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, তাঁরাই কবিওয়ালা। জনতার আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সুর-ছন্দ যোগে কবিতা রচনা করে গানের মাধ্যমে পরিবেশন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এই কবিগণ জনতাকে তুষ্ট কবতেন, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে উপার্জন করতেন অর্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এ এক অভিনব কাব্যানুশীলন। অতীতে গায়েন পূজার মণ্ডপে অথবা সামাজিক উৎসবে অন্য কবির কাব্য গান করে শোনাতেন। আর কবিগানে কবি স্বয়ং রচনার ও গীত-পরিবেশনের দ্বিবিধ কর্মই তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করতেন। এমন পেশাজীবী কবির রচনার মান উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অবশ্য কবিগানের উদ্ভবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রিটিশ কোম্পানীর নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা ও মুদ্রানির্ভর বাণিজ্যনীতির আকস্মিক প্রয়োগে পুরোনো গ্রামীণ পণ্যবিনিময় ব্যবস্থা ও সামন্ত রাজনীতি দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। এর জন্য গণমানুষের যে মানসিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তা তারা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে নষ্ট হল সামন্তব্যবস্থার স্থিতি ও স্বস্তি। কিন্তু নতুন কোনো স্পষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো তখনও পরিকল্পিত হয়নি। অর্থাৎ পুরাতন তখন অপসৃয়মান এবং নূতন অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। পুরাতন ও নবীনের এই সন্ধিক্ষণে মানুষের দ্বিধা-দোলায়িত অবস্থানের, চিন্তা-চেতনার এবং কর্ম-আচরণের প্রতিনিধিত্ব করেছে কবিওয়ালারা। ইংরেজ-সৃষ্ট কলকাতা নগরীতে জমায়েত হওয়া বিত্তবান অথচ কৌলিন্য-বর্জিত সদাগর-ঠিকেদার-বেণে-ফড়ে-দালাল-দেওয়ানদের প্রতিপত্তি তখন আকাশচুম্বী। এঁদেরই প্রতিপোষণ বাঞ্ছায় এবং মনোতুষ্টি

সাধনের উদ্দেশ্যে এঁদের আশ্রয়প্রার্থীরা কলকাতায় এসে ভিড় জমাল। মান-যশকামী নতুন কর্তারা সাহিত্যরসিক হয়ে উঠলেন ঠিকই, কিন্তু ঐতিহ্যের অভাবে রসোপভোগের চালু কয়দা তাঁদের জানা ছিল না। কিংবা জানা থাকলেও স্থানভেদে ও শহুরে জীবনযাত্রার পদ্ধতিভেদে সম্ভব হয়নি পুরোনো রাগ-তাল-মান চালু রাখা। কাজেই কালান্তরের গোধূলি লগ্নে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠবাসী গাইয়ে-বাজিয়েরা হাঁটাপথে জীবিকা সন্ধান করতে কলকাতায় এসে ধনীরসিকের পার্বণিক ও মৌসুমী রসপিপাসা চরিতার্থ করার কাজে লেগে গেল। জন্ম নিল কবিগান। স্বভাবতই এসব রচনায় চিন্তন ও মননের সূক্ষ্ম কারুকার্য অনুপস্থিত। বরং বাঙালীর দুর্দিনের দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য প্রমাণবহুল ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেই এগুলো মূল্যবান।

জনতা কবিগানের পৃষ্ঠপোষক এবং রস-আনন্দভোগী। এতে লিখিত সাহিত্যের সৃজনশীলতা ও শিল্পসুষমা থাকতে পারেনা। কথার চটক আর অলঙ্কারের চাতুর্য দ্বারা গানকে মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিসুখকর করে তোলার দিকেই কবিগণ জোর দিতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

'ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিলনা, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। ...... তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।'[৫৫]

কবিগানের বিষয়বস্তু ধর্ম ও শাস্ত্র সম্পৃক্ত।। হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্বকথা, জীবনকথা এবং লীলরস বিতর্ক- প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শোনানো ও প্রচার করাই ছিল তার লক্ষ্য। কাজেই এতেও সুপ্ত রয়েছে লোকগীতির মাধ্যমে লোকশিক্ষাদানের বাঞ্ছা। তবে স্বল্প-শিক্ষিত রুচিহীন লোকের মনোরঞ্জন মানসে নিম্নরুচির কবিওয়ালা রচিত এসব গান বা কথা ব্যজস্তুতি হয়ে উঠেছে প্রায় তাঁদের অজ্ঞাতেই। প্রতিপক্ষকে জব্দ করাই যেখানে বিতর্কের আপাতলক্ষ্য ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সেখানে স্বল্পযুক্তি অঢেল কুকথাযুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কথার তোড়ে রসের তরঙ্গে রঙ চড়ানোর তাগিদে দেবকথাও ক্রমে ইতর রঙ্গরসকথার রূপ নিয়েছে।

অবশ্য কোনো কোনো কবিওয়ালা প্রতিভাধর ছিলেন সন্দেহ নেই। ফলে যুগ, পরিবেশ ও শ্রোতার চাহিদা বদলে যাওয়ায় দেবলীলা-কাহিনীকে আধ্যাত্মিকতার মোড়ক মুক্ত করলেও এঁরা প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অনেক গানে। নরনারীর বাস্তব প্রেম ও মাতা-কন্যার বাৎসল্যকে অবলম্বন করে রচিত বেশ কিছু সঙ্গীত কাব্যরসোত্তীর্ণ হয়েছে।

কবিগান বিভিন্ন শ্রেণীর। 'দাঁড়া কবি' বা 'কবির লড়াই' একটি জনপ্রিয় শাখা। আসরে দুজন কবি 'চাপান উতোর' ভঙ্গিতে গান গেয়ে পরস্পরকে আক্রমণ- প্রতিআক্রমণ করেন। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত ছিল কবিগানের প্রধান অঙ্গ এবং এই অর্থে তা পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অভিনব শাখা। কিন্তু কবিগানের ভাবে-ভাষায়-রসে পূর্ববর্তী সাহিত্যের গুণপনা বজায় থাকেনি। বিষয় ও আঙ্গিক প্রথাগত ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। কবিগানের উত্তর- প্রত্যুত্তর যখন চরমে ওঠে, তখন সে অংশের নাম হয় 'খেউড়'। 'খেউড়' এর অশ্লীলতা প্রশ্নাতীত।

ছড়ার মাধ্যমে দু'জন কবির যে লড়াই হয় তাকে 'তর্জা' বলে। আরবি 'তরজি' থেকে 'তর্জা' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ প্রত্যুত্তর। যে গানের প্রতিপক্ষ আছে এবং জয়-পরাজয় আছে, তাতে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন বেশী হয়। তর্জাতে শ্লীল-অশ্লীলের বালাই ছিল না।

রামনিধি গুপ্ত টপ্পা গানের প্রবর্তক। হিন্দি টপ্পা শব্দের অর্থ 'লম্ফ', রূঢ়ার্থ সংক্ষিপ্ত। খেয়াল গানের সংক্ষিপ্ত রূপ টপ্পা অস্থায়ী ও অন্তরা - এই দুই 'তুক' নিয়ে গঠিত। সুশীলকুমার দে বলেন, 'আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। .... ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।'

আখড়াই, হাফ-আখড়াই কবিগানের আর একটি শাখা। এর পরিচয় দিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন ঃ

'কবিগানকে পাঁচালী কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়ে নূতন করে ঢালাই করে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ উদ্ভাবন করলেন আখড়াইয়ের। তিনটি মাত্র গানে তা সাধিত ঃ প্রথম 'মালসী', তারপর 'প্রণয়গীতি', শেষ'প্রভাতী'। এই আখড়াই রীতিমত কালোয়াতি ব্যাপার, নানাবিধ যন্ত্র যোগে তা গীত হত। কাজেই তা আরও ছেঁটে কেটে সরল কবে তৈরী হল লঘু পাকের হাফ-আখড়াই।'[৫৬]

শ্রোতার ইন্দ্রিয় উত্তেজনাকর এসব গানের সাময়িক ও ব্যবসায়িক মূল্য ছিল, স্থায়ী শৈল্পিক মূল্য ছিল না। নগর কলকাতার সাংস্কৃতিক রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতরজন তুষ্টকারী এসব সঙ্গীত ও কাব্যচর্চা তিরোহিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালারা হলেন যথাক্রমে —

ক) গোঁজলা গুঁই। ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'এ (১ অগ্রহায়ণ, ১২৬১) সর্বপ্রথম গোঁজলা গুঁইয়ের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গোঁজলা গুঁইই কবিগানের আদিগুরু। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি কবি সঙ্গীতের সূত্রপাত করেন।

খ) রঘুনাথ দাস। গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য। ফরাসডাঙার বাসিন্দা এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাকালেই কবিগান রচনা করতেন বলে অনুমিত হয়।

গ) লালু নন্দলাল।গোঁজলা গুঁইয়ের অপর শিষ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য থেকে শেষার্ধে তিনি কবিগান রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ঘ) রামজী দাস। ইনিও গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য ছিলেন। তবে রামজী দাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না।

ঙ) ভবানী বণিক। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনা নিবাসী ভবানী বণিক কলিকাতার বরানগরে এসে কবিগায়ক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইনি রামজী দাসের শিষ্য ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই কবি তাঁর বেশ কিছু গানে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

চ) রাসু-নৃসিংহ ভ্রাতৃদ্বয়। হাওড়া গোন্দল পাড়ার এই দুই সহোদর কবিওয়ালা হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের দুজনের জীবৎকাল যথাক্রমে ১৭৩৪-১৮০৫, এবং ১৭৩৮-১৮০২। সখীসংবাদ ও বিরহ-পর্যায়ের গান বচনায় এঁরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।

ছ) হরু ঠাকুর। ১৭৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সিমলা অঞ্চলে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া চলে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। কবির দল গঠন করে সাধারণ সমাজে তিনি হরু ঠাকুর নামে পরিচিত হন। এই সখের কবির দল কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি এলাকাকেও এক সময় মাতিয়ে দিযেছিল। পরবর্তীকালের অনেক প্রসিদ্ধ কবিগায়কই তাঁর দলে প্রথমে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। ভবানীবিষয়, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর - এই প্রত্যেকটি শাখাতেই তাঁর নৈপুণ্য অনস্বীকার্য ছিল।

জ) কেষ্টা মুচি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই কবি বাঁধনদার ও কবিগায়ক - উভয় ক্ষেত্রেই সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন। সে যুগের অভিজাত এলাকায় তাঁর গানের খুব কদর ছিল। প্রাপ্ত মাত্র একটি সখীসংবাদের খণ্ডিত গানে তাঁব স্নিগ্ধ ও লালিত্যপূর্ণ ভাব এবং ভাষাশৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ঝ) নিতাই দাস বৈরাগী। চন্দন নগরের এক বৈষ্ণব পরিবারে ১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা কুঞ্জদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আজীবন বৈষ্ণব ঐতিহ্যে লালিত এই কবি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সখীসংবাদ এবং মাথুরের গান রচনায় অসামান্য পারদর্শী ছিলেন।

।। জঙ্গনামা ।।

ইসলামী বাংলা সাহিত্যের ধারায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট অবদান 'জঙ্গনামা' বা যুদ্ধকাহিনী। এই জাতীয় গ্রন্থে ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের যুদ্ধকাহিনীর প্রসঙ্গ আছে। এগুলি বিষয়গত কারণেই নয়, ভাষাভঙ্গির দিক দিয়েও অভিনব। ভাষাবৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে জেমস লঙ একে 'মুসলমানী বাংলা' বলে এবং সুকুমার সেন ও আনিসুজ্জামান যথাক্রমে 'এছলামী বাঙ্গালা' ও ' মিশ্রভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য সাহিত্য দরবারে 'দোভাষী পুথি' অভিধাটিই গূঢ়ার্থ লাভ করেছে। পুথির ভাষা সম্পূর্ণ কৃত্রিম, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এর উদ্ভব। শুধু আরবি-ফার্সি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণে নয়, পদবিন্যাস ও বাক্যগঠনেও ঐসব ভাষারীতির প্রভাব পড়েছে। এমন কি উর্দু-ফার্সির নিয়মে গ্রন্থের সূচনা হয়েছে ডানদিক থেকে। ইসলামী রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, সত্যনাবায়ণ পুথি, পীর-পাঁচালী, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং আলোচ্য 'জঙ্গ নামা' কাব্যসমূহ' এই দোভাষী পুথির দৃষ্টান্ত বহন করছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জঙ্গনামা রচয়িতারা হলেন —

ক) হেয়াত মামুদ। রঙ্গপুর জেলার ঝাড়বিশিলা গ্রামের এই কবি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে জঙ্গনামা রচনা করেন। কারবালার কাহিনী নিয়ে রচিত জঙ্গনামা করুণরসের কাব্য।

খ) শাহ গবীবুল্লাহ। বালিয়া হাফেজপুরের এই কবি রোমান্স মিশ্রিত যুদ্ধকেন্দ্রিক দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১) 'আমীর হামজা' (১ম অংশ) - ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ।

ইরানের শাহ নওশেরওয়ানের সঙ্গে খলিফা ওসমানের যুদ্ধ এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে অজস্র উপকাহিনী আছে। অলৌকিক ও কাল্পনিক ঘটনাও অছে। এটি মূলত বীররসের কাব্য।

২) 'সোনাভান' - ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ। যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম।

গ) সৈয়দ হামজা। ভূরশুট পরগণার অদুনা গ্রামের এই কবি দুটি যুদ্ধ কাহিনীর রচয়িতা।

১) 'আমীর হামজা' (২য় অংশ)। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। গবীবুল্লাহর 'আমীর হামজা' কাব্যের শেষাংশ এটি।

২) 'জৈগুনের পুথি' (জৈগুন-হানিফার কেচ্ছা)। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যজয় করে সম্পদ ও রমনীলাভের সরলরৈখিক কাহিনী এরও আলোচ্য।

।। বাউল গান ।।

বাউল গান হল তত্ত্বাশ্রয়ী মরমিয়া সাহিত্য। তত্ত্ব নির্ভর মরমিয়া সাধনায় যোগাভ্যাস এবং সূফীসাধনার দেহতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। বঙ্গভূমিতে পাল আমলে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের একটি শাখা মধ্যযুগে সূফী প্রভাবে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতরূপে প্রকাশ লাভ করেছিল।

বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে বাউল মতের উদ্ভব। ইরানের সূফীমত এবং প্রাচীন ভারতের বেদান্ততত্ত্ব বাংলার মাটিতে বাউলবাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাউল সম্প্রদায়ে জাতি ও শ্রেণীবৈষম্য নেই। হিন্দু মুসলিমে ভেদ নেই। পরমত সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এঁদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বাউল ধর্মে বৈরাগ্য নেই। এঁরা মুখ্যত তাত্ত্বিক, গৌণত প্রেমিক। এই তাত্ত্বিকতা থেকেই আসে বিষয়ে অনাসক্তি। তাই বাউল দুই প্রকার ঃ গৃহী (বিষয়ী গৃহী) এবং বৈরাগী (অনাসক্ত গৃহী)। বাউল বৈরাগীরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। বাউলমত বাংলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালীর মানস ফসল। ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসে বাউলেরা সাধনা করে 'পরমাত্মা'র বা দেহাধারস্থিত আত্মার, কারণ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলেই পরমাত্মাকে জানা হয়। এই পরমাত্মাই বাউল বচনে 'মনের মানুষ', সহজ মানুষ' 'মানুষ রতন', 'অচিন পাখী' বা 'অলখ সাঁই'। বস্তুত বাউল গুরুগণ একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা এবং মরমী। তাঁদের গান লোকসাহিত্য মাত্র নয় বাঙালীর প্রাণের কথা, মনীষার কথা, সংস্কৃতির স্বাক্ষর। চর্যাপদ, দোহা প্রভৃতি সব মরমী রচনার মত বাউলগানও রূপকের আবরণে আচ্ছাদিত। সে রূপক দেহাধার, বাহ্যবস্তু ও ব্যবহারিক জীবনের নানা কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টা থেকে সংগৃহীত।

রাধা, কৃষ্ণ নামের ভিত্তিতে রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার চৈতন্যদেবকে বাউলমতের উদ্ভাবকরূপে অনেকে প্রচার করেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র একাধিক স্থানে 'বাউল' শব্দের ব্যবহারও লক্ষিত হয়। আবার অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুর থেকে পুরীধামে চৈতন্যদেবকে যে আর্যা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি মহাপ্রভুকে 'বাউল' আখ্যা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তা 'ঈশ্বর প্রেমে ব্যাকুল' — এই ব্যঞ্জনার অতিরিক্ত কোনো তাত্ত্বিক অর্থ বহন করেনি। বাউল মতের উদ্ভাবন ও বিকাশ প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যোত্তর কালে।

মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ। মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাঁদই এই মতের প্রবর্তক বলে বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র বাউলমতকে জনপ্রিয় করেন। কিন্তু বাউলগানের উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। লালন গুরু সিরাজ সাঁই প্রথম বাউল গানের

রচয়িতা। সিরাজ সাঁই সম্ভবত যশোর জেলার কুলবাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পাল্কিবহন করে ইনি জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানা যায়। তাঁর জন্মসন নিয়েও মতবিরোধ আছে। মোটামুটিভাবে মনে হয় ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিরোহিত হন।

সিরাজ সাঁই আমিনুদ্দী নেড়া বা আমানত উল্লাহ শাহের কাছ থেকে বাউল ফকীরী মতে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন দরবেশী নেড়ামতের ফকির। সাধনায় তাঁর বিলক্ষণ উন্নতির কথা জানা যায়। কিশোর লালনকে তিনি পুত্ররূপে পালন করেছিলেন। তাঁর রচিত একটি মাত্র গানের সন্ধান পাওয়া গেছে। গানটি এই --

আঠারো মোকামের খবর
বুঝে লও তাই হিসাব করে।
আছে আউয়ল মোকাম
রাগের তালা
পাঁচ পাঞ্জাতন সেই ঘরে।।......ইত্যাদি"

।। গীতিকা সাহিত্য ।।

দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্‌যোগ ও নির্দেশে চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক মৈমনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে (বিশেষ করে ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) যে পালাগানগুলি আবিস্কৃত হয়েছে, সেগুলিই 'গীতিকা সাহিত্য' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ১৯৩২ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রথমে প্রতি খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ ও ভূমিকা প্রকাশিত হয়েছে, তারপর বাংলা পালাগান ভূমিকাসহ আত্মপ্রকাশ করেছে।

চারখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ইংরাজিতে Eastern Bengal Ballads - Mymensingh (Vol.I, Part-I, 1923) নামে প্রকাশিত হয়। এর বাংলা সংস্করণ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয় (১৯২৩)। ইংরাজী খণ্ডে দীনেশচন্দ্র মূল পালার গদ্যানুবাদ সংযুক্ত করেছিলেন, বাংলা খণ্ডে মূল পালা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম খণ্ডে মোট দশটি পালা মুদ্রিত হয়েছে— ১) মহুয়া, ২) মলুয়া ৩) চন্দ্রাবতী, ৪) কমলা, ৫) দেওয়ান ভাবনা, ৬) দস্যু কেনারামের পালা, ৭) রূপবতী, ৮) কঙ্ক ও লীলা, ৯) কাজলরেখা এবং ১০) দেওয়ান মদিনা।

পূর্ববঙ্গগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট চোদ্দটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। ১) ধোপার পাট ২) মইষালবন্ধু, ৩) কাঞ্চনমালা, ৪) শান্তি, ৫) নীলা, ৬) ভেলুয়া, ৭) কমলাবাণীর গান, ৮) মাণিকতারা ডাকাইতের পালা, ৯) মদনকুমার ও মধুমালা, ১০) সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, ১১) নেজাম ডাকাইতের পালা, ১২) দেওযান ইশা খাঁ মসনদ আলি, ১৩) সুরৎজামাল ও অধুয়া এবং ১৪) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।

পূর্ববঙ্গগীতিকাব তৃতীয় খণ্ডে মোট এগারটি পালা সন্নিবেশিত হয়েছে। ১) মাঞ্জুর মা, ২) কাফেন চোবা, ৩) ভেলুয়া, ৪) হাতীখেদা, ৫) আযনাবিবি, ৬) কমল সদাগর, ৭) শ্যাম রায়, ৮) চৌধুরীর লড়াই, ৯) গোপিনী কীর্তন, ১০) সুজাতনয়ার বিলাপ এবং ১১) বারতীর্থের গান।

পূর্ববঙ্গগীতিকাব চতুর্থ খণ্ডে মোট উনিশটি পালা সংগ্রহীত হয়েছে। — ১) নছর মালুম, ২) শীলাদেবী, ৩) রাজা রঘুর পালা, ৪) নুরন্নেহা ও কবরের কথা, ৫) মুকুট রায়, ৬) ভারাইয়া বাজার কাহিনী, ৭) আন্ধাবন্ধু, ৮) বগুলার বারমাসী, ৯) চন্দ্রাবতীর বামায়ণ, ১০) সন্নমালা, ১১) বীরনারায়ণের পালা, ১২) রতন ঠাকুরের পালা, ১৩) পীরবাতাসী, ১৪) রাজা তিলকবসন্ত, ১৫) মলযার বাবমাসী, ১৬) জিরালনী, ১৭) পরীবানুর হাঁহলা, ১৮) সোনাবায়ের জন্ম, এবং ১৯) সোনাবিবির পালা।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই পালাগুলিকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। ত্যাগ-তিতিক্ষা আব শাশ্বত প্রেমে পরিপূর্ণ লৌকিক প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক রোমাণ্টিক আখ্যান এবং ঐতিহাসিক আখ্যান। তবে প্রথম শ্রেণীর রচনাই গীতিকা সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ। মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ান মদিনা, ধোপার পাট, কাঞ্চনমালা প্রভৃতির আবেদনই পাঠককে সবথেকে বেশী করে টানে।

কাম ও প্রেম — এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তিই শাস্ত্র ও সমাজ বিরোধী ব্যাপার। বিশেষ করে মধ্যযুগের ধর্মীয় আবহের মধ্যে তো বটেই। কিন্তু অন্ত্য-মধ্যযুগে বসে গীতিকা রচয়িতারা এরই চর্চা করেছিলেন। প্রচলিত শাস্ত্র, সমাজ-নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও তদানীন্তন রেওয়াজ বহির্ভূত জীবন জিজ্ঞাসা ও প্রাণধর্মপ্রসূত হয়ে এই সাহিত্য শুধুমাত্র হৃদয়বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। বস্তুত আমাদের লোকমানসেব ও লোকসমাজের অতুল্য সৃষ্টি এই গীতিকাগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানী সাহিত্য চর্চার মূলেও ছিল এমনই কোনো ধর্ম বিবিক্ত মানবিক প্রণয়ানুভূতি। কিন্তু ভাবতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রেব সেই স্থির নির্দেশকে তা অমান্য করতে পারেনি। নির্দেশটি কাহিনীব পরিণতি সম্পর্কিত। অর্থাৎ সাহিত্যের উপসংহারে থাকবে মিলনান্তক অনুভূতি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে ট্র্যাজেডি সংবেদী এবং শুধু বেদনাই পারে সাহিত্য পাঠে আতৃপ্তির অনুভূতি জাগিয়ে রাখতে, শেষ হয়েও অশেষের অসীমতায়

নিজেকে ছড়িয়ে দিতে বাংলা সাহিত্যের গীতিকা রচয়িতাবা প্রথম তার প্রমাণ দিলেন। ফলে, এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক ট্র্যাজেডির আস্বাদ পাওয়া গেল।

।। ছড়া ।।

লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছড়া সমকালধর্মী। ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলেই তা গণ্য হয়ে থাকে। ফলে এগুলোতে মূল বচয়িতার নাম নিশানা হারিয়ে যায় সহজেই। অবশ্য এগুলো মৌখিক ছড়া। অন্যদিকে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে রচিত লিখিত ছড়ার ঐতিহ্য মৌখিক ছড়ার মত সুপ্রাচীন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই লিখিত ছড়াব জন্ম। এই শতাব্দীর রাষ্ট্র-সংকট, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী শক্তির আক্রমণ, বিপন্ন সামাজিক প্রতিবেশ, আর্থ-রাজনীতিক বিপর্যয় সাধারণ মানুষকে যুগ-সচেতন করে তুলেছিল। লিখিত ছড়ায় সেই ইতিহাসকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন বঙ্গভূমির বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন। অবশ্যই সাহিত্যিক গুণপনার ছায়া এতে পাওয়া যায় না! পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এই সব ছড়ার উল্লেখ অছে। দু'একটি ক্ষেত্রে রচয়িতার নামও পাওয়া যায়। যেমন রমানাথ রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশৃঙ্খল রাজকীয় উত্থান পতনের প্রেক্ষাপটে সর্বসাধারণের মনে সংহতি শক্তি বিষয়ে যে অবোধপূর্ব অনুভবের সঞ্চার হচ্ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর এই ছড়াটি উপস্থিত করা যায় —

দশে যেই কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম হয়।
দশের আদেশ বুদ্ধি একা কোন ছায়
দশে পতিত করে দশে করে পার।
দশের মহিমা ভাই কে কহিতে জানে
সেই বড় ভাগ্যমান দশে যারে মানে।
দশ যেই পথে চলে সেই পথ সোজা
দশের লাঠি হইলে হয় এক জনার বোঝা।[৫৮]

এই ছড়ারই শেষে রমানাথ রায়ের ভণিতা আছে —

ভণে রমানাথ রায় ভাব্যা দশের পায়
দশ জগতে বড় দশের বড় নাই।।[৫৯]

ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বিচার-ব্যবস্থার সরল ব্যঙ্গ-চিত্র চিত্রিত হয়েছে আর একজন ব্যক্তির ছড়ায়। ইনি উত্তর বঙ্গের কবি, পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ মৈত্রেয়।

।। মহারাষ্ট্রপুরাণ ।।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যকাব্য 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'। যশোর জেলার নড়াইল গ্রাম নিবাসী গঙ্গরাম দত্ত ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেছেন। কাব্যের বিষয় মারাঠা-বর্গীর বঙ্গদেশ আক্রমণ ও বর্গীনেতা ভাস্করের পরাভব। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৪ পর্যন্ত পরপর তিনবার এই লুণ্ঠন ও শোষণ চলেছিল। বর্গীহানা ঠেকাতে নবাব আলিবর্দীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত ভাস্কর পণ্ডিতের নিধন ঘটানো সম্ভব হয়।

কবি গঙ্গারাম 'পুরাণ' নামটি ব্যবহার করেছেন মধ্যযুগের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে। কাব্যের সূচনাও হয়েছে পুরাণের রীতিতে। পুরাণের প্রারম্ভে যেমন পাই অসুরের অত্যাচারে পৃথিবী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুকে অবতীর্ণ করানোর জন্য অনুরোধ করেন, গঙ্গারামও সেই ভাবে তাঁর গাথা আরম্ভ করেছেন। তবে তিনি বিষ্ণু অথবা শিবকে অবতীর্ণ করাননি। সাহুরাজার দূতের দ্বারা সেই কাজ করিয়েছেন। সে দূত ভাস্কর। অবশ্য পুরাণ অনুমত করে কাব্যের সূত্রপাত হলেও অচিরেই কবি মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন। অনতিরঞ্জিতভাবে সাক্ষাৎ দৃষ্ট ঘটনাবলীকে পরিবেশন করে ঐতিহাসিক কাব্য রচনার ভিত্তি প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

।। তীর্থমঙ্গল ।।

'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-কে যেমন প্রথম ঐতিহাসিক কাব্যের অভিধা দেওয়া যায়, 'তীর্থমঙ্গল'-কে তেমন বলা যায় বাঙালী রচিত প্রথম বাংলা ভ্রমণকাহিনী। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ সালে বহু লোকজন নিয়ে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেছিলেন। ইছামতী নদীতীরবর্তী ভাজনঘাট-নিবাসী বৈদ্য বিজয়রাম সেন বিশারদ এই দলে ছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে এই তীর্থযাত্রার বিবরণ নিয়ে 'তীর্থমঙ্গল' রচনা করেন। রচনা সম্পূর্ণ হয় ১১৭৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭০ সালে। গঙ্গার দুই তীরের বর্ণনায় সমৃদ্ধ হওয়ায় তীর্থমঙ্গলের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এছাড়া তৎকালীন সামাজিক অবস্থার আভাসও কিছু কিছু পাওয়া যায় এখানে।

সুতরাং দেখা গেল, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা পুরাতনের অনুচিকীর্ষা যেমন করেছেন, তেমনি নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও লাভ করেছেন। সমকালীন যুগের প্রতি বিশ্বস্ততায় তাঁরা ধীরে ধীরে দেবতার বদলে আত্মচৈতন্যে আস্থাশীল হয়েছেন। সমাজের অবক্ষয়, ধ্বংস আর পঙ্গুত্বকে শিল্পের মোড়কে উপস্থিত করেছেন পাঠকের সামনে। ব্যক্তির আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে সৃজনশীল সাহিত্যের উৎসমুখ নির্বারিত হয়েছে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নতুনত্ব না এলেও জীবন দৃষ্টির অভিনবত্বে বেশ কিছু ভিন্নধর্মী সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। শতাব্দীব্যাপী এই সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে মন্থর পদক্ষেপে পরবর্তী শতাব্দীর উপযোগী হয়ে বাংলা সাহিত্যে ক্রমিকধারাবাহিকতায় এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, মানব-মহিমা উপলব্ধি এবং সাম্যবাদ।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১) মোহিনী মোহন মৈত্রেয়, কবি জীবন মৈত্র, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃঃ ১৮৪।
২) তদেব।
৩) তদেব, পৃঃ ২০২।
৪) সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ১৯৯৩, পৃঃ ২৫২।
৫) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ১৯১৪, পৃঃ ৩৭২।
৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৮, পৃঃ ৫৭৮।
৭) প্রণব রায়, অকিঞ্চণ চক্রবর্তী, মঙ্গলকাব্যের এক বিস্মৃত কবি, আকাদেমি পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা,১৯৯০, পৃঃ৯৬।
৮) অনিলবরণ গাঙ্গুলী সম্পাদিত রামানন্দ ঘোষের চণ্ডীমঙ্গল, ১৯৬৯, পৃঃ ১০০।
৯) তদেব, পৃঃ ১৪৪।
১০) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ১৫২।
১১) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃঃ ৬৮৬।
১২) বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃঃ ৪৩৯।
১৩) মানিকরাম গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাদশ সংখ্যা, ১৩১২, পৃঃ ৭।
১৪) তদেব, পৃঃ ৮।
১৫) তদেব, পৃঃ ১০।
১৬) তদেব, পৃঃ ৯।
১৭) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃঃ ৫০৭।
১৮) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী ১৪০০, পৃঃ ৪৯৭।
১৯) তদেব, পৃঃ
২০) তদেব, পৃঃ ৩৯৭।
২১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃঃ ১৫।
২২) তদেব, পৃঃ ১৫।
২৩) তদেব, পৃঃ ৩২১।
২৪) তদেব।
২৫) তদেব, পৃঃ ৩৩৯।
২৬) তদেব, পৃঃ ১৮০।
২৭) তদেব, পৃঃ ১৮২।
২৮) তদেব, পৃঃ ৩২৫।
২৯) তদেব, পৃঃ ৩৭৯।

৩০) তদেব, পৃঃ ১২৭।
৩১) তদেব, পৃঃ ৩৪৭।
৩২) তদেব, পৃঃ ১৪৭।
৩৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ৪৩৯।
৩৪) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১৩১৯, পৃঃ ২৩৭।
৩৫) তদেব, পৃঃ ২৩৮।
৩৬) তদেব।
৩৭) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ৪৪২-৪৪৩।
৩৮) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ১৩১৯, পৃঃ ২৩২।
৩৯) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ৩৬৩।
৪০) চিত্রা দেব সম্পাদিত শঙ্কর কবিচন্দ্রের মহাভারত, ১৩৮৯, পৃঃ ৬।
৪১) তদেব, পৃঃ ২৭৬।
৪২) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয়খণ্ড, ১৯৯২, পৃঃ ৩১৪।
৪৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ৩৪৫।
৪৪) সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৮, পৃঃ ৪৮৬।
৪৫) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, ১৯৮৪, পৃঃ ৪।
৪৬) তদেব, পৃঃ ২৫।
৪৭) তদেব, পৃঃ ৯৩।
৪৮) তদেব, পৃঃ ৯৬।
৪৯) তদেব, পৃঃ ৩০৯।
৫০) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃঃ ১২৯।
৫১) তদেব, পৃঃ ১৩০।
৫২) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, ১৯৮৪, পৃঃ ২৮৯।
৫৩) তদেব, পৃঃ ৭০।
৫৩) (ক) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৮১, পৃঃ ৩২৯।
৫৩) (খ) তদেব।
৫৪) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃঃ ৩৫৪।
৫৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৯।
৫৬) গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ২৩৮।
৫৭) ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন জিজ্ঞাসা, ১৩৯১, পৃঃ ৭-৮।
৫৮) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬।
৫৯) তদেব, পৃঃ ৪৬৩।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন

অ্যারিস্টটলের মতে, মানুষ রাজনৈতিক প্রাণী — Zoon politicon, political animal। কথাটা সর্বাংশে না হলেও আংশিক সত্য — অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ ভূমি ও বঙ্গবাসী সম্পর্কে। আসলে মানুষ রাজনৈতিক প্রাণী হয়ে ওঠে সমকালের জটিল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তাল মেলাতে। আর সেদিক থেকে এই শতাব্দীর জুড়ি নেই। প্রথম অধ্যায়েই দেখেছি বিচিত্র, গোলযোগপূর্ণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, তথা শাসকশক্তির উত্থান-পতনে ভারাক্রান্ত এই সময়পর্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অভিজাত থেকে অতিসাধারণ - কেউই পারেনি সমকালের বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। দুর্বার রাজনৈতিক স্রোতের টানে নিজের অজান্তেই হয়ত ভেসে গেছে, তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতালোভীর রাজনৈতিক চালে। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জের স্রষ্টা নয়, বরং শিকার। কারণ প্রকৃতই 'রাজনৈতিক প্রাণী' হতে গেলে যতখানি সচেতনতা প্রয়োজন, তা এই শতাব্দীর মানুষের ছিল না। আর ছিল না মূলত শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ কিংবা অন্ধ সংস্কারমুক্তির অভাবে।

ফলে, এই শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যকর্মও দুর্বল, গতানুগতিক ধর্মাচ্ছন্ন। জীবনের ভাঙন আর ক্ষয় রোধের শক্তি তাদের নেই। তবুও শুক্তিতে কখনও কখনও মুক্তো মেলে। সেটুকুই আশা, যুগান্তরে পদার্পণের বিশ্বস্ত রসদ। সমকালীন বাংলাসাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজন স্রষ্টার কাছ থেকে এটুকু আশ্বাস আমরা পেয়েছি। যুগদর্পণের কাজ করেছে এই সব সাহিত্য। ধর্মকেন্দ্রিক হলেও বাস্তবকে অস্বীকার করেনি। আর এদের মধ্য দিয়েই তৎকালের রাজনৈতিক ছবি শতাব্দী পরম্পরায় জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এমন একজন প্রতিভাবান কবি হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য)। তাঁর 'শিবায়ন' ও 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'তে আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে কবি সমকালের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পরোক্ষে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার, ঘাটাল থানার বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রাম রামেশ্বরের জন্মভূমি —

.... বলে দ্বিজরাম।
সাকিম বরদাবাটি যদুপুর গ্রাম।।[১]

বিস্তৃত বংশপরিচয় তিনি গ্রন্থমধ্যে দিয়েছেন।[২] কিন্তু যৌবনে রামেশ্বর জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত হয়েছিলেন সামন্তের অত্যাচারে। কর্ণগড়ে বসে 'শিবসংকীর্তন' রচনার সময় যদুপুরের স্মৃতিতর্পণ করেছেন তিনি চোখের জলে —

পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।।[৮]

শিবায়নের রচনাকাল ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় বঙ্গভূমির সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্য, কর্মতৎপরতা ও শাসননৈপুণ্যের বিষয়টি প্রথম অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এও ঠিক যে, রাজস্ব আদায়কে কেন্দ্র করে জমিদারদের সঙ্গে তিনি বেশ নৃশংস ব্যবহারই করতেন। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'নবাব-সাহেব তার উপর আবার ভবিষ্যতের জন্যে উঠে-পড়ে টাকা জমাতে লেগে গেছেন। বাদশা বুড়ো হয়েছেন। কবে আছেন কবে নেই। তিনি গেলে সে-টাকা খুবই কাজে আসবে।

একদিকে নবাব আজীমউশ্বান, আর একদিকে দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁ। এই দু'জনের মধ্যে পড়ে শুধু ইংরেজরা কেন, এ-দেশের বড় বড় জমিদাররা পর্যন্ত সবাই একেবারে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। খাজনার টাকা জমা দিতে একটু দেরি হলেই মুর্শিদকুলী খাঁর চেলাচামুণ্ডারা জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার লাগিয়ে দিতেন। তাতেও টাকা আদায় না হলে তাঁদের সপরিবারে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হত।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ এমনি বেড়ে চলল যে তার হেপায় প'ড়ে অনেক পুরনো বনেদী জমিদার-ঘর একে একে উচ্ছেদ হয়ে গেল। তার জায়গায় নতুন নতুন হঠাৎ নবাব জমিদাররা মাথা গজিয়ে উঠল।'[৯]

স্বভাবতই নবাবের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ক্ষুব্ধ জমিদারের দল স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে থাকেন, আর বিপদে পড়ে সাধারণ মানুষ।

অবশ্য কবি রামেশ্বর তাঁর যদুপুর ত্যাগের প্রকৃত কারণটি লোক চক্ষুর আড়ালেই রেখেছিলেন। ফলত, কিংবদন্তীর সংখ্যাধিক্য ঘটেছে।[১০] কারণটা যাইহোক কবির যদুপুর ত্যাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই তুলে ধরেছে।

তবে লোকপালক ভূস্বামীও ছিলেন। কর্ণরাজগড়ের স্তুতিতে তার সাক্ষ্য মেলে। হেমৎসিংহের অত্যাচারে কবি যখন ছিন্নমূল, তখন কর্ণরাজগড়ের অধিপতি রামসিংহ তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দেন এবং রাজসভার পুরাণপাঠক নিযুক্ত করে কেশপুর থানার অযোধ্যানগর গ্রামে তাঁর বাসগৃহ নির্মাণ করিয়ে দেন।[১১]

এই রামসিংহের পুত্র যশোমন্ত সিংহ কবির অকৃত্রিম সুহৃদ ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১১১৮ বঙ্গাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনাসীন যশোমন্ত রামেশ্বরকে পুরাণ পাঠক

থেকে সভাকবির আসনে উন্নীত করে দেন। রচিত হয় 'শিবসংকীর্তন'।

যশোমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।
যে রাজসভায় হৈল সংগীত প্রকাশ।।[৭]

আসলে হেমৎ সিংহের উৎপীড়নের বেদনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল রামসিংহ-যশোমন্তের আন্তরিক অনুগ্রহ। নিপীড়নের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তোচ্চারণ এবং শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে রাজাদের বারংবার প্রশস্তি একথাকেই প্রমাণ করে ।

শক্রের সমান সভা   জ্বলন্ত অনল প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ কবি।।
দেবীপুত্র নৃপবরে   স্মরণে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর   তদাশ্রয়ে কর্য্যাঘর
বিরচিল শিবসঙ্কীর্তন।।[৮]

সুতরাং অস্থিতি, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা থাকলেও তা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ততটা নৈরাজ্য বা রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেনি, কবি রামেশ্বরের শান্তবসাস্পদ 'ভব্যভাব্যভদ্রকাব্য' তারই নজির।

এই শতাব্দীর আর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্য ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' (১৭১১ খ্রীঃ)। কবি রামেশ্বর যেমন মেদিনীপুরের কর্ণগডরাজ্যের ছত্রছায়ায় বসে 'শিবসঙ্কীর্তন' লিখেছিলেন, কবি ঘনরামও তেমনি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের। তাঁর কল্যাণ কামনায় তাই কবি লিখেছেন —

মহারাজ কীর্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।[৯]

এই কীর্তিচন্দ্র রায় এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর পিতা জগৎরাম রায় সুযোগ্য শাসক ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে ফরমান পেয়ে জমিদারীও বাড়িয়েছিলেন অনেকখানি। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কীর্তিচন্দ্রের পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়ও নিহত হয়েছিলেন ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী জমিদারদের হাতে। যাহোক পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিচন্দ্রই রাজত্ব পান। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময় থেকেই এই বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সাহসী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁর সম্পর্ক বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়। পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বছরের মধ্যেই সম্রাট ঔরঙ্গ

জেবের প্রদত্ত (১৭০৩ খ্রীঃ) অস্থায়ী সনদে দেখা যায় — 'জগৎরামের পুত্র কীর্তিচন্দ্রকে বর্ধমান ওগয়হর ৪৯ মহলের জমিদারী ও চৌধুরাই খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য সম্রাটের কোষাগারে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা নজরানাস্বরূপ জমা পড়েছে।'[১০]

আটত্রিশ বছর ধরে কীর্তিচন্দ্র ৪৯টি পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমিদাররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন (১৭০২-১৭৪০); জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল বহুলাংশে। আসলে কীর্তিচন্দ্র নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন নবাব মুর্শিদকুলির সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ককে। তাই যেসব ভূস্বামীর চক্রান্তে তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরাম নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চারিতার্থ হয়েছিল ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি নবাব হলে। 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে —

বিষ্ণুপুর জমিদার ববদা প্রদেশ।
ভবানী প্রদেশ করে স্বয়ং আদেশ।।
পরে সন্ন্যাসীর দল রাখিতে শাসনে।
বর্দ্ধমানভূপ চিন্তা করে সেইক্ষণে।।[১১]

কীর্তিচন্দ্রের চরিত্রের এই প্রতিশোধ-পরায়ণ দিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতচন্দ্র রায়ের লেখনীতে —

রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিলরাজ্য
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।[১২]

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরসুট বা ভূরিশ্রেষ্ঠ পরগণায় এক ব্রাহ্মণ রাজবংশেব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ইনি ফুলিয়ার মুখটি বংশজাত। রাজা কৃষ্ণ রায়ের মূলবংশে রাজা প্রতাপনারায়ণ নামে একজন মহান ব্যক্তির জন্মও হয়েছিল। ভুরসুট পরগণায় তিনটি প্রধান গড়, এদের মধ্যে ভবানীপুর গড়ই প্রাচীনতম। রাজবংশের প্রধান শাখার (অর্থাৎ প্রতাপনারায়ণের) বসবাস ছিল এখানেই। দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে। রাজা কৃষ্ণরায়ের দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায় এবং তারপর তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নবেন্দ্রনারায়ণ রায় পর্যন্ত বংশধরগণ এই গড়ের অধিকারী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মও হয়েছিল এই শাখাতেই। আর ভুরসুট রাজ্যের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায় অবস্থিত। কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মুকুটরায় এখানকার দু'আনা জমিদারির মালিক ছিলেন।

জনশ্রুতি আছে প্রতাপনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে কীর্তিচন্দ্রের সদ্ভাব ছিলনা। লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার তিনি সৈন্য-প্রেরণও করেছিলেন।

কিন্তু গড় ভবানীপুর হস্তগত হয়নি। লক্ষ্মীনারায়ণের অমিত বিক্রম বারংবার কীর্তিচন্দ্রকে প্রতিহত করেছে। সেই থেকে ভুরসুট রাজ্য-গ্রাসের সুযোগ খুঁজছিলেন কীর্তিচন্দ্র। সুযোগ মিলল ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য রাজবল্লভের কৃতঘ্নতায়। জ্ঞাতিশত্রুতার বশবর্তী হয়ে ইনি কীর্তিচন্দ্রের সহায়ক হয়েছিলেন। তারই ফলে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র ভুরসুট আক্রমণ করে ভবানীপুরের গড় অধিকার করলেন। ভুরসুট সীমানাভুক্ত পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োও কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হল। হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়লেন জমিদার নরেন্দ্র রায় আর ভারতচন্দ্রের জীবন বাঁক নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।'[১৩] বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থা সমকালের পক্ষে এমনই আকস্মিক অথচ অনিবার্য ছিল যে, ব্যক্তিচরিত্র অনেকসময়েই তার অঙ্গুলি সংকেতে নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য কীর্তিচন্দ্র সুশাসকই ছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিশোধ স্পৃহা তাঁকে নৃশংস করে তুললেও সামগ্রিকভাবে তাঁর শাসনকালের প্রশংসাই করে গেছেন ঐতিহাসিকেরা। প্রবল পরাক্রমী এই মানুষটি সাহিত্য তথা পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন আজীবন। তাই বলা যায়, কবি ঘনরাম খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্য মধ্যে মহারাজের প্রশস্তি রচনা করেছেন। সে যুগে রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হলেও রাজসভাকবিদের সঙ্গে নৃপতির সম্পর্ক সুমধুরই ছিল।[১৪]

কীর্তিচন্দ্রের গুণকীর্তন করেছেন আর এক কবি 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা অকিঞ্চন চক্রবর্তী —

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।।[১৫]

কিন্তু কবি কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন না, কারণ তাঁর কাব্যে উল্লেখ আছে তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালের প্রসঙ্গ।[১৬]

ডঃ সুকুমার সেন ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে রচিত হয় অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল। তেজশ্চন্দ্রের শাসনকাল ১৭৭০ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। কীর্তিচন্দ্র লোকান্তরিত হয়েছিলেন বহুপূর্বেই — ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁকে ভুলতে পারেনি। তাই পরবর্তী কবিদের রচনাতেও তাঁর স্তুতিপাঠ হয়েছে।

বর্গি আক্রমণের প্রারম্ভে কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যু হলে বর্ধমান শহর শোকসাগরে ডুবে গিয়েছিল। এই নিয়ে একটি শোকগাথা রচিত হয় —

রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল।

বনকেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর
হেদে হে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর।

বর্গীভয় হতে রাজা আমাদের রাখলে যতনেতে
তোমার সমান দয়াল রাজা না দেখি ধরাতে।

পাখ কান্দে পাখুড়ী কান্দে কান্দে রাজতোতা
মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা।
শহরের লোক কান্দে করে হায় হায়
হেঁটমুণ্ড করে কান্দে হরেকৃষ্ণ রায়।[১৭]

রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' নামক গ্রন্থে বাংলা ১৩২১ সালে উক্ত গাথাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিগত গুণপনার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিই অমরত্ব দিয়েছিল মহারাজা কীর্তিচন্দ্রকে।

ফিরে আসা যাক ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনায়। এই কাব্যে যে গৌড়েশ্বরের প্রসঙ্গ পাই, তাঁর নাম উচ্চারিত না হলেও তিনি যে ধর্মপালের পুত্র এমন উল্লেখ অছে —

ধর্ম্মপাল নাম ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর।।
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর।।[১৮]

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের (আঃ ৭৭০-৮১০) পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নানাভাবে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। ঘনরামের কাহিনীতে আছে, ধর্মপালের পুত্র সমুদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবপালই ঘনরাম উল্লিখিত গৌড়েশ্বর কিনা বিবেচ্য। তবে বিভিন্ন দিক আলোচনা করে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র বলেছেন - '...... প্রত্যক্ষভাবে দেবপালের সহিত ঘনরাম চিত্রিত গৌড়েশ্বরের পার্থক্য প্রচুর।'[১৯] কাব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ইছাই ঘোষ। ডঃ মহাপাত্র এই চরিত্রটির মধ্যেও ঐতিহাসিকতার সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, 'ঘনরামের কাব্যে আছে যে অজয় নদীর তীরে ত্রিষষ্টির গড়ের নামকরণ ইছাই ঘোষ করিয়াছিলেন ঢেকুর। তাহা অরণ্যভূমি ছিল। কিন্তু,

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ীগড়
দুর্গম গহন কাটি।

করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটী ।।
(ঢেকুর পালা)

তিনি পার্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং দেবীর জন্য এক মন্দিব নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত ছিল। হাণ্টার এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, The governor of the district was Ichai Ghose, who built there a large temple named Ichai Mandir, and a fort called Sham Rup Ghar. He was attacked and over-powered by another man in the district called Laisen: and his temple, with its goddess and fort, fell into the hands of the enemy." (The Annals of Rural Bengal, W.W.Hunter. Vol-I, London 1868, P-436)

এই কাহিনী হাণ্টার কোন ঐতিহাসিক সূত্র হইতে সংগ্রহ করেন নাই। বীরভূম সম্পর্কে এক ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি শুনিয়াছিলেন। ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও এ কাহিনী যে লোককথায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করিয়াছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই।'[১১]

কিন্তু আসল কথা হল, চবিত্রগুলো ঘনরামের কাব্যে ধূসর অতীত আঁকড়ে থাকেনি। কবি প্রকৃতই যুগসচেতন ও জীবনবোদ্ধা। তাই ইতিহাস বা পুরোনো লোককথার সাহায্য নিলেও এদের তিনি সমকালের আঙিনায় দাঁড় করাতে পেরেছিলেন অনায়াসে। মহামদ পাত্র থেকে কালু ডোম পর্যন্ত চরিত্রগুলোও তাঁর হাতে জীবন্ত এবং সময়োপযোগী হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক আবহের সঙ্গে কবি এদের স্বচ্ছন্দে পরিচিত করিয়েছিলেন - সমকালের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল এরা। শুধু চরিত্রই নয়, ধর্মমঙ্গলের দেবমাহাত্ম্য বিষয়ক কাহিনীর মধ্যেও তিনি তৎকালীন যুগের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন।

ঘনরামের কাব্য রচনাকালে মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন বাংলার দেওয়ান। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ্ ঔরংজীবের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আকাশে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের যে ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল, তার প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায়ও। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার ঢেউ বাংলার বুকে তখনও আছড়ে পড়েনি। আসলে মুর্শিদকুলি ছিলেন সুযোগ্য শাসক। যদুনাথ সরকারের মতে, "For over half a century Murshid Quli and Alivardi Khan between them maintained peace, increased the wealth and trade of the Century ....."[১২] ঐতিহাসিকের তথ্য নির্ভুল সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যের অতিরিক্ত অব্যক্ত কাহিনীকে রূপময় করেন সাহিত্যিক। কবি ঘনরামের সাহিত্য কর্মে তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বের সুখ-সমৃদ্ধির পাশাপাশি তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকা দুঃখ-দৈন্য-বিশৃঙ্খলার ছবিও পরোক্ষে প্রাণ পেয়েছে।

এই পর্বের রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রধান কারণ হল, রাজচক্ষুর আড়ালে পাত্র-মিত্রের স্বৈরাচারিতা ও প্রজানিগ্রহ। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী চব্বিশটি পালায় বিভক্ত। তবে গল্পরস জমাট বেঁধেছে দ্বিতীয় পালা থেকে (ঢেকুর পালা)। সুশাসক গৌড়েশ্বরের অজান্তে তাঁরই প্রধানমন্ত্রী মহামদ পাত্রের প্রজা পীড়নের প্রথম সংবাদটি আমরা এখানে পেয়েছি। গৌড়েশ্বরের কাছে বন্দী গোয়ালা সোমঘোষের সকাতর অভিযোগ তদানীন্তন যুগের এই নিষ্ঠুর সত্যকেই প্রমাণ করেছে—

সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গতবর্ষে মহারাজে গোচর করিতে।।
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফঃস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দীখানা।।
পূর্ব্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে।
এবে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে।।[২২]

অর্থাৎ প্রজাপালক নৃপতি দরিদ্র প্রজার খাজনা মকুব করলেও তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হাত থেকে প্রজাদের রেহাই ছিলনা। এর থেকে একটা কথা কি প্রমাণিত হয়না যে, রাজকার্যে রাজার ব্যক্তিগত সক্রিয়তার অভাব ছিল? তিনি উদার হলেও অতিরিক্ত মাত্রায় পরনির্ভর ছিলেন? নতুবা রাজ-নির্দেশকে অমান্য করার দুঃসাহস মন্ত্রীর হতনা। আর একটা কারণ আছে। সেই সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রী বা রাজপার্ষদেরা মনোনীত হতেন ব্যক্তিগত যোগ্যতায় নয়, রাজার আত্মীয় হবার সুবাদে। ফলে, পারিবারিক সম্পর্কের অজুহাতে তাঁরা রাজরোষ উপেক্ষা করতেন। মহামদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে বারবার। তার অন্যায় আচরণ গৌড়েশ্বর সমর্থন করেননি কখনও; তবু 'শ্যালক' বলে তাকে শাস্তি দেওয়াও সম্ভব হয়নি —

অন্য যদি পাত্র হত পেতি খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড ভাব।।[২৩]

'কাঙুরযাত্রাপালা'য় অত্যাচারী মহামদের স্বরূপ আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। তার নির্যাতন আর শোষণে 'গৌড়ের ভুবন' হাহাকারে ভরে গেছে। প্রজাসাধারণ স্বদেশ ছেড়ে ময়না, নীলাচল, উৎকল, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজেছে। ছিন্নমূল হয়ে সুবিচারের অভাবে মহামদকে শাপ-শাপান্ত করেছে—

কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয়।।[২৪]

কারণ, তারা তো অনর্থক শাস্তিভোগ করছে। চাহিদা অনুযায়ী রাজকর দিয়েও মহামদকে তুষ্ট করা যায়নি। সে —

মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।।
অসতে আদর নিত্য সৎপথে কণ্টক।[২৫]

অথচ — 'প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ। 'জানবেন কি করে '? 'পাত্রেব প্রতাপে' কারোর সাহস নেই মুখ খোলার। ফলে বিচারেব বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে জনগণের মনে; সরবে আত্মপ্রকাশিত হতে পারেনি। শিবায়নকার রামেশ্বরকেও বোধহয় এমনই এক স্বেচ্ছাচারী শাসকের অত্যাচারে বাস্তহারা হতে হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদমুখর হতে দেখেছি একজনকে। তিনি ভারতচন্দ্র রায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারী রামচন্দ্র নাগের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি লিখেছিলেন 'নাগাষ্টকম্'। সংস্কৃত ভাষায় শিখরিণী ছন্দে রচিত এই লিপি মহারাজ-সমীপে পেশ করে মনের জ্বালা মিটিয়েছিলেন।[২৬]

যাই হোক, ধর্মমঙ্গল কাব্যের গৌড়েশ্বর যখন প্রকৃত ঘটনা জানলেন, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। 'সোনার পুরী' তখন 'ছারখার'। অথচ দেশে অনাবৃষ্টি নেই, ফলন যথেষ্ট, সর্বোপরি রাজা খাজনা আদায়ের জন্যও কোনো জবরদস্তি করেননা। নিশ্চিন্ত ছিলেন গৌড়েশ্বব, প্রজাদের তথা রাজ্যের সুখ-ঐশ্বর্যেব কল্পনায়। কিন্তু অকস্মাৎ শিকারে বেড়িয়ে তাঁর চোখ খুলে গেল! মন্ত্রী মহামদের কাছে তিনি জবাব চাইলেন। তবে সদুত্তব মিলল জনাকয়েক প্রজার কাছথেকে। গৌড়েশ্বরকে পাশে পেয়ে তাবা মনোবল ফিরে পেয়েছে, জোট বেঁধেছে মহামদের বিরুদ্ধে —

রাজার আসান শুনি পাত্রের নার্বড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি।।
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবব'
তিনসন ইজাফা দিয়াছি রাজকর।।
তথাপি বন্ধনদশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে।।
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার।।[২৭]

আর সবচেয়ে নির্মম সত্য উচ্চারিত হল এরপর —

এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন।।[২৮]

এটাই মূল কথা। কবির মনোগত অভিপ্রায়টি বুঝতে অসুবিধা হয়না। রাজায়-প্রজায় সাবলীল সম্পর্ক বজায় থাকুক, অসৎ রাজকর্মচারীর উপযুক্ত শাস্তি হোক -

নতুবা সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অযাচিত দুর্গতির হাত থেকে কোনোদিন মুক্তি পাবে না সাধারণ মানুষ। আর এটা সম্ভব, গৌড়েশ্বরের মত সুশাসকের সক্রিয়ভাবে রাজকার্য পরিচালনায়। তাই কায়মনোবাক্যে ঘনরাম সার্বজনীন মঙ্গল চিন্তা করেছেন, কেবল পৃষ্ঠপোষক রাজারই শুভ কামনা করেননি — 'চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।'[২৯] বলেছেন, 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।'[৩০]

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণই ছিল রাজার শাসনকাজে অনুপস্থিতি ও ঔদাসীন্য। ঘনরাম স্পষ্টত এই শতাব্দীর উল্লেখ না করলেও প্রকারান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতাকেই তুলেধরতে চেয়েছেন। আসলে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কুফল এটা। এই সময় একদিকে যেমন সামন্তেরা অধিক লোভ ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের অনুকরণে প্রচুর ব্যয়-নির্বাহ করতে প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক কর আদায় করেছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় রাজকর্মচারীগণও বাদশাহের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে নির্বিচারে প্রজা শোষণ চালিয়ে গেছে। জীবন অভিজ্ঞ ঘনরামের সৃষ্টির অবলম্বন দ্বিতীয়টি। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক সম্পর্কে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্রের অভিমতটি ('সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের তখন সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধির যুগ'[৩১]) পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয় বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'মানসিংহ' অংশের উপসংহারে এই ঐতিহাসিক তথ্যটি দান করেছেন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সুশাসক বলে পরিচিত হলেও কখনও কখনও যে অমানুষিক স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতেন তারই নজির বহন কবছে 'মানসিংহ' কাব্যের শেষাংশ। কৃষ্ণনগরের রাজা ভবানন্দের পর গোপাল, এবং তারপর রাঘব সিংহাসনে বসেন। এই রাঘবরাজা সম্পর্কে ভারতচন্দ্র অন্নদার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন —

দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।

রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্য ধন।।[৩২]

কুমুদনাথ মল্লিক বলেছেন, 'এই উক্তির মূলে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহা বলিতে পারা যায়না'[৩৩] তবে এটা নিশ্চিত যে, দেবপাল বংশের পতনের পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজা রাঘবের হস্তগত হয়েছিল। এই রাজার সম্পর্কে ভারতচন্দ্র আরো বলেছেন —

তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্র রায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়।।[৩৩]

রুদ্র রায় জমিদারী বিস্তৃততর করেন। তাঁর তিন পুত্র - রামচন্দ্র, রামজীবন ও

রামকৃষ্ণ। ভারতচন্দ্র লিখেছেন —

রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার।।
জিনিবেক শোভাসিংহ আদি রাজযাজী।
সোমযোগ করি নাম হবে সোমযাজী।।
এই ঝাঁপী হেলন কারিব অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে।।
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে।।[১১]

দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্যকে কবি সংক্ষেপে ও সুকৌশলে প্রকাশ করেছেন। আর এই ঐতিহাসিক তথ্যটি থেকেই মুর্শিদকুলির আমলের একটি প্রচ্ছন্ন অন্ধকার দিক উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তথ্যটি হল - কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণকে যোগ্যতম বিবেচনা করে রুদ্ররায় তাঁকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু রুদ্ররায়ের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী হস্তগত করেন। একবার রামজীবন কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করে অবশেষে ব্যর্থকাম হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন দ্বিতীয়বার রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের চক্রান্তে ঢাকার নবাব কর্তৃক বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে নবাব মুর্শিদকুলির কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়। এইজন্য রামকৃষ্ণকে তিনি ঢাকায় বন্দী করে রাখেন। কারাগারে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রামজীবন মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁর দীর্ঘদিনের বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। নদীয়ার পৈতৃক জমিদারীর নিষ্কণ্টক মালিক হন তিনি।

কাজেই নবাবের সঙ্গে সামান্য মনান্তরের ভীষণ পরিণাম থেকেই বোঝা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রকৃত স্বরূপটি।[১২]

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। আর সেই পটভূমির সার বস্তু হল অভ্রান্ত কৃতঘ্নতা। একের পর এক নবাব মসনদে বসেছেন পূর্ববর্তী বা পরবর্তীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি বহিরাগত ইংরেজ কোম্পানীও সেই সুযোগ ছাড়েনি, বরং সর্বাধিক কূটচাল প্রয়োগে জাঁকিয়ে বসেছে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে। অবশ্য এ ইতিহাস অনেক পরের। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে দেওয়ান মুর্শিদকুলির কাছে তা চিন্তারও অতীত ছিল। তিনি বোধহয় ভাবতেই পারেননি কেন্দ্রীয় শাসনমুক্ত করে তিলে তিলে যে দেশটাকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন, সেই বঙ্গভূমিই অদূর ভবিষ্যতে এক অনতিক্রম্য বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে। চতুর

কুশলী হলেও এমন কল্পনাশক্তি তাঁর ছিল না। কিন্তু সমসাময়িক হলেও বুঝেছিলেন বোধহয় ঘনরাম। আসলে মহৎ কবি মাত্রই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আসন্ন ভবিতব্যকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন মনের আয়নায়। তাই আজকের কৃপা প্রার্থী রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে অচিরেই যে আশ্রয়দাতা রাজার পদস্খলনের অনিবার্য কারণ হয়ে উঠবে - এমনই আভাস কবি দিতে চেয়েছেন ইছাই ঘোষের প্রসঙ্গে।

দরিদ্র গোয়ালা সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ অতি সাধারণ মানুষ। দয়ার্দ্রচিত্ত গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহে তারা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। শেষে একদিন ত্রিষষ্ঠিগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের উপরে ইছাইকে প্রধান করে পাঠানো হয়। ভবানীভক্ত ইছাই স্থাপন করে ঢেকুরগড়।

স্বরাজ্যে সে দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, ক্রমে কর দেওয়াও বন্ধ করে দেয় গৌড়েশ্বরকে, এবং কর্ণসেনের সম্পত্তি গ্রাস করে। ক্রুদ্ধ গৌড়েশ্বর ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় পাঠালেন কর্ণসেনকে। পরাজিত কর্ণসেন ফিরে এলেন রণক্ষেত্রে ছয় পুত্রকে হারিয়ে।

গোয়ালা ইছাই ঘোষ ছিল গরীব - ধনে, মানে সবদিক থেকে। অযাচিত সম্মান ও ঐশ্বর্য লাভ করে সে ধর্মাধর্মজ্ঞান হারাল। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে তাকেই পদদলিত করার স্পৃহায় দুর্নিবার হয়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অতিমাত্রায় সুলভ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের আর এক কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী আবার ইছাইয়ের স্বরূপটি চিনিয়েছেন খলতম চরিত্র মহামদের দ্বারা; কারণ, রতনে রতন চেনে —

হেদে বেটা সোমঘোষ আভীর নন্দন।
না আইল তব আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন।।

ভৃত্য হয়ে ভর্তাকে যে না রাখয়ে ভয়।
দেখ বুঝে দণ্ড তাকে দিবা যুক্তি হয়।।[৮]

বীরভূমের পাঠান 'রাজারা' প্রতিপত্তিশালী স্বাধীন শাসক ছিলেন। রাজনগরের বিস্মৃতি মলিন প্রান্তরে পরিত্যক্ত প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে গ্রামবাংলার ঐতিহাসিক উইলিয়ম উইলসন হান্টার এঁদের সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ধার করেছেন। তিনি এখানে রাজাদের একটি বংশাবলী পান। তাঁর মুনশী, শেখ রহিম বক্স, সিউড়িতে বসে সেই ফার্সী-পুঁথিটি নকল ও অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে থেকে একটা প্রাসঙ্গিক অংশ আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল।

রাজনগরের পাঠান বংশের তৃতীয় জমিদার আসাদুল্লাহ খান ইতিহাসে পরিচিত। বংশাবলীতে শুধু এইটুকু দেখা যায় - দেওয়ান খৃজার ছেলে দেওয়ান আসাদ উল্লাহ খান ১১০৪ বঙ্গাব্দে থেকে ১১২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত (১৬৯৭-১৭১৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল মোট একুশ বছর একমাস কুড়ি দিন। তিনি তাঁর দুই ছেলে আজিম খান এবং বদি আল-জামান খানকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে মারা যান। জেমস গ্রান্টের মতে এই বংশে ইনিই প্রথম দেওয়ানী সনদ দ্বারা নিযুক্ত হন; কিন্তু হান্টারের পণ্ডিত লিখেছেন, আসাদ উল্লাহ খানের ছেলে বদি-আল-জামান খান প্রথম দেওয়ানী সনদ পেয়েছিলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় মতটিই সঠিক কারণ ফার্সী ইতিহাস সমূহে দেখা যায় আসাদুল্লাহ খানের আমলে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা অন্যান্য দেওয়ানী সনদ নিযুক্ত জমিদারদের মতো নবাব সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সেসময় মুর্শিদকুলি খান সবে আজিম-উস-শানের অধীনে নায়েব নাজিম হয়ে সারা বাংলাদেশের জন্য খাজনার নতুন বন্দোবস্ত করেছেন। দেওয়ানী সনদ নিযুক্ত জমিদাররা মুর্শিদাবাদে হাজিরা দিতে বাধ্য ছিলেন, খাজনায় ঘাটতি পড়লে তাঁরা আটক হতেন। নৃশংস অত্যাচার চালানো হত তাঁদের ওপর। কিন্তু বীরভূম-বিষ্ণুপুরের প্রত্যন্ত জমিদারেরা এবং ত্রিপুরা, কোচবিহার ও আসামের চতুর্ধারী স্বাধীন রাজারা এই ব্যবস্থার অধীন ছিলেন না। তাই নবাবের সামনে স্বয়ং হাজির না হয়ে তাঁরা উকিলের মারফৎ পেশকাশ ও নজর পাঠাতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে উকিল প্রাধান্য পেতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতিতে।

নবাব দরবারে আসাদুল্লাহ খান যাঁকে উকীল রেখেছিলেন তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি - নরসিংহ বসু। বর্ধমান শহরের দক্ষিণে শাঁখারী গ্রামে তাঁর জন্ম। এই পরিবার মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের প্রজা — 'অধিকারী দেশের শ্রী কীর্তিচন্দ্র রায়। জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।।'[১১] বাংলা ও ফার্সী আয়ত্ত করে তিনি 'নানা দেশে রোজগার' করতে বের হন, অবশেষে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বীরভূম রাজনগরের রাজা আসাদুল্লাহ্‌র তরফে উকিল নিযুক্ত হন। নিজের প্রভুর মহিমা ও পরাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে এই কায়স্থ উকিল ধর্মমঙ্গলে লিখেছেন —

তীরন্দাজ ধানুকির নাহিক সুমার।
অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু-হাজার।।

দেশে নাঞঃ ডাকাচুরি রিপু কম্পমান।
তার দ্বারে থাকে সদা হাথে কর্যা প্রাণ।।[১২]

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। প্রথমত মুর্শিদাবাদ থেকে অনতিদূরে বীরভূমের রাজারা দু-হাজার পাঠান ঘোড়সওয়ার এবং বারো হাজার ঢালী ও তীরন্দাজের সমাবেশ করেছিলেন। নবাবরা এই সামরিক শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ঝাড়খণ্ডের জংলি মানুষের সান্নিধ্য সত্ত্বেও বীরভূমে এই সময় চুরি-ডাকাতি কম ছিল। এহেন পরাক্রান্ত পাঠান জমিদারীও নবাব দরবারে সালিয়ানা খাজনার সবটাকা জমা না পড়ায় বিপন্ন হল। নরসিংহ উকিলের বিনীত মধ্যস্থতায় অবশেষে মুর্শিদকুলি কিছু সময় দিলেন এবং কবি তখন টাকার যোগাড় করতে রাজনগর যাত্রা করলেন।[৮]

রাজার শিরোপা পেয়ে মুর্শিদাবাদে টাকা রওনা করিয়ে দিয়ে বসুজা নিজে বের হয়ে পড়লেন। পথে জুঝাটির খেজুরতলায় জাগ্রত ধর্মঠাকুরের পূজাবেদীতে পূজা দিতে গিয়ে দৈবযোগে সাক্ষাৎ পেলেন ধর্মঠাকুরের। অলৌকিক ভাবে ধর্মমঙ্গল রচনার অদেশ পেয়ে ভয়বিহ্বল নরসিংহ সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একবার বাড়ি হয়ে অবশেষে নবাব দরবারে পৌছলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় কাজ হাসিল হল — উকিল নবাব দরবারে টাকা জমা দিয়ে প্রভুর রাজা রক্ষা করলেন —

অনাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত।
পথে যাই মনে অকস্মাৎ উঠে গীত।।
রাত্যে দিনে চল্যা যাই বিলম্ব না হয়।
ধর্মের কৃপায় হইল দরবারে জয়।।

দিনে দরবার করি রাত্রে কবি গীত।
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত।।[৯]

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে এইসব ঘটনা ঘটেছিল। কায়স্থ উকিলের বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, মুর্শিদকুলি খানের নিজামত শুরু হবার পর থেকে রাজনগরের দেওয়ানরা আর আগের মতো স্বায়ত্ত্ব শাসন বজায় রাখতে পারেননি। হাণ্টারের পণ্ডিত লিখেছেন, নবাবকে প্রয়োজনে সৈন্য সাহায্য দিয়ে আসাদুল্লাহ পেশকাশ মকুব করিয়ে নেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আসাদুল্লাহর উকিলের সাক্ষাই মানতে হবে। সম্ভবত, আসাদুল্লাহর রাজত্বের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদে শুধু নজর ও পেশকাশ যেত; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে যে হুজুরে খাজনা চালান দিতে হচ্ছিল তার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার কথা শুধু সমকালীন প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের কাব্যগুলি থেকেই পাইনা, সমসাময়িক ছড়া ও গাথাও আমাদের সাহায্য করে প্রভূত পরিমাণে। আসলে ছড়া হল বাঙালীর ঘরের সম্পত্তি, বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে তার গাটছড়া। তাই মহৎ কবির প্রয়োজন হয় না ছড়া সৃষ্টিতে। সমাজজীবনের অতি তুচ্ছ থেকে অতিকায় নানা ঘটনা, আলোড়ন, আন্দোলন, নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অনুভূতিকে মুখে মুখে বেঁধেই ছড়ার জন্ম দেয় সাধারণ মানুষ।

সাহিত্যিক মূল্য হয়ত এদের বেশী নেই, কিন্তু সমকালের হৃদ্‌স্পন্দনটুকুর প্রায় অবিকল ওঠাপড়াকে প্রতিফলিত করার শক্তি আছে। অর্থাৎ ছড়ার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

আমরা জানি মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ-কে মসনদের উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা শুজাউদ্দিন সরফরাজের পিতা হয়েও তারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নিজে সিংহাসনে বসেছিলেন। বঙ্গভূমির পক্ষে এটা শুভও হয়েছিল। ১৭২৭ থেকে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবী চাললেন শুজাউদ্দিন খাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর নিষ্কণ্টক মসনদে সরফরাজের অধিষ্ঠান আদৌ কষ্টকর হয়নি। কিন্তু বিপদ দেখা দিল কিছুদিনেই মধ্যেই। শুজাউদ্দিনের আমলের অতি বিশ্বস্ত, উচ্চপদের বেশ কিছু কর্মচারী সরফরাজকে সরানোর জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এঁরা হলেন আলীবর্দী খাঁ, হাজি আহমদ, জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ, রায়রাঁয়ান আলমচাঁদ প্রমুখ। পরিণাম, গিরিয়ার যুদ্ধ (প্রথম) এবং নবাব সরফরাজের মৃত্যু। এই নিয়ে একটি গ্রাম্য ছড়া রচিত হয়েছিল ঐ সময়ে।

এই ছড়াটির প্রারম্ভেই আছে সরফরাজ এবং আলিবর্দী— এই উভয়পক্ষের যুদ্ধযাত্রা ও সৈন্য সজ্জার কথা। ইতিহাসে পাই, সরফরাজের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদে ঘনীভূত ষড়যন্ত্রকে সার্থক করার জন্য হাজি আহমদ পারিবারিক বিপদের ছলে ডেকে পাঠান ভাই আলিবর্দীকে। আলিবর্দীও সসৈন্যে পাটনা থেকে যাত্রা করেন এবং জগৎ শেঠকে গোপনে এক পত্র পাঠিয়ে প্রকাশ্যে নবাব সরফরাজেব কাছেও একটি বিনম্র পত্র পাঠান। কিন্তু ধূর্ত আলিবর্দীর পত্রে আস্থা স্থাপন না করে সরফরাজ যুদ্ধসজ্জার আয়োজন করেন। ছড়াটির প্রথমাংশে এই ঐতিহাসিক তথ্য অক্ষুন্ন আছে —

সহর হইতে বাহির হইল নবাব সহব করে খালি

নবাবের তাম্বু যখন পড়িল দেয়ানসরাই
আলিবর্দীর তাম্বু তখন আইল ফরক্কায়।
নবাবের তাম্বু আইল খামরা সরাইতে
আলিবর্দীর তাম্বু তখন সূতীর দরগাতে।
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে।[৪২]
'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থেও এর সমর্থন পাই।[৪৩]

ছড়ার কিয়দংশ আবার সংলাপধর্মী। সরফরাজের সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি গেয়াস খাঁ-র কথোপকথনটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে পরবর্তী অংশে।[৪৪]

স্বল্প পরিসরে সেনাপতি গওস খাঁব চরিত্রটি বীরত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে —

জলদী করে হুকুম দেরে নবাব জলদী করে,
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সূতীর দরগাতে।
সওয়া সের আটার মোয়া পোওয়া ভর ঘী,
একা লবে গোয়াস খাঁ সকলের জী।।[৪৫]

জানা যায় যে, নবাব গিরিয়ায় উপস্থিত হলে তাঁর সেনাপতি গওসখাঁ ভাগীরথী পার হয়ে প্রায় সূতী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সূতীতে মর্তুজা নামক এক প্রসিদ্ধ ফকিরের সমাধি ছিল। সে সময়ে দরগা মুসলমানদের বিশেষ পবিত্র স্থান ছিল; সেই সূত্রেই কবি এখানে সূতীর দরগায় জয়লাভ মানসে শিন্নি মানসের কথা লিখেছেন।

গিরিয়া যুদ্ধে সরফরাজ খাঁর ভাগ্যবিপর্যয় যে কিরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে সাধিত হয়েছিল তাব ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্তমান ছড়াটিতে —

ভাল ভাল কামান সাজায়ে কামান করিল বিলি,
নবাবের কামানে ভবে ইট আর বালি।[৪৬]

প্রথম অধ্যায়ে এই ঘটনার ইতিহাস-সমর্থিত বর্ণনা দিয়েছি। ছড়াটির পরিশেষ এইরূপ —

হাজার হাজার পল্টন কেটে ময়দান করিল,
ভাল ঘোড়ায় চড়াইয়া নবাবকে বিদায়দিল।
হাতী পড়িল দুলদুলিতে, ঘোড়া পড়িল রণে
পাঞ্জাদার ডুবাইল সাহস বিলের ঘোনে।[৪৭]

গওস খাঁ কর্তৃক নবাবকে ভালো ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় দেবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়না। প্রথমতঃ গওস খাঁ নন্দলালের সঙ্গে নদীর অপর পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ নবাব সরফরাজ খাঁ রণক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে নয়, হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ স্থলে প্রবেশ করেন এবং হস্তিপৃষ্ঠেই অবশেষে শায়িত হন। মুর্শিদাবাদের নবাবদের মধ্যে একমাত্র তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন।

নবাব হলেন আলিবর্দী। কিন্তু ষড়যন্ত্র আর কৃতঘ্নতা দ্বারা অধিকৃত মসনদ তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বস্তি দিলনা। গোটা বঙ্গভূমি জুড়ে তখন ঘনীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর কেন্দ্রীয় শক্তির ভাঙনজনিত বিপর্যয়। আলিবর্দী জর্জরিত হয়ে পড়ছেন আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে। এমনই এক অবিন্যস্ত পটভূমি মারাঠা শক্তিকে চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছিল সর্বভারতীয় অধিকার বিস্তারের। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর বর্গীরা বাংলায় এসেছে। গ্রাম নগর আক্রমণ করে, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার ও অপহরণের দ্বারা নিজেদের নগ্ন ও স্থূল লালসাকে তৃপ্ত

করেছে। প্রথমদিকে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যা সমেত সর্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এবং পরে প্রচুর পরিমাণে চৌথ বা রাজস্ব ও সরদেশমুখীর দাবি'তে সন্ত্রাস সৃষ্টি - বাংলাদেশের সর্বত্র প্রগাঢ় আতঙ্কের কালোছায়া বিস্তাব করেছে। স্বভাবতই নবাব আলিবর্দীর ওপর পড়েছিল গোটাদেশের শান্তিরক্ষার ভার। তিনি কখনও অর্থ দিয়ে, কখনও বা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বর্গীর হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবার পথ খুঁজেছেন। এই ইতিহাস দীর্ঘ ন'বছরের।

গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্টা পুরাণ' কাব্যটির উপজীব্য এই বর্গীর হাঙ্গামা। আমরা জানি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মসম্পৃক্ত। লৌকিক জগতের নরনারীর মৃত্তিকাশ্রয়ী সুখদুঃখের কাহিনী এখানে অপ্রাকৃতলোকের অপার্থিব অনুরঞ্জনে অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। কিন্তু কবি গঙ্গারাম তাঁর কাব্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের বর্গী বিভীষিকার জীবন্ত ও অনতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক বাতাবরণ একটা আছেই, তবে তা নিছকই গৌণ। বাস্তব রসই এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণী। বহিরাগত দস্যুর আকস্মিক ও একটানা আবির্ভাবে বাঙালীর জীবন যন্ত্রণার এমন তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্বস্ত গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপুলাকার বাংলা সাহিত্য সম্ভারে আর একটিও নেই।

কাব্যের সূচনাতেই অবশ্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারে একটা পৌরাণিক আবহ তৈরী করেছেন কবি। আর তারই মধ্যে নিহিত রেখেছেন বাংলায় মারাঠা আক্রমণের অন্তঃসলিলা কারণকে। কবির মতে, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনায়, হিংসা-দ্বেষে ক্লিষ্ট মানুষ এই সময় নৈতিক অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছিল। তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে গ্লানিময় হয়ে উঠছিলেন বসুন্ধরা। পাপের এই ভীষণ প্রবাহে মর্ত্যমানব ঈশ্বরচিন্তাও ভুলেছিল। ধরিত্রী তখন স্তব শুরু করলেন ব্রহ্মার —

পাপের কারণে প্রভু পৃথি হইল ভারি।
কত ব্যাম পাব আমী তার সহিতে নারি।।[৪৮]

ব্রহ্মা পৃথিবীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শিবের কাছে। শিব এই দুর্বিপাক থেকে পরিত্রাণের একটি উপায় স্থির করে নন্দীকে উপদেশ দিলেন —

দক্ষিণ শহরে তুমি যাহ ততক্ষণ।।
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হয় জাইআ তাহার দেহেতে।।
বিপরিত পাপ হইল পৃথীবি উপরে।
দুত পাঠাইএ৷ ৷ন পাপি লোক মারে।।[৪৯]

আদেশ পেয়ে নন্দী সাহুরাজা৷৷ আশ্রয় করল, এবং —

সাহু রাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেএ মোরে।।
দুত পাঠাইয়া দেঅ বাদশার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে।।[৫০]

এইভাবে পুরাণের ছাঁদে কাব্যারম্ভ হলেও পরবর্তী অংশ থেকেই কবি যথাসম্ভব সত্যনিষ্ঠভাবে সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনাবলী ও বাংলা আক্রমণের লৌকিক কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন।

সাহুরাজার আদেশে রঘুরাজা বাদশাহকে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখে চৌথ না পাঠাবার কারণ জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। জানা গেল, বাংলার রাজস্ব দু'বছর দিল্লীতে পাঠানো হয়নি। আর সরফরাজ খাঁর হত্যাকারী আলিবর্দীর নবাবীলাভ, তথা শক্তিবৃদ্ধিকেই বাদশাহ চৌথ অনাদায়ের কারণ বলে নির্দেশ করেছেন।[৫১] ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখি, এ সময় মুঘল সম্রাট ছিলেন মুহম্মদ শাহ। গঙ্গারাম বলেছেন, আলিবর্দী নবাব হওয়ায় বাদ্শাহ খুশী হতে পারেননি এবং তাঁকে কোনো খেতাব প্রদান করাও হয়নি। সেই রোষেই আলিবর্দী দিল্লীতে খাজনা পাঠানো বন্ধ করেন। এই সংবাদ অবশ্য কাব্যের সূচনাতেই পরিবেশিত হয়নি; কিন্তু পরে আছে। গঙ্গারাম লিখেছেন, নবাব যখন হরকরা মারফৎ বর্ধমানে বর্গী প্রবেশের খবর পেলেন, তখন তিনি রাজারাম হরকরাকে ফৌজের অবস্থা জানার জন্য পাঠালেন। হবকরার কাছ থেকে শাহুরাজা প্রেরিত ভাস্করের আগমনবার্তা পেয়ে তার সঙ্গে চৌথ সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য একজন উকিলকে প্রেরণ করা হল। এই খানে উকিল ও ভাস্করের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় বাদশাহ্ কর্তৃক নবাবকে উপাধি প্রদানের অস্বীকৃতিই নবাবের খাজনা বন্ধের কারণ —

আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজনা তবে জাএ
চোথাই পাবে সেই খানে।।
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথা নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রণ।।[৫২]

মহারাষ্ট্র তখন বাংলার রাজস্বের এক চতুর্থাংশ পেত। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছে সেই চৌথ দাবি করলে, বাদশাহ আপন দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অভিপ্রায়ে মারাঠা নায়ক দ্বিতীয় শিবাজী বা সাহুরাজাকে

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার চৌথ বাবদ বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেন, এবং একইসঙ্গে বাংলা থেকে চৌথ আদায়ের পরামর্শ দেন —

আজ্ঞা দিলা বাদসা ফৌজ পাঠাইএ্যা।
চৌথাই নেএন জেন জবর করিএ্যা।।
এতেক সুনিএ্যা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোন জনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে।।
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া।।
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই।।[৫৩]

সুতরাং 'মহারাষ্টাপুরাণ'কারের মতে, দাক্ষিণাত্যের সাতারার রাজা সাহুর আদেশক্রমেই রঘুরাজা স্বীয় অনুচর, ভাস্কর পণ্ডিতকে চৌথ আদায়ের জন্য বাংলায় পাঠিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত আলিবর্দী ও মারাঠা বিসংবাদের কাহিনীটি উল্লেখ করা যায়। এই কাব্যের 'গ্রন্থসূচনা' অংশে কবি জানিয়েছেন, মোগল সৈন্য উড়িষ্যা প্রদেশে অত্যাচারকালে শিবের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরেও এসে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করলে শিবের পরামর্শক্রমে নন্দী গড়সেতারায় বর্গী রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন —

আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়।।
সেই আসি যবনের করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা তখন।।
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত।।[৫৪]

অর্থাৎ, 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' ও 'অন্নদামঙ্গল' — উভয় কাব্যেই বর্গী প্রসঙ্গে দৈবীভূমিকা এসেছে। তার প্রধান কারণ হল, সমসাময়িক রাজনৈতিক অচলাবস্থা সম্পর্কে কবিদের বীতরাগ। মুসলমান শাসকশক্তির প্রতি অনাস্থা। বিশেষত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এরূপ মনোভাব আরো প্রকট। পাপাচার, জনসাধারণের দুর্ভোগ, অসন্তোষ এবং দৈবী প্রতিকারের উপর সাধারণ মানুষের নির্ভরশীলতার কথা উভয়ের কাব্যে থাকলেও ভারতচন্দ্র উল্লিখিত নবাব আলিবর্দীর সৈন্যদল কর্তৃক ভুবনেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন ও অপবিত্র করার অভিযোগকে অনেকেই সত্য বলে মনে করেন নি। আসলে রায় গুণাকর ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সভাকবি। বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করতে নবাব আলিবর্দীর রাজকোষ

শূন্যপ্রায় হলে তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের উপর নির্দেশ আসে বারলক্ষ টাকা প্রদানের। কিন্তু রাজা অসমর্থ হন। ফলে আলিবর্দীর নির্দেশে তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় কিছু কাল কাটাতে হয়। আশ্রয়দাতার প্রতি নবাবের এই অমানবিক ব্যবহার ভারতচন্দ্রকে কুপিত করেছিল, এবং সেই কারণেই হয়ত কিছু অতিরঞ্জন ঘটেছিল তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যেও —

.... মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা ব'লে বার লক্ষ টাকা চায়।।
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।।
বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেলধন।।
বদ্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে।।[৫৫]

অবশ্য কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অত্যাচারের কাহিনীটি সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, কৃষ্ণচন্দ্র "পৈতৃক রাজস্ব বাকী দশলক্ষ ও এই নজরানার জন্য কিয়ৎকাল তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কারারুদ্ধ অর্থাৎ নজরবন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নিজ বাটীতে থাকিতে বাধ্য হন।"[৫৬] কুমুদনাথ মল্লিকও বিষয়টি সমর্থন করেছেন।

উপরিউক্ত পংক্তির মধ্যে দুটি ছত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ —

বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন।
নানা মতে রাজার প্রজার গেল ধন।

অর্থাৎ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিশ্রুত অর্থ সর্বভক্ষ সুজন সাজোয়াল আত্মসাৎ করেছিল। শুধু রাজার অর্থই নয়, প্রজার সম্পত্তিও সমভাবে লুণ্ঠিত হয় তার দ্বারা। বর্গীর শোষণের সঙ্গে কবি যার কোনো প্রভেদ দেখেননি। আসলে, অষ্টাদশ শতাব্দীব দেশব্যাপী অরাজকতার ফয়দা সবচেয়ে বেশী করে তুলত এই সুজন সাজোয়ালের মত মানুষেরা।

বর্গী বিষয়ে গঙ্গারামের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বর্ণনার আর একটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। 'মহারাষ্টাপুরাণ'-এ মুঘল বাদশাহ কর্তৃক আলিবর্দীকে উপাধি দানের অস্বীকৃতি বিবৃত হয়েছে। কিন্তু 'অন্নদামঙ্গল'-এ আছে প্রাক-বর্গী ইতিহাসের প্রসঙ্গ—

সুজা খাঁ নবাব সুত সরেফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রাঁয়া।।

ছিল আলিবর্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিল যুদ্ধ বধিলেক তায়।।
তদবধি আলিবর্দী হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা বাদশা খেতাব।।
কটকে মুরসীদকুলী খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দী খেদাইয়াদিল।।
কটকে হইল আলিবর্দ্দীর আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল।।
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে।।
লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ী তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক।।
উত্তরিলা কটকে হইয়া ত্বাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর।।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া।।
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বর করিলেন ধূম।।[৫৭]

গঙ্গারাম দত্তের কাব্যে এসব পূর্বপ্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র পাইনা। তিনি সরাসরি ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, আলিবর্দী প্রেরিত উকিলের মারফৎ ভাস্কর পণ্ডিত নবাবকে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান জানান। অবশেষে বর্গীর দল বর্ধমান শহরে পদার্পন করে —

বৈশাখের উনিশা যাএ বরগি আইল তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।[৫৭(ক)]

এই 'বৈশাখের উনিশা' কোন্ সালের গঙ্গারাম তা উল্লেখ করেননি। তবে G. S. Sardesai জানিয়েছেন, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই মারাঠাবা বর্ধমানে পৌঁছেছিল।[৫৮]

'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এর প্রত্যেকটি বর্ণনাই জীবন্ত। রাজনীতি'র একটা অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল কূটকৌশল। বর্গীরা বর্ধমানে উপনীত হবার পর এইজাতীয় কৌশলের আশ্রয় নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল —

লস্কর নিসন্দে জাএ কেহু নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ উনিশাতে।।[৫৯]

… … … …

ভাস্করের সঙ্গে ছিল চল্লিশ হাজার ফৌজ —

চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা।[৬০]

ভাস্কর বর্ধমানে পৌঁছেই নবাবকে খবর পাঠান — চৌথ না দিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যপাট, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা সব রসাতলে যাবে —

সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারনে আইলাম আমি।

… … … …

চৌথাই না দিবে জবে রায্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রণ।।[৬১]

এদিকে আলিবর্দী উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করে সবেমাত্র বাংলায় ফিরেছেন, তখনই এই দুঃসংবাদ। নবাবের মূল সৈন্যবাহিনী আগেই মুর্শিদাবাদের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। নবাবের সঙ্গে রয়েছে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক। মেদিনীপুরের কাছাকাছি এসে বর্গীর আগ্রাসী আচরণ সম্পর্কে অবহিত হলেন তিনি। এই পর্বে নবাবের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। আর তারই প্রায় অবিকল প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কবি 'মহারাষ্টাপুরাণ'এ। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে আলিবর্দী তাঁর পাবিষদদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, চৌথ দিতে যে টাকা ব্যয় হবে, সেই টাকা সিপাহিদের বকেয়া বেতনে ব্যয় করা হোক; তারা লড়াই করে ভাস্কর পণ্ডিতকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। গঙ্গারাম লিখেছেন —

জতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে।
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে জেন আইস্তে নাই পারে।।
বরগি সব মারিব দেসে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে।।[৬২]

কিন্তু ব্যাপাবটা অত সহজ হল না। অতর্কিতে নবাবের শিবিরে বর্গীর হামলা হল —

একদিন দুইদিন কবি সাত দিন হৈল।
চতুর্দ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল।।

....

খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি য়াইসা লুটিতে লাগিল।।[৬৩]

অতঃপর অতিকষ্টে মারাঠাব্যূহ ভেদ করলেন আলিবর্দী। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পৌছলেন মুর্শিদাবাদের পথে কাটোয়াতে। মারাঠারা পিছন দিক থেকে নবাব বাহিনীকে হয়রান করতে করতে হঠাৎ হানা দিল মুর্শিদাবাদে। রাজধানী অবাধে লুণ্ঠিত হল। পলায়নপর্ব শুরু হয়ে গেল সেখানেও। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তিও আর মুর্শিদাবাদে বা কাশিমবাজারে ভরসা করে থাকতে পারলনা। অন্য মানুষ যেমন তেমন, জগৎশেঠের মত বিখ্যাত লোকের পক্ষে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাঁর মহিমাপুরের বিশাল বাড়ি, টাঁকশাল - আকৃতি ও প্রকৃতিতে বর্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। বর্গীদের লক্ষ্য হল সেই বাড়ি —

তবে বরগি পার হইলা হাজিগঞ্জের ঘাটে।
সিগ্রগতি আইসা জগত সেটের বাড়ি লুটে।।[৬৪]

জগৎ শেঠের বাড়ি লুঠ করে এত সম্পত্তি পেয়েছিল যে, পাছে কারোর কাছ থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই ভয়ে আগেই কিছু টাকা পথে ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পালিয়ে যায় গঙ্গা পার হয়ে। আর সাধারণ মানুষ সেই পথে ছড়িয়ে দেওয়া টাকা কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে —

তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা
সিগ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গা পার হইয়া।।
তবে ফকির ফকীরা গিরস্ত জত ছিল।
সেইসব টাকা তার লুটিতে লাগিল।।[৬৫]

অবিলম্বে নবাবের কাছে এ খবর পৌছল। নবাব কাটোয়া ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে এলেন। ভাস্কর তখন কাটোয়াতে পালিয়ে যায় এবং আলিবর্দী রাজধানীতে পৌছোবার আগেই তারা পিছু হটে সহজেই অধিকার করে নেয় অরক্ষিত কাটোয়া।[৬৬]

কাটোয়াতে স্থাপিত হয় মারাঠাদের মূল ঘাঁটি। এরপর দ্রুত রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, লুঠপাট ও অত্যাচারের অবাধ অধিকার।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়েই বর্গীদের আগমন বার্তা দাবাগ্নির মত কাশিম বাজারের ইংরেজ কুঠিতে পৌছল। বীরভূম ধ্বংস করে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে - এ খবর রাষ্ট্র হতে বেশী সময় লাগল না। ইংরেজ, ফরাসি আর ওলন্দাজ কুঠির প্রধানরা দেখলেন কুঠি রক্ষার আব কোনো উপায় নেই; তার চেয়ে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তাই মঙ্গলজনক। শেষবাতে যাত্রা করে তাঁরা পদ্মানদী পর্যন্ত পলায়ন করলেন। তিনজন ইওরোপীয় কর্মচারী মোটা অর্থের বিনিময়ে কুঠিবক্ষার দায়িত্ব নিল; সঙ্গে রইল কোম্পানীর পঞ্চাশজন দেশী পিওন। 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা' নামক একটি খণ্ডিত পুথিতে ইংরেজদের কলকাতা ছেড়ে পালানোর সংবাদ পাই—

বিরভম থাক্যা আইল বরগি বর্দ্ধমানে থানা।
বর্দ্ধমান ছাড়িয়া হুগলি আইল কথজনা।।
ফজদুর সে ছমান পলায় আর ফরাশ।
এনসাল ওলোন্দাজ পলায় পাইয়া তরাস।।
কলিকাতায় ফিঙ্গিরাজ পলায় আর পলায় শ্বাস।
ববগিরে দেখিয়া তারা না করে বিশ্বাস।।[৬৭]

মারাঠা আক্রমণেব পর কাশিমবাজার এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয। রাজধানী মুর্শিদাবাদেও একই অবস্থা। দেশের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁদের পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ রক্ষার জন্য গঙ্গার পূর্বদিকে দলে দলে আশ্রয় নিতে থাকেন। স্বয়ং নবাব ও তাঁর ভাই হাজি আহম্মদও পরিবার পরিজনকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নিজেরা প্রস্তুত হতে শুরু করেন মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য।

যুদ্ধ শুরু হল। কখনও নবাব সেনা পিছিয়ে আসে, কখনও বা বর্গীর দল —

ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল।।
তবে বরগি পিঠ দিয়া সিগ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ।।[৬৮]

ইতিমধ্যে আশ্বিন মাস এসে যায়। ভাস্কর পণ্ডিত গ্রামের লোকের সহায়তায় দুর্গা পূজার আয়োজন করে, কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে। আর বিহার থেকে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিন সসৈন্যে যোগ দিলেন নবাবের সঙ্গে। নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে রাত্রিকালে নৌসেতু করে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ায় পৌঁছান। নবাব জামাতা জৈনুদ্দিন নবাবকে পরামর্শ দেন, পূজা শেষ হবার পূর্বেই মারাঠা বাহিনীকে আক্রমণ কবতে। কারণ পূজার পরে চারদিকের জলকাদা শুকিয়ে গেলে বর্গীদের সুবিধে হবে।

তখন তাদের পরাজিত করা কঠিন হবে —

জল কাদা শুখাইলে বরগির হবে বল।
চতুর্দিগে লুটিবে পোড়াবে সকল।।
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া।
রাতারাতী জেন বরগি মারে গিয়া।।[৬৯]

সুতরাং ভাস্করের পূজা অসমাপ্তই থেকে যায়। কারণ নবমীর দিন আলিবর্দী খান অতর্কিতে বর্গীর দলকে আক্রমণ করেন। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি দুর্গোৎসবে শ্রান্ত, নিশ্চিন্ত মারাঠাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে আলিবর্দী তাদেব কাটোয়া ছাড়া করেন। তারা লুঠের মাল ফেলে দিয়ে, কোনরকম বাধা দেবার চেষ্টা মাত্র না করে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে যায়।[৭০]

পরে পরাজিত ও পলায়মান বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে, নবাব তাদের ওড়িশার চিল্‌কা হ্রদের ওপারে পাঠিয়ে দেন। এই সময় বর্গী বিতাড়নে নবাবকে সাহায্য করেন বীরভূম ও বর্ধমানের জমিদারদ্বয়। পরের পছর অর্থাৎ ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে আবার মারাঠারা এল —

আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুণরূপি আইল সাজিযা।।[৭১]

বর্গীদের এবার আগমনের উদ্দেশ্য চৌথ আদায় নয়: অমানুষিক লুণ্ঠন। হত্যার পরিমাণ আরো বাড়ল। এবারে ছাউনি পড়ল কাটোয়াতেই। নবাব বিপন্ন ও হতাশ হয়ে পড়লেন; মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ হল। দেওয়ান ও প্রধান সচিব জানকীরাম (ইনি মহারাজা দুর্লভরামের পিতা ও রাজা রাজবল্লভের পিতামহ) এক চমৎকার বুদ্ধি দিলেন। তাঁদের পরামর্শমত নবাব ভাস্করের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী নবাবের কারুকার্য খচিত তাঁবু পড়ল গঙ্গার পাড়ে, মানকর পরগণায়। এইখানেই নবাবের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য এল ভাস্কর পণ্ডিত। কবি বলেছেন —

দুসরঞ্জি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে।।
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল।।
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিলি নবাবকে।
তারপরে নবাব কহেন কিছু তাকে।।

এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন আহি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি।।
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল।।
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন।।
দুই দণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি সান পূজাএ জাই।।[৭২]

অর্থাৎ, বৈশাখ মাসের দু'তারিখে শনিবার ভাস্করকে কৌশল করে আনা হয়েছিল নবাবের তাঁবুতে। বিধাতা বিমুখ হওয়ায় তারও বুদ্ধিনাশ হল, হাতিয়ার ছাড়াই সে মিলিত হতে এল নবাবের সঙ্গে। আলোচনা চলাকালীন নবাব সুকৌশলে 'খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি' বলে শিবির ত্যাগ করলেন। নবাবের প্রত্যাবর্তনের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাস্করও 'স্নান পূজা' সমাপ্ত করতে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে নবাব-দরবারে লুক্কায়িত সেনারা তাকে অতর্কিতে আক্রমণ ও হত্যা করে —

জেইমাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলআর খুলিয়া তখন মারিলেক মাথে।।[৭৩]

বাইরে তখন ভাস্করের অনুচর, মারাঠা সেনাদল অপেক্ষামান। তারা নবাবী সেনা দ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হল। কিছু মরল, কেউ পালাল, কবি গঙ্গারামের বর্ণনা অনুযায়ী অবশ্য সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল। আর মানকরের শিবিরে যেই মাত্র সপার্ষদ ভাস্কর মণ্ডিত মারা গেল, সেই ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ মনসুরা নামক জনৈক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কবি গঙ্গারামেকে এসে দিয়েছিল।[৭৪]

এই ঘটনার পর বর্গীরা বছরখানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর আবার আক্রমণ শুরু হল। শেষপর্যন্ত নবাব আলিবর্দী আর না পেরে বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে। 'মহারাষ্টাপুরাণ'-এ অবশ্য এই ইতিহাস পাইনা। ভাস্কর পণ্ডিতেব নিধনেই কাব্যের উপসংহার টানা হয়েগেছে।। বস্তুত, বর্গী হানায় বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি যে কিভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছিল তা জানার জন্য কবি গঙ্গারামের কাব্যই যথেষ্ট মূল্যবান। এরপর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমিতে আর প্রায় কখনই সুস্থিরতা ফিরে আসেনি। একের পর এক রাজনৈতিক বিপর্যয়ে গোটা দেশ ক্রমে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

বর্গী-হাঙ্গামা শেষ হতেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনকে অশান্ত করে তুলল পলাশীর ষড়যন্ত্র। বর্গিদের কারণে অর্থলোভ ও দস্যুবৃত্তির সঙ্গে সুবাহ বাংলার প্রজাদের পরিচয়

ঘটেছিল আগেই। হানাদাবদের মুখে ছিল একটাই শ্লোগান - 'রূপি দেহ, রূপিদেহ'।[১১] অর্থাৎ তারা জানে লুটেপুটে নিতে। কিন্তু ইংরেজরা অনেক বেশী বিচক্ষণ ও পারদর্শী। তাদের বিষয়বাসনা আকাশের মত অবারিত। তাই লুণ্ঠনের চেয়ে তারা শ্রেয় মনে করেছে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি করায়ত্ত করাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ধীরে ধীরে গোটা দেশের রাজনৈতিক আকাশকে ছেয়ে ফেলে তারা। বাংলায় ইংরেজ- প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোনো কাব্য রচিত হয়নি, এমনকি তাদের নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মকেন্দ্রিক কাব্যগুলোতে বিশেষ আলোচনাও হয়নি। তাই, এবিষয়ে আমাদের পুনরায় আশ্রয় নিতে হবে সমসাময়িক কালে রচিত ছড়া ও গাথার।

পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ছড়া পাওয়া যায় —

কি হলো রে জান -
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।
. . . .
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চাঁদোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি।।[১২]

ছড়াটি কবিত্ব বর্জিত হলেও কতকগুলো তথ্য আমারা পাই। যেমন - সিরাজের সেনাপতি মীরমদনের আপ্রাণ যুদ্ধ করার কথা, মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে নবাবের পরাভবের কথা, সিরাজের মৃতদেহকে খোশবাগে আলিবর্দীর পাশে সমাধিস্থ করার কথা। এগুলো ইতিহাস সম্মত। 'মোহনলালের বেটী' - কথাটি সম্পর্কে সংশয় আছে। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন - "মোহনলালের ভগিনীকে সিরাজ স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক সেই ভগিনীকে বেটী করিয়া লইয়াছে। অনেকে ভ্রমক্রমে সিরাজের অন্যতম বেগম লুৎফন্নিসাকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস, তখন অশিক্ষিত লোক যে ভ্রম করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? সম্ভবতঃ এখানে লুৎফাকেই মোহনলালের বেটী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।"[১৩] আর ছড়াটির একস্থলে নবাব পলাশীর ময়দানে সসৈন্যে নিহত হন এরূপ ভ্রান্ত উক্তি আছে - 'পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ'।

অবশ্য ছড়াকার স্থানগত ভ্রান্তিই শুধু করেছেন। নয়ত সিরাজের সর্বস্বতো খোয়া গেছে পলাশীর ময়দানেই। প্রাণটুকু কেবল স্তব্ধ হয়েছে দু'দিন পরে। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা - মোগল শাসক, অবাঙালি বণিক আর হিন্দু জমিদার শ্রেণীর মধ্য থেকে

ষড়যন্ত্রের কলকাঠিতে উদ্ভূত এমন এক রাষ্ট্রবিপ্লব কি খুব একটা ছায়া ফেলেছিল তৎকালীন বঙ্গসমাজে ? বোধ হয় না। তাহলে 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এর মতো, কিংবা তার চেয়েও চাঞ্চল্যকর কোনো সাহিত্য কীর্তি আমরা পেতাম। রজতকান্ত রায় যথার্থই বলেছেন — "রাষ্ট্রশক্তির বহির্ভূত সাধারণ লোকে তা নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে তাকিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিল - চাষা লাঙ্গল ধরতে গেল, ফড়িয়া ফিরি করতে বেরোল পোতদার কাঁড় বিছিয়ে বসল, বোকা জোলাকে নিয়ে হাটের লোকে তাদের অভ্যস্ত রসিকতা করতে লাগল। এ সমস্ত কাজের ভিত্তি যে নড়ে গিয়ে জনজীবনে বিপুল বিপর্যয় দোরে এসে হাজির হয়েছে, সে বোধশক্তি মনসবদার জমিদার সওদাগরের ছিলনা, জনতার কোথা থেকে আসবে ? জনতা নিশ্চয় নবাবী রাষ্ট্রশক্তির সপক্ষে ছিল না, কিন্তু ফিরিঙ্গিদের প্রতিও সাধারণ লোকের মনোভাব এক প্রকারের বিতৃষ্ণতায় ভরা ছিল। কলকাতা থেকে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়ে চুঁচুড়া চন্দননগরের ওলন্দাজ ফরাসীদের ভয়কম্পিত শিথিল হাত থেকে যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৩ লক্ষ টাকা আদায় করে এক বছর আগে নবাব যখন বিপুল দর্পে মেদিনী কাঁপিয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরছিলেন, তখন চন্দননগরের ফরাসীরা গাঁয়ের লোকেদের বলাবলি করতে শুনেছিল - এই ফিরিঙ্গিরা বানচোত। সে সময় তাদের মনে সাহেবদের প্রতি কৃপা-মিশ্রিত অবজ্ঞা ছাড়া কিছু ছিল না।

আবার যখন দৃশ্যপট পাল্টে গেল, বিপর্যস্ত ফিরিঙ্গিরা ফিরে এসে নবাবের জান খতম করে দিল, তখন মুর্শিদাবাদের আশেপাশের মুসলমান গ্রামগুলিতে লোকের মনে ভারি কষ্ট হল। এ নিয়ে তারা গান বাঁধল। তারপর সে ঘটনা চিরাভ্যস্ত প্রথায় মেনে নিল। সতের বছর আগে আর এক তরুণ নবাব সরফরাজ খান দরবারের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন। তখনো লোকে দুঃখ পেয়ে গান বেঁধেছিল। এ ষড়যন্ত্রের পরিণাম থেকে সে ষড়যন্ত্রের পরিণাম আলাদা হবে, সেই বোধশক্তি তাদের ছিল না। সেও দরবারের ষড়যন্ত্র, এও দরবারের ষড়যন্ত্র।"[১] তাই ছড়ায় গান বাঁধার অতিরিক্ত বৃহৎ বা মহৎ কোনো সৃষ্টির আন্তরিক তাগিদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবিরা অনুভব করেননি।

পলাশী যুদ্ধের পরে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধবিষয়ক দুটি গ্রাম্য ছড়া পাওয়া যায় 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'র 'পরিশিষ্ট' অংশে। এ দুটির মূল বিষয়বস্তু একই অর্থাৎ কাটোয়া এবং পলাশীর নিকট ইংরেজ ও মীরকাশিমের সৈন্যের যুদ্ধ বর্ণনা।[২]

বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজ কোম্পানীর দখল একচ্ছত্র হবার পর তাদের শোষণের পরিমাণও মাত্রাছাড়া হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ অবশেষে ইংরেজের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে - -

বাঙ্গলাতে মরদ নাই ফিরিঙ্গিতে আমল করে।
লুটিল চাটিগাঁয়ের বাজার আনাড়ি মরদ মেরে,

তা ভাইরে ভাই পালায়ে যাই কলিকাতার ভিতরে
টাকা কড়ি নেয় না তারা মানুষ মেরে ফেলে .....।[৮০]

আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার ক্রম-অবক্ষয়ের মূল কারণটি, আগেই বলেছি, 'অভ্রান্ত কৃতঘ্নতা'। রাজা বা প্রভুর প্রতি কর্মচারী তথা ভৃত্যের মনুষ্যত্বহীন বিশ্বাসঘাতকতা। আলোচ্য ছড়াটির রচয়িতা এমনই এক ইঙ্গিত দিয়েছেন — 'চাকর হয়ে মুনিব মারে মারে তলওয়ার ছাড়ে।' প্রাসঙ্গিকভাবে আর একটি ছড়ার উল্লেখ করছি —

হেস্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিম বাজারে গিয়া হন উপনীত।।
কোন স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।।
কান্তমুদী ছিল তার পূর্বে পরিচিত।
তাহারে দোকানে গিয়া হন উপনীত।।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে।।
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত ক'রে হায় হায়।
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখাযায়।।
ঘরে ছিল পান্তা ভাত আর চিংড়িমাছ।
কাঁচালঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ।।[৮১]

— ছড়াটির মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও মূল বিবরণে সত্যতা আছে। কান্তবাবু এইসময় কাশীমবাজার ইংরাজ কুঠিতে মুহুরী ছিলেন। আশ্রয় লাভের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হেস্টিংস পরবর্তীকালে কান্তবাবুকে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রদান করেন। কান্তবাবু প্রতিষ্ঠা করেন কাশীমবাজার রাজবংশ। সুতরাং বাঙালী বারবার বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে এবং নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছে। ছড়াটির রচয়িতা কৃষ্ণনগরের রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের ভাগ্য সুনির্ধারিত হয়ে গেলেও দেশে শাসন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনে বহু সময় লেগেছিল। অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তা হয়নি। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও অর্থসংগ্রহের প্রবল বাসনায় বঙ্গ-ভূমি বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সমসাময়িক কালের কোম্পানীর কাগজ-পত্রাদিতে এর সাক্ষ্য মেলে (যেমন — Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the

East Indian Compani - Introduction)। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসে পাই — "সেই আঠারো বৎসর পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেস্টিংস কর্তৃক শাসন সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত বাংলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"[৮২]

দুটি ঐতিহাসিক কবিতায় ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগের রাজনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা ১১৭২ সাল বা ইংরেজি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখটি কোম্পানীর দেওয়ানি লাভের ঐতিহাসিক তারিখ। আর ইংরেজদের রাজনৈতিক জয়যাত্রার সেই চরম লগ্ন থেকেই বাংলার মাটিতে জন্ম নিয়েছিল অনেক করুণ ইতিহাস। পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের এক অখ্যাত কবি রামপ্রসাদ মৈত্রেয় এই তারিখটিকে অমর করে রেখে গেছেন পদ্যবন্ধে আবদ্ধ করে —

বাঙ্গালার অভিলাষে   আইলা সদাগরবেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি।
গতামল সুভেদারী   শুভ সন বাহাত্তরী
ইংরেজ আমল তদবধি।[৮৩]

কবিতাটির মধ্যে ইংরেজ আমলের সুবিচার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি ফুটে উঠলেও কবি চিরাচরিত সংস্কারানুযায়ী কবিতার প্রারম্ভেই ইংরেজ সওদাগর শাসকদের ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণনা করে পূর্বতন অদৃষ্টবাদের উপরই আস্থা স্থাপন করেছেন। গ্রাম্য কবিদের এই ধরণের মনোভাব আমরা ইতিপূর্বে, মুসলমান আমলেও দেখেছি। ঔরঙ্গজেবের সমকালীন জনৈক বাঙালী হিন্দুকবির উক্তিতে পাই স্বর্গের দেবতারা তাঁদের রূপ-গুণ-আচরণের পরিবর্তন করেন যবনরূপে —

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
জাজপুরে প্রবেশিলা হইআ জবন।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জত পথে নাগালি পায়।
ভালের তিলক সব পুছ্যা ফেলে পায়।।[৮৪]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, নবাব প্রদত্ত দেওয়ানী পত্তনীর মধ্যে মোট চব্বিশটি জেলা ছিল এবং এই পত্তনীর বহির্ভূত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান এই তিনটি জেলার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক পৃথক ফরমানে প্রদত্ত হয় (Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East Indian Compani - Introduction- p-4)। রামপ্রসাদ মৈত্রের কবিতা থেকে তৎকালীন শাসন ও বিচার বিভাগের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা ঐতিহাসিক তথ্য-সমৃদ্ধ হলেও তেমন সুসংবদ্ধ নয়। এজন্য গ্রাম্য কবিকেও ঠিক দায়ী করা চলেনা, কারণ সেযুগে তা বড় সহজসাধ্য ছিলনা। যাইহোক, প্রথম কবিতাতে পাই —

বাঙ্গালায় কৈরা দিলা পাঁচ আফিল ছাব্বিশ জেলা
কেলেক্টর জজ ফৌজদার।
কেলেক্টার তহশীলেতে জজ কৰ্ত্তা আদালতে
ফৌজদারী আইন মতে লিখে।।
চুরি ডাকাতি ফেল শানি মাইর পীট লুটি খুনি
এসব ফৌজদার মোতালকে।।[৮৫]

আর দ্বিতীয়টিতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে —

আদালত ফৌজদারি কেহ কর্ত্তা কেলট্টরি
আফিলের কর্ত্তা কেহ হৈলা।
বুঝিলাম হকবটে জজসাহেব ধর্মবটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান।।[৮৬]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল সম্পর্কে প্রামাণিক বিবরণাদি থেকে যতদূর জানা যায় তা হল, ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেই কোম্পানী জেলা সমূহের জন্য সুপারভাইজার পদের লোপ করে কালেক্টর নিয়োগ করেন এবং তাঁদের কাজে সহায়তা ও প্রয়োজন বোধে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য একজন করে দেশী কর্মচারীকে দেওয়ান হিসাবেও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই সময় বাংলাদেশে ছাব্বিশটি জেলার বিবরণ পাওয়া যায়না - জেলার সংখ্যা আরো কমিয়ে চোদ্দটি করা হয়। স্যর জনশোরের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ পরিবর্তন - পরিবর্ধন চলতে থাকে, এবং পরবর্তী সময়ে জেলার নির্ধারিত সংখ্যা চব্বিশ করা হয় (Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East Indian Company - Introduction Combridge History of India Vol.V 1497-1858)। অবশ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের তদানীন্তন বিচার ব্যবস্থার বর্ণনাসূত্রে কবি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীর যে বিবরণ প্রদান করেছেন তা তথ্যাশ্রিত এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা দুটির বর্ণনানুযায়ী দেওয়ানী আদালতের কর্তা ছিলেন কালেক্টর এবং তিনি দেশীয় দেওয়ানের সহায়তায় অন্যান্য আমলাদের নিয়ে বিচার করতেন এবং ফৌজদারি আদালতে জেলার কাজী ও মুফতিদের সহায়তায় বছরে দু'বার ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করতেন। বক্সী, নাজির, মোল্লা এবং গঙ্গাজলীর উপস্থিতিতে বিচার কার্য চলত। এই বর্ণনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। - "On May the 14th 1772, the Governor and Council came to a determination as to 'the constitutional ground work of all their subsequent prceedings and their decision may be summarised as fallows :

The servants of the company employed in the districts under the designation of 'supervisiors' or supravisors were henceforth to be termed collectors'.

In each of the several districts a native office under the title of Diwan, should be appointed to inform or check the collectors."[৮৭]

রিপোর্টের মধ্যে অন্যত্র আছে, - "In the criminal court the cauzy and moofty of the district and two moolavis sat to expound the Mahomeddan Law and to determine how far delinquents were guilty of its violation. But it was the Callector's duty to attend to the proceedings of his court, so far as to see that all necessary evidence were summoned and examined and that the decision passed was fair and impartical."[৮৮]

প্রথম কবিতাটি থেকে জানা যায়, যে সব মামলা দায়রা সোপর্দ হত সেগুলির বিচার ফৌজদারী আদালতে হত না, কর্মচারীরা সেই মামলার নথি পত্র প্রস্তুত করে রাখত এবং যে 'সাহেব অধিকারী' তিনি বছরে দুবার জেলায় এসে সেই সব মামলার নিষ্পত্তি করতেন। এই দায়রা বিচার কাহিনীর নীরস তথ্যকে কবি প্রতিমা পূজার উপমার সাহায্যে অত্যন্ত সরস বর্ণনায় উপভোগ্য করে তুলেছেন। এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —

দিনেক দুই গতে　　হুকুম জারি ফৌজদারীতে
যেমত প্রতিমা পূজা হয়।
তবে শুন তার মজা　　যেমত হইল পূজা
প্রতিমা হইল সাহেব আসি।।
কাঁদিয়া আসন করি　　সমুখেতে সেজ ধরি
পূজা লন পূর্বমুখে বসি।

* * * *

খড়ম হইল কোড়া　　বানাতে বান্ধ্যাছে গোড়া
খাঁড়াইত তার জাফর খালাসী।।
চন্দন হইল কালি　　পুষ্প হইল কাগজগুলি
মেজের উপরে রাখে আনি।
নাহি কোশা টাট ছিপ　　শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ
সবে বাদ্য বেড়ির ঝন্‌ঝনি।।[৮৯]

মালদহ কালেক্টরী থেকে প্রাপ্ত নথিপত্রের মধ্যে সাধারণ অপরাধীদের জেলখানার মধ্যে সুরকী ভাঙা প্রভৃতি কাজে এবং গুরু অপরাধীদের বাইরে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিশ্রমমূলক কাজে নিয়োগের বিবরণ পাওয়া যায় (Report of the Regional

Records Survay Committee for West Bengal 1949-50 Maldah)। পরবর্তী কালে স্ত্রীলোকের বেত্রাঘাত নিষিদ্ধ হয়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের শুনানী এবং দায়রা কোর্টের মন্তব্য ইত্যাদি কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত হত এবং কাউন্সিল কাগজপত্র পরীক্ষান্তে, 'হুকুম' লিখে জেলায় পাঠাতেন। ফৌজদারী থেকে সেই হুকুম কার্যকরী করা হত। কবিতাটির এই বিবরণ অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যাশ্রিত। তদানীন্তন বিচাব ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য কাগজ পত্রাদির মধ্যেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।[২০]

আর বিচারের নামে সেই সময় যে হাস্যকর অসঙ্গতি দেখা যেত, তারই তীক্ষ্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'নাটোরের কবিতা'র ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় —

বুঝিলাম হক বটে　　জজ সাহেব ধর্ম্মবটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান।
গুণবান আমলা যত　　সাহেবের মনোমত
সাক্ষিরূপে পণ্ডিত প্রধান।।
কাজেব কিছু নাহি ছল.　　দুধের দুগ্ধ জলের জল
জজের আমনার ধর্ম্ম বটে।
প্রজাক ভরতের সাপ　　কলিতে প্রধান তাপ
তাহে ভাল মন্দ ঘটে।।[২১]

ইংরেজ শাসনাধিকারের প্রথমদিকে সরকারী আদালত ছাড়াও গভর্নরের মনোনীত সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণেব জাতি ধর্ম সম্পর্কিত অভিযোগাদির বিচার পৃথক বিচারালয়ে হত। একে 'Caste cutchery' বলা হত। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে সাধারণত শাস্তিস্বরূপ তাকে সমাজচ্যুত করা হত। প্রধানত, হিন্দু জমিদারগণই এই বিচারালয়ের কর্তা নিযুক্ত হতেন। বিনা অপরাধে সমাজ-চ্যুতি অভিপ্রেত না হলেও কোন কোন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ত হয়ে থাকবে। আর সমাজ-চ্যুতির থেকে জাতি-চ্যুতিও শাস্তি হিসাবে বলবৎ হতে দেখা গেছে কখনও কখনও। একটি-ছড়ায় পাই —

জাতির কর্ত্তা রাজীব রায়, মুলুকের শুবা।
তাঁর হুকুম তুচ্ছ করে দত্ত হলেন ধোবা।।'[২২]

অথবা —

হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস।
তার বেটা কায়েত হলো, বিশ্বাস খাষ।।'[২৩]

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার সংক্রান্ত সমস্ত কর্তৃত্ব চলে আসে ইংরেজের হাতে। গর্ভণরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কোনো কাজ করলেই নির্মম দণ্ড স্বীকার করতে

হত উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল বঙ্গদেশীয়কে। বিচারের নামে অনেক সময়েই প্রহসন অনুষ্ঠিত হত। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি এমনি এক স্বেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্ত। কোম্পানীর কাউন্সিলেব কতিপয় সভ্যের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমার কর্তৃক আনীত উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ নিয়ে হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ, এবং হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রে পরিশেষে বিচারের অজুহাতে নন্দকুমারের ফাঁসীর বিধান - গোটা বঙ্গভূমিতে তুমুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই কলঙ্কিত ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ঘিরে অনেকগুলি ছড়া রচিত হয়েছিল —

আজগুবী এক আইন হয়েছে
কৌলচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাঁধয়েছে।
হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফাঁসি হোল
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।[১৪]

এ সম্পর্কে আর একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছেন অণিমা মুখোপাধ্যায় যাতে সেই ঘটনার দিনক্ষণ সহ-বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে—

বাঙ্‌লা এগারশত বিরাশির সালে
২১ শে শ্রাবণ শানিবারের সকালে।
ব্রহ্মনাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে
হেষ্টিংসের হৃৎকম্প হতো যার দাপটে।[১৫]

অপর একটি ভাবপ্রবণ গ্রাম্য ছড়ারও উল্লেখ করেছেন তিনি —

মহারাজ নন্দকুমার রে।
তোর রাজ্যপাট কারে দিলিরে।।
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণীগো দিদি।
সি'তে ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিত কবলেন বিধি।।[১৬]

বস্তুত, এমন সর্বাঙ্গীন সঙ্কটময় শতাব্দী বঙ্গভূমিতে ইতিপূর্বে বোধহয় কখনো আসেনি।

ছড়ার চরণে চরণে ধরা পড়ে সমকাল। কল্পনার চেয়ে বাস্তবের আবেদন এখানে অনেক বেশী। তাই, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দিনে ছড়াগুলো এত অনিবার্য। অন্যদিকে আলোচ্য সময়পর্বের মুখ্য সাহিত্যকীর্তিগুলো (রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী, গীতিকা সাহিত্য ইত্যাদি) জীবন-ভূয়িষ্ঠ হলেও শুধুই সমকালকেন্দ্রিক নয়। এদের পরিধি অনেক ব্যাপক, এমনকি কালাতিক্রান্তি। অবশ্য শতাব্দীর জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণি এতই তীব্র যে এই সব সাহিত্যও তার আবর্তকে অস্বীকার করতে

পারেনি। সে আলোচনা পরে করছি। কিন্তু বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যটির গোত্র আলাদা। সমকালের জনপদজীবন এতে ছড়ার মতই স্পষ্ট, প্রাণবন্ত; আবার ছড়ার মতই কাব্যমূল্যহীন।

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বহু লোকজন সমভিব্যাহারে নিজের বাসস্থান খিদিরপুর থেকে গঙ্গা পথে তীর্থযাত্রা করেন। তাঁর নৌকা পুটিমারীতে পৌছালে ইছামতী ভাজনঘাট নিবাসী কবিরাজ বিজয়রাম সেখানে এসে ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী হন। সেখান থেকে বিজয়রাম বরাবর ঘোষাল মহাশয়ের আদেশে তীর্থযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর আগমনের পূর্ববর্তী স্থান সমূহের অর্থাৎ খিদিরপুর থেকে পুটিমারী পর্যন্ত পথের বিবরণ তিনি ঘোষাল মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।

কাব্যের পরিশেষে বিজয়রাম কাব্যরচনার তারিখ ও বাসভূমির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যটি যে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বচিত হয়েছিল তাও ব্যক্ত করেছেন —

সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্র মাসে।
বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে।।
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট নাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম।।[২৭]

এর থেকে জানা যায় যে, কাব্যটি সম্পূর্ণ হয় ১১৭৭ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যটি নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। কাব্যের ভূমিকায় বসু মহাশয় লিখেছেন, "সাধারণে যে উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন. আমাদের কবি কেবল সেই উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রী হন নাই, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য তাহার তীর্থযাত্রার একমাত্র সহায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন এবং পথে যাত্রাকালে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় প্রকাশ।"[২৭(ক)] বস্তুত, তৎকালীন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক চিত্র, জনগণের মনোভাব এবং ইংরেজ অধিকার কালের প্রথমদিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অন্য প্রকারের নানা চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যায়। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে স্বদেশযাত্রা করেন এবং সেই সময় হ্যারী ভেরেলষ্ট্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তিন বছর গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ছিলেন তাঁর দেওয়ান এবং ১৭৬৭ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত বাংলা দেশের সর্বময় কর্তা। বিজয়রাম তাঁর কাব্যের একাধিক স্থানে এই দেওয়ানের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি বর্ণনা করেছেন -

দেওয়ানজির গুণকথা কি কহিব বাণী।
গরিব সদয় বড় সর্ব্বত্র বাখানী।।

ভগবতীর কৃপা তাঁরে সর্ব্বলোকে বলে।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি রাখিলা ভূতলে।।[৯৮]

দেওয়ানজীর বদান্যতা, সহৃদয়তা এবং উপচিকীর্ষার অজস্র পরিচয় বিজয়রাম কাব্যমধ্যে রেখেছেন। অন্যত্র বলেছেন -

দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালাকা খামেদ।
উস্কো ভাই কেষনচাঁদ নাহি ভেদাভেদ।।[৯৯]

বলেছেন —

গোকুলচন্দ্র কালীমাতা তুমি বর দিবা।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি সদাই রাখিবা।।[১০০]

কিংবা —

দেওয়ানজীর সমোদাতা নাহি এই দেশে।
তাঁহার গুণের কথা দেশে দেশে ঘোষে।।[১০১]

তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়ও পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। কাশীপতি বিশ্বনাথ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালকে কাশী দর্শনের স্বপ্নাদেশ দেন। একথা সহোদরকে জানালে তিনি পরমানন্দে জ্যেষ্ঠকে তীর্থযাত্রায় সম্মতি দিয়ে বলেন —

এক কাজে তিনকাজ করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর।।[১০২]

দেওয়ানজী এই 'এক কাজে তিন কাজ' বলতে যে কি কি কাজের ইঙ্গিত করেছিলেন এখানে তা স্পষ্ট করে না বললেও এই তীর্থযাত্রার ফলে যে কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজনও সাধিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। তখন দেশে ইংরেজাধিকারের প্রথম অবস্থা। 'ইংরাজ গবর্ম্মেন্টের প্রথম আমলে বোগ্‌ল টার্ণার প্রভৃতির বৈদেশিক দৌত্য কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রা তদপেক্ষাও একটা সমারোহ ব্যাপার বলিতে হইবে। ইংরাজ রাজদূতগণ কয়েকজন নির্দিষ্ট লোক লইয়া স্বকার্য উদ্ধারে ভোটাদি স্থানে যাত্রা করেন, কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রাকালে তেমন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিলনা, যিনি তাঁর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়াছেন, ছোট-বড় বাছবিচার করেন নাই। তাই তীর্থমঙ্গল পাঠে মনে হয় - তাঁহার তীর্থযাত্রা যেন রাজারাজড়ার শোভাযাত্রা। ঘোষাল মহাশয় কেবল আপনার স্বগ্রামবাসী বা নিজ আত্মীয় স্বজন বা অনুচরবর্গকে লইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাঙলার

মধ্যে তাঁহার যেখানে নৌকা লাগিয়াছে, সেই সেই স্থান হইতেই যেন দু-একজন লোক আসিয়া তাঁহার তীর্থযাত্রার অনুযঙ্গী হইয়াছিলেন। এই লোকসংগ্রবের দুটি হেতু ছিল। প্রথমতঃ তাঁহাদের তীর্থকৃত্য দ্বারা তাঁহাদের সহিত তাঁহারও পুণ্যসঞ্চয় এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেই স্থানের ভিতরকার অবস্থা সংগ্রহ। কেবল যে তিনি ঐরূপ লোকমুখে শুনিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নয়। যে সব প্রসিদ্ধ বা জনাকীর্ণ স্থানে তাঁহার নৌকা লাগিয়াছে, সেইস্থানে উঠে বড় বড় লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াও তাঁহাদের সহিত মিশিয়া দেশের ও দশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন।"[১০৩]

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু গঙ্গা তীরবর্তী বাঙলা, বিহার ও কাশীপ্রদেশের সমৃদ্ধশালী জনপদসমূহে বিজয়রামের সময়ে যেসব প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক কর্ণধার ছিলেন, তাঁদেরও সন্ধান দিয়েছেন — "যাত্রাকালে কলিকাতায় বনমালী সরকারের ঘাটে রঘুনাথ মিত্র ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর, হুগলীতে দেওয়ান রাজকিশোর রায়, রাজমহলের ফৌজদার, সূর্য্যগড়ায় শঙ্কর মজুমদার, রাঢ়ে রামানন্দ সরকার, পাটনার ভায়া বিষ্ণুসিংহ রায়, রাজা সেতাব রায় ও দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, টিকারীতে (দক্ষিণদেশবাসী) দেওয়ান মাধবরাম, প্রয়াগে দুলাল চাটুয্যা, কাশীর আড়পারে রামনগরে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ এবং প্রত্যাগমন কালে গোটপাড়ার কালুরায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়।"[১০৪]

ইংরেজ আমলের প্রথমার্ধেই কলকাতা নগরী ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছিল। শাসনকাজের সুবিধার জন্য রাজধানীও স্থানান্তরিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে। 'তীর্থমঙ্গল' রচনার সময় কলকাতা নতুন শহর। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বহু-অট্টালিকা ও অভিজাত শোভিত। এই প্রসঙ্গে কবি বিজয়রাম লিখেছেন —

কলিকাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখ্যা বিশারদ।
রচিতে না পার্য্যা বলে কি হৈল আপদ।।[১০৫]

তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কবি প্রকটভাবে কোথাও তুলে ধরেননি। কিন্তু পরোক্ষে তাদের পরিচয় রেখে গেছেন গঙ্গাবক্ষে যাত্রাকালে দর্শনীয় স্থান-নামের পরিচয়ে। যেমন - বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ফকিরের বিশ্বাসঘাতকতায় যেখানে বন্দী হল, কিংবা নবাব মীরকাশিমের দক্ষিণ হস্তে গুরগণ খাঁ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করেও যেখানে নবাবের ভাগ্য ফেরাতে অসমর্থ হন সেই সব বেদনার ইতিহাসকে শুধু স্থান মাহাত্ম্যে চকিতে স্মরণ করে কবি পুনরায় ইংরেজ অধিকৃত বঙ্গ ভূমির ইংরেজ-লালিত দেওয়ানের প্রশস্তি কীর্তন করেছেন। একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি বামেতে থাকিল।
বায়ুবেগে নৌকাগণ চলিতে লাগিল।।

যথা হৈতে নবাবেরে ধর‍্যা লয়্যা ছিল।
সেই ফকিরের বাটী বামেতে থাকিল।।[১০৬]

সমসাময়িক কালের আর একটি কাব্য, সায়ের ফকির গবীবুল্লাহ্ রচিত 'ইউসুফ জোলেখা'র উপসংহার অংশেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে —

আল্লাতালা ছালামতে রাখিবে বাদশারে।
ছহি ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে।।
বজায় ছালামত রাখ রাজার দেওানে।
সিকদার চোপদার ইজারাদার জনে।।[১০৭]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনেকরেন, এখানে দিল্লীর সম্রাট (বাদশা), নায়েব নাজিম (বাদশার উজির) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (রাজার দেওয়ান) ইঙ্গিত আছে। অবশ্য 'সাহিত্যপত্রিকা'র বর্ষা সংখ্যা (১৩৬৫)-য় আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'বাদশা' আর 'রাজা' শব্দ দুটি এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আগের দুই পংক্তিতেই যখন কবি 'বাদশা' শব্দের ব্যবহার কবেছেন' তখন তৃতীয় পংক্তিতে এসে সেখানে 'রাজা' শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাই মনে হয়, এখানে রাজা বলতে ভূস্বামী অর্থাৎ বর্ধমানের রাজাদের প্রতিই কবি ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে এর রচনাকাল ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী হওয়াই সম্ভব। কারণ ঐ বছরই বর্ধমান রাজবংশের তিলকচন্দ্র রায় মোগল সম্রাট আহমদ শাহের কাছ থেকে প্রথম 'রাজা' খেতাব পান।

যাই হোক, গবীবুল্লাহর 'আমীর হামজা' কাব্যের প্রথম পর্বের দুটি পংক্তিতে মীরজাফরের পরবর্তী বাংলার নবাবীর প্রসঙ্গ পাই —

গরীব কহেন সাহা নেজামের পায়।
কেতাব মাফিক এত্তা দুর হইল দায়।।[১০৮]

কারোর কারোর মতে এই 'সাহা নিজাম ছিলেন স্বনামধন্য দরবেশ নিজামউদ্দীন আউলিয়া। কিন্তু তা মনে হয় না। কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তি যদি পীর হতেন, তাহলে কবির অন্যান্য কাব্যেও এঁর নাম থাকত। তাই বলা যায়, সাহা নিজাম কোন পীর-মুর্শিদ নন, বরং তদানীন্তন বাংলাদেশের শাসক। সঙ্গত কারণেই মনে পড়ে মীর জাফরের পুত্র নিজামউদ্দৌলা বা নাজিমউদ্দৌল্লার কথা - পিতার মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য (১৭৬৫-৬৬) যিনি বাংলার নবাবী নামেমাত্র লাভ করেছিলেন।

রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তিনি একাধারে কবি, সাধক ও সিদ্ধপুরুষ। সুললিত তত্ত্বসঙ্গীত দ্বারা মধুর মাতৃভাবে সাধনার প্রবর্তক। সেই কারণেই

স্থূল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর গভীর অধ্যাত্ম আবেগ-আপ্লুত পদগুলির বিশ্লেষণ নিতান্তই কষ্টসাধ্য। তবু মহৎ কবি মাত্রই যুগ সচেতন। তাই, প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে চলমান, অস্থির রাষ্ট্র-সঙ্কট প্রসাদী-সঙ্গীতে স্থান পেয়েছিল।

রামপ্রসাদের বাল্য-কৈশোর-তারুণ্যের দিনগুলোয় বঙ্গভূমি মুসলমান শাসনকর্তাদের অধীন ছিল। আলীবর্দীর রাজত্বকাল থেকে দিল্লী সম্রাটের অধীনে সুবা বাঙলা, উড়িষ্যা আর রইল না। নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌল্লা, তাঁর প্রিয় দৌহিত্র, বাংলার মসনদে বসলেন। শুরু হল অপশাসন, ব্যভিচার। সিরাজ মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কাশিমবাজারের ইংরেজদের কুঠি অধিকার করলেন, কলকাতা আক্রমণ করলেন, অবশেষে পলাশীর রণক্ষেত্রে অস্তমিত হলেন। সুবা বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের অতিশোচনীয় মৃত্যু হল। পলাশী-যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের দিনে বঙ্গভূমিকে পাকাপাকিভাবে মুষ্টিগত করল ইংরেজ। বাঙালী সর্ব বিষয়ে তার স্বাধীনতা হারাল। রামপ্রসাদ তখন পূর্ণবয়স্ক। দেশের এই অন্তর্বিপ্লবকে তিনি স্বচক্ষে দেখলেন। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরের করাল ক্ষুধা আপন চৈতন্যের কোষে-কোষে অনুভব করলেন। আর এই অনুভূতি থেকেই জন্ম নিল মাতৃসঙ্গীত। আসলে, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা আর সঙ্কটের সময় বিশ্ববিধায়িনী শক্তির সংহার রূপিনী মূর্তিটিই তাঁর মানস-অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর তাই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে কম্পমান ধরিত্রীর সন্তানরূপে সর্বনাশিনী শ্যামার ভয়ঙ্কর কালো রূপের উপাসনায় উদ্‌গীত হয়েছিল শ্যামা-সঙ্গীত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একেই সমর্থন করেছেন।[১০৯]

সুতরাং রামপ্রসাদের শক্তিসাধনের উৎস হল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভগ্নপ্রায় যুগজীবন। তিনি নিজে তাঁর বাস্তভিটা সম্বন্ধে গানের দু-এক স্থানে কিছু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা থেকে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। যেমন একটি সঙ্গীতে আছে —

থাকি একখানা ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে।।[১১০]

এর থেকে এটুকু অনুমিত হয় যে - রামপ্রসাদ দালান কোঁটাতে বাস করতেন না। কিন্তু চিরদিনই কি ?

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝ্‌লি নাতো মররে ঠেঁটা।।
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা।[১১১]

এ থেকে মনে হয় একসময় রামপ্রসাদের 'দালানকোঠা' ছিল, কিন্তু কালগ্রাসে সব খোয়া গেছে —

শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে।।
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে।।[১১২]

পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের সাংসারিক অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। তাঁর বয়স তখন ষোল বছরের অধিক ছিলনা। সে সময় নদীর দুই তীরেই বর্গী-পাঠান প্রভৃতির অত্যাচারে রাজ্যের পরিস্থিতি অরাজকাতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তদুপরি নদীর ভাঙন ও পারিবারিক বিসম্বাদ। এই সবকিছুর মিলিত চাপে নিজের অধিকার থেকে (অর্থাৎ পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি) ছিট্‌কে পড়লেন রামপ্রসাদ। আর একটি গানেও সমকালের প্রসঙ্গ আছে —

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি।।
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে দিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলি জমিদারী।।
হুজুরে দবখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।[১১৩]

কৃষ্ণপান্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত রাজনৈতিক চরিত্র। ১১৫৬ সালে, ইংরাজী আনুঃ ১৭৪৯ খ্রীঃ রানাঘাটের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কথিত আছে, কৃষ্ণপান্তী পিতার মৃত্যুর পর কেবল একটি আধুলি সম্বল করে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। নিজের অধ্যবসায় বলে লক্ষ্মীর কৃপায় বহু বিত্ত উপার্জন করেন এবং বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী জমিদাররূপে খ্যাতি লাভ করেন। রামপ্রসাদের জীবৎকালেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়, এবং পালচৌধুরী বংশের কৃতী পূর্বপুরুষ কৃষ্ণপান্তী প্রভূত ভূসম্পত্তি ক্রয় করে ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে এও জানতে পারি যে, হুজুর কৃষ্ণপান্তীর দেখা পেতে হলে সাধারণ মানুষকে নজরানা নিয়ে উপস্থিত হতে হত (হুজুরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব টাকাকড়ি)। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে উকিলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কথাও আলোচ্য গানে পাওয়া যায় (নরসিংহ বসু প্রসঙ্গে উকিলের কথা আছে)। রামপ্রসাদের আর একটি পদেও 'উকিল'-এর ভূমিকা বিবৃত হয়েছে —

দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথায় রে।।
লাখ উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।[১১৪]

গানটির অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সুদূর প্রসারী হলেও সমকালের দৃষ্টিকোণে দেখলে মনে হয় 'দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথায় রে' বলতে কবি পুতুল নবাবদের ক্ষমতাবান উপস্থিতির কথা বলেছেন।

উকিলের কার্যকলাপ - দলিল সই, ডিক্রিজারি, সওয়াল জবাব, মোকদ্দমা - এই সব কিছুই রামপ্রসাদের পদে ঘুরে ঘুরে এসেছে —

শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।।
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিল কালে।।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে।।[১১৫]

সাধারণ মানুষের ঐহিক সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে; কূটরাজনৈতিক চালে সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। ক্ষমতাবান জবরদখল করছে দুর্বলেব ভিটেমাটি; খলতম পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। এরকম বিভীষিকাময় রাজনৈতিক অবস্থাটিকেই রামপ্রসাদ প্রকারান্তরে তুলে ধরেছেন তাঁর পদাবলীতে —

এ যে বিষম লেটা।
যেটা কবুলতি সেই সত্য হল, মিথ্যা করে দিলি পাটা।।
এক জনাকে জমি দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা।
এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা।।
জমী জরিপ করে দিলিমা, কোণে কোণে মেপে কাঠা।
এবার কিস্তির সময় বুঝবে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা।।
প্রসাদ বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টো লেঠা।
আমি কিস্তি মত খাজনা দিলেম, তবু টাকায় সিকি ব্যাটা।।[১১৬]

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা বঙ্গভূমিকে তারা করায়ত্ত করেছে। দেশের প্রকৃত শাসক শক্তিহীন হয়ে পড়েছে মনে করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে—

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে।।
ইজাবার পাট্টা পেয়ে এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে।।[১১৭]

বাংলাদেশে রামপ্রসাদের সঙ্গীত যুগ-যুগ ধরে প্রচারিত, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রত্যহ গীত। কবি তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'-এ লিখেছেন ঃ 'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।' সত্যিই তাই হয়েছে। প্রসাদী গান অষ্টাদশ শতাব্দীর দুঃখময় জীবনেব ঘোর তমসার ওপর বৈরাগ্যের সুরকে বাজিয়ে তুলেছে। মানুষকে সহ্য শক্তি দান করেছে। দুঃখবাদের

মধ্যেও মাতৃচরণে অসীম নির্ভরতা গানগুলোকে যুগান্তকারী মর্যাদা দিয়েছে —

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তিমুক্তি করতলে দেখ।।
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুনে কথা রাখ।।[১১৮]

এই অক্লান্ত আকৃতি ও মাতৃ-নির্ভরতাই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ, নৈরাশ্য পীড়িত এবং দ্বিধা-চঞ্চল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিবাচক ভিত্তি।

গীতিকার মধ্যেও রাজনীতি-অনুসন্ধান একটু আয়াস সাধ্য। কারণ, মৈমনসিংহ গীতিকা আর পূর্ববঙ্গ গীতিকার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে প্রেম। সমাজের ছবিও এসেছে। তবে প্রেমিক-প্রেমিকার অবারিত উচ্ছল ভালোবাসার মধ্যে কাঁটার মত প্রায়শই অশান্তির দূতরূপে তা উপস্থিত থেকেছে। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্দশাগ্রস্ত রাজনৈতিক জীবন এগুলোতে ততটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এছাড়া, সব কটি গীতিকাকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্তও মনে করতে পারি না। পূর্ব পূর্ব শতাব্দীতেও বেশ কিছু রচিত হয়েছে। এদের মধ্যেই প্রাসঙ্গিক কয়েকটিকে বেছে নিয়ে আলোচ্য শতাব্দীর রাজনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিলেন মূলত মুসলমান। প্রশাসনে, বিচারব্যবস্থায় নবাব ও তাঁর আমলা শ্রেণীরই অবাধ আধিপত্য। কাজীর ভূমিকাও প্রবল ছিল। তবে গীতিকা-রচয়িতারা কারোর আচরণেই সততা লক্ষ্য করেন নি। যেমন - 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত হয়েছে কাজী চোরকে আশ্রয় দিয়ে কয়েদ করে সাধুব্যক্তিকে —

চোরে আশ্রা দিয়া মিয়া সাউদেরে দেয় কার।।
ভালামন্দ নাহি জানে বিচাব আচাব।
কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার।।[১১৯]

যাঁর ওপর দেশের বিচারকার্যের ভার, সেই কাজী পরস্ত্রী মলুয়ার দৈহিক সৌন্দর্যকে সম্ভোগের বাসনায় একটার পর একটা কুৎসিৎ পথ অবলম্বন করেছে। প্রথমে কুটনি লাগিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছে —

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে।
একবারে বসেগিয়া কুটুনির ঘরে।।[১২০]

* * *

কিন্তু অর্থের প্রলোভনে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও বশীভূত হয়নি মলুয়া। তখন মলুয়ার

স্বামীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে কাজী। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় এজাতীয় স্বেচ্ছাচারিতার কথা আগেও উল্লেখ করেছি —

হুকুম করিল কাজী পেয়াদা পশ্চাতে।
"বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইস্কার ময়দানে।।
জেতায় রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও।
তার ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও।।
জাঙ্গিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির।
তাহার হাউলীতে নিয়া করিও হাজির।।"[১১১]

দেওয়ান --- যিনি গোটা দেশের রক্ষক তার স্বরূপটিও আলোচ্য গীতিকায় স্পষ্ট ফুটেছে। বিলাসিতা আর ব্যভিচারের কদর্য স্রোতে নিজে যেমন ভাসমান, তেমনি মলুয়ার মত সাধ্বীকেও আয়ত্ত করতে চেয়েছেন বৈভব দানের প্রতিশ্রুতিতে। এই ধরণের স্থূল, ইন্দ্রিয় সর্বস্ব ব্যক্তিই ক্ষমতার উচ্চ চূড়ায় বসে অষ্টাদশ শতাব্দীকে অবক্ষয়ের নিম্নতম স্তরে টেনে নিয়ে গেছে। দেওয়ান পদমর্যাদা ভুলে বলেছে —

আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও।
দুষ্মনি করিয়া আর মোরে না ভাবাও।।
আরাম খানা খাইয়া বস পালঙ্ক উপরে।
পিত্থিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে।।[১১২]

প্রকৃতপক্ষে গীতিকায় যতটুকু রাজনৈতিক চিত্র পাই, তাতে অনাচার আর অস্থিরতা ছাড়া কিছু নেই। 'কাফেন চোরা পালা' (আয়না বিবির পালা) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ঘটনা সম্বলিত। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক তাঁর 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা'র তৃতীয় খণ্ডে সংযোজিত আলোচ্য পালার ভূমিকায় বলেছেন, কাফেন চোরা মনসুর আলী ডাকাতের উপদ্রব চলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে, অর্থাৎ ত্রিপুরা চট্টগ্রামে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে, পাহাড়ী ও মঘ দস্যুর অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতি উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। 'কাফেন চোরা পালা'র কবি, মনসুর আলি ডাকাতের দুরন্ত দস্যুবৃত্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের অসুস্থ, বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাতেই তার প্রতিপালন সম্ভব —

মাও নাই বাপ নাই নাই রে বাড়ী ঘর।
ডাকাতি করিয়া ফিরে জঙ্গলার ভুতর।।
খুন করে ডাকাতি করে মনে নাই তার দুঃখ।
সিং কাড়ি বাহির করে ঘরের সন্ধুক।।[১১৩]

আর একটি পালার কথাও উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল 'মাণিকতারা ডাকাইতের পালা'। দীনেশচন্দ্র সেন এই পালাটির রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন, "এই সমস্ত দস্যুভীতি ও অরাজকতাব বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীযমান হয় যে, এই পালা ইংরেজাধিকারের কিছু পূর্বে অর্থাৎ মুসলমানাধিকারের অবনতির দিনে রচিত হইয়াছিল। গানটির রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।"[১১৪ক] এই পালার নায়িকা মাণিকতারাব দস্যুবৃত্তির বর্ণনায় তৎকালীন যুগের দস্যু ভীতি এবং তাকে দমন করার পরিবর্তে নতি স্বীকারের প্রবণতা লক্ষ্য কবা যায়। দেশের দেওয়ান ও কাজী সকলেই ডাকাতদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। একটা অংশে পাই —

দেশের দেওয়ান কাজী ডরায় মাণিকতারার নামে।
সাধুর ডিঙ্গা সেলামী দেয় ভাটি আর উজানে।।[১১৫]

মাণিকতারা চরিত্রটি অসাধাবণ। তদানীন্তন যুগের সুকুমারীবৃত্তি প্রধান নায়িকাদের মাঝখানে মাণিকতারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়ী। অস্থিত ও বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মেলাতেই হযত এই জাতীয় নারীরা একে একে আবির্ভূত হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক অসংযমী প্রশাসকদের নির্যাতনেব হাত থেকে নয়ত নারীর আত্মরক্ষার উপায় ছিলনা।

আমরা দেখলাম, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি ছড়ায় যতখানি জীবন্ত কাব্যসাহিত্যে ততটা নয়। এখন আমরা বেশ কিছু চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনা করব। আলোচ্য শতাব্দীর বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দলিল হিসাবে এগুলোর পৃথক মূল্য স্বীকার করতেই হবে। কোনো সামন্ত নৃপতি বা বৃহৎ ভূস্বামীর সঙ্গে মুসলমান ফৌজদার বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনাই এই পত্রাদির কেন্দ্রীয় বক্তব্য।

উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা গদ্যেব সমৃদ্ধির সূচনা। ইতিপূর্বে 'গদ্য' রূপটির সঙ্গে বাঙালী হয়ত কোনোক্রমে পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে উপযুক্ত মনে করেনি। তাই, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মুখ্যত কাব্যময়। কিন্তু চিঠিপত্রে গদ্যের ব্যবহার বেশ প্রাচীন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কুচবিহাররাজ নবনারায়ণেব একখানি চিঠিই হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাংলা গদ্যে রচিত বেশ কিছু চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের ফৌজদার লিখিত, "অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি, থানার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগেব থানাতে ফৌজ পাঠাইতেছি।" কিংবা আসামেব বড় ফুকন লিখিত, "তোমাব পত্র সমাচার পহুঁছিল। তাহাব শুনিযা পবম প্রসন্ন হৈলাম।" পত্রগুলি বাঙলাব বাইরে বচিত এবং এর উদ্দেশ্যও নিছক বাজনৈতিক। ভাষা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, প্রয়োজনেব চাপে আদৌ বিকৃত নয়। কিন্তু এই [illegible] সময়ে রচিত পত্রগুলি আববী-ফাবসী শব্দের বাহুল্যে যথেষ্ট পীড়িত। এগুলোব

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহারাজ নন্দকুমারের লেখা দু'একটি চিঠি। নন্দকুমার শেষ জীবনে যে শোচনীয় রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়েছিলেন, এই দ্রুতলিখিত পত্রগুলির মধ্যে তার উত্তাপ স্পর্শ করেছে —

"..... অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য। মুখ প্রক্ষালিনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যতযত পাইলাম তাহা কত লিখিব। ... এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার জান লোপ হইল।"[১১]

নন্দকুমারের এই পত্র ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিপদের বিষন্ন সম্ভাবনা ও তা থেকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। তৎকালীন রাজনৈতিক সংঘর্ষের চাপে চিঠির ভাষাও নিরাভরণ, রিক্ত, হতাশাক্লিষ্ট। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র গুরুদাসকে আর একটি পত্রে তিনি লিখেছেন —

"তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল। পরন্তু শ্রীযুক্ত মিস্তর মেদনটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবস কালে এখান হইতে রাহি হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্যদ্বাশ বুঝিবে। তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না।"[১১]

চিঠির বক্তব্য রাজনৈতিক ভ্রূকুটি-কুটিল, ইঙ্গিতপূর্ণ। দেশের সর্বময় শাসক ইংরেজের সঙ্গে মতানৈক্যের কুফলটুকু চিঠি দুটোতে প্রতিফলিত।

রাজ্যশাসন, বিচার, অভিযোগ প্রভৃতি শাসন-বিভাগীয় যেসব চিঠি ভারত সরকারের 'মহাফেজাখানা'র ধূসর অন্ধকার ত্যাগ করে সম্প্রতি মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাতে ইসলামী শব্দ ও আইন-আদালতের এমন সমস্ত জটিল, পারিভাষিক শব্দ রয়েছে যে, তার মধ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশোন্মুখ রূপটি প্রায় বিপর্যস্ত হয়েছে। অধিকাংশ পত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীকে লিখিত। এগুলির সম্বোধন পাঠ অতি জটিল এবং লিখনপদ্ধতি বাঁধাবুলিতে পর্যবসিত হয়েছে।[১১]

প্রায় সবকটি চিঠিতেই একই বাক্‌ভঙ্গিমা অনুসৃত হয়েছে। কুচবিহার থেকে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ কর্ণওয়ালিশকে যে পত্র লিখেছিলেন তার ভাষার বিকাশ যেন মধ্যপথে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু এক বিষয়ে বাঙালী অগ্রসর হয়েছিল। এই সময়ে রচিত সমস্ত চিঠিতেই "কুম্পানীর ছায়া লইয়াছি"[১১] "কুম্পানী বাহাদুরের সরণাগত দস্তবস্তা হাজির আছি"[১১], - এই জাতীয় বিনয়োক্তি পাওয়া যাবে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাঙালী ভূস্বামীদের বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং সর্বোপরি তাঁবেদারী সুলভ মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কুচবিহারের কলহ-বিবাদে

কর্ণওয়ালিশকে হস্তক্ষেপ করার জন্য কুচবিহারের রাজা এবং রাজমাতা কমলেশ্বরী দেবীব আর্তনাদপূর্ণ বহুপত্র কলকাতায় প্রেরিত হয়েছিল। এমনকি, ক্যাপ্টেন ওয়াল্‌স্‌ সসৈন্যে আসাম পরিত্যাগ করে আসার প্রাক্কালে আসামের বুড়া গোহাঞিং, বড় গোহাত্রিত, বড় বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রীরা বড়লাট স্যার জন শোরকে সকাতরে অনুনয় বিনয় করে লিখেছিলেন —

"আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করিয়া কাপ্তেন ওবালিচ সাহেবকে (অর্থাৎ ওয়ালেস) ফৌজ সমেত থাকিয়া শত্রুদমন করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন।"[১০২]

এই সমস্ত চিঠি পত্রের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্গভূমি ও তার সীমান্ত অঞ্চলের সামন্ত শাসিত প্রদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি কিভাবে বেড়ে চলেছিল। কিন্তু সাধাবণ বৃত্তিজীবী বাঙালী বণিকদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিত্তলোলুপ কর্ম্মচারীদের যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব কলহ হত তারও কয়েকটা প্রমাণ আছে।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহবিমোহন ও জয়কৃষ্ণ শর্মা লিখছেন, তাঁদের ধোপা যখন তসরের কোরা কাপড় কাচছিল তখন - "মেঃ শেল্‌ সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামাখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবালোককে ধরিয়া লইয়া গেলো। আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা যাইয়া সাহেব মজকুরকে হাজির করিলো। তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক, ... পুরায় তোমরা আইয়াছ। সাজাই দিব।"[১০৩]

অত্যাচারের আরো বর্ণনা আছে —

"মেঃ ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতি লোককে কাপড় বুনিতে দেয় না। মুচলেকা লইয়াছেন। সে ওয়ায় ইংরেজ কোম্পানী আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না। ইহাতে তাতীলোক আমাদিগের কাপড় বুনিতে নারাজ। যদি ছাপীয়া আমাদিগের কাপড় কেহ বোনে, তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারাপিট করেন। ইহাতে আমাদিগের কর্ম্ম কাজ বন্ধ হইয়াছে। জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়।"[১০৪]

শ্রী হরিমোহন ওলন্দাজ কোম্পানীর কাছ থেকে দাদন নিয়ে তসরের কাপড় সরববাহ করতেন। ঈর্ষাতুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তা সহ্য করতে না পেরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিকেব ওপর কিরূপ অত্যাচার করত, তার সামান্য পরিচয় পাওয়া গেল এই অভিযোগ পত্রে।

প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই এই শতাব্দীব সমাপ্তিমুখে যেসব চিঠি

লেখা হয়েছে তার ভাষা যেমন পরিচ্ছন্ন, বক্তব্য বিষয়ও তেমনি নতুন জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। যেমন - ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষাল 'মহামহিম মহিমাসমূহ শ্রীযুত রাইট হানবিল গয়র নর জানেরেল বাহাদুর হাহেবকে' যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন তা অভিনব বলতে হবে। তাঁরা লিখেছিলেন —

"জাহারা কানা খোড়া আতুর অচল ও পুঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত অনাথা পিতামাতহিন ও পতিপুত্রবিহিন শক্তিরহিত। শ্রম করিয়া আত্ম ভরণপোষণ করিতে অযোগ্য। সর্ব্বদা সহরের রাস্তাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চাপচে ও অন্য ২ অসদগতিতে। তাহাদিগের মৃত্যু হইলে পরে সহবের মুরদাফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়াদেয়।"[১৩৫]

এইসব দূর করার জন্য খিদিরপুরের স্বনামধন্য ঘোষালদ্বয় গভর্ণর জেনারেলের নিকট কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব করেছিলেন। পরিশেষে বলেছিলেন, "ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি, এজন্য বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম।"[১৩৬]

এই সামান্য একটি পত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নবজাগৃতির যে প্রবল বন্যা বাঙালীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবল আঘাত হেনেছিল, তাতেই তারা বিদেশী শাসকের কাছ থেকে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারগুলো বুঝে নেবার প্রেরণা পেয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫১০।
২) তদেব, পৃ: ৪৩৩।
৩) তদেব, পৃ: ৪৩৩।
৪) পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১, পৃ: ৩৬।
৫) রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫৬-৫৭।
৬) তদেব, পৃ: ৪২৫।
৭) তদেব, পৃ: ৫০৫।
৮) তদেব, পৃ: ৩৫৭।
৯) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৪৬।
১০) তদেব, পৃ: ১০২।
১১) যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ১৬৮।
১২) তদেব, পৃ: ১৬৯।

১৩) তদেব, পৃ: ১৬৯।

১৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৯৯।

১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৮, পৃ: ৭৮৯-৭৯১।

১৬) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৬৮৬।

১৭) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ: ৫৩৬।

১৮) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ২৮।

১৯) তদেব, ভূমিকা

২০) তদেব, ভূমিকা

২১) History of Bengal, Vol II, 1948, P-397

২২) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ২৯।

২৩) তদেব, পৃ: ২৯।

২৪) তদেব, পৃ: ৩৫১।

২৫) তদেব, পৃ: ৩৫১।

২৬) মদনমোহন গোস্বামী, ভারতচন্দ্র, ১৯৮৪, পৃ: ৯৯।

২৭) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৩৫২।

২৮) তদেব, পৃ: ৩৫২।

২৯) তদেব, ভূমিকা

৩০) তদেব, পৃ: ৬৮৬।

৩১) তদেব, ভূমিকা

৩২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভাবতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৯৫।

৩৩) নদীয়া কাহিনী, ১৩১৮, পৃ: ২৭।

৩৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৯৫।

৩৫) তদেব, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬।

৩৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৮, পৃ: ৮২৯-৮৩১।

৩৭) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দাদত্ত সম্পাদিত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০,

৩৮) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ১৫৫।

৩৯) তদেব, পৃ: ১৫৫-১৫৬।

৪০) তদেব, পৃ: ১৫৬।

৪১) তদেব, পৃ: ১৫৭-১৫৮।

৪২) নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী. ১৯৮৮, পৃ: ৩৮৮।

৪৩) তদেব, পৃ: ৬৮।

৪৪) তদেব. পৃ: ৩৮৮।

৪৫) তদেব, পৃ: ৩৮৯।

৪৬) তদেব, পৃ: ৩৮৯।

৪৭) তদেব, পৃ: ৩৮৯।

৪৮) হারাধন দত্ত সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্র পুরাণ বা ভাস্কর পরাভব, ১৩৭৩, পৃ: ১-২।

৪৯) তদেব, পৃ: ৩৪।

৫০) তদেব, পৃ: ৪।

৫১) তদেব, পৃ: ৪-৬।

৫২) তদেব, পৃ: ১২-১৪।

৫৩) তদেব, পৃ: ৬-৭।

৫৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী. ১৩৬৯, পৃ: ১৩।

৫৫) তদেব, পৃ: ১৪।

৫৬) বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮, পৃ: ১১২।

৫৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১২-১৩।

৫৭(ক) হারাধন দত্ত সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ১৩৭৩, পৃ: ৯।

৫৮) New History of the Marahatas, 1948, P-211.

৫৯) হারাধন দত্ত সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ১৩৭৩, পৃ: ৯।

৬০) তদেব, পৃ: ১১।

৬১) তদেব পৃ: ১২-১৩।

৬২) তদেব, পৃ: ১৫।

৬৩) তদেব, পৃ: ১৭।

৬৪) তদেব, পৃ: ৩০।

৬৫) তদেব, পৃ: ৩০।

৬৬) তদেব, পৃ: ৩০-৩১।

৬৭) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ১৮।

৬৮) হারাধন দত্ত সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্রপুরাণ, ১৩৭৩, পৃ: ৩৬।

৬৯) তদেব, পৃ: ৩৭।

৭০) তদেব, পৃ: ৪১।

৭১) তদেব. পৃ: ৪২।

৭২) তদেব, পৃ: ৪৯-৫১।
৭৩) তদেব, পৃ: ৫১।
৭৪) তদেব, পৃ: ৫১-৫২।
৭৫) তদেব, পৃ: ২৫।
৭৬) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৮১, পৃ: ৩৯৮।
৭৭) মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৮৮, পৃ: ৩৯৫।
৭৮) পলাশীব ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ১৯৯৪, পৃ: ২৪৬-২৪৯।
৭৯) নিখিলনাথরায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৮৮, পৃ: ৩৯৬।
৮০) তদেব, পৃঃ ৩৯৯।
৮১) অণিমা মুখোপাধ্যায়, আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ: ১৪৪।
৮২) যদুনাথ সরকার সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, ভূমিকা, ১৯৬০, পৃ: ৪।
৮৩) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্র ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৮৯৯, পৃ: ৯৭।
৮৪) পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পুঁথি পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ: ১০৯-১১০।
৮৫) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ৭৪।
৮৬) তদেব, পৃ: ৭৪।
৮৭) তদেব, পৃ: ৭৫।
৮৮) তদেব, পৃ: ৭৫-৭৬।
৮৯) তদেব, পৃ: ৭৬।
৯০) The Fifth Report from the Select Committee of the House of the Commons on the Affairs of the East India Company, Introduction, Cambridge History of India), Vol.V, P-6.
৯১) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ৭৭।
৯২) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ৮৫।
৯৩) তদেব, পৃ: ৮৫।
৯৪) তদেব, পৃ: ৮৬।
৯৫) অণিমা মুখোপাধ্যায়, আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ: ১৪৬।
৯৬) তদেব, পৃ: ১৪৬।
৯৭) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল, ১৩২২, পৃ: ২২৭।
৯৭(ক) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ২।

৯৮) তদেব, পৃ: ১২৩।
৯৯) তদেব, পৃ: ২২৬।
১০০) তদেব, পৃ: ২২৬।
১০১) তদেব, পৃ: ২২৬।
১০২) তদেব, পৃ: ৭।
১০৩) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ৫।
১০৪) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ৬।
১০৫) তদেব, পৃ: ২২২।
১০৬) তদেব, পৃ: ২২০।
১০৭) আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ: ৫৪।
১০৮) তদেব, পৃ: ৫৫।
১০৯) সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ১৩৬৯, পৃ: ৮৭-৮৮।
১১০) শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, ১৯৬৭, পৃ: ৪২৬।
১১১) তদেব, পৃ: ৪২৪।
১১২) তদেব, পৃ: ৩৯৫।
১১৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩৪৬।
১১৪) তদেব, পৃ: ৩১৮।
১১৫) তদেব, পৃ: ২৮৮।
১১৬) তদেব, পৃ: ৩৬১।
১১৭) তদেব, পৃ: ৩০২।
১১৮) তদেব, পৃ: ৩৪১।
১১৯) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৭১-৭২।
১২০) তদেব, পৃ: ৭২-৭৩।
১২১) তদেব, পৃ: ৮৫-৮৬।
১২২) তদেব, পৃ: ৮৮।
১২৩) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ: ২৬৭।
১২৩(ক) তদেব, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭২, পৃ: ২৩০।
১২৪) তদেব, পৃ: ২৮৯-২৯০।
১২৫) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৩, পৃ: ২৯।

১২৬) তদেব, পৃ: ২৯।

১২৭) তদেব, পৃ: ২৯।

১২৮) তদেব, পৃ: ৩০।

১২৯) তদেব, পৃ: ৩০।

১৩০) তদেব, পৃ: ৩০।

১৩১) তদেব, পৃ: ৩০।

১৩২) সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ১৯৪২, পৃ: ৮০-৮১।

১৩৩) নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৮, পৃ: ৩১।

১৩৪) সুরেন্দ্রনাথ সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ১৯৪২, পৃ: ৩।

১৩৫) তদেব, পৃ: ২০৯।

১৩৬) তদেব, পৃ: ২০১।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন

সমাজ যদি হয় বহির্কাঠামো, তবে তার প্রাণভ্রমরটি নিঃসন্দেহে অর্থনীতি। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি-অবনতি তথা দেশীয় অর্থনীতির পরিবর্তন বা তার প্রভাবের সঙ্গেই গোটা দেশের ভাগ্য জড়িত থাকে। সমাজের সর্ব স্তরে তার তরঙ্গ এসে পৌঁছায়। শিল্প-সাহিত্যও বাদ পড়ে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে এ যুগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করলে এই তথ্যকেই সত্য বলে বিশ্বাস হয়।

ইতিহাস বলে অষ্টাদশ শতাব্দী হল অরাজকতার শতবর্ষ, কেন্দ্রীয় শক্তির পতন, সিংহাসন নিয়ে সহিংস সংগ্রাম, গৃহযুদ্ধ, প্রাদেশিক সুবাদারদের বিদ্রোহ, বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক আক্রমণ, বর্গী হাঙ্গামা, ঔপনিবেশিক বণিক শক্তির আবির্ভাব, মন্বন্তর, সন্ন্যাসী-ফকির অভ্যুত্থান — সব কিছু মিলিয়ে এই শতাব্দী অগ্নিবর্ষী। এমতাবস্থায় বঙ্গভূমির আর্থ-সামাজিক জীবনমান যে খুব একটা উন্নত হবে না, তা বলাই বাহুল্য। তবু পলিমাটিতে গড়া বাংলার বিস্তৃত, উর্বরা, সমতল ভূমি, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য শাখানদীর জলধারায় পুষ্ট কৃষিভিত্তিক জনজীবন সহজে নিঃস্ব হয়নি। অনেক শোষণের পরিণামে বঙ্গভূমি তার অন্নসংস্থান হারিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পাতায়-পাতায় আছে সেই আগ্রাসনের, সেই যন্ত্রণার ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের আর্থিক সমৃদ্ধির গুণগান করেছেন বেশ কিছু বিদেশী পর্যটক ও মুসলমান প্রত্যক্ষদর্শী। আর এই সমৃদ্ধির উৎস হিসাবে তারা চিহ্নিত করেছেন কৃষিকে। যেমন রবার্ট ওরমে বলেছেন, বাংলার সবচেয়ে বড় ফসল ধান। নিম্ন বঙ্গে ধান এত প্রচুর পরিমাণে জন্মায় যে, ফসল ওঠানোর সময় মাত্র এক ফার্দিনে দু'পাউণ্ড ধান পাওয়া যায়।¹ মুর্শিদকুলি খানের আমলেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। "স্বভাবতই এই সময়ে 'দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে লোক তাহা পরিজ্ঞাত ছিলনা। খাদ্য সামগ্রীর বাণিজ্য বিষয়ে কৈবল্য তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা বাজার দরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, শস্যাদির মূল্যের সাময়িক বিবরণী সংগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল। কোনও ব্যবসায়ী নির্দ্ধারিত বাজার দরের উপর মূল্য চড়াইলে বা অধিক লাভের আকাঙ্খায় বিক্রয় স্থগিত রাখিলে যথেষ্ট শাস্তি পাইত আর এরূপ অপরাধীকে গর্দ্দভ পৃষ্ঠে নগর পরিক্রমণ করান হইত। সহর ও বাজারে শস্যাদির আমদানী স্বাভাবিক আমদানী অপেক্ষা অল্প বিবেচিত হইলে বাণিজ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগন মফঃস্বলের মহাজনদিগকে মজুদ শস্য বাজারে আনিতে বাধ্য করিতেন। মুর্শিদাবাদে এ সময়ে সাধারণত টাকায় ৴/৫ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইত। অন্যান্য শস্যাদি ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এই অনুপাতে সুলভ ছিল, এই কারণে রিয়াজ গ্রন্থকার গোলাম হোসেন এই স্থলে বলিয়াছেন, এ

সময়ে মাসে এক টাকা আয় হইলে একজন লোক দু'বেলা উদর পুরিয়া 'কালিয়া পোলাও' খাইতে পারিত। তাঁহার নির্দেশমতে চাউল টাকায় ৫/৬ মণ ছিল। এই কারণে দরিদ্র ভিক্ষুক পর্যন্ত আনন্দে কালাতিপাত করিত।'[১] 'Dow's Hindoostan, Vol.I. Ciii ' এ পাই,—

"Bengal from the mildness of its climate, the fertility of its soil, and the natural history of the Hindoos, was always remarkable for its commerce "[২]

এ জাতীয় বৈভবের বর্ণনা আছে আরো অজস্র। টার্ভানিয়ে, মানুচি, মানবিক, টমাস বাউরি, লিন্‌সকোটেন, পেলসার্ট, ফর্স্টার, থীভনট্ প্রমুখেরা বাংলার গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা সব্জির মনোহর বর্ণনা দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সার্বিক সম্পন্নতার কথাই ঘোষণা করেছেন বারবার।

সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচলিত হতে হয় আলোচ্য পর্বের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পর। সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা যেখানে শুধুই ঐশ্বর্যের নির্যাসটুকু গ্রহণ করেছেন, গণমানসের প্রতিনিধি সাহিত্যিকের দল সেখানে আলোর নীচে অন্ধকারের অতল সুড়ঙ্গেরও সন্ধান পেয়েছেন। ফলে সীমাহীন বুভুক্ষার খাঁটি বর্ণনার পাশে রাজ রাজড়ার ঐশ্বর্যের চেকনাই রঙিন আর জমকালো আষাঢ়ে গল্পের মত আকাঙ্খকর হয়ে পড়েছে।

এটা ঠিক, এই সময়ে অর্থনৈতিক কাঠামো ক্ষণভঙ্গুর ছিলনা। ছিল মূলত কৃষিভত্তিক। কৃষিজাত পণ্যও উৎপাদিত হত প্রভূত। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে কবি সমকালিন চাষ-আবাদের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহড়।
মসূরাদি বরবটি বাটুলা মটর।।
দে-ধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা ঘর।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব।।[৩]

কিন্তু সমস্যা অন্যদিকে। ফসলের এই প্রাচুর্য সাধারণ কৃষকের ভোগে লাগত না। সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' (১৭১১) এর সাক্ষ্য দেয়। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষিজীবি বাঙালী গৃহস্থের সত্যকার দিনলিপি এখানে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করেছেন। দেবতা নয়, ক্ষেত্রপতি কৃষক শিব এ কাব্যের নায়ক। ক্ষুধার তাড়নায় সংসারের চাপে তাঁকে লাঙল ধরতে হয়েছে। কারণ, ভিক্ষান্নে পরিবার আর চলে না। তাই শিব গৃহিনী স্বামীকে কর্মযোগে টেনে আনতে চেয়েছেন —

চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন।।[৫]

আসলে পার্বতী মানেন সেই চিরপুরাতন তত্ত্ব - কৃষিতে ঘরের লক্ষ্মী বাঁধা। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগের অবক্ষয়কে তিনি চেনেন না। নিত্যদিনের দারুণ অভাবের কশাঘাত যে ভূমিলক্ষ্মীর অকৃপণ দানেও বিদূরিত হবার নয় এই অধুনা প্রচলিত ব্যবস্থা নারী-বুদ্ধির অগোচর। অন্যদিকে নেশাসক্ত, অলস হলেও শিব জীবন-সচেতন। তিনি জানেন, কৃষিকার্যের বহুশ্রমলব্ধ দৃষ্টিনন্দন সবুজ ফসলের অন্তরালে রিক্ত চাষীর দীর্ঘশ্বাস অবিচলই থাকে। তাই লোকঠকানো সৌভাগ্যের আশ্বাসে সর্বদর্শী শিব সহজে ভোলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক সমাজের আর্থিক দুর্গতির প্রকৃত রহস্যের জট খুলে যায় তাঁর প্রত্যুত্তরে —

বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা।
দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা।।
ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।।
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর।।
চাষ বলে ওরে চাষী অগে তোকে খাব।
মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব।।
অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাৎ বিপরীত।।
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বাব কর‍্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।।
ক্ষেত্যা দেখি খন্দ যদি খাত্যে নাহি পায়।
কুত্যা কাত্যা কায়েত কিফাতি করে তায়।।
কাঁদাপানি খেয়ে খাট্যা করে চাষীপণা।
নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা।।
চাষ অভিলাষ ক্ষেমা কর ক্ষেমঙ্করি।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি।।[৬]

সুতরাং কাদা মাটি মেখে জল ঘেঁটে নিজের ক্ষেতে নতুন ধানের শোভা দেখে মুগ্ধ হলেও অভাবের নিদারুণ সঙ্কটকে উপেক্ষা করতে পারেনি 'সোনার বাংলা'র অভাগা কৃষকেরা। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির অত্যাচার তো ছিলই, তার ওপরেও ছিল রাজার প্রসারিত হস্তের লোলুপ চাহিদা। ফলত চাষীর চোখের সামনে দিয়ে নিঃশেষে ক্ষেত শূন্য করে

চলে যেত সমস্ত তাজা ফসল। তখন শুধুই অনতিক্রমনীয় অনটন আর অনাহার। এই হল অষ্টাদশ শতাব্দীব সমৃদ্ধ কৃষির অন্তঃসারশূন্য ছলনার জীবন্ত ছবি।

স্বভাবতই পেটের দায়ে বাংলার চাষী বিপুল, অপরিশেষ কর ভারের পাকে পাকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হত। আসলে ভূমির উপরেও তাদের কোনো প্রজা স্বত্ব ছিল না। খেয়ালবশে জমির মালিক প্রজা পরিবর্তন করতেন। ফলে রায়তের দুর্দশা পৌঁছেছিল চরমে। প্রজার রায়তী স্বত্বের পাট্টা না পাবার দুর্গতি ইন্দ্রের কাছে শিবের চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ অংশে দেখা যায় —

শিব বলে শক্রু কিছু চক্র বক্র আছে।
খন্দ হলে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে।।
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটা টুকি পাল্যে পরিণাম শুদ্ধ হয়।।[৭]

যাহোক, গৃহিণীর অনুরোধে সাংসারিক অচলাবস্থা দূর করতে অতঃপর শিব নিমরাজি হয়ে কৃষিতে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অভাব দেখা দিল কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্রেব। দেববাজ ইন্দ্র সমস্ত ভূমির অধীশ্বব। তাঁর কাছে যাত্রা কবা যেতে পারে। তিনি হয়ত কিছুটা জমি ব্রহ্মোত্তব হিসাবে দেবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিমুখ করবেন না। সত্যিই প্রত্যাখ্যাত হতে হল না হৃতসর্বস্ব দেবাদিদেবকে। ইন্দ্র সানন্দে সম্মত হলেন —

ভৃত্যে কেন ভূমি মাগ ভূমিস্বামী হৈয়া।
যত পাব জোত কর কাজ নাঞি কয়্যা।।
. . ..
কবে লয্যা মসীপত্র কশ্যপের বেটা।
দেবদেবে লিখ্যা দিল দেবোত্তর পাটা।।
বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী দির্ব্বান নই।।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান।।
ডুম্বরের ডোরে পাটা বান্ধ্যা দিগম্বর।

ইন্দ্রকে আশীষ কব্যা আল্য যমঘর।।[৮]

মহেশ্বর যমেব কাছে মহিষ চাইলেন, যম সাদরে মহিষ দিলেন। নিজের বৃদ্ধ ষাঁড় এবং যমের মহিষে চমৎকাব হেলে যোগাড় হল।

রামেশ্বর রচনাবলীর সম্পাদক শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী এই শিব-ইন্দ্র সংবাদ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন প্রয়োজনীয় বোধে তা উদ্ধৃত করছি —

" . . শিব ইন্দ্র সম্বাদের মধ্যে কবি রামেশ্বর যে একান্তভাবে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অবং কৃষকসমাজের ভূমি-স্বত্তের সার্থক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ, ভূস্বামীর নিকট নিষ্কর ভূমি পাইতেন। কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের নিকট কবিই ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। জমিদারগণ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর এবং গোচর নির্দ্ধাপত রাখিতেন, কখনও উপরোক্ত ভূমিগুলি কাহাকেও দিতেন না। উহা ব্যতীত অন্যান্য পতিত জমি জমিদারগণ দান করিতেন বা কৃষকগণকে খাজনা করিয়া পাট্টা লিখিতেন। ভূমি সম্পর্কে মৌখিক কোনো নির্দেশ উভয় পক্ষই রাখিতে সাহস করিতেন না। পতিত ভূমি দেখিয়া জমিদার হয়ত বিনা খাজনায় কোন জমি কৃষককে দিয়াছেন, কৃষক তাহার পরিশ্রমের দ্বারা পড়া বা পতিত জমিকে উদ্ধার করিয়া সোনা ফলাইয়াছে, জমি উর্ব্বর হইয়াছে, জমিদার তখন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিলেন। সেইজন্য তখনকার দিনে রায়তী-পাট্টার প্রচলন ছিল। পাট্টায় শুধুমাত্র ভূমির রকম অর্থাৎ আবাদী বা অনাবাদী এবং ভূমির পরিমাণ লিখা থাকিত না, উহাতে 'তাজা' 'খার্সা' ফসলে কিরূপ কর ধার্য্য হইবে, তাহারও উল্লেখ থাকিত। শুকা, হাজা বা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে ফসল ভাল হয় না, তখন ত রায়ত সাধারণ হারে কর দিতে সক্ষম হইবে না। সেই জন্য জমিদার কর্ত্তৃক রায়তকে দেয় পাট্টায় এইসব বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিত। এই পাট্টার বলেই রায়ত জমিদারের কর্ম্মচারীর অহেতুক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইত। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে সে কালে পাট্টা না দিয়ে প্রজাকে ব্যতিব্যস্ত করারও প্রচলন ছিল - শেষকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোম্পানীকেও পাট্টা রেগুলেশন পাশ করতে হয়েছিল, যাতে জমিদারেরা পাট্টা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরের নানা রিপোর্টে জানা যায়, রেগুলেসান সত্ত্বেও পাট্টা ঠিকমত দেওয়া হতনা। ... ... (তাই), শিব ঠকবার পাত্র নন। একেবারে পাকা কাগজ চাই, পাট্টা চাই। তা না হলে বিশ্বাস নাই।' (সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিমলচন্দ্র সিংহ, পৃঃ ৯৬) শিবের এই মনোভাব তো বাংলার দরিদ্র কৃষকেরই মনোভাব।"

কৃষিকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় লাঙল, জোয়াল, কোদাল, দা, উখুন, পাশী, লাঙলের সুন্দর ঈষ, কোদালের ভাল বাঁট সব কিছু সংগ্রহ হবার পর অভাব দেখা দিল বীজধানের। আর এই প্রসঙ্গে শিব-দুর্গার সংলাপে কবি বাঙালী চাষীর জীবন- যন্ত্রণার আর একটি করুণ দিক তুলে ধরেছেন। সেটি - কৃষিঋণ। ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার একটি অনিবার্য কারণ। কবি রামেশ্বর শিবের মুখ দিয়ে এই তথ্যটিও ব্যক্ত করিয়েছেন --

কাত্যায়নি কর্জ্জ কর কুবেরের কাছে।
ভিখারীকে ভয় ভাব্যা ভঙ্গ দেয় পাছে ।

এটি কোনো বিক্ষিপ্ত চিত্র নয়, বাংলার কৃষক সাধারণের অতিপরিচিত, সদা-অনুভূত প্রাণধারণের প্রাত্যহিক সমস্যা। এই সমস্যার মোকাবিলা করতেই তারা সদসৎ নানা উপায় কল্পনা করে। ভিখারীর পত্নী হলেও ভূপতির কন্যা হবার সুবাদে মহাজনের

কাছে অতিরিক্ত ঋণপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় গৌরীকে কুবেরের কাছে পাঠানোর প্রস্তাবে এই মানসিকতাই প্রকাশিত। বস্তুত এই সব কারণেই কৃষির প্রতি কৃষকের অনীহা ক্রমে বাড়তে থাকে, এবং ক্ষতির মাত্রা হিসাব করে ব্যবসার প্রতি তারা আসক্ত হয়। কবি রামেশ্বর ছিলেন সেই ক্ষয়িষ্ণু অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয়-লগ্নের কবি। কৃষিকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা তখন নিম্নবিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। আর ততদিনে ইওরোপীয় বণিক সমাজের কল্যাণে বাণিজ্যের অর্থও ধরা পড়েছে স্বচ্ছদৃষ্টি বাঙালীর কাছে, পার্বতীর উক্তিতে সেই সত্যের প্রকাশ - 'পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল'। কিন্তু শিবের কৃষি বৈরাগ্য বড় অনমনীয় —

চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি।।[১১]

হয়তো মানুষের চিন্তা বিবর্তনের এই চোরাপথেই একদিন নগরকেন্দ্রিক বণিক সভ্যতা ও পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের সময় বাংলার কৃষি আরো পঙ্গু, আরো নির্জীব হয়ে পড়েছিল। আর তাতে মৃত্যুর - 'এলিজি' পাঠ করেছিল বর্গী-লুঠেরার দল। ধীরে ধীরে সুজলা ধরিত্রীর সুফলা শ্যামলতা হারিয়ে যেতে বসল ধূসর রিক্ত ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরের হাতছানিতে। এই ভাবেই ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশে বাংলার শস্য সম্ভারের প্রসন্ন সচ্ছলতার ছবি চিরতরে বিলীন হয়ে গেল ইতিহাসের দিগন্তে।

দ্বিজ রামেশ্বর ভণিতাযুক্ত 'আখোটীপালা' এবং 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'তেও একই চিত্রপট। শিবায়ন কাব্যের নায়ক-নায়িকা মর্ত্যজাত নন। কিন্তু শেষোক্ত কাব্য দুটির কাহিনীতে মাটির পৃথিবীর অভাব- পীড়িত মানব-মানবীর জীবন- যন্ত্রণাই মূল উপজীব্য।

'আখোটী পালা'র নায়ক হতদরিদ্র মনাই ব্যাধ। হোসেন শহরের সুখ-ঐশ্বর্যে ভরপুর রাজা মানসিংহের প্রাসাদের অদূরে তার জীর্ণ কুটির। ধনী গৃহের চোখ ধাঁধানো সমৃদ্ধির পাশে বুভুক্ষু গৃহহীন মানুষের এই উপস্থিতি নাটকীয় বৈপরীত্যমূলক। মনাই ব্যাধের জীবন-যন্ত্রণা কবি প্রত্যক্ষদর্শীর মত বর্ণনা করেছেন ---

সম্বল নাহিক ঘরে সদা রহে বসি।
অন্ন নাহি ঘরে তার যেমন সন্ন্যাসী।
তিনখানি ছেঁড়া কানি পরে তার নারী।
শনি দৃষ্টে পড়ে যেন শ্রীবৎস সুন্দরী।।[১২]

'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'র ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মাও নিতান্ত অভাবী। একমাত্র অবলম্বন ভিক্ষা ('লঙ্ঘনে বঞ্চন কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ')। কিন্তু ভিক্ষাতেও লাঞ্ছনা ---

ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে।
কেহ ঘরে নাঞি কেহ থাকিয়া না শুনে।।

দাতা কৃষ্ণ কোথা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
বাটী বাটে গিয়া মাঠে অপরাহ্ন কালে।
বিষাদে বসিলা বিপ্র বট বৃক্ষতলে।।[১৩]

পেটের জ্বালায় ব্রাহ্মণ অবশেষে দেহত্যাগের সংকল্প করেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য অতিলৌকিক হস্তক্ষেপে এই অপমৃত্যু নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন্ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পরাভবের এই চূড়ান্ত স্তরে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে ? নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধি নয়। জানি, কবির কল্পনায় অতিশয়োক্তি থাকবেই - তবু এমন নির্ম্মম ও অসঙ্কোচ দারিদ্র্যের জন্ম দিতে অতিরঞ্জনকে ছাপিয়ে বাস্তবেরই জয় ঘোষণা করেছেন তাঁরা।

প্রায় একই সময়ে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' (১৭১১ খ্রীঃ)। এখানেও দেখি জনসাধারণের জীবন নাজেহাল মূলত রাজা এবং রাজকর্মচারীর অত্যাচারে —

রাজকর লোকের তে সনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হলো দেশছাড়া।।[১৪]

শাসকশ্রেণীর এই শোষণ-ঐতিহ্য কালাতিক্রান্তি। তাই ঘনরামের কাব্য রচনার প্রায় ষাট বছর পরে রচিত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলেও দৃশ্যপট প্রায় অপরিবর্তিত। এখানেও কবি সদ্য-প্রাপ্ত উচ্চপদের অধিকারী মহামদকে শক্তির ফয়দা তুলতে দেখেছেন এইভাবে —

দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষবিনে প্রজাগণে দুস্খ দেও নিত্য।।
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সদ্য গুণাকার করে।।
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।[১৫]

শাসন ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন এই অরাজকতা, সাধারণ শ্রমজীবি তখন বাধ্য হয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে। কিন্তু প্রার্থিত অন্ন দেবে কে ? আপামার গৃহস্থ যে বিপর্যস্ত অর্থনীতির নিম্নগামী স্রোতে অনেকটাই অধঃপতিত। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'শালেভর পালা'য় এজাতীয় দৃষ্টান্ত পাই। পুত্রহীনা রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় শালে ভর দিয়েছিল। হনুমান এই সংবাদ ধর্মঠাকুরকে জানালে তিনি ব্যস্ত হয়ে রঞ্জাবতীর কাছে আসতে উদ্যত হন। এই সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। সে

'ব্রহ্মহত্যা দিতে যায় ধর্ম্মের উপর'। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জানায় —

দ্বিজ বলে ধর্ম্মদেব হত্যা দিতে ক্ষিপ্র।।
আমারে অখিলে সে করেছে অতিদৈন্য।
ভিক্ষা বিনে ভবনে ভরসা নাহি অন্ন।।
সাতভাই গৃহস্থ ঘরে গেলাম ঠাকুর।
ভিক্ষা নাহি দিল আর ছোবাল কুকুর।।[১৬]

এই ব্রাহ্মণ এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহারকারীরা তৎকালীন দৈন্য লাঞ্ছিত সমাজের অবশ্যম্ভব সৃষ্টি।

প্রশ্ন উঠতে পারে অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শী বা নামকরা ঐতিহাসিকদের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের তথা সমকালীন সাহিত্যের কেন এই অসঙ্গতি ? তাহলে কি তাঁরা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করেছেন, নাকি সাহিত্যে দারিদ্র্যের বিলাসিতাকেই গণ-আকর্ষণের যুৎসই মাধ্যম বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। উত্তরটা কোনো পক্ষকেই আঘাত না করে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার প্রথমার্ধ নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধির যুগ। ভূমির উর্বরতা, উৎপাদন প্রাচুর্য, নিখুঁত বণ্টন ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি, দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসকদের কর্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই এই পর্ব 'সোনার বাংলা' নামে অভিধা পাবার যোগ্য। এবং দ্বিতীয়ত, সমকালীন সাহিত্যের বেশ কিছু অংশে দারিদ্র্যের পাশাপাশি সম্পদের স্ফীত বর্ণনায় মুখর হয়ে সাহিত্যিকরাও জীবনের তুলাদণ্ডে সমতা বজায় রেখেছেন। বিত্তহীনের পাশাপাশি বিত্তবানের সচ্ছল অস্তিত্ব একপেশেমির অভিযোগ থেকে তাঁদের মুক্তি দিয়েছে।

ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, গীতিকা সাহিত্য - প্রভৃতিতে সম্পন্ন মানুষের বনেদি জীবনাচরণের কথা পাই। ছোট্য রাজ্য ময়নার অধিপতি কর্ণসেনের জীবনচর্যায় সমৃদ্ধির যে গগনচুম্বী বর্ণনা দিয়েছেন ঘনরাম চক্রবর্তী পরবর্তীকালে 'অন্নদা- মঙ্গল' কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে এবং ভবানন্দের ভরাট সংসারের সুখ-ঐশ্বর্যের চেকনাইয়ে তারই অনুবর্তন করলেন ভারতচন্দ্র। মৈমনসিংহগীতিকাও তাকে সমর্থন করল। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে তো ফলন প্রাচুর্য থেকে সুলভ দ্রব্যমূল্য পর্যন্ত আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রতিটি পারম্পর্যই ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। যেমন 'মানসিংহ' অংশে বন্ধন প্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে সেরা জাতের যাট প্রকার ধানের নাম উল্লিখিত হয়েছে —

দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।।
কালিন্দী কনকচূড় ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুপি সুঁদী।।

ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার।।
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি।।
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে।।
বাজাল মরিচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্কবচিনা চিনি সমতুল।।[১৭]... ইত্যাদি

'শিবায়ন' কাব্যেব 'ধান্যের নাম ও গীত সমাপ্তি' অংশে এমন শতাধিক জাতের ধানের নাম পাওয়া যায়।[১৮]

অর্থনীতির সূত্রানুসারে উৎপাদনের প্রাচুর্য দ্রব্যমূল্য অনিবার্যভাবে কমায়। 'অন্নদামঙ্গল'কার হীরামলিনীকে দিয়ে সেকথাই বলিয়েছেন —

সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিযাছি আধ সের পাইতে সন্দেশ।।
আট পাণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্য আম চিনি।।

দুই পণে এক পণ কিনিযাছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান।।[১৯]

অথচ আট পণে আধসের চিনি ও দুইপণে একপণ পানের মূল্যাকে মহার্ঘ বলেছে হীরা - 'মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।' সুতরাং এই দেশের মানুযের দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্যের সহজলভ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ ওঠা উচিত নয়। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনজীবনের এই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মুগ্ধ হয়েই বিদেশীরা এ দেশকে 'সোনার বাংলা', 'ভারতের ভূস্বর্গ', 'জান্নাতুল ফিলাদ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন।

মৈমনসিংহ গীতিকায় সমৃদ্ধির চিত্র আরো বেশী অনুপুঙ্খ। রাজা-জমিদার-বণিক-দেওয়ানদের তো বটেই এমনকি কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পন্নতার দৃশ্যও এতে বিরল নয়। উচ্চবিত্তের বিলাসপূর্ণ প্রাসাদ, সোনার পাত্রে অন্ন গ্রহণ, গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম, নারীদের অলঙ্কার, আভরণ ইত্যাদি সব কিছুতেই গীতিকার কবিরা অনেকখানি এগিয়ে। 'কাজল রেখা' গাথায় অতিথি আপ্যায়নের জন্য কাজলরেখার সাড়ম্বর আয়োজনের বর্ণনা পাওয়া যায়—

সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত।
ঘরে ছিল পাতি নেবু কাইট্যা দিল তাত।।
সোনার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
ঘরে মজা সবরি কলা কইরা দিল চির।।
সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি।
তাম্বুলে সাজায কন্যা সোনার বাটাখানি।।[১০]

আবার 'কমলা' গাথায় সোনার পানসী চড়ে জমিদার পুত্র প্রদীপ কুমারের শিকার বিলাসের[১১] কাহিনীও আছে। গীতিকাগুলির সর্বত্র এ জাতীয় অজস্র দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে কৃষকদের সচ্ছল জীবনযাত্রার ছবি পাঠককে আকর্ষণ করে বেশী। যেমন - 'মলুয়া' গাথার হীরাধর দাস বিত্তশালী কৃষক। তাব পাঁচ পুত্র এক কন্যা। গোলাভর্তি ধান ও সরিযা, দশটি দুগ্ধবতী গাভী, বাইশ আরা (প্রায় আঠাশ বিঘা) জমি এবং তা চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় হালের বলদ - এই সব নিয়ে তার সঙ্গতির অভাব হয়না কোনোদিনই ---

সরু শস্যে ভরা টাইল গোলাভরা ধান।।
ঘরে অছে দুধ বিয়ানী দশগোটা গাই।
হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই।।
বাইশ আরা জমীন তার সাইল আর আমন।[১২]

এমনকি হীরাধরের বসতগৃহের বর্ণনাও সম্পন্ন কৃষক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ বাগান, পুকুর বিশিষ্ট বহির্দ্বার যুক্ত পাকাবাড়ি। 'দেওয়ান মদিনা' গাথায়ও বিত্তবান কৃষক জীবনের পরিচয় পাই।

সমকালীন দোকান বাজার ইত্যাদি ব্যবসার বর্ণনা কোনো কোনো সাহিত্যে করা হয়েছে এবং তাতেও মধ্যবিত্তের আশঙ্কার কোনো কারণ দেখা যায়নি। যেমন - বিজয়রাম সেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গা তীরবর্তী 'ভগবানগোলা' নামে বিশাল বাজারের কথা বলেছেন —

ভগবানগোলা হাটে শীঘ্র আইল তরী।
মহা কলরবে সভে বলে হরি হরি।।
গোলাহাট দেখি তুষ্ট হৈলা সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া দেখেন সহর ভুবন।।
চারিক্রোশ গোলাহাট দেখিতে সুন্দর।
সাঁখারি কাঁসারি তাঁতি আছয়ে বিস্তর।।
সড়কে সড়কে মুদী বহুত দোকান।
হাট বাজার দেখি সবে করয়ে বাখান।।

ধান চালুর গোলা কত না জায় গণন।
দুই দিন থাকি তথা করিলা গমন।।[২৩]

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এখানে শস্যের পাইকারি ব্যবসা থেকে বাণিজ্য শুল্ক হিসাবে বাংলা সরকার বছরে তিন লাখ টাকা পেত। .. .... এখানে প্রধানত শস্য, তেল ও ঘি পাইকারি বিক্রি হত।'[২৪]

এমনই আর একটি সমৃদ্ধ বাজারের বর্ণনা করেছেন রামপ্রসাদ সেন তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে। বর্দ্ধমান শহরে সদ্য আগত সুন্দর এখানকার হাট-বাজাব দেখে চমৎকৃত হয়েছে। দেশী-বিদেশী কারবারকারীদের সমাগমে জমজম করছে সেইস্থান —

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার।।
বণিজি দোকানি কত শত শত ঠাঁই।
মণিমুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই।।
বনাত মখ্মল পটু ভূষনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।।
মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমীর পছন্দ।।
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিম্মতের।
খরিদার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের।।
সুলভ সকল দ্রব্য যাচাই তাপাই।
বাজারে বেসাতি নাই রাজার দাহাই।।[২৫]

ইংরেজ আগমনের ফলশ্রুতিতেই মূলত বিদেশী জিনিসপত্র এত সুলভে আমদানি করতে পারা গেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে পণ্য সামগ্রী বিদেশী বণিকদের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে রপ্তানিও শুরু হয়ে গিয়েছিল এই সময়ে। আর রপ্তানীটা হত প্রধানত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে নির্মিত নতুন বন্দর কলিকাতার মাধ্যমে। বিদেশী বণিকসহ সর্বভারতের বণিক কুলের দৃষ্টি পড়েছিল বাংলার প্রাচুর্যময় সস্তা দ্রব্যের উপর। দেশ-বিদেশের বণিকেরা বাংলার হাট-বাজারে উপস্থিত হয়ে কাঁচা পয়সার বিনিময়ে ক্রয় করতে থাকে দেশীয় পণ্য সামগ্রী। এরই পরিচয় পাওয়া যায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কৃষ্ণনগরের গড় বর্ণনা প্রসঙ্গে —

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস।।

দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।।
... ...
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন।।[২৬]

এই সমৃদ্ধির পাশেই সমসাময়িক সাহিত্যে আছে অভাবী মানুষের কাহিনী। রামপ্রসাদ সেনের মন্তব্য ধরেই আমরা এগোতে পারি। বর্দ্ধমান বাজারের সারিসারি বিলাসদ্রব্যের বর্ণনা ছলে অতি সংক্ষেপে কবি সেগুলোর অন্তঃসারশূন্যতার কথাও বলে গেছেন উপরিউক্ত অংশে ('খরিদার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের '[২৭])। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী পণ্য সম্ভারের অফুরন্ত আয়োজন নিয়ে নিঃশব্দেই পড়ে আছে বিপনন কেন্দ্রগুলো, কারণ - খরিদ্দারের অভাব। আর এই অভাবের কারণটির মধ্যেই নিহিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত সত্য।

এই সত্যান্বেষণের তাগিদে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের দিকে।

শেরশাহের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে মোগল বাদশাহগণ 'ফরমান' জারি করেছিলেন। শেরশাহের আদর্শ ছিল জনকল্যাণ। আকবর বাদশাহ ছাড়া এই আদর্শ আর কারোর ছিল না। জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবা-বাংলার শাসন পদ্ধতির ক্রমপরিণতিতে দেখা যায়, একদিকে বিলাস-বৈভব সমৃদ্ধ রাজন্যবর্গ ও অভিজাত-সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে ধন বৈষম্যের প্রাচীর সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে। এই বৈষম্যই বঙ্গভূমির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের গোড়ার কথা।

যে কোনো মানদণ্ডে মুঘল আমলে কৃষকের ওপর খাজনার হার ছিল অত্যন্ত বেশী। বাদশাহ ঔরংজেবের কালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে হল উৎপাদনের প্রায় অর্ধাংশ। বঙ্গভূমির প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমলে খাজনার হার ফসলের অর্ধাংশ ধার্য করা হয়। এর অর্থ হল আজকের বর্গাদারদের মতে সেযুগের রায়ত শ্রেণীকে তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে খাজনা হিসাবে। অতএব, এমন ভাবা অযৌক্তিক নয় যে, আজকের বর্গাদারী অর্থনীতির মতো প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের কৃষকের অর্থনীতিও ছিল একই রকম দুর্বল ও নুব্জ। কোনো প্রাকৃতিক কারণে ফসল হানি হলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব ছিলনা। কাজেই বলা যায়, নবাবী বাংলার অর্থনীতির যে রঙিন ছবি বিদেশী পর্যটকেবা এঁকেছেন তা আসলে নির্বিশেষ জনসাধারণের জীবন যাত্রার সত্যকার অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি নয়। বিদেশী পর্যটকেরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাজা, অভিজাত, জমিদাব বা বণিক শ্রেনীর। পর্ণ কুটীবে বসবাসকারী বিত্তহীনেব দল তাঁদেব

জ্ঞানচক্ষুর সামনে আসার সুযোগ কোনোদিনই পায় নি। এই সব শ্রমজীবির কাছ থেকে সরকারী আমীল রাজস্বের নামে কেড়ে নিত সমস্ত কৃষি উদ্বৃত্ত। খোরাকির উপরে সঞ্চয় বৃদ্ধির সামান্যতম সুযোগ তারা পেতনা। আর অর্থাভাবের কারণেই তাদের চাহিদাও ছিল নগণ্য। এস. ভট্টাচার্য তাঁর 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গ্রন্থে একেই সমর্থন করেছেন।[২৮]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন সুশাসক। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে অসুস্থ, বিশৃঙ্খল বঙ্গভূমির দেওয়ানরূপে এ দেশের মাটিতে তাঁর প্রথম পদার্পণ। আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ এই সময়ে এতই হ্রাস পেয়েছিল যে সৈন্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্য সুবা থেকে টাকা আনতে হত। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁ পূর্ব ব্যবস্থার আমুল সংশোধনে বদ্ধপরিকর হলেন। উন্নত ধরণের একটি রাজস্ব পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করলেন। তাঁর ভূমি বন্দোবস্তের পূর্বে জায়গীর-ভোগী সরকারী কর্মকর্তারা রাজকীয় সম্পত্তি ভোগের পরিবর্তে খাজনা বা রাজস্ব প্রদান প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। তাছাড়া রাজস্ব নির্ধারণের কোনো নিদিষ্ট প্রক্রিয়াও ছিল না।

আদায়কারী কর্মচারীরা, অনেক সময় ব্যক্তিগত লাভের জন্য ইচ্ছা মত প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত। মুর্শিদকুলি খান এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নতুন এক পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। প্রথমতঃ, তিনি খাজনা আদায়কারীদের বাংলার সমস্ত জমি জরীপ করার হুকুম দিলেন। এই জরীপ 'জমা-ই-কামিল-তুমার' নামে পরিচিত। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। বাংলার জমিকে আবাদী, অনাবাদী ও বন্ধ্যা — এই তিন ভাগে ভাগ করে মুর্শিদকুলি প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের হিসাব এবং কৃষকের ক্ষমতা বিচার করে ভূমি রাজস্ব ধার্য করলেন। আর এই সূত্রে বাংলাদেশেকে তেরটি চাকলায় বিভক্ত করা হল। এই তেরটি চাকলার অর্ন্তভুক্ত মহাল বা পরগণার সংখ্যা ছিল ১৬৬০ এবং রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। শাহ সুজার সময়কার বন্দেবস্তের (১৬৫৮) উপর রাজস্ব বাড়ানো হল ১১,৭২,২৭৯ টাকা। অর্থাৎ ৬৪ বছরে (১৬৫৮-১৭২২) ১৩.৫ শতাংশ রাজস্ব বাড়ল।

দ্বিতীয়তঃ পুরাতন জমিদারদের খাজনা প্রদানে অক্ষমতা এবং অনীহা লক্ষ্য করে নবাব জমিদারদের নামেমাত্র বহাল রেখে ইজারাদার বা ঠিকাদারের উপর উপযুক্ত চুক্তি পত্রের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ইজারা প্রাপকরা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত, তার জন্য পূর্বেই তাদের জামিনস্বরূপ সেই পরিমাণ টাকার চুক্তিপত্রে সই করতে হত। এই ব্যবস্থা 'মাল জামানী প্রথা' নামে পরিচিত। ইজারাপ্রাপ্তরা যে সকলেই নতুন লোক তা কিন্তু নয়, অনেক পুরোনো জমিদারও একাজে নিযুক্ত হতেন। এই ইজারাদাররাই পরবর্তীকালে নতুন জমিদার হিসাবে গণ্য হলেন। জন্ম নিল এক নতুন অভিজাত শ্রেণী। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই 'কনট্রাক্ট সিস্টেম' বা 'মালজামিনী ব্যবস্থা'কে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, ইজারাদারদের প্রবল চাপে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারগুলি মুর্শিদকুলি ও কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[২৯]

বাংলার কৃষি-অর্থনীতির ওপর মুর্শিদকুলির ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব গভীর। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করলেও প্রাপ্য অংশের শেষ কণাটিও উশুল করে নিতেন। আর এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে নির্মম খুব কম শাসকই ছিলেন। সলিমুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে ('তারিখ-ই-বাঙ্গালা') মুর্শিদকুলির কঠোরতার বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন। রাজস্ব বাকি পড়লে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অর্থাৎ আমিল, কানুনগো, মুৎসুদ্দি এবং জমিদারদের বন্দী রাখা হত। অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চলত। বলাই বাহুল্য রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি বেশ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই চাপের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্বভাবতই প্রজাদের ওপর জোর খাটাতে হত জমিদার, তথা ইজারাদার শ্রেণীকেও। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাই লিখেছেন যে, টাকার জন্য মুর্শিদকুলি দেশটাকে ছিঁড়ে টুকরো করছেন।[৩০]

মুর্শিদকুলি এক খাতে (ওয়াজামাৎ খাসনোবিশী) ২,৫৮,৮৫৭ টাকার বাড়তি ভূমি রাজস্ব আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এছাড়া সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাংলা থেকে সোনার মোহর যেত। এজন্যও তিনি রায়তদের কাছ থেকে কর নিতেন। সাধারণত খালসা জমিতে আবওয়াব ধার্য হত, যদিও তার অংশ তেমন বিশাল নয়। তবে, মুর্শিদকুলির বাড়তি ভূমি করের আরোপ বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে একদমই শুভ হয়নি।[৩১] তাই এই সময় দ্রব্যমূল্য যথেষ্ট কম থাকলেও, কিংবা ফলন বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়নি, পুঁজি গড়ে ওঠেনি। বাংলার মানুষ ক্ষেতে ও তাঁতে শ্রমের বিনিময়ে সামান্যতম সম্পদের মুখও দেখেনি। ফলে দুর্দিনে এরা সঞ্চয়ের অভাবে মেষপালের মত শুধু দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত। অবশ্য একটা কথা ঠিক যে, বঙ্গ অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা ও বেআইনি ব্যবসা মুর্শিদকুলির হস্তক্ষেপেই নিবারিত হয়েছিল।

মুর্শিদকুলি ও শুজাউদ্দিনের আমলে জিনিসপত্রের দাম খুবই সুলভ ছিল। আর নিম্নগতি-সূচক দ্রব্যমূল্য দেখেই সমসাময়িক পর্যটকগণ সাধারণ মানুষের সহজ লভ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতসত্য বোধহয় এর বিপরীতেই ছিল। অর্থনীতির একটি সূত্রানুসারে চাহিদার তুলনায় দ্রব্যের যোগান বেশী থাকলে এবং অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় কড়ির যোগান স্বল্প থাকলে পণ্য মূল্য নামমাত্র হতে বাধ্য। অর্থনৈতিক শোষণের ফলে বঙ্গভূমির পরিস্থিতি এখন এমনই পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বলতে কিছুই ছিল না। ফলতঃ যাকে আমরা অপরিমিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন বলে মনে করছি তা প্রকৃতপক্ষে সীমাহীন শোষণে নিঃস্ব মানুষের কপর্দকহীন চেহারা ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রয়ক্ষমতা থাকলে তবেই বাজারদরকে সস্তা বলা সঙ্গত। আর ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের ওপর। কিন্তু তখনকার বৃত্তিজীবীদের বেতনহার ছিল যৎসামান্য তাই অত্যল্প দ্রব্যমূল্যও তাঁদের কাছে মহার্ঘ

হলে বিবেচিত হয়েছে।[৩২] ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ জুড়ে কোনরকমে টিকে থাকা অগণিত অন্নহারা মানুষের দল প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, শাসকীয় অত্যাচার আর মহাজনের শোষণকে নির্বিবাদে সহ্য করে প্রায়শই মৃত্যু বরণ করেছে। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ বাংলা সাহিত্যেই পাই হৃতসর্বস্ব মানুষের একচ্ছত্র উপস্থিতি।

মুর্শিদকুলি ও শুজাউদ্দিনের আমলের বাজারদর এবং সাধারণ মানুষের বেতন মজুরির তালিকা উদ্ধার করা হল।

বাজারদর (১৭০০-১৭৩৭) ঃ

সময়ঃ	মন	সের	টাকা	আনা	পয়সা	গণ্ডা
১৭০০-১৭২২						
চাল (ভাল)	২		১			
চাল (মোটা)	৩/৫		১			
চিনি	২	১৩	৯/১০			
মাখন	১		৪/৫			
তেল	১		১-১২ আনা - ২টাকা			
বাদাম	১		৫	১		

ইত্যাদি।

সময়ঃ	মন	সের	টাকা	আনা	পয়সা	গণ্ডা
১৭২৯-১৭৩৭						
চাল (ভাল)	১	১০	১			
চাল (মোটা)	৪	১৫	১			
তেল		২১	১			
গম (ভাল)	৩		১			
গম (মাঝারি)	৩	৩০	১			

ইত্যাদি।

বেতন-মজুরি (১৭০০-১৭৩৭)

পদ	মাসিক	দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
কেরানী	"		৪	৬		
পুলিশদারোগা	"		৪			
রাজস্ব সংগ্রাহক	"		১	১৩		
পুলিশ কনস্টেবল	"		১	৮		

তাঁতি	"	১	৮	
সাধারণ মজুর, কুলি	"			১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি
রাজমিস্ত্রি	"			২ পণ ১ গণ্ডা কড়ি
কুশলী কারিগর	"		১০	

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এদেশীয় কর্মচারীদের বেতন

কেরানী	"	৪	১০
সারেঙ্গ	"	১০	
টানডেল (ছোট অফিসার)	"	৮	
লস্কর	"	৫	

কলকাতার মেয়র কোর্টের কর্মচারীদের বেতন

দোভাষী	"	২০	
দেশী কোর্টসার্জেন্ট	"	২	৪
অল্ডারম্যান	"	১৫	
ইওরোপীয় কোর্টসার্জেন্ট	"	১০	
ব্রাহ্মণ	"		৩
ক্যাশিয়ার	"		৫

ইত্যাদি।

মুর্শিদকুলির আমলে শোষণ থাকলেও শৃঙ্খলা ছিল। শ্রমজীবী গৃহস্থ তাদের প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে বছরে একটা-দুটো দিনও আনন্দে মুখর হয়ে উঠত। সমস্ত সমস্যা ভুলে বৈভবহীন সংসারে নবান্নের সুগন্ধ উঠত। মরাই ভরা সোনারঙা ধান দেখে চোখ জুড়োত। এটুকুই তৃপ্তি। রামেশ্বর চক্রবর্তী সার্থকভাবে দারিদ্র পারবারের এই আনন্দোৎসবের ছবি তুলে ধরেছেন। লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী এখানে বহু কষ্টে সারা বছর ধরে সংসারকে টেনে বিদায়ী হেমন্তের এক সকালে হয়ে উঠেছেন অন্নপূর্ণা। পতি-পুত্রকে ভালমন্দ খাওয়াতে পেরে কি অপরিসীম শান্তি তাঁর। 'শ্বশুরালয়ে সপুত্র শিবের ভোজন' অংশে এই সামান্য আয়োজনেব অসামান্য বর্ণনা দিয়েছেন কবি —

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি।।
তিন জনে একুনে বদন হৈল্য বার।
গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার।।
তিনজনে বার মুখ পাঁচ হাথে খায়।

এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়।।
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যে এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে।।[৩৩] ইত্যাদি

বছর যত ঘুরতে থাকে ক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ দিনেকের তরে শান্তির শ্বাস নেওয়াও ভুলতে বসে। সঙ্কট আর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে সান্ত্বনার আশ্বাস বাণী খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়। অনাহার আর বঞ্চনার বেদনায় পাণ্ডুর বৃহত্তর বাংলার গণজীবন অমানবিক বিধি-বিধান ও পরিবেশের শাসনে বিষন্ন যন্ত্রণার দিন কাটাতে থাকে। নবাব শুজাউদ্দিনের শাসনকাল পর্যন্তও বঙ্গভূমি এতটা বিপদগ্রস্ত হয়নি। তিনি বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক ক্রিয়াকর্ম করেছিলেন। নবাব ও জমিদারের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিও হয়েছিল এই সময়। কিন্তু বাড়তি ভূমি কর মুর্শিদকুলির শাসন কালের চেয়েও প্রজাদের বেশী পীড়িত করেছিল। আসলে, নবাব বিলাসী ছিলেন। ইন্দ্রিয় বিলাসিতার সঙ্গে দেশকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার দিকেও তাঁর নজর ছিল। প্রাসাদ, সরকারি অফিস, বাগান বাড়ি, মসজিদ ইত্যাদিও নির্মাণ করিয়েছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাছাড়া তাঁর সময়ে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় অনেক গুণ বেড়েছিল। শুজাউদ্দিনের ধারণা হয়েছিল প্রজারা কর ভারে পীড়িত নয় এবং তাঁর শাসনাধীনে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তথা আর্থিক উন্নতি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকাংশে। তাই তিনি মোট চারখাতে ১৯,১৪,০৯৫ টাকার আবওয়াব ধার্য করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে বলা হয়ে থাকে, বাংলার আর্থিক জীবনে মুর্শিদকুলি এবং শুজাউদ্দিনের শাসন কালের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার অবসান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষিত সত্যটুকু হল, এই পর্বে চাষ-আবাদ বহুল পরিমাণে বাড়লেও কৃষকদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। পুঁজি গড়ে ওঠেনি। কারণ তাদের উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তারা টাকা যোগাড় করতে পারেনি। কৃষক ও কারিগরের উদ্বৃত্ত উৎপাদন রাজকোষে জমা হয়েছে। ডঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন —

"১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্থিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টগুলি হল ঃ বাজারে জিনিসের দাম কম। বেতন ও মজুরি কাঠামো মূল্যস্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। টাকা দুষ্প্রাপ্য তবে টাকার ক্রয় ক্ষমতা খুব বেশি। এ ধরণের স্থিতিশীল গতিহীন অর্থনীতিতে মানুষ খেতে পায় তবে আর্থিক অগ্রগতি ঘটেনা। এরকম অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি বড় রকমের অসুবিধা হল অনাবৃষ্টি, বন্যা, ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়-হীনতার জন্যে দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, এবং উৎপাদক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায়না, কৃষক ফসলের দাম পায়না এবং কারিগর ও মজুর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলে উৎপাদনে উৎসাহের অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা আসে।"[৩৪] ডঃ মুখোপাধ্যায় অর্থনৈতিক নিম্নাবগতির যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তার

থেকে আর একটি বিষয় বাদ পড়েছে - সেটি বহিঃশত্রুর আক্রমণ। নবাব আলিবর্দীর আমলে এই বহিরাক্রমণের প্রকোপ বঙ্গীয় অর্থনীতিতে গভীর ছায়া ফেলেছিল।

অবশ্য অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী মারাঠা বর্গীর আক্রমণকে বঙ্গীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমধ্বংসের একটি অনিবার্য কারণরূপে স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য হল, "মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার অবশ্যই অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেটা প্রধানত আঞ্চলিক ব্যাপার এবং তার প্রভাব নেহাৎ অল্প সময়ের জন্যই পড়েছিল।"[৫৫] তিনি এও বলেছেন "মারাঠা আক্রমণের ফলাফলকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অতিরঞ্জিত করেছেন। মারাঠারা যে পথে এগিয়েছে, সাধারণত ক্ষয়ক্ষতি তার দু'পাশেই হয়েছে। দেশের অন্যান্য জায়গায় কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। মারাঠা আক্রমণ সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা যে তেমন খারাপ হয়নি তার প্রমাণ, জমিদারগণ তাদের বার্ষিক খাজনা ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহের বাড়তি খরচ মেটানোর জন্য আলিবর্দীকে একবার এক কোটি টাকা ও আরেকবার ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলার বহু বণিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে যে বক্তব্য তা কিন্তু ঠিক নয়।"[৫৬]

কিন্তু তাঁর বক্তব্যের পক্ষে দুটি যুক্তি দেওয়া যায়। প্রথমত, বহিরাক্রমণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে হলেও তার প্রভাব গোটাদেশে ছড়িয়ে পড়াই স্বভাবিক। বর্ধমানের মত একটি বর্ধিষ্ণু জেলা হলে তো বটেই। আর একটি জেলার ফলন, উৎপাদন, শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, পরিবহন, প্রভৃতি উন্নতির সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে পঙ্গু অর্থনীতির চাপ নিঃসন্দেহে গোটা দেশের উপর পড়বে দ্বিতীয়ত, সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্য। বর্গী-হাঙ্গামার ঘটনা-সম্বলিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মহারাষ্টাপুরাণ' থেকে আরম্ভ করে 'অন্নদামঙ্গল' বা লোকজীবন সম্ভূত ছড়াতে এই আক্রমণের হতাশা-ব্যঞ্জক ফলাফল বিবৃত হয়েছে।

ডঃ অণিমা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' বর্গীর হাঙ্গামার যে ভয়াবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তা সমগ্র রাঢ়-বঙ্গ সম্পর্কেই সত্য। বস্তুত নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কেউই রক্ষা পায়নি তাদের নৃশংস উৎপীড়ন-অত্যাচারের হাত থেকে।"[৫৭] স্বভাবতই বাংলার অর্থনীতির বুকে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে; চাষে, শিল্পে সম্পদ-ক্ষয়ের গাঢ় ছাপ পড়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে অর্থনৈতিক কাঠামো। K. K. Datta এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "The repeated invesions of the Marathas also occasioned a great scarcity of money. The Bank of Jagat Seth alone was robbed of a huge amount, sums of realised rents were sometimes plundered by them on the way of their being carried to the Nawab's treasury, the important market places were once and again, deprived of their cash and stock and the ordinary people had to protect their lives by paying money to the Maratha soldiers."[৫৮] কাজেই অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত হয়ে বলতে পারি, বর্গী হাঙ্গামার ফলে দেশের এক বিশাল অঞ্চল যে বিধ্বস্ত

হয়েছিল, কৃষিক্ষেত্র আর লোকালয় যে একাকার হয়ে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ফল পড়েছিল বাংলার অর্থনীতির উপর —

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল।।
চাইর দিগে লোক পলাএ ঠাঞি ধাঞি।
ছত্তিস বর্ণে লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি।।
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে।।
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া।।
কারু হাত কাটে কারু নাক-কান।
একি চোটে কারু বধএ পরান।।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুঠে দড়ি বাঁধি দেএ তার গলাএ।।
এই মতে বরগি কত বিপরিত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তবে প্রাণে মারে।।
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেএ বরগিবে।
জার টাকা করি নাই সেই প্রাণে মরে।।[৩৯]

আব 'প্রাণে মরা'র দলটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে ওঠে ধীবে ধীরে। আগ্রাসী লুণ্ঠন তো ছিলই, তার উপরে ছিল অনাহার —

টাকা সেব হৈল আনাজ কিস্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ।।[৪০]

এর পিছনে নবাবী আমলের অর্থনীতির সেই সূত্রটি কিছুটা ক্রিয়াশীল তো বটেই - উৎপাদন প্রচুর, দ্রব্যমূল্য সুলভ কিন্তু মজুরীর হার নিম্ন। ফলে যে কোনো আর্থ-সামাজিক অচলাবস্থায় সঞ্চয়হীন মানুষের অকাল-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

নবাব-বিদ্বেষী ভারতচন্দ্র রায় মোগল রাজত্বের পতন সম্ভাবনায় কিংবা আলিবর্দীর স্বকৃত পাপের ফলস্বরূপ বর্গী আক্রমণ সমর্থন করলেও প্রকৃত হাঙ্গামার ছবিটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কোথাও কোথাও —

লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।[৪১]

বস্তুত এই বর্গী হাঙ্গামা থেকেই বঙ্গ-অর্থনীতির সমূহ বিপর্যয়ের সূচনা। মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে শতাব্দীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত যেসব উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে দারিদ্র্যের আবেদনই তাতে মুখ্য। আর নিতান্ত বাস্তব বলেই সেগুলো মর্ম্মস্পর্শী।

কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র অর্থাভাবে সুখের জীবন উপভোগ তো দূরের কথা, প্রদীপের তেল পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। তাই কবি দুঃখ করে বলেছেন —

শ্রীমিত্র জীবন কবি ঘরে বসি রৈল।
একদিন লিখিতে তাড়ির তৈল ফুরাইল।।[৪২]

অন্যত্র কবি আবার বলেছেন —

কাগজ অতি বুড়া কলম তাহে মুড়া
দোওয়াতে পচা মসি।।[৪৩]

অর্থাৎ, প্রতিভা অপচয়িত হতে বসেছে সামান্য অর্থের অভাবে — কালি-কলম-কাগজের অপ্রতুলতায়। আর তার চেয়েও নিদারুণ যন্ত্রণার বিষয়, পুথি-প্রেমকে বহু কষ্টে মন থেকে দূরে সরিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নায় পথে বেড়িয়ে পড়া। আর সেটাও নিজের জন্য নয়, স্ত্রী ও সংসারের প্রতি কর্তব্যবোধে —

কবির খরচ কিছু নাই।
তত্ত্ব ছিল পুর দারা সকল বুদ্ধি পাইল হারা
পুথি বাঁধি হাটে চলি যাই।।[৪৪]

শ্রী মোহিনী মোহন মৈত্রেয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "জীবন দরিদ্র হইলেও সংসারী ছিলেন। 'পুরদারার' লালন পালনে অসমর্থ হইয়া মনের বিরাগে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন কিম্বা 'সকল বুদ্ধি হারা' হইয়া গৃহের অর্গল রুদ্ধ করত: অদৃষ্টবাদীর মত শয্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে সমরায়োজন করিয়াছিলেন। তিনি কপর্দ্দক বিহীন হইয়াও 'পুন্থি বাঁধি হাটে গিয়াছিলেন।"[৪৫]

জীবন মৈত্র কবি ছিলেন — কল্পনার ভাব রাজ্যে বিচরণ তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁর দেওয়া বাজার ফর্দটিকে এমনই নিছক কবি কল্পনা প্রসূত বলে মনে হতে পারে। কারণ, ১৬৫ বৎসর পূর্বে আমাদের এই নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে দিনাতিপাত এত সহজসাধ্য ছিল বলে মনে হয় না। অবস্থা বিপর্যযে লক্ষপতি চাঁদ পথে মৎস্য বিক্রয় লব্ধ অর্থে যে আহার্য সামগ্রী খরিদ করেছিলেন তার তালিকা এই —

সাধু বলে এহি মৎস্য বেচিব ছয় বুড়ি।
এরু পোণের চালু লবণ হাঁড়ি তৈল খড়ি।।
পাঁচগণ্ডা হাড়িক দিয়া বাজাইব কাড়া।
ডাকিয়া বলেন গেল কানির মাথা মোড়া।।
বাকি পাঁচ গণ্ডার খাইব গুয়াপান।
আনন্দে যাইব দেশে করিয়া পয়াণ।।

অর্থাৎ -

চাউল, লবণ, তৈল, হাঁড়ি ও খড়ি	/০ একপণ
গুয়াপান	৫ পাঁচ গণ্ডা
হাটে কাড়া দেওয়া হাড়ির আজুরা	৫ পাঁচ গণ্ডা
	/১০ গণ্ডা

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণের রচনাকাল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। সময়টা আলিবর্দীর নবাবী আমল। ইতিহাসে পাই, শুজাউদ্দিনের কাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের অধোগতি লক্ষিত হলেও ধীরে ধীরে শতাব্দী মধ্যাহ্নে পৌঁছে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবনতি ঘটতে থাকে দ্রুত। এর পিছনে ১৭৩৭-এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৭৪২ পর্যন্ত টানা ৯ বছরের বর্গী হাঙ্গামা তো ছিলই, উপরন্তু ছিল জটিল মুদ্রা ব্যবস্থা।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন তখন এখানে রাজমহল ও ঢাকায় দুটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে রাজমহলের টাঁকশাল তিনি মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। বাংলার টাঁকশালে এ যুগে তিন রকমের মুদ্রা তৈরি হত - সোনা, রূপা ও তামা। সোনার টাকা মোহর নামে পরিচিত। সোনার মোহরের (ওজন ১৯০.৭৭৩ গ্রেন) সঙ্গে রূপোর সিক্কা টাকার বিনিময়ের হার হল এক মোহর সমান চোদ্দ বা ষোল সিক্কা টাকা। সোনার টাকা বাজারে লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত না; এগুলি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপঢৌকন, উপহার বা সঞ্চয়ের জন্য টঙ্কন করা হত। রূপোর টাকা সিক্কার ওজন ১৭২.৫ গ্রেন; এতে ৯৮ থেকে ১০০ ভাগই খাঁটি রূপো থাকত। এ টাকা বাজারে লেনদেনে ব্যবহৃত হত। সিক্কা সরকারের স্বীকৃত বাংলার বাজারে বৈধ টাকা। তামার পয়সা 'দাম' খুচরো ক্রয়-বিক্রয়ে লাগত। টাকার সঙ্গে এর বিনিময় হার হল এক টাকা সমান চল্লিশ দাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে আস্তে আস্তে দাম উঠে যায় এবং এর স্থান গ্রহণ করে কড়ি। ২৫৬০টি কড়িতে হয় এক টাকা।

নবাবী আমলের মুদ্রাব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি পায় অন্যান্য প্রাদেশিক মুদ্রার অনুপ্রবেশে। ঐতিহাসিকদের মতে, মুর্শিদকুলি ও তাঁর পরবর্তী নবাবদের সময়ে নাকি

৩২ প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলি আসত ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন অঞ্চল স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয় এবং স্বাধীন রাজারা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করতে থাকে। ব্যবসার খাতিরে বিদেশী বণিকেরা সেই সব টাকা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে বাধ্য হত। বস্তুতপক্ষে এই সময়ে ভারতের টাঁকশালগুলিতে টাকা তৈরির ব্যবস্থা খুব উন্নত ছিল না। এক বছরের ছাপা টাকার সঙ্গে অন্য বছরের ছাপানো টাকার পার্থক্য তৈরি হত আকৃতিতে, গুণগত মানে ও পরিমাণে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজরা বোম্বাই, সুরাট, কাশী, অযোধ্যা, আর্কট প্রভৃতি স্থান থেকে মুদ্রা নিয়ে এসে নিজেদের ইচ্ছামত টাকা ছাপাত। এইসব বিজাতীয় নানা ধরণের মুদ্রার প্রকৃত মূল্য কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য বাংলার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিবার জগৎ শেঠরা নিযুক্ত ছিলেন। শুধু বিদেশীদের আনীত টাকায় নয়, মুঘলদের অধীনে বিভিন্ন টাকশালে ছাপা টাকাগুলোও সবক্ষেত্রে সমান থাকত না। ফলে 'বাট্টা' দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করে মধ্যবর্তী হিসাবে কিছু লাভের পথ খুলে রেখেছিলেন এই শেঠ সম্প্রদায়। সেকালে বাদশাহী 'সিক্কা' টাকার সঙ্গে একটি মুদ্রা মান চলত বাজারে; এর নাম চালানি টাকা। সমস্ত অর্থ মূল্যের একক ও ধ্রুবক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল এটাকে। স্থির ও চঞ্চল সমস্ত টাকার বিনিময় হার স্থির হত এর মাধ্যমে। এই টাকাটি শুধু মানক মূল্যকেই নির্দেশ করছিল না, সেই সঙ্গে সিক্কা-টাকার শ্রেষ্ঠত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। একটি টাকা যে বছরে বাজারে ছাড়া হত তার মধ্যে মুদ্রিত থাকত সেই বছরের পরিচয় এবং তার মূল্য ১০০% বলে ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ের জন্য এর মূল্য হ্রাস পেত। দ্বিতীয় বছরে ৯৭% এবং তৃতীয় বছরে ৯৫% মূল্য দাবী করতে পারত। ফলে পুরনো 'সিক্কা'-কে নতুন সিক্কায় পরিণত করতে জনগণকে বাট্টা দিতে হত। আর নয়ত সেগুলো অচল বা 'খোঁটা' টাকা রূপে পরিগণিত হত। এই পুরনো সিক্কার অচলাবস্থার কথা জানা যায় হীরা মালিনীর হিসাব প্রদানে —

বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি।।
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যদি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা।।
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়।।
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি।।"

এই মুদ্রা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "বাংলার মুদ্রা-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতি তিন বছরে সিক্কা টাকা পুনরায় টঙ্কন করার

ব্যবস্থা হত (triennial recoinage)। টাঁকশাল থেকে বেরুনোর পর সিক্কা টাকা এক বছর পূর্ণ দামে বাজারে চালু থাকত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এর নাম হত সোনাত। সিক্কা এক বছর পর তিন শতাংশ এবং দুবছর পর পাঁচ শতাংশ মূল্য হারাত। একটা উদাহরণ দিয়ে সিক্কা ও সোনাতের পার্থক্য আরো পরিস্কার করে বোঝান যেতে পারে। সিক্কার সঙ্গে চালানি টাকার বিনিময় হার হল ১০০ সিক্কা সমান ১১২.৫ চালানি টাকা। এটা অবশ্য সরকারি হার। বাজারে বেসরকাবি হার হল ১১৮ চালানি টাকা। সিক্কা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে সোনাত হল (ক্ষয় হোক বা না হোক) এবং সোনাতের সঙ্গে চালানির বিনিময় হার হল ১০০ সোনাত সমান ১১১ চালানি টাকা। সুপরিকল্পিতভাবে সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সিক্কার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা, সিক্কাকে বাজারে একমাত্র বৈধ টাকা হিসাবে চালু রাখা। তিন বছর পর সোনাত সিক্কায় রূপান্তরিত করার ব্যবস্থাও এজন্য। অন্যথায় সোনাত বাজার ছেয়ে ফেলত। এরকম মুদ্রা ব্যবস্থায় টাঁকশালের আয়ও ঠিক থাকে। সোনাত দামে কম বলে ব্যবসায়ীরা এগুলি পুনরায় টঙ্কনের জন্য টাঁকশালে নিয়ে যেত। বাংলাব স্রফ ও পোদ্দাররা তৃতীয় বছরের শেষে সোনাত নিয়ে টাঁকশালে হাজির হত। দু'শতাংশ টাঁকশাল কর দিয়ে সোনাত সিক্কাতে রূপান্তরিত করে দু শতাংশ লাভ করত। তিন বছরের পর সোনাত আর বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত হত না। তখন এর ধাতু মূল্য এব প্রকৃত মূল্য।"[৪৮]

নবাবী আমলের মুদ্রা ব্যবস্থার আরো এক জটিলতা সৃষ্টি করে আর্কটের টাকা। সেখানকার টাঁকশালে এগুলি নির্মিত। আর সেই টাকা বিদেশী বণিকদেব মারফৎ চলে আসতো বাংলার প্রান্তীয় বাজারে। চালানি মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়ের হার এদেশীয় সিক্কা টাকার চেয়ে কম ছিল। কারণ, যেখানে ১০০ সিক্কা টাকা সমান ১১২.৫ চালানি টাকা, সেখানে ১০০ আর্কট টাকা সমান ১০৯ চালানি টাকা। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের রাজধানী যতদিন দাক্ষিণাত্যে ছিল, ততদিন আর্কটের মুদ্রায় রাজস্ব পাঠানো হত। কিন্তু দিল্লীতে বাজধানী চলে আসার পর এই মুদ্রায় রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। বোধ হয় এই কারণেই ঐ বৎসর থেকে আর্কট মুদ্রার দাম আরো ২% কমে গিয়ে ১০৭ চালানি টাকাতে পরিণত হয়। বাংলা কাব্যে আর্কটের টাকা সর্বক্ষেত্রে 'আড়কাট' বলে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী এই আর্কটেব মুদ্রা ভাঙানোর অজুহাত দেখিয়েই সুন্দরকে প্রতারণা করতে চেয়েছিল —

ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি কান্দিয়া তিতায় মাটি
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর।[৪৯]

বোধ হয়, এই সময় তামার পয়সার তেমন চল ছিল না। নতুবা মালিনী যখন মৃদু ভর্ৎসনা করে সুন্দরকে বলে,

তোমার কথায় টাকা
লয়ে গেনু জানি পাকা
তামা বলি ফিরে দিলে সাটে।[৫০]

তখন সুন্দর তার প্রতিবাদ করেনা। এছাড়া একালের মতো সেকালেও মেকী টাকা চলেছিল বাজারে। রামপ্রসাদ তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে 'মালিনীর হাট পরিচয়' অংশে সুচতুরা হীরাকে দিয়ে তৎকালীন মুদ্রা ব্যবস্থার জটিলতা প্রকাশ করেছেন এই ভাবে —

প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা।।
ছটা ছিল গরসাল ছটা ছিল মেকী।
হরে দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি।।
বাটা বাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিক দ্রব্য থোকে গেল ছয়।।[৫১]

এখানেও বাট্টার পরিমাণ হরে দরে ২৫%। 'গরসাল' বলতে সোনাউৎ- 'মেকী' বলতে কৃত্রিম মুদ্রা ও 'আড়কাট' বলতে আর্কটের মুদ্রাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অনেক সময়েই দরিদ্র ব্যক্তিদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে মুদ্রায় মুদ্রিত বৎসরের গোলমালে সিক্কাকে সোনাউতে পরিণত করে পোদ্দাররা লাভবান হয়ে উঠত।

আগেই বলেছি ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি গণজীবনে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিরিশ শতাংশ। কার্পাস, নীল ও খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছিল প্রায় চারগুণ। অন্য সমস্ত জিনিসের দামও আনুপাতিক হারে বেড়েছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমস্ত রকম বস্ত্রের দাম বেড়েছিল তিরিশ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির হার আরো বেশি। যে মোটা চাল ছিল টাকায় চার থেকে পাঁচ মণ তা হয়ে দাঁড়াল টাকায় একমণ তিরিশ সের। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারী শ্রমিক, মজুর ও কারিগরের বেতন ও মজুরিও বেড়েছিল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময় পর্বের দ্রব্যমূল্য ও বাজারদর নীচে প্রদত্ত হল —

দ্রব্যমূল্য (১৭৩৮-১৭৬৯)

সময় ঃ	জিনিস ঃ	পরিমাণ ঃ		দাম			
১৭৩৮		মণ	সের	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
	চাল	২-৩		১			
	কার্পাস	১		২			
১৭৫১-৫২							
	চাল	১	৩২	১			
	গম	১	৩২	১			
	ময়দা	১	৩	৩			
	তেল	১		৫			
	কার্পাস		২৫	১			
১৭৫৯							
	চিনি	১		১৬			
	হিং	১		১০০			
	বাদাম	১		২৫			
১৭৬০							
	চাল	২	২০	১			
	তেল	১	২	৮	আর্কট টাকা		
	তুলা	১					৪-৫ পণ কড়ি
	সিল্ক	১	৬-১০				

বেতন / মজুরি (১৭৩৭-১৭৬৯)

সময় ঃ	পদ ঃ	মাসিক	দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা
১৭৩৯						
	ইটমিস্ত্রি	"		৩		
	ছুতোর	"		২	১৫	
	মহিলা শ্রমিক	"		১		
	কুলি,মজুর	"		২		
	নৌকামাঝি	"		৩		
	পিওন	"		২	৮	
	দারোয়ান	"		২	৮	
১৭৫৯						
	কোচম্যান	"		৫		
	হেড বেয়ারায়	"		৩		

	পিওন	"	২	
	নার্স	"	৪	
	সারেঙ্গ	"	১০	
১৭৬০				
	তাঁতি	"	১	৮
১৭৬৭	কুলি	"	২-৩	

তবে বলাই বাহুল্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চড়া মেজাজের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। বিশেষ করে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চরম আকার ধারণ করেছিল। ঐ বছর নভেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মূল্য স্তর কিছুটা নিম্নমুখী হয়। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলিতে কোম্পানীর কর্মচারীরা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করায় মূল্য সূচক আবার বাড়তে থাকে। এই পর্বের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কারণগুলিকে সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় সুন্দর পারম্পর্যে সূত্রবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'বাংলার আর্থিক ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করছি —

"১) ১৭৩৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রবল ঝড় হয়। এতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এর পরের বছর প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৭৫২-র ২০ নভেম্বর কলকাতায় প্রেসিডেন্ট রজার ড্রেককে লেখা গোবিন্দরাম মিত্রের চিঠিতে ১৭৫১-র এপ্রিল মাসের বৃষ্টিতে দেশে বন্যা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। ঐ বৃষ্টিতে দেশের নীচু অঞ্চল ডুবে যায়, শস্যহানি ঘটে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

২) ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত বাংলাদেশে চলেছিল বর্গী বা মারাঠা আক্রমণ। এ আক্রমণ পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও সামাজিক ভাবে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। হলওয়েল জানিয়েছেন বাংলার মারাঠা আক্রমণ যুদ্ধের সমস্তরকম ধ্বংসাত্মক কুফল নিয়ে দেখা দিয়েছিল। খাদ্যশস্যের অভাব, মজুরি বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি মারাঠা আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল। বাঙ্গালী কবি গঙ্গারাম 'মহারাষ্টা পুরাণ'-এ মারাঠা আক্রমণের ফলে বর্ধমান অঞ্চলে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মারাঠা আক্রমণ রুখতে বাংলা সরকারকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় এবং মোটা টাকা সৈন্যবাহিনীর বেতন হিসাবে ব্যয় হয়। এরই মধ্যে বিহারে দেখাদেয় আফগান বিদ্রোহ (১৭৪৫, ১৭৪৮)। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয় এবং নবাবদের প্রতি বছর বহু মূল্য হীরে, মতি, জহরত কিনে টাকা জমানোর

প্রবণতা আর দেখা গেল না। এজন্য বেশ কিছু টাকা বাংলার আভ্যন্তরীণ বাজারে এল।

৩) বাংলা সরকার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা সায়ের খাতে আদায় করতে শুরু করে দেয়। স্থানীয় শুল্কের জন্য স্থানীয় বাজারে ভোগ্য পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলে।

৪) এ যুগে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বাংলার বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে সুতী বস্ত্র, কাঁচারেশম ও রেশম বস্ত্র কিনত। তাতে প্রতিযোগিতা মূলক বাজারের রীতি অনুযায়ী জিনিস-পত্রের দাম বাড়তে থাকে। ১৭৫২ তে ফরাসিদের প্রতিযোগিতার জন্যে ঢাকায় সুতী বস্ত্রের দাম বেড়েছিল।

৫) এর সঙ্গে ছিল বিদেশীদের আনা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপো। বাংলার বাজারে টাকার যোগান বেশি হওয়ায় দ্রব্য-মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখা গেল।

৬) পলাশী উত্তর কালে (১৭৫৭-৬১) বাংলার বাজারেও কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অতি লাভের আশায় পরিচালিত বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ফলে বাংলার বাজারে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছিল। জিনিসের দাম বাড়লে মূল্য সূচক বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতন, মজুরি ইত্যাদিও বেড়ে চলে। ১৭৩৭ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আভ্যন্তরীণ বাজারে এ ধারাটি অব্যাহত ছিল।"[৭২]

বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনিবার্য পরিণাম দারিদ্র্য। সমসাময়িক সাহিত্য তারই প্রামাণ্য দলিল।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে সমকালের ছাপ সবচেয়ে গভীর। নিঃস্ব ভূপতির সন্তান হয়ে মারীগ্রস্ত সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃখের স্বরূপটি তিনি সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, ভাঙন ধরা গ্রামীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, আর রাজনীতির অন্তর্নিহিত মৌল অসত্যের বীজটি খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়নি। আবার সেই সূত্র ধরে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তেই বাংলাদেশের সমাসন্ন ঐতিহাসিক নিয়তি যেন তাঁর কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অর্থের প্রাচুর্যকে আমরা বলি ঐশ্বর্য; বর্ণময় সাংস্কৃতিক জীবন যাপনের পক্ষে সেই ঐশ্বর্যের অপরিহার্যতাকে ভারতচন্দ্র স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর দিকে

তাকিয়ে তাকে সমর্থনের উপযুক্ত নজির যোগাড় করতে পারেননি তিনি। বরং দেখেছেন, প্রাণ ধারণ করার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন, তাই নেই মানুষের। অন্নই জীবনের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রত্যয়ের স্বীকৃতিতেই ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের আরাধ্যা হলেন দেবী অন্নদা। এঁর রূপ কল্পনার তাৎপর্য বোঝার জন্য দুটো ঘটনার উল্লেখ করেছেন ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ' গ্রন্থটিতে। প্রথমটি হল, বর্গীর তাণ্ডবে গঙ্গার পশ্চিম দিকের চাষীরা জোত-জমি ছেড়ে পালিয়ে আসে, ফলে বহু শত বিঘা জমিতে ফলন বছরের পর বছর বন্ধ থাকে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটা বিস্ময়কর কৃতিত্ব। ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন এত অল্প সময়ে কি করে তিনি নবাব সরকারে দেনার ঐ বিরাট অঙ্কটা পরিশোধ করে, আপন রাজকোষও পূর্ণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই; প্রজাদের কাছ থেকে রাজা জমিদারের আদায়ের ইতিহাসটা তারা জানেন না এমন নয়; আর এ ঘটনা কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যেই ঘটেনি, ঘটেছে সারা দেশ জুড়ে। বর্গীর আক্রমণে হৃতসর্বস্ব নবাব সরকার জমিদারদের উপরে যে বোঝা চাপিয়ে দিলেন কি করে জমিদারের এই সঙ্কট প্রজাদের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসে তাতো সহজেই অনুমেয়।

কাজেই অন্নের জন্য হাহাকার সারা দেশ জুড়ে না হক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে বেদনা বিকীর্ণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল, রাজসভার কবি তা ধরে রেখেছেন তাঁর কাব্যে। শিবের 'হা অন্ন হা অন্ন' বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর প্রেরণায় যে অন্য কিছু নেই তা বলা যায় জোর দিয়ে। অন্নদা পরিকল্পনার উদ্ভবও এখানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই দেবীটির আবির্ভাব এই সর্বপ্রথম।[১১]

তবে আলোচ্য কাব্যে 'অন্নদা' উপাস্যা হলেও (অন্তত প্রথম খণ্ডে) কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু শিব আর শিব চরিত্রকে মুখ্য করে তোলার পিছনেও কবির দেশকালানুগ সুচিন্তিত মেধা ক্রিয়াশীল। এ শিব বেদোক্ত মহর্ষি নন, সৃষ্টির আদি রচয়িতা 'লিঙ্গ' রূপী সনাতন দেবাদিদেব নন, নিছকই লৌকিক, নেহাৎই লোকজীবন-সম্ভূত। নামেই তিনি দেবতা, কিন্তু ভাবে চিন্তায়-কর্মে-আচরণে আবহমান বাঙালী। তাঁর বৈষয়িক জীবনে তাঁর সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নায় সর্বতো ভাবে তিনি অভাব ক্লিষ্ট নিঃস্ব নিরন্ন এক ভ্রষ্টাচারী গৃহস্থ পুরুষ। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ তাঁর কাছে মরীচিকা। তাই কামে-ভাঙে-গাঁজায়-সিদ্ধিতে তিনি আত্মভোলা হয়ে থাকেন। এই সব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েই ভারতচন্দ্রের শিব বিক্ষুব্ধ যুগমানসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আহমদ শরীফ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যে বিরুদ্ধ পরিবেশে পর্যুদস্ত পরাভূত মানুষ আশা-ভরসা চ্যুত হয়ে জীবনের

মূল্য মর্যাদা হারিয়ে নিঃসম্বল নির্বিকার জীবনে আপাত নির্বেদ স্বস্তি উপভোগ করে। আত্মসম্মান বোধ থাকে না বলেই তখন সে পরিবেশেই তার ভিক্ষায়, চুরিতে ও মিথ্যাভাষণে আগ্রহ জাগে। নির্জিত চির শোষিত পীড়িত বাঙালীর মানস-সন্তান এবং জাতীয় প্রতীক ও প্রতিভূ দেবতা শিবঠাকুরও অঙ্গে অন্তরে তেমনি নিঃস্ব নির্লক্ষ্য জীবনের প্রতীকরূপে চিত্রিত।"[৫৭] ভারতচন্দ্রের শিব এর ব্যতিক্রম নন।

তাই ভারতচন্দ্র দুঃখের আভূষণে হর গৌরীকে সাজিয়েছেন। তাঁদের শ্মশান ঘরে বাঙালির যে গৃহস্থালি দেখি, সেখানে বেদনা, অশ্রু, বঞ্চনা আর অনশনের অবাধ বিস্তার। শঙ্কর ভিখারী, ভিক্ষায় কিন্তু তার পেট ভরে না, পেটের জ্বালায় ছটফট করতে করতে সমাজ সংসারকে তিনি বিষাক্ত দেখেন। বিষের জ্বালার চেয়ে বড় পেটের জ্বালা - নীলকণ্ঠ মহাদেব ক্ষুধাভগ্ন কণ্ঠে চিৎকার করেন —

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি।।
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই।।[৫৮]

সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে গৃহিণীর উপরে —

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।।
.. . .
কিবা শুভক্ষণে হইল অলক্ষণ ঘর
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।।
....
স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।।
এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাক্ছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল।।[৫৯]

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে পার্বতীরও। হা-ভাতের ঘরে পড়ে তাঁর দুর্দশার অন্ত নেই। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সংসারের অভাব মোচন তাঁর সাধ্যে কুলোয়নি। স্বামীর সহানুভুতির তুহিন স্পর্শে কোথায় মনের জ্বালা জুড়োবে, না কটু বাক্যের অগ্নিদাহে দেহ মন পুড়িয়ে দিচ্ছে। যে তীব্র অনটনের জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র দায়িত্ব নেই, তার জন্য তীব্র ভৎর্সনায় দগ্ধ হয়ে নিষ্কর্মা পতির উদ্দেশ্যে পার্বতীর তীক্ষ্ণ শ্লেষ অবলীলায় ঝলসে উঠল —

আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহার কপালে সব হয়েছে নন্দন।।
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়।।[৫৭]

পতিব্রতা সতীর পক্ষে পতিনিন্দা অনুপযুক্ত। তাই ব্যঙ্গের মোড়কে তার পরিবেশনটি বড় চমৎকার হয়েছে —

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই।।
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন হয়ে।।
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু।।
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।।[৫৮]

ভাগ্যহীনার হাতে পড়ে শিব ঠাকুরের দুর্দশা সীমাহীন। সরবে তিনি দুষেছেন স্ত্রীকে। আর পরম ভাগ্যবানের হাতে পড়ে হতভাগিনীর জীবন-বিলাসিতার নমুনা সংগ্রহ করেছেন কবি বাস্তব জীবন-অভিঘাত থেকে —

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা, অঙ্গ গেল ফেটে।।
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।।[৫৯]

বলাই বাহুল্য এই বর্ণনার কোথাও, স্বর্গীয় সৌরভ নেই - দেবতার কোনো স্পর্শ, বা দিব্যজীবনের কোনো ইঙ্গিত এখানে দুর্লক্ষ্য। বরং, পরিবর্তে, এই মান-অভিমানের ছত্রে ছত্রে সমসাময়িক কালের দুর্ব্বহ জীবনভার আত্ম প্রকাশ করেছে। যে নিদারুণ দারিদ্র্য, যে অসম পরিণয় প্রথা, যে সাংসারিক নিত্য অভাবের জ্বালা দাম্পত্য প্রেমকে তিক্ত ও বিস্বাদ করে তোলে তারই বাণীমূর্তি ভারতচন্দ্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। উপহাসের শ্লেষে বিদ্ধ হয়েছে দেব সমাজ, বিদ্ধ করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক জীবনের চরম আপ্তবাক্য - দারিদ্র্যকে। আর সেই দুর্ভর দারিদ্র্যের তাড়নায় হাভাতে, উপবাসী শিব প্রত্যক্ষ করেছেন আসন্ন মন্বন্তরের ভয়াবহ আতঙ্কের ছবি। তাই গৃহিণী পার্বতীর 'অন্নপূর্ণা' রূপধারণ তাঁর কাছে সব সৌন্দর্য হারিয়ে কেবলই প্রতারণার মরীচি

কায় পর্যবসিত হয়েছে। অন্নপূর্ণা সমস্ত অন্ন সংহরণ করে নিয়েছেন, তার ফলে কোথাও অন্ন নেই। দ্বারে দ্বারে ফিরছেন ভিক্ষাবঞ্চিত মহাদেব। - এমনকি লক্ষ্মীও লক্ষ্মীছাড়া। ব্যর্থ, ক্ষুধার্ত শিবের মর্মান্তিক আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে —

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কাব ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।।[৮]

লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠোচ্চারিত অমোঘ জীবন-সত্যে দারিদ্র্যের সাড়ম্বর, সাহংকার জয় ঘোষণা অশ্রুবিন্দুর আড়ালে গোপন থাকেনি - 'অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।' দেবতা থেকে মানুষ সবাইকে এক সুতোয় বেঁধেছেন ভারতচন্দ্র। তবে অন্নহাবার দলে দেবতার থেকেও উচ্চাসন দিয়েছেন তিনি মানুষকে। বস্ত্রহীনা, অন্নহীনা বড়গাছিব পদ্মিনীর ব্যাক্তিত্বে, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করে হরিহোড়েব জীবন-ছন্দের নির্বিকার বিন্যাসে, কিংবা, সর্বোপরি দেবী অন্নদার অনুরোধে তাঁর কাছে বর প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বরী পাটুনির লালসাহীন, আর্তিহীন সংযত চাহিদায় তারা দেবতাকে যেন অনেকটাই অপাঙ্‌ক্তেয় করে দিয়েছে। এখানেই 'অন্নদামঙ্গল' দেবী অন্নদাব উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়েও মানুষেরই বিজয় কাব্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বচনাকাল ১৭৫১ খ্রীঃ। এই দশকেবই এক অসিতপক্ষে যুগের যাবতীয় মালিন্য, বৈরূপ্য বিকৃতি আর ষড়যন্ত্র একজোট হয়ে বাংলার আকাশকে ঘোর তমসায় ঢেকেছিল। ঘটনাটা পলাশীর যুদ্ধ। দেশের আর্থিক মানদণ্ডটি সবার অগোচরে সর্পিল গতিতে হস্তান্তরিত হয়ে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে।

প্রথমদিকে ইংরেজরা ঠিক বুঝতে পারেনি রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসতে শুরু করেছে। এ দেশে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয় - তাই পাততাড়ি গুটোবার আগে বর্গীদের মতই লুণ্ঠতরাজে মন দিয়েছিল। বস্তুত, পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী মাস থেকেই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন নয়, বরং টাকা আদায়ের চিন্তা তাদের মন জুড়ে বসল। তাই কোম্পানীর আমলারা যখন শুনল প্রতিশ্রুত অর্থের সবটা নতুন নবাব এই মুহূর্তে দিতে পারছেন না, তখন থেকেই তখ্‌ত কব্‌জা কবার এক দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তা তাদের মাথায় এল। একদিন তারা ভাবত, নবাবের হাতে রাষ্ট্র শক্তি ও ভূমি রাজস্ব। ব্যাঙ্কার জগৎ শেঠের মুচলেকা ছাড়া প্রতিশ্রুত অর্থ নবাবেব কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। কারণ নবাবী রাষ্ট্রের কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা তখনো পর্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে অটুট ছিল। নতুন নবাবের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকলে সেই কাঠামো টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হতনা। কিন্তু ইংবেজদের অপরিসীম বিত্তবাসনা তাতে বাদ সাধল। তাদের টাকার দাবি মেটাতে না

পাবায় মীরজাফর মসনদ চ্যুত হলেন। সে দাবি রোধ করতে গিয়ে মীরকাশিম লড়াই করে দেশত্যাগী হলেন। টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী হাতে নিয়ে ক্লাইভ দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন করলেন। তার পাঁচ বছর পেরোতে না পেরোতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ঘটে যাওয়ায় ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন করতে হল। এই ভাবে ইংরেজদের অর্থলোভের সূত্র ধরে বাঙালি সমাজের পুরাতন রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে ঘন ঘন, কিন্তু সেসব ঘটনা দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে খুব কমই প্রভাবিত করেছে। নতুন শাসকরা পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা আবহমানকাল ধরে অপরিবর্তিত থাকার এটা একটা বড় কারণ বটে। বলা যায়, অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে গ্রাম বাংলা চিরকালই ছিল স্বনিয়ন্ত্রিত। উপরের স্তরের রাজনৈতিক পরিবর্তন কখনো গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারেনি। গ্রামীণ অর্থনীতি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাব অনুভব করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর। কোম্পানী শাসনের প্রভাবে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য সব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় এবং সে পরিবর্তন ছিল নেতিবাচক। কোম্পানী শাসনের প্রাথমিক শোষণ ও লুণ্ঠন নীতির ফলে দেশের গোটা অর্থনীতি ভেঙে পড়ে।

আগেই বলেছি নবাব তাঁর প্রতিশ্রুত অর্থ কোম্পানীকে এককালে পরিশোধ করতে না পারায় বাংলা-দখলের সুপ্ত স্বপ্ন ইংরেজদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছিল। আর এ বিষয়ে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভ চেয়েছিলেন মুঘল সরকারের রাজস্ব সংগ্রহে যোগদান করে কোম্পানীর আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নিশ্চিত করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের প্রশাসন থেকে দূরে রাখলেন। রেজা খানকে তিনি দিলেন মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব। এমন কি ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন দেশের আইন মেনে চলতে এবং কোম্পানীর ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে। আসলে তাঁর বিষয় বাসনা ছিল আকাশের মতো অবারিত। পনের বছর বাদে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ক্লাইভ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন—

"A great price was dependent on my pleasure, an opulent city lay at my mercy; its richest bankers bid against each other for my smiles. I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels! Mr. chairman, at this moment I stand astonished at my own moderation!"

বর্গিদের সঙ্গে ক্লাইভ আর তাঁর দলবলের পার্থক্য এইখানেই। বর্গিরা একবার মুর্শিদাবাদে হানা দিয়ে যা পেয়েছিল ঘোড়ায় চাপিয়ে নাগপুর নিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা

তার বদলে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে বছর বছর নৌকো বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে ভাটি বয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। প্রতিশ্রুত তিন কোটি টাকা দিয়ে এই প্রণালীবদ্ধ দস্যু বৃত্তি শুরু হল। নবাব শুরুতেই যা দিতে পারলেন তা দিলেন। বাকি টাকার পাই-পয়সা ইংরেজরা নিশ্ছিদ্র প্রণালীতে কিস্তিতে কিস্তিতে উশুল করবার বন্দোবস্ত করল।

ক্লাইভের পর থেকে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকে। ইংরেজ উৎপীড়নের চিত্র তুলে ধরে ঐতিহাসিক টমসন বাংলাকে প্যাগোদা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন - 'ঝাঁকুনি দাও, লুফে নাও স্বর্ণ রৌপ্যের ঝরা ফল।' ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার। প্রধানত এই ইস্যুতেই নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে কোম্পানীর। কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য মানে প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বণিকদের উৎখাত হওয়া। শুধু বিনা শুল্কে বাণিজ্য করেই কোম্পানীর কর্মচারীরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় বণিকদের দ্বারা ঐসব পণ্যের বেসাতি বেআইনি ঘোষণা করেছে। এমন অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ উঠেছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ক্ষমতামত্ত, অর্থগৃধ্নু ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে কয়েক বছরের মধ্যেই দেশীয় অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইংরেজদের অত্যাচার উৎপীড়ন সম্পর্কে কয়েকজন সাহসী ভূস্বাধিকারী কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের কাছে নিম্নরূপ অভিযোগ করেন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে—

> "ইংরেজ বণিক গোমস্তাগণ বাংলার সর্বত্র কুঠি স্থাপন করেছেন, ছড়িয়ে পড়েছেন গ্রামে-গঞ্জে। তাঁরা দেশের তাবৎ উৎপন্ন দ্রব্যের কেনা বেচা করেন, যেমন বস্ত্র চুনা পাথর, তৈল বীজ, তামাক, হলুদ, তৈল, চাল, পান, দড়ি, গম এবং সব রকম খাদ্যশস্য। এসব দ্রব্য কেনার জন্য সাহেবরা রায়তকে টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং এভাবে তাঁরা নিম্ন মূল্যে জিনিস ক্রয় করেন, কিন্তু বিক্রয়ের সময় বাজারের ক্রেতাদেরকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে বলপ্রয়োগ করেন। সরকারকে তাঁরা শুল্ক দেন না। যেকোন রকমের জঘন্য কাজ করতে তাঁদের মোটেই বাধেনা। ফলে দেশ এখন এক শূন্য শ্মশানে পরিণত হয়েছে।"

বাঙালীর চোখে কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিল মনুষ্যরূপী পঙ্গপাল। এই পঙ্গপালদের আক্রমণে বাংলার হাট, বাজার, গঞ্জ ও সব শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এক দশকের মধ্যেই। হাট-বাজারে গিয়ে এরা উৎপাদক ও সরবরাহকারীদের বলপ্রয়োগে বাধ্য করতো তাদের কাছে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে। একের পর এক পুতুল নবাব ও তাদের আমির-ওমরাহ ও জমিদারগণ চাপের মুখে বাধ্য হন তাঁদের সব উদ্বৃত্ত নজরানা, পেশকাস ও বকশিসরূপে ফিরিঙ্গিদের হাতে তুলে দিতে।

কোম্পানী কর্মচারীদের লুঠপাট নীতি শুধু বাংলার অর্থনীতিকেই নষ্ট করেনি, এর দুষ্ট অভিঘাতে একই সঙ্গে খোদ কোম্পানীর অর্থনীতিও ধ্বংস হয়েছে। পলাশীর আগে কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্য ছিল বিপুল লাভজনক, প্রতি বছর এর শেয়ারহোল্ডারগণ পেতেন অতি উচ্চ হারে লভ্যাংশ। কিন্তু রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানী বাণিজ্যে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে চলে। প্রতিবছর বাড়তে থাকে সে লোকসানের মাত্রা। বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য কৃষকের উপর খাজনা বৃদ্ধি করা হয় বার বার। কিন্তু সে বর্ধিত খাজনা পরিশোধ করার ক্ষমতা কৃষকের আছে কিনা সে বিষয় কোম্পানী কখনো ভেবে দেখেনি। ফল দাঁড়ায় এই যে, ১৭৬৮ সাল থেকে শুরু হয় আকাল ও দুর্ভিক্ষ।[২২]

আপামর বাঙালীর জীবন বৈকল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাহিনী আজ আমাদের কারোরই অজানা নয়। তবু দু'এক কথায় সেই ইতিহাসটুকু স্মরণ করে নিচ্ছি ঘটনা সূত্রটি ধরে রাখার জন্য।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে ২৬ লক্ষ টাকা কর দেবার বিনিময়ে বাংলা বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকারলাভ করে ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার প্রথম পদক্ষেপটি ফেললেন। কোম্পানির এই দেওয়ানিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবার ভালোমন্দের দায়িত্বও স্বাভাবিক ভাবেই হল কোম্পানীর। কিন্তু সুচতুর ক্লাইভ এক রাজনৈতিক চালে সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। তিনি বাংলা ও বিহারের রাজস্বের দায়িত্ব অর্পণ করলেন যথাক্রমে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায়ের উপর। শুরু হল দ্বৈতশাসন। ক্ষমতা ও অধিকার থেকে দায়িত্বকে বিচ্ছিন্ন করে সুবা বাংলায় সৃষ্টি হয় বিচিত্র এবং অসহনীয় এক শাসন-ব্যবস্থা, যার পরিণামে বাংলার জীবনে ঘনিয়ে আসে চরম বিপর্যয়।

মীরজাফরের আমলে যখন বাংলার রাজস্বের সুনির্মিত বনিয়াদে প্রথম ফাটল দেখা দিয়েছিল, ব্যাপক অর্থে মন্বন্তরের বীজ রোপিত হয়েছিল তখনই। পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম 'নজরানা' দিলেন নবাবীর বিনিময়ে। এর আগেই দেওয়া হয়েছিল ২৪ পরগনার জমিদারি। এই জেলাগুলিতে ইংরেজ কোম্পানীর রাজস্ব-ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে, তার বিশ্বগ্রাসী লোভের সঙ্গে পরিচয় হল বাংলার সাধারণ মানুষের। বঙ্গীয় অর্থনীতি দ্রুত ধেয়ে চলল প্রলয়ঙ্কর মহাধ্বংসের পথে।

জমিদারেরা সময়মত এবং চাহিদামত অর্থ সরবরাহ করতে না পারলেই সে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হত আমিলদের হাতে। আর এই দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে আমিলদের চরিত্র এবং ক্ষমতা এই দুয়েরই রং বদলে গিয়েছিল। জেলার জমিদারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, নির্ধারিত খাজনার সামান্যতম অংশের খেলাপ হলেই তাঁকে বাতিল করে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হবে তাঁর জমিদারি। আমিলদের তখন এমনই অপ্রতিহত ক্ষমতা। স্বভাবতই সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ আকাশচুম্বী হতে বেশী দেরী হল না। শোষণের মাত্রা চতুর্গুণ হয়ে চেপে বসল প্রজা সাধারণের উপর। ভেঙে পড়ল অর্থনীতির মানদণ্ড। আর সেই বিধ্বংসী আর্থ-প্রেক্ষাপটকে সময়োপযোগী ইন্ধন যুগিয়ে ভয়াবহ গণমৃত্যুর নির্বেদ চেহারা দিল প্রকৃতির রুদ্ররোষ - খরা ! দু' বছর উপর্যুপরি অভূতপূর্ব এই খরা, - 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বাংলাসন যার ১১৭৬, ইংরেজি ১৭৭০।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল অনাবৃষ্টি। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলা ও বিহারে অস্বাভাবিক অনাবৃষ্টি, খরা ও শস্যহানি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকা রচনা করেছিল। বাংলায় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৬৮ সালের আউস এবং পরের বছরের আমন ফসল নষ্ট হয়ে যায়।১৭৬৯ সালের জানুয়ারী মাসের অল্প কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টির জল কোনো কাজেই লাগেনি। পরের ছ'মাসেও এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। ফলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে সংগ্রহযোগ্য চৈতালি ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ১৭৬৯-এর ডিসেম্বর মাসের পৌষালি ফসলও বেঁচে থাকেনা। বাংলার শস্য ক্ষেত্রগুলি শুকনো খড় বুকে নিয়ে নিষ্প্রাণ পড়ে থাকে। এরকম অবিশ্বাস্য অনাবৃষ্টি খরা ও শস্যহানি স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে ঘটেনি।

১১৭৭ বঙ্গাব্দের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রামের জনৈক ৭০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের লেখা একটি পুঁথির পুষ্পিকা থেকে ১১৭৬ সালের অনাবৃষ্টির ফলে, পরের বছর অর্থাৎ ১১৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ পর পর এই দু'মাসের খাদ্যশস্যের বাজার দর জানতে পারা যায়। সেইসঙ্গে অনুমান করতে পারা যায় মন্বন্তর কবলিত বর্ধমানের অবস্থা। কারণ প্রতিটি শস্যের মূল্যই এক টাকায় কতটা পাওয়া যায়, তার হিসাব সেখানে দেওয়া আছে।

<u>১১৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস</u>

চাল	১২ সের	১ টাকা
ভোজ্য তেল	২.৫ সের	১ টাকা
নুন	১৩ সের	১ টাকা
কলাই (ডাল)	১১ সের	১ টাকা

এর ঠিক একমাস পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে চালের দর উল্লেখ করেছেন এক টাকায়

চার সের। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ঐ সময়ের বাংলা-গ্রাম-গঞ্জের বাজারদর।[৯৮]

এরই সঙ্গে বিপদের ওপর বিপদ নিয়ে এসেছিল এক সর্বগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড। প্রচণ্ড দাবদাহে যখন দেশের নদীনালাগুলো শুকিয়ে গেছে, তখন ছোট ছোট গুদামগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে ভস্মীভূত হল মানুষের শেষ ভরসা। সম্ভবত মানুষ খিদের জ্বালায় লুঠপাটের আশায়ই এই আগুন লাগাত। বাংলার নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদ থেকে ১৭৭০ সালের ১৫ মে কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন —

" . There is no remedy against the decrees of providence. How can he describe the misery of the people from the severe droughts and the dearness of grain. Hitherto it was scarce, but this year it can not be found at all The tanks and springs are dried up and it is daily growing difficult to procure water In addition to these calamities, dreadful fires have occurred throughout the country, impooverising whole families and destroying thousands of lives . . . Even now it is too late and if there are a few showers of rain, something may be done. If the scarcity of grain and want of rain were confined to one part of the country, some remedy for the alleviation of distress could be found But when the whole country is in the grip of famine, the only remedy lies in the mercy of God. The Almighty alone can deliver the people from such distress "[illegible]

এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মহামারি হিসাবে দেখা দিল বসন্ত রোগ। কার্টিয়ার এবং তার পারিষদবর্গও স্বীকার করেছেন, দেশের এই অবস্থার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বাংলা থেকে গভর্ণর ভেরেলস্ট ২৮ মার্চ একটি চিঠিতে জানান —

" . . the distress of the people is so great that it can not be described and requests the addressee to send by water as much grain as may be available with the greatest dispatch."[৯৯]

এমন অনেক অঞ্চল ছিল যেখানে মানুষ মানুষের মৃতদেহ ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। বীজধান আগেই খেয়ে ফেলেছিল অথবা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল চাষীরা। তারপর ঘাসপাতা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানুষ বেঁচে রইল কিছুকাল। পরে গ্রামের নিরন্ন কঙ্কাল-মিছিল ভিড় করে শহরে। পথে-প্রান্তরে অগণিত মানুষের মৃতদেহ ঘিরে শিয়াল শকুনের চলে মহোৎসব।

বুভুক্ষু মানুষও যে সেই অলৌকিক মহাভোজে যোগ দেয়, সরকারি নথিপত্রে তার প্রমাণ মেলে। সভ্য মানুষ খিদের তাড়নায় নরখাদকে পরিণত হয়। মৃত নর মাংসেও তার অরুচি নেই। এই যন্ত্রণার বিলাপ চলেছিল ১৭৭০-এর নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু পরের বছরের শস্য ভোগ করার জন্য অনেকেই বেঁচে ছিল না। জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হ্রাসের পর এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। মন্বন্তরের পরের তিন বছর প্রচুর ফসল হয়েছিল, দাম কমে গিয়েছিল, তবু এমন অনেক অঞ্চল ছিল, যেখানে নতুন বছরের শস্যের কোনো দাবিদার ছিলনা। ঐ বছর ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার সদস্য কর্তৃপক্ষকে জানান যে, মন্বন্তর সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াল থাবা গ্রাস করেছিল গোটা বাংলাদেশকে। মহাধ্বংসের যজ্ঞ-ভূমিতে তখন শুধুই অনিঃশেষ, অকাতর, অপরিমেয় দারিদ্র্য আর মৃত্যুর শাসন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মানুষ কেনাবেচার শেষ খেলায় মেতেছে বাঙালি। যেমন, অগাধ ঋণের হাত থেকে পরিত্রান পেতে ৩২ বছর বয়স্কা বিনিদাসী মাত্র পনের টাকায় আত্মবিক্রীত হয়েছিল ১১৭৭ বঙ্গাব্দে। অবশ্য শুধু মন্বন্তর কালেই নয়, মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের তাণ্ডব প্রক্রিয়া সমাজে চালু হয়েছিল। ১১৩৩ বঙ্গাব্দে ২১ টাকায় বিক্রীত হয়েছিল স্বামী-স্ত্রী ও তাদের এক পুত্র। ১১৩৪ বঙ্গাব্দে আরেকটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ মোট চারজন আত্মবিক্রীত হয়েছিল মাত্র ১১ টাকায়। ১১৪২ বঙ্গাব্দে আরেক ব্যক্তি মাত্র ৭ টাকার বিনিময়ে তার ৮ বছরের পুত্রকে বিক্রি করে দেয়। এই ভাবে নামমাত্র মূল্যে মানুষ বিক্রির বাজার গড়ে ওঠে বাংলার এখানে সেখানে। অবশ্য ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বলবৎ আইনে নিলামে মানুষ বিক্রির বিষয়টি নিবারণ করার প্রসঙ্গ আছে।

এই সর্বহারা যুগের গ্লানিময় চালচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক সাহিত্যেও।

মৈমনসিংহ গীতিকার 'কাজলরেখা' পালায় পেটের দায়ে পিতার কন্যা-বিক্রয়ের প্রসঙ্গ আছে। নায়িকা কাজলরেখা হাতের কঙ্কণের বিনিময়ে দরিদ্র পিতার কাছ থেকে তার কন্যাকে কিনে নিয়েছিল —

কর্ম্মদোষে কাজলরেখা হইছিল বনবাসী।
কঙ্কণ দিয়া কিনল দাই নাম কাঙ্কণ দাসী।।

কৃষকজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শাসক শ্রেণীর অন্যায় নির্যাতন, মহাজনী ঋণের কালগ্রাস প্রভৃতি যেন অনিবার্য অদৃষ্ট লিপির মতো। অদৃষ্ট লিপির বিধানকে অনগ্রসর মানসিকতায় প্রতিবাদ হীন ভাবে মেনে নেওয়ার প্রথা বিশেষভাবে তৎকালে প্রচলিত ছিল। এবং এভাবেই ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে কৃষকসমাজ। উপর্যুপরী প্রতিকূল শক্তির যে কোনো একটির নির্মম আঘাতেই কৃষক জীবন সহজে উন্মূলিত হয়ে সাধারণ শ্রমজীবিতে পরিণত

'মলুয়া' গাথায় চান্দ বিনোদেব জীবনকে প্রথম উন্মূলিত করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। চান্দ বিনোদ তার নিজের জমি আবাদ করে ধান রোপন করেছিল, পরে ধান পাকার সময় হলে মাঠে গিয়ে দেখে আশ্বিন মাসের প্লাবনে জমির সমস্ত ধান বিনষ্ট হয়ে গেছে। শস্যহীন জীবনে সম্বৎসব সংসার কিভাবে নির্বাহ হবে সেই চিন্তায় মা-ছেলের চোখে ঘুম নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যযেব ফলে আসন্ন দুর্ভিক্ষেব আশঙ্কায় দুঃস্বপ্নে ঘেরা তাদের দিন যাপন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে স্মবণ করায়—

আইশনা পানিতে মাও সব শস্যি গেছে।।
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়ে হাত।
সারা বছরেব লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।।
টাকায দেড়-আড়া ধান পইড়াছে আকাল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানির সঙ্গে আকালের সম্পর্ক নিতান্ত ওতপ্রোত। এই বিপর্যয় যেহেতু কৃষক জীবনকেই সবচেয়ে বেশি আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সেহেতু দুর্ভিক্ষের সঙ্গে কৃষক জীবনেব সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতেই শুধু নয়, আধুনিক বাংলাদেশেব গ্রাম-জীবনের পটভূমিতেও বলা যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শস্যহানি, মন্বন্তর প্রভৃতির নির্মম আঘাতে জর্জবিত দরিদ্র কৃষকজীবন বৈষম্যমূলক সমাজের অনিবার্য গতিপ্রবাহে ক্রমশ ভূমিহারা দিনমজুব জীবনে রূপান্তরিত হচ্ছে। চান্দ বিনোদের জীবনে, 'মহিষাল বন্ধু' গাথায় সুজন, ডিঙাধর ও বলবামেব জীবনে রূপান্তরের এই ক্রমবিপর্যয়েব ছবিই অঙ্কিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যহানির পব চান্দ বিনোদ ক্রমশঃ তার হালের গরু, জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে —

আছিল হালেব গরু বেচিয়া খাইল।
পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে দিল।।
খেত খোলা নাই তার, নাই হালের গরু।

এমতাবস্থায কাযিক শ্রমই তার একমাত্র সম্পদ। কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করেই তাকে জীবিকা নির্বাহেব উপায় অবলম্বন করতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে পেশা পরিবর্তনেরও বিকল্প নেই তাব সামনে। শিকার কবে জীবিকা নির্বাহে প্রয়াসী হয় চান্দ বিনোদ।

মহাজনী ঋণ কৃষক জীবনকে বিপর্যস্ত কবার আর এক উপাদান। মহাজনী ঋণের গ্রাসে দু-দুটি সম্পন্ন কৃষক জীবন বিপন্ন হওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'মহিষাল বন্ধু' গাথায়। উচ্চবিত্ত কৃষক সুজন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মহাজনী ঋণের শোষণে নিঃশেষিত হয। প্রথমে অগ্নিদগ্ধ হয় তাব বাড়ি, রোগে মবে হালেব মহিষ ও দুগ্ধবতী গাভী, পরে আশ্বিন মাসের প্লাবনে ঘটে শস্যহানি —

আগুন লাগিয়া পুড়ে তিন খণ্ড বাড়ী।।

... ...

বাতানে মইষ মরল পালে মরল গাই।

... ...

আইশনা পানিতে তার খাইল বাকের ধান।[৭১]

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উন্মূলিত সুজন কৃষকের মহাজনী ঋনের শরণাপন্ন হবার পেছনেও রয়েছে মন্বন্তরের প্রেক্ষাপট। ধনী কৃষক ও মহাজন বলরামের কাছ থেকে একশ টাকা ঋণ নিয়ে সে তার কৃষক জীবন অব্যাহত রাখে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে পুত্র ডিঙাধর যখন আর্থিক সংকট উত্তরণে প্রয়াসী হয়, তখন মহাজনী ঋণ পরিশোধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকে কৃষক জীবন থেকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয়ে বলরামের বাড়ির সাধারণ মইষালে রূপান্তরিত হতে হয়। একশ টাকা ঋণের জন্য ডিঙাধরকে মইষালের কাজ করতে হয়। ছ'বছরের পরিশ্রমের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ হবে, তাও নির্ধারণ করে দেয় স্বয়ং মহাজনই –

আজি হইতে করবা তুমি মইষের রাখালী।
ছয় বছর খাট্যা দিলে তবে হইব ফালি।।[৭২]

এরকম দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে গীতিকাগুলির বহু স্থানে। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি কেউই - নিছক কলমপেষা ছড়াকার থেকে মহৎ সাহিত্যস্রষ্টা পর্যন্ত। মূলত দ্বৈত শাসন তথা দেওয়ানী আমল থেকে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান-হারা বাঙালী জনসাধারণ তাদের স্বোপার্জিত জীবন যন্ত্রণাকে অভিব্যক্তি দিয়েছে সাহিত্যে। তাই দেবতার উদ্দেশে রচিত হলেও সেগুলোকে আর ঠিক ধর্মান্ধতার কোটায় ফেলা যায়নি। যেমন রামানন্দ ঘোষ যখন রামের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসে সর্বহারার মত বলেন - 'ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানি'[৭৩] তখন বুঝি গণ অর্থনীতির ভারকেন্দ্রটি কোন অতলে ডুবতে বসছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কালের একটা বিচিত্র ব্যাপার হল, দুর্ভিক্ষের বছরে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় আরো কিছুটা বর্ধিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সরকারি প্রশাসন ও কর সংগ্রাহকরা বল প্রয়োগ করে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণে ভারসাম্য রেখেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় চার বছরের আদায়ীকৃত রাজস্বের হিসাব থেকে এরকম সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

সারণী ঃ

বাংলা বৎসব	ইংরাজী বৎসর	সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ (টাকায়)
১১৭৫	১৭৬৮-৬৯	১,৫২,৫৪,৮৫৬
১১৭৬	১৭৬৯ ৭০	১,৩১,৪৯,১৪৮
১১৭৭	১৭৭০-৭১	১,৪০,০৬,০৩০
১১৭৮	১৭৭১-৭২	১,৫৩,৩৩,৬৬০

মুর্শিদাবাদ দববারে ব্রিটিশ রেসিডেন্টও স্বীকার করেছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের সময় রাজস্ব বড় বেশি কড়াকড়ি কবে আদায় করা হয়েছে। এর আগে রাজস্ব আদায়ে এতটা জবরদস্তি ছিল না। বাংলার নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও তাঁর অধীনস্থ আমিলরা এবং ইংরেজ সুপারভাইজারের দল নিজের নিজের উদরপূর্তির জন্য কিংবা মালিকদের সন্তুষ্ট রাখতে বলপ্রয়োগ করে বাজস্ব আদায করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় লোক সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়াব কথা। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে ঘটল এর বিপরীত ঘটনা। ডিরেক্টর সভা ১৭৭১-এর ২৯শে আগস্টের চিঠিতে এ দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করে রেজা খাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি মুর্শিদাবাদগামী ধান বোঝাই নৌকাগুলি আটক করে কমদামে শস্য ক্রয় ও মজুদ করেন এবং টাকায় ৩০ থেকে ২৫ সের চাল কিনে তা টাকায় তিন বা চার সেব দরে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লাভ করেন। তাঁর এজাতীয় অবৈধ ব্যবসা বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে পেটের জ্বালায় মেরেছিল। সমসাময়িক ছড়া তার নজির —

নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল।।
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে।।
একচেটে ব্যবসা, দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর।।
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মবে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।।[৮]

উত্তরবঙ্গের ইজারাদাররূপে নিযুক্ত হওয়া কুখ্যাত দেবীসিংহ এ যুগের আর এক সন্ত্রাস। দিনাজপুরের নাবালক মহারাজার দেওয়ানও ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে দু'দুটো ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কৃষকদের উপর নিত্য নতুন অত্যাচারের ফলে অনেকটা বাধ্য হয়েই তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহী কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবাণী পাঠক ও দেবীচৌধুরানী। এই নির্মম অত্যাচাব যা অসংখ্য প্রজাকে করেছিল গৃহহারা. যা ছিয়াত্তরের

মন্বন্তরের পথকে প্রশস্ততর করেছিল, সেই অত্যাচারের আর এক কর্ণধাব দেবী সিংহেব চরিত্র ও তার নির্যাতন পদ্ধতির বিস্তারিত ছবি প্রকাশ পেয়েছে রংপুর অঞ্চলের রতিরাম দাস নামক জনৈক ব্যক্তির রচিত 'জাগের গান'-এ। কবি তাঁর এই 'জাগের গান'-এ 'রাস' অংশের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা সকলের সম্মিলিত বিদ্রোহের বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য গাথাটির রচয়িতা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন - "এই কবিতা রচক রতিরাম রঙ্গপুর জেলায় প্রাচীন ইটাকুমারী গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন।"[৭৫] সুতরাং আলোচ্য গাথা কাব্যটি আঠার শতকের শেষের দিকের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

কবি রতিবাম রাজবংশীর লেখন বৈশিষ্ট্য এই যে, অপরাপর অদৃষ্টবাদী কাব্যরচয়িতার মত রতিরাম ইজারাদারের এই অত্যাচারকে প্রজার পাপের ফল বলে মনে করেননি। বরং তিনি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী ইজারাদারদের উত্থানের জন্য রাজশক্তিকেই প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযুক্ত করেছেন —

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মুল্লুকেতে হৈল বার ঢিং।।
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন।।
রাজার পাপেতে হৈলো মুল্লুক আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল।।[৭৬]

এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেও দেবী সিংহের হররাম প্রমুখ কর্মচারীরা আদায় বকেয়ার কোন হিসাব নিকাশ না রেখে কিভাবে প্রজার কাছ থেকে অনবরত অর্থ আদায় এবং জমিদারের উপর অত্যাচার করেছিল নীচের ছত্রগুলি থেকে তার এক নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় —

কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই।।
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোটবড় নাই সবে করে হাহাকার।।[৭৭]

খাজনা আদায়ের লোভ মাত্রাছাড়া আকার ধারণ করেছিল। শুধু তাই নয়। অত্যাচারী দেবী সিংহের যোগে দলবলের কামুকতায় প্রজাদের অন্তঃপুরের অবস্থাও কাহিল হয়েছিল —

পাবে না ঘাটায় চলিতে ঝিউরী।
দেবী সিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি।।

পূর্ণ কলি অবতার দেবী সিংহ রাজা।
দেবী সিং এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।[৭৮]

দেবীসিংহের অত্যাচার, আর অধিক রাজস্ব আদায়ের জুলুমের শিকার হয়ে দেশের রায়তদের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তারও বর্ণনা পাওয়া যায় আলোচ্য কবির রচনায় —

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত যুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া।।
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয় খান করি উপবাস।।
... .
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ায় নাই জল।[৭৯]

অর্থাৎ রাজার পাপে বছর বছর আকাল-সহ প্রজাদের হাজার দুর্গতি।

ছড়ায় শুধুই থাকে সমকালের স্বীকৃতি। আগের অধ্যায়েই বলেছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ যুগমানস বর্ণনার সার্থক বাহন হিসাবে ছড়াগুলির উপযোগিতা কতখানি। কিন্তু সাহিত্যিক আবেদন এগুলিতে গৌণ। অন্যদিকে রামপ্রসাদের শাক্ত পদের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্যেরই সমবেত উপস্থিতি লক্ষ্য করি। মহৎ কবি হিসাবে একদিকে যেমন সমকালকে তিনি উপেক্ষা করেত পারেননি, অন্যদিকে তেমনি সমকালকে অবলম্বন করে তাঁর পদগুলো সুদূর অধরা আধ্যাত্মিকতার অনবদ্য ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে কালাতিক্রান্তি মহিমাও অর্জন করেছে অনায়াসে। যিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি।[৮০]

রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, অন্তর্কলহ, মারাঠা বর্গী থেকে ঔপনিবেশিক বণিক শক্তির মত বহিরাগত দস্যু-লুণ্ঠনকারীর বঙ্গভূমিতে অবাধ প্রবেশ এবং আঘাতের পর আঘাতে বঙ্গ বাসীকেজর্জরিত করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ বন্যা থেকে খরা পর্যন্ত সব কিছুরই দ্রষ্টা তিনি। তাই তাঁর পদগুচ্ছে আধ্যাত্মিক আকূতির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঐতিহাসিক সংকেতটুকু দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন - ১৭৫২-র ভয়াবহ জলপ্লাবন এবং তজ্জনিত শস্য হানির ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি পদে —

অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।।[৮১]

প্রাকৃতিক দুর্বিপাকগ্রস্ত কৃষিসর্বস্ব মানুষের জীবনের গ্লানি এই সঙ্গীতে অভিব্যক্ত।

স্বাধীন নবাবী আমলের শেষার্ধ থেকে ইংরাজ শাসন কায়েমের পাকাপাকি বন্দোবস্ত

পর্যন্ত সময় পর্বে রামপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। তাই এই পর্বের প্রধানতম জীবনসত্যটুকু তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রতি মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি। যে সত্য শুধ্ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে নয়, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির উত্থান পতনের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ে নয়; তার থেকেও অনেক গভীরে যার মূল - তা হল দারিদ্র্যে, অন্নহারা মানুষের জঠরাগ্নি নেভানোর আর্তিতে। সে আর্তি গগনভেদী হয়েছে ছিয়াত্তরের মহামারীর সময়ে। প্রত্যক্ষদর্শী কবি-কলমের আঁচড়ে তার প্রকাশভঙ্গি বড় বেশীরকমের বাস্তব আর মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে—

অন্নদে গো অন্নদে গো অন্নদে গো।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে।।[১১]

ভারাক্রান্ত জীবন -প্রবাহের প্রতিনিধি স্থানীয় তাঁর এই পদটি বহু যুগের ব্যবধানেও অক্ষয় মর্যাদায় সমাসীন।

তবে কবি সেখানেই সাধক, যেখানে দৈনন্দিনতাকে অতিক্রম করে অভাবের অনাশ্রয় থেকে মাতৃ পদতলে শরণাগতির অভয় পান। তাই মন্বন্তরের দুর্দিনেও রামপ্রসাদ মায়ের কাছে মোক্ষ প্রসাদ চেয়েছেন। অন্ন ত্রাসে প্রাণ সংশয় হলেও মাতৃচরণে পরম নির্ভরশীল হয়ে থেকেছেন। তাঁর কৃষিক্ষেত্রে ফসল ফলেনা, যা ফলেছিল তাও ভোগে লাগে না। তাই শাকান্ন থেকে যায় আলুনা। এমতাবস্থায়ও সাধক কবির মাতৃ নিষ্ঠায় চিড় ধরেনি। ভক্তি বিশ্বাসে এবং অভিমানে আপ্লুত তাঁর কণ্ঠ —

কাজ কি সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে তোর ধন বিহনে।।
সামান্য ধন দিবে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দাও মা অভয়চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে।।[১২]

এইভাবেই রামপ্রসাদ কালের করাল আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও কালোত্তীর্ণ মহিমায় উত্তোরিত হয়েছেন।

ছিয়াত্তরের মহামারীর দাপট একদিন কমে এল। কিন্তু তার রেশটুকু সমাজের সর্বাঙ্গে রয়ে গেল দুষিত ক্ষতের মত। আর সেই দুষ্ট-অঙ্গে ভয়াবহ যন্ত্রণার সঞ্চার করল আর একটি গণ অভ্যুত্থান - নাম 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ দেশের ক্রমবর্ধমান অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার সাক্ষাৎ পরিণাম। এর উল্লেখ রয়েছে মন্বন্তরের সাত বছর পরে। কারো মতে এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র দিনাজপুর, কারো মতে রাজসাহী, কারোর মতে মৈমনসিংহ। অর্থাৎ হয় উত্তরবঙ্গে, নয় উত্তর-পূর্ববঙ্গে।

মন্বন্তরে গ্রামের পর গ্রাম লোকবসতি শূন্য হয়ে যাওয়ায় জঙ্গলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কৃষকদের এই ব্যাপক হারে ভূমিত্যাগ এবং অকর্ষিত জমির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান

হওয়ায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন পার্লামেন্ট বা সংসদ এই ক্রম-অবক্ষয়ের ছবিটি লক্ষ্য করে কৃষকশ্রেণীর এই ভূমিত্যাগের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ দিল। কিন্তু শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে কোনো অঞ্চলকে নতুন করে বসতিপূর্ণ করা যায়না। যাই হোক, জমি এইভাবেই অকর্ষিত পড়ে রইল বছরের পর বছর এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁর দীর্ঘ তিন বছরের সতর্ক অনুসন্ধানের শেষে জানালেন যে, বাংলায় কোম্পানীর রাজ্য সীমানার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল "....... a jungle inhabited only wild beast." এর ফলে, দেশ জুড়ে চুরি ডাকাতি চলতে লাগল অবাধে। এদের সঙ্গে দলে দলে যোগ দিয়েছিল না খেতে পাওয়া মানুষের দল। দুর্ভিক্ষের সময়ে যে সব মানুষ পাহাড়ী অঞ্চলে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে গিয়েছিল, তারা শুধু আশ্রয়ের সন্ধানই পায়নি, পেয়েছিল নতুন জীবিকারও সন্ধান। সে পেশা হল ডাকাতি। মন্বন্তরের সময় ভাগলপুর ও রাজমহলের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ অভাবের তাড়নায় পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারণ, সেখানে মকাই ও বোরো ধান নষ্ট হয়নি। সুতরাং তারা পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গেই বছরখানেক থেকে যায়। কিন্তু মন্বন্তরের পরে যখন তারা নিজের নিজের অঞ্চলে ফিরে আসতে থাকে, তখন এদের আর কেউ বিশ্বাস করে সমাজে প্রবেশ করতে দেয়না এবং কোনরকম কাজেও নিযুক্ত করে না। বাধ্য হয়ে তারা আবার পাহাড়ী অঞ্চলে ফিরে যায় এবং ডাকাতি শুরু করে। তাদের পুরোনো আবাস নিম্ন ভূমির সব কিছু এত নখদর্পণে ছিল, পার্বত্য ডাকাতের চেয়েও এরা অনেক বেশী ভয়াবহ হয়ে উঠল। বস্তুত এই ডাকাতদের উৎপাত মন্বন্তরের সমাপ্তিকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ভাবনার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল বাংলার মানুষের জীবনে। ডাকাতদের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল মন্বন্তরের কবলগ্রস্ত সর্বহারা ক্ষুধার্ত মানুষের দল।

এই ডাকাত দলের সৃষ্টির পিছনে ছিল কোম্পানীর নির্দয় নীতি। আগেই বলেছি, মন্বন্তরকালে দুর্যোগের দিনগুলোতে রেজা খাঁর মত সুপারভাইজাররা খাজনা আদায়ে কতটা অমানবিক হয়েছিল। আর এর জন্য বাংলার মানুষ যে বিভীষিকা ও মর্মযন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছে তাও নজির বিহীন।

বাংলার গ্রামজীবনের অরক্ষিত গৃহপ্রাঙ্গণে ব্রিটিশ শক্তির এই হঠাৎ প্রবেশ যাদের সর্বহারা করে তুলল, তাদের যখন আর হারাবার মত কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন তারা মুক্তির পথ খুঁজে নিল সংঘর্ষ-সংঘাতের পথে। সকলেই তো অদৃষ্টবাদী ছিল না। তাই নীরবে মৃত্যুর আগে একবার শেষ চেষ্টা করল। মেরুদণ্ড সোজা করে রুখে দাঁড়াল। অত্যাচারীকে শুধু শত্রু বলে মনে করেই ক্ষান্ত হল না, অস্ত্রধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। যেহেতু সন্ন্যাসী ও ফকিররা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাই এর নাম সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। ক্ষুধা তাড়িত মুসলমান রায়তরা অনেকেই যোগ দিল ফকিরদের সঙ্গে। হিন্দুরা যোগ দিল সন্ন্যাসীদের দলে। উভয় দলই রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে এক যোগে বাংলার বুকে সৃষ্টি করে চলল অরাজকতা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য বা ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে যা কিছু রচনার সূত্রপাত - সবই উনবিংশ শতাব্দীতে। যেমন - ঐতিহাসিক গাথা 'মজনুর কবিতা' (রচয়িতা - পঞ্চানন দাস, ১২২০ বঙ্গাব্দ), কিংবা 'মহাস্থানগড় ছড়া' (রচয়িতা - দ্বিজ গৌরীকান্ত, ১২২১ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। আর সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের নাম। এছাড়া কিছু কিছু চিঠিপত্রের হদিশ পাওয়া যায়।[৮৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক সন্দেহ নেই। কিন্তু শতাব্দী যত যুগসন্ধিক্ষণের পথে এগিয়েছে ততই দেখা গেছে বাংলার চাষের করুণ অবস্থা। বঙ্গ ভূমির চাষী আজ চিরঋণগ্রস্ত। এ দেনার অন্ত নেই, কিন্তু আদি রয়েছে। রাজস্ব যখন কেবল শস্যের বিনিময়ে মেটানো হত, তখন এ দেনা ছিল নিতান্তই নগন্য ও সাময়িক। চতুর্দশ শতাব্দীতে শেরসাহী আমলে মুদ্রা নিয়ে খাজনা দেবার রীতিরও প্রচলন হল - আকবরের প্রতিভূ টোডবমল তা চালু করলেন। খাজনা 'শস্যঞ্চ গৃহমাগতং' ছকের আশ্রয় ছেড়ে রোপিত শস্যের ঘাড়ে পড়ল। ফলে চাষীর ঝুঁকি বেড়ে গেল - সঙ্গে সঙ্গে দেনার প্রয়োজনও।

সোনার বেণে একসময় ছিল সমাজে উত্তমর্ণ। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালী আমলে তাদের হতমান করার ফলে সে জায়গা দখল করল গুজরাটী ও রাজস্থানী। অষ্টাদশে সে বল্লালী ভুলের বিষময় ফল স্পষ্ট হল স্বনামধণ্য ব্যাঙ্কার জগৎশেঠে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ তাকাবি, অর্থাৎ চাষীকে চাষের জন্য দেওয়া সাময়িক ঋণ যোগাতেন জমিদার। তাদের সুদের হার ছিল অকিঞ্চিৎকর। পরে তাঁরা অপারগ হলেন। কুসীদজীবী এল প্রথমে তার মাস প্রতি শতকরা দু'টাকা সুদের বেসাত নিয়ে। তারপর তা ক্রমে ক্রমে বহুগুণ বেড়ে উঠল। আইনগত কোনো বাধা ছিলনা। বস্তুত এ প্রাধান্যের সঙ্গে ব্রিটিশ বিচার-ব্যবস্থা জড়িত। ইতিপূর্বে মুর্শিদকুলির আমলের ইজারদারী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস পুরোনো জমিদার-ইজারদারদের বরখাস্ত করে নতুন ধরণের ইজারা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ হিসাবে কেউ বলেছেন, এটি রাজস্ব বাড়াবার জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র। কারোর মতে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁর অর্থলিপ্সা। এব ফলে বঙ্গ ভূমির অভ্যন্তরে অশান্তি আরো বেড়ে গেল। পুরোনো জমিদারদের অনেকেই মাসোহারা পেয়ে বিদায় নিলেন, নতুন নতুন ইজারাদার বেশী টাকা কবুল করে আবির্ভূত হলেন। এমনকি নিজেদের এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হলেন। এই অদল বদলের ফলে রায়তদের কাছ থেকে আগের পাট্টা অর্থাৎ জমি ভোগ করার অধিকার পত্রও কেড়ে নেওয়া হল। আর চাই কি ? জমি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হল, চাষীর ওপর

অত্যাচারেরও সীমা রইল না। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চলল পাঁচটি বছর। রজতকান্ত রায়ের মননশীল গবেষণায় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভবানীর 'নাটোর' জেলাকে কেন্দ্রে রেখে তিনি আলোচনাকে বিন্যস্ত করেছেন।[৮৭] এই ইজারাদারী ব্যবস্থায় শুধু যে কোম্পানীর বড় কর্তারা লাভবান হলেন তাই নয়, কোম্পানীব তাঁবেদার দেওয়ান ও মুৎসুদ্দিরাও ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগলেন। যেমন—

রাণী ভবানী নিজের জমিদারি রক্ষা করতে হেস্টিংসকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে পার পেলেন না। "শুধু হেস্টিংস তো নন, আরো অনেক দাবীদার ছিলেন। রাণীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ আপন ভোলা কালী ভক্ত মানুষ। সাধক পুরুষ বলেই তাঁর খ্যাতি। জমিদারী দেখাশুনা করতে গিয়ে ভবানীর নিগূঢ় প্রবাহগুলি সম্বন্ধে তাঁর চাক্ষুস পরিচয় ঘটল। সাধকসুলভ অনভিজ্ঞতাবশতঃ তিনি মনে করলেন, অন্যায় উৎপীড়নের প্রমাণ দিতে পারলে তার ন্যায় বিচার হবে। তিনি জেনারেল ক্লেভারিং এর কাছে সুবিচার প্রার্থী হলেন। তাঁর আর্জিতে জানা গেল ১১৭৯ এবং ১১৮০ সনে তাঁর নিজের জমিদারীর ইজারা হস্তগত করবার জন্য তাঁকে মোট৪,৪০,০০১ টাকা সেলামী দিতে হয়েছে। তার মধ্যে মুরলী পোদ্দার, সদানন্দ পোদ্দার ও হট্টু বিশ্বাসের হাত দিয়ে কান্তবাবু ১,২৫,০০১ টাকা নিয়েছেন। তাছাড়া যুগল উকিল, রূপ পোদ্দার ও মুরলী পোদ্দারেব হাত দিয়ে এবং জগৎ শেঠের কুঠির মাধ্যমে শান্তিরাম সিংগি ২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছেন - তার মধ্যে এক লক্ষ টাকা রাজবাটি থেকে শেঠভবনে গয়নাগাটি এমন কি থালাবাসন বেচে সংগ্রহ করতে হ ছে। তৃতীয় যে ব্যক্তি প্রণামী পেয়েছেন তাঁর নাম ভবানী মিত্র - তিনি নয়ান পোদ্দার, মুরলী পোদ্দার, রামকৃষ্ণ পোদ্দার, অখিল পোদ্দার, সদানন্দ, আনন্দরাম উকিল ও পরীক্ষিত মোরারের হাতে হাতে এবং আনন্দরাম উকিলের মধ্যস্থতায় মোতিচন্দ শেঠের 'পাট' ও দর্পনারায়ণ উকিলের মাধ্যমে পরগণা নুরুল্লাহপুরের উপর ঢাকায় প্রদেয় 'পাট' মারফৎ মোট ৩,৭৫,৪৫২ টাকা লাভ করেছেন।"[৮৮]

"........ এই কান্তবাবু, শান্তিরাম সিংগি কিংবা ভবানী মিত্রের মত সুযোগ সন্ধানী উঠতি বড়লোকের সংখ্যাধিক্য হতে লাগল এই সময়। এঁরা হলেন - শোভাবাজারের জমিদার নবকৃষ্ণ দেব, লবণ ব্যবসায়ী গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাণাঘাটের ছোলা ব্যবসায়ী এবং পরবর্তী কালে পানচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত পান এবং পাইকপাড়ার জমিদার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এঁদের মধ্যে নবকৃষ্ণের ভাগ্যলক্ষ্মীর আকস্মিক প্রসন্নতা নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাষায় —

"..........এই নবকৃষ্ণ একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর বা ততোধিক সময়ে চিনাবাজারের দিকে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ক্লাইভ সাহেবের বেহারার সহিত সাক্ষাৎ হইল। নবকৃষ্ণের সহিত কথাবার্তার ভাবে বুঝিতে পারিল যে নবকৃষ্ণ পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন। বেহারা কহিল, "আপনি যদি আমার সঙ্গে আমাদের সাহেবের

নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আপনার বিশিষ্ট ফল লাভ হইবে।" নবকৃষ্ণ আনুপূর্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া, বেহারার সঙ্গে সাহেবের কুটিতে গমন করিলেন।

এদিকে ক্লাইব সাহেব, ব্যাকুল চিত্তে বেহারার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। বেহারা হিন্দু মুন্‌শীর সহিত প্রত্যাগত হইতেছে দেখিয়া ক্লাইব নবকৃষ্ণকে সমাদর সহকারে চৌকি দিয়া বসাইলেন এবং কহিলেন, "আপনি অদ্য হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুনশী পদে নিযুক্ত হইলেন। আপাততঃ মাসিক বেতন ৪০ টাকা পাইবেন, পরে কার্য্য দক্ষতা দেখাইতে পারিলে, বেতন বৃদ্ধি হইবে।" নবকৃষ্ণ ক্লাইবের সমাদরে ও সহসা মুন্‌শী পদ প্রাপ্তিতে পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সাহেবকে পারস্যভাষায় লিখিত পত্রেব মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া, তাহার যথোপদিষ্ট উত্তর লিখিয়া দিলেন। ইহাতে ক্লাইব সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপে নবকৃষ্ণের ভাগ্যলক্ষী সামান্য বেহারার আকারে তাঁহাকে ক্লাইব সাহেবের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া, তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। সেইদিন হইতেই নবকৃষ্ণ পদস্থ হইয়া ভবিষ্যতে ইংরেজ রাজ্যে যশ খ্যাতি ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ দিন দিন ইংরাজ রাজপুরুষগণেব বিশ্বাস পাত্র হইয়া সম্মান সহকারে স্বীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিত লাগিলেন। হেস্টিংস সাহেবের কর্তৃত্ব সময়ে নবকৃষ্ণ "মীর মুন্সীর" পদে উন্নতি লাভ করেন। কাল সহকারে ইনি "রাজা নবকৃষ্ণ" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কলিকাতার শোভাবাজার নামক স্থ বৃহৎ ও সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া হেষ্টিংস সাহেবের সময় হইতে ইনি সম্ভ্রমশালী এবং কলিকাতার কায়স্থ সমাজে ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সম্মানিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।"[৮৮]

সামান্য কলমপেষা কেরানীর সমাজের মাথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ - এর পিছনে ইংরেজের মদত যতই থাকনা কেন, কৌলীন্যের কোনো স্থানই ছিলনা। স্বভাবতই কুলীন-অকুলীনের দ্বন্দ্ব বাঁধতে। যেমন দেখা গেছে ধনী ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ চূড়ামণি দত্তের সঙ্গে নবকৃষ্ণের সামাজিক বিবাদ-বিসম্বাদের ঘটনাটি। এমনকি চূড়ামণির অন্তিম সময়েও সে কলহের অবসান হয়নি। "কথিত আছে যে চূড়ামণিকে যখন গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়, তৎকালে তিনি শয্যায় বসিয়াছিলেন, শয়ন করেন নাই। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকাব ধারণ কবিবা মাত্রই, তিনি বহু সংখ্যক ঢুলি আনাইয় নিজে একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলায় বসিয়া গঙ্গা যাত্রায় চলিলেন। অগ্র পশ্চাৎ অসংখ্য লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগর কীর্তন। চতুর্দ্দোলাটি নানা রূপে সাজানো। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসী মালার ঝালর, চারদিকে তুলসী গাছ, আর তার মধ্যে চূড়ামণি দত্ত, আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্ত বর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। অগ্রে ঢুলির "চূড়া যায় যম জিনতে" এই বোল বাজাইতে

লাগিল। কীর্ত্তনিয়ারা গাহিতে লাগিল। গীতটি এই —

আয়রে আয় নগর বাসী দেখবি যদি আয়।
সবারে (জগৎ) জিনিয়ে চূড়া যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায় রে চূড়া যম জিনিতে যায়।
নবা দেখবি ত আয়, নবা দেখবি ত আয়।
জপ তপ কর কিন্তু মরলে জানতে হয়।
. . . ইত্যাদি

শোভাবাজার রাজবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই গান গাহিবার পর, চূড়ামণি সদলবলে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকেরা এই কঠোর বিদ্রূপে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কয়েকদিন গঙ্গাবাস করিয়া চূড়ামণি দত্ত, পরিশেষে সজ্ঞানে গঙ্গ লাভ করেন।"[১৮] নিছকই স্থূল বিষয় নিয়ে কৌলীন্য-বর্জিত লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করত আঠার শতকের গণ্যমান্য সমাজ-কর্তারা। বলাই বাহুল্য অর্থই যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিমাপক হয়, শিক্ষা সেখানে প্রায় একেবারেই অবগুণ্ঠনের আড়ালে আত্মগোপন করে। নবকৃষ্ণ, কান্ত মুদি, কিংবা পান-মহাশয়দের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বভাবতই এদের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা ছিল না ধ্রুপদী, বা পুরা প্রচলিত গম্ভীর সাহিত্যের। ফলশ্রুতি - কবিগান, বৈঠকী মেজাজীদের আনন্দ দিতেই বাংলা সাহিত্যে যার উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা। এই কবিগানের আবির্ভাব উৎসব আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রহরের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত জেনারেল লর্ড চার্লস কর্ণওয়ালিস যখন কলকাতায় এসে ব্রিটিশ রাজ্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন (১৭৮৬) তখন বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্ণওয়ালিশকে নিয়োগ করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেটি হচ্ছে বাংলার ব্রিটিশ লুণ্ঠন বন্ধ করা, অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এমন একটি স্থায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার অধীনে অর্থনীতি আবার গতিশীল হবে, জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং কোম্পানী ও ব্রিটিশ জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সাধিত হবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এর আনুষঙ্গিক আইন কানুন প্রতিষ্ঠানাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অবশ্য লর্ড কর্ণওয়ালিশের কোন মৌলিক অবদান নয়। ১৭৭৬ সালে কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। এর পর থেকে কলকাতা ও লণ্ডনে এ ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা ও পর্যালোচনা হতে থাকে এবং কর্ণওয়ালিশের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব একটি ভিন্ন গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে

কর্ণওয়ালিশ ও তাঁর উপদেষ্টাদের চিন্তা-ভাবনা ছিল ফিলিপের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। এ বন্দোবস্তের সুফল সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। তিনি আশা পোষণ করেছিলেন যে, এই বন্দোবস্তের ফলে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটবেই। আসলে কলকাতায় আগমন করে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা দেখে তিনি নিদারুণ মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁকে বিশেষ ভাবে পীড়া দিয়েছিল সরকার কর্তৃক জমিদারকে এবং জমিদার কর্তৃক রায়তকে শোষণ। রায়তের সমস্ত উদ্বৃত্ত কেড়ে নেয় রাষ্ট্র। একে কর্ণওয়ালিশ স্রেফ রাষ্ট্রীয় লুটতরাজ বলে গণ্য করেন, এবং তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ঐ লুটতরাজ প্রক্রিয়ার ফলেই বাংলা এবং কোম্পানীর অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠেনি, কৃষক শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থারও কোনো উন্নতি হয়নি। জমিদারদের উপর প্রত্যাশা স্থাপন করা হয়েছিল যে, এরা কৃষি উৎপাদন ও কৃষি-সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগী নেতৃত্ব দেবে, যেমনটি দিয়েছিল ইউরোপের ভূস্বামী শ্রেণী। কিন্তু বাস্তবে জমিদারগণ গরীব কৃষকের কাছ থেকে জবরদস্তি মূলক ভাবে আদায়কৃত তাদের অর্জিত খাজনার উপর নির্ভরশীল একটি পরনির্ভর শ্রেণীতে পরিণত হয়। জমিদারগণ কেন উন্নয়নকামী হয়নি এ নিয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তবে পুঁজিবাদী উন্নয়নে জমিদারদের অনীহার অর্থনৈতিক কারণ এই হতে পারে যে, পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জনের যতোগুলি সুযোগ ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম লাভজনক এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কৃষি খাত, অধিকতর লাভজনক এবং তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকি পূর্ণ বিনিয়োগ পন্থা ছিল মহাজনি ব্যবসা, শস্য ব্যবসা, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি। মূল্য বিপ্লবের দরুণ ব্রিটিশ ভূস্বামীর কৃষি বিনিয়োগ থেকে যে হারে মুনাফা লাভ করতো তা অন্য যে কোনো বিনিযোগ ক্ষেত্রের তুলনায় ছিল অধিক সুবিধাজনক। সমকালীন বাংলার কৃষি বিনিয়োগ থেকে অনুরূপ মুনাফা অর্জন ছিল অকল্পনীয়। তবে বাংলার কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিনিয়োগের অভাব বিশ্লেষণ করতে শুধু লাভ-ক্ষতির পাল্লায় বিচার করলে চলবে না। জমিদারদের সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ সমকালীন অভিজাত শ্রেণীর মনোভঙ্গী ছিল সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী নয়। অতএব তাদের জীবন ধারায় অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে সামাজিক উপাদানের প্রভাব ছিল বেশী গভীর। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নটি বিবেচনায় এসেছে অতি গুরুত্ব সহকারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যেসব বাণিয়া ভূমি নিয়ন্ত্রণে এসেছে তারা অধিক মুনাফার জন্য ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ কথা বলা যায় না। তারা জমিদারি এস্টেট ক্রয় করেছে অধিক সম্মানের জন্য, সামাজিক স্বীকৃতির জন্য।

জমির বন্দোবস্ত হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে কৃষকদের পঙ্গু করে দিয়েছিল এবং অন্যদিকে ভূমি রাজস্ব খাতে রাষ্ট্রের আয়কে চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল। এর ফলে উনিশ শতক ও বিশ শতকে মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমি থেকে অতিরিক্ত মুনাফার সমগ্র অংশই জমিদারদের পকেটস্থ হয়, তার দ্বারা কৃষক সমাজ অথবা রাষ্ট্র কেউই

উপকৃত হয়না। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হিসেব করে দেখা গিয়েছিল যে, ভূমি-রাজস্ব থেকে বাংলাদেশের জমিদাররা লাভ করেছিল দুই কোটি পাউণ্ড। কিন্তু সরকারের ঘরে জমা হচ্ছিল মাত্র চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ বস্তুতপক্ষে এই চলিশ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় করার জন্য সরকার সামগ্রিক ভূমি- রাজস্ব থেকে ব্যয় করেছিলো দুই কোটি পাউণ্ড। বস্তুত, এই অবস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারেরই সৃষ্টি। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের ভূম্যধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। এর পরবর্তী পর্যায়ে জমিদারদের উপর ইচ্ছামত কর ধার্যের নানা ব্যবস্থাও তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে করে দিয়েছিল। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভারতের ভূমি সমস্যার উপরে লেখা একটি পুস্তকে এ সম্পর্কে বলেছেন, আধুনিক জমিদারী প্রথা গ্রাম্য সমাজের অধিকার এবং কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে ব্যবহার করেছিল কৃষকদের দমন করার কাজে।" এর একটা উদাহরণ হিসাবে তিনি বিক্রয় আইনের উল্লেখ করেছেন। এই আইন অনুযায়ী নিলাম কৃত জমিতে নতুন জমিদারদের ইচ্ছা মত অতিরিক্ত করবৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে এর আওতা কেবলমাত্র নিলাম কৃত জমির উপর সীমাবদ্ধ থাকলেও সত্বর সমস্ত জমিদাররাই তার সুযোগ নিয়ে এবং সরকারের থেকে এ ব্যাপারে কোনো বাধা না পেয়ে জবরদস্তি মূলক ভাবে নিজেরাই জমির ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে যেতে থাকে। রাষ্ট্রের আয় এবং জমিদারদের আয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান তারতম্যের এটাই হল সর্বপ্রধান কারণ।

বদরুদ্দিন উমর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে বন্দোবস্ত-সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত করেছেন। এই মধ্যস্বত্ব ভোগীরা মূল জমিদারদের পক্ষ থেকে জমিদারী দেখাশুনার জন্য ভারপ্রাপ্ত হত এবং জমিদারদের দেয় রাজস্ব ও জমিদারদের থেকে তাদের পাওনা বাদ দিয়েও অতিরিক্ত আদায় দ্বারা নিজেদের উদরপূর্তি করতো। অপদার্থ জমিদাররা নিজেদের জমিদারী কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে অক্ষম হওয়ার জন্যেই প্রধানত এই শ্রেনীর নতুন মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই প্রায় স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের এলাকায় খাজনা আদায়ের নামে প্রজাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন জারি রাখতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসে এই অতিরিক্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তর ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে এ দেশে নিয়মিতভাবে খাদ্যসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদের জমি থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে উচ্ছেদ করে তাদের পরিণত করেছে ভূমিহীন কৃষক ও গ্রাম্য দিনমজুর শ্রেণীতে।

এই মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণী সৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর অসংখ্য জমিদারীর হাত বদল। পরবর্তীকালে জমিদারীর মুনাফা বহু গুণে বৃদ্ধি পেলেও প্রথম দিকে অর্থাৎ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের ওপর দেয় রাজস্বের যে ভার চাপানো হয়েছিলো তৎকালীন অবস্থায় তা

ছিল অতিরিক্ত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর অনেকদিন পর্যন্ত কৃষকদের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা পূর্বের থেকে কমে আসে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার সেদিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রেখে জমিদারদের ওপর রাজস্বের এক গুরু ভার চাপিয়ে দেয়। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই রাজস্ব আদায় করা অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের পক্ষে সম্ভব হতো না এবং তার ফলে বন্দোবস্তের শর্তানুসারে সরকারের হাতে দেয় রাজস্ব পৌঁছে দিতে না পারার জন্য তাদের জমিদারী আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে নিলাম হয়ে যেত। এই অবস্থায় অনেক জমিদার জমিদারী রক্ষার জন্য মহাজন ও বেণিয়াদের শরণাপন্ন হতো। কিন্তু এ সব করেও শেষ পর্যন্ত জমিদারী রক্ষা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। এই সমস্ত জমিদারী যারা পুরাতন জমিদারদের থেকে ক্রয় করতো তারা ছিল মুৎসুদ্দী, বেণিয়া, মহাজন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী। কাজেই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় যে সমস্ত জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নিজেদের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের অন্য শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হত। এই নির্ভরশীলতার ফলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোর মধ্যে 'পত্তনি' নামে এক ধরণের নতুন ভূমি স্বত্বের সৃষ্টি হয় এবং 'পত্তনিদার' নামে এক নতুন বংশানুক্রমিক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী জন্মলাভ করে।"

তবে এই মধ্যস্বত্ব ভোগীর জন্ম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে বলা ভুল। বরং মুর্শিদকুলি খাঁর সুবাদারীকালে বাংলার অভিজাত ভূস্বামীদের অবস্থা দেউলে হওয়ার সময় থেকেই এরা সমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আভিজাত্যে, বংশ কৌলীন্যে, কিংবা শিক্ষা মর্যাদায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকা এইসব ইজারাদারের দল বিত্তের অহংকারে সব অভাব ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা করত। কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে এঁদের বংশধরেরাই পাকাপোক্ত জমিদার হয়ে গেলেন। আর মূলতঃ এদের নিয়েই জমে উঠল সদ্য-সৃষ্ট শহর — কলকাতা।

কলকাতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমান সুবাদারের খামখেয়ালিপনা ও নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য জমিদার তালুকদার এবং বিত্তবান ব্যক্তিরা ইংরেজের নব নির্মিত নিরাপদ বাণিজ্য-কেন্দ্র কলকতায় ভিড় করতে শুরু করেন। এছাড়া শহরে পথ-ঘাট নির্মাণের জন্য বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলার গ্রামাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী বিহার উড়িষ্যা থেকেও বহু দিনমজুর কলকাতায় স্থায়ী বা অস্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করে লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তোলে। সেই সঙ্গে ছিল বর্গী হাঙ্গামা থেকে শুরু করে পলাশী যুদ্ধের মত আর্থ-রাজনৈতিক ইন্দ্র পতনের ঘটনা। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "বোধহয় মারাঠা আক্রমণের ফলে (১৭৪২-১৭৪৫) নিরাপত্তার অভাবে এবং সিরাজ-উদ-দৌলার পতনে ইংরেজের শক্তিসামর্থ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ নির্ভরতার কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই শহরের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হতে থাকে। হেস্টিংস যখন মুর্শিদাবাদ থেকে বিচার, শাসন ও

রাজস্ব বিভাগ কলকাতায় তুলে আনালেন. কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হল (১৭৭৪) . তখন মামলা মোকদ্দমার জন্য এ শহরে জমিদার মধ্যবিত্ত এবং উকিল-পেসকার-নাজির ইংরেজিতে দরখাস্ত লিখিয়ে প্রভৃতি নানা ধরণের লোকের ভিড় বাড়াতে লাগল। . ... "[২১] আর প্রকৃতপক্ষে এই 'ভিড়' থেকেই কবিগানের জন্ম। স্বভাবতই নিরালা সাধনার অভাব এই সংস্কৃতির সর্বত্র। উপরন্তু এই সময় যে সমস্ত মূর্খ অলস লম্পট অর্থগৃধ্নু অত্যাচারীরা কলকাতা ও গ্রামবাংলার জনসমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা হয়ে বসেছিলেন তাঁরাই মূলত 'আখড়াই-হাফ আখড়াই-দাঁড়া কবি-যাত্রা-পাঁচালীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় মার্জিত রুচির কোনও ছাপও তাতে ছিলনা। মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ জুড়ে এই স্থূল সংস্কৃতিরই ক্রমবিবর্ধিত রূপ প্রত্যক্ষগোচর হয়।

উল্লেখপঞ্জী

১) K K. Datta. Economic condition of the Bengal Subah. 1984. P. 220.

২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়. বাঙ্গলার ইতিহাস. ১৩০৮. পৃ: ৬৯।

৩) K K. Datta. Economic condition of the Bengal Subah. 1984. P. 220.

৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৫২-৩৫৩।

৫) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী. ১৪০০, পৃ: ৪৪৬।

৬) তদেব।

৭) তদেব, পৃ: ৪৪৯।

৮) তদেব. পৃ: ৪৪৯-৪৫০।

১০) তদেব, পৃ: ৪৫২।

১১) তদেব, পৃ: ৪৪৭।

১২) তদেব, পৃ: ৫৩৬।

১৩) তদেব. পৃ: ৫১২।

১৪) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', ১৯৬২. পৃ: ৩৫১।

১৫) বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল. ১৯৬০ , পৃ: ৩৩।

১৬) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'. ১৯৬২, পৃ: ১০০।

১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী. ১৩৬৯, পৃ: ৩৮৮।

১৮) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫০৪।
১৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২০৪।
২০) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৩৩১।
২১) ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ: ২৪১।
২২) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৫৬।
২৩) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল, ১৩২২, পৃ: ৩৯-৪০।
২৪) বাংলাব আর্থিক ইতিহাস, ১৩৯১, পৃ: ১৭৩।
২৫) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ১৮।
২৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১৯২।
২৭) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ১৯।
২৮) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯২, পৃ: ১০-১১।
২৯) Jadunath Sarkar, History of Bengal, Vol.II, 1948, P. 409.
৩০) Ibid, P. 417.
৩১) Ibid, P. 412.
৩২) এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২, পৃ: ৫১৪।
৩৩) পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৪৯৭-৪৯৮।
৩৪) বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ১৩৯১, পৃ: ১৭৫।
৩৫) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯২, পৃ: ৫৪।
৩৬) তদেব, পৃ: ৫৫-৫৬।
৩৭) আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ: ৩৩।
৩৮) K. K. Datta, Economic condition of the Bengal Subah, 1984, P. 114.
৩৯) হারাধন দত্ত সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্টাপুরাণ', ১৩৭৩, পৃ: ২৪-২৫।
৪০) তদেব, পৃ: ১৮।
৪১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬২, পৃ: ১৪।

৪২) প্রভাসচন্দ্র সেন, বগুড়ার ইতিহাস, ১৯২৯, পৃ: ২৩৪-২৩৫।
৪৩) তদেব।
৪৪) তদেব।
৪৫) মোহিনী মোহন মৈত্রেয়, কবি জীবনমৈত্র, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৬, পৃ: ২০৩।
৪৬) তদেব।
৪৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬২, পৃ: ২০৪।
৪৮) সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক পলাশী বাংলা, ১৯৮২, পৃ: ৯৬।
৪৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬২, পৃ: ২০২-২০৩।
৫০) তদেব, পৃ: ২০৪।
৫১) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ৩৬।
৫২) বাংলার আর্থিক ইতিহাস, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৯১, পৃ: ১৭৭।
৫৩) ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, পৃ: ১৯০।
৫৪) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ৭৮৮।
৫৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬২, পৃ: ৭২।
৫৬) তদেব, পৃ: ৭২।
৫৭) তদেব, পৃ: ৭৩-৭৪।
৫৮) তদেব, পৃ: ৭৪।
৫৯) তদেব, পৃ: ৭৫।
৬০) তদেব, পৃ: ৮২-৮৩।
৬১) রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র সেকালের সমাজ, ১৯৯৪, পৃ: ২৫৪।
৬২) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯২, পৃ: ১৩-১৪।
৬৩) বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, ১৯৭৪, পৃ: ২৪১-২৪২।
৬৪) আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃ: ৪৫-৪৬।
৬৫) তদেব, পৃ: ৪৬-৪৭।
৬৬) তদেব, পৃ: ৪৮।
৬৭) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায, দু'শ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য-পুথি, ১৯৭৮, পৃ: ১৭।
৬৮) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৩২৫।
৬৯) তদেব, পৃ: ৪৮।

৭০) তদেব, পৃ: ৪৮-৪৯।
৭১) ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ: ৩২।
৭২) তদেব, পৃ: ৩৬।
৭৩) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ৪৪৩-৪৪৪।
৭৪) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ১৮।
৭৫) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৬, পৃ: ১৪১৩।
৭৬) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ৮৬।
৭৭) তদেব, পৃ: ১৭৬।
৭৮) তদেব, পৃ: ১৭৭।
৭৯) তদেব, পৃ: ১৭৭।
৮০) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩।
৮১) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩৪৫-৩৪৬।
৮২) তদেব, পৃ: ১৬৬।
৮৩) তদেব, পৃ: ৩৩৬।
৮৪) আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭, পৃঃ ১০০-১০১।
৮৫) রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ১৯৯৪, পৃ: ২৯০-২৯২।
৮৬) তদেব, পৃঃ ২৯৩।
৮৭) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ১৭৬-১৭৭।
৮৮) তদেব, পৃ: ১৭৫।
৮৯) বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলা দেশের কৃষক, ১৯৯৪, পৃ: ২৪।
৯০) তদেব, পৃ: ২৫-২৬।
৯১) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থখণ্ড, ১৯৮৫, পৃ: ৩৬।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মীয় অবস্থার প্রতিফলন

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ধাত্রীদেবতা এক কথায় ধর্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এর রেশ উপলব্ধ হয়, তবে এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্টতা এখানেই যে, ধর্মতত্ত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকার পাশাপাশি সমাসন্ন রেনেসাঁসের প্রাক প্রস্তুতি হিসাবে এতে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে শুরু করেছে যুক্তিবাদ। স্বভাবতই অন্ধ ভক্তির একনিষ্ঠতায় চিড় ধরেছে। জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসের জন্ম। বন্ধ্যা মনেই বিশ্বাসের লালন, যুক্তি হীনতায় বিশ্বাসের বিকাশ। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এই একপেশে বিশ্বাসের জমিতে ধীরে ধীরে ফাটল ধরতে শুরু করেছে।

কথায় আছে 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ' । অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ পালাক্রমে আসা যাওয়া করে। কাজেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন এল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। দৈবী তোষণের পরিবর্তে মানব হিতৈষনা, সন্ত্রস্ত ভক্তির পরিবর্তে চুলচেড়া যুক্তিবাদ আর ক্ষুদ্র আত্মতোষণের জায়গায় সাম্যবাদ হয়ে দাঁড়াল নবযুগের মুল বাণী। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই রূপান্তর ক্ষণিকের তপস্যায় আসেনি - বহুদিন ধরে চেতনে-অবচেতনে চলেছে তার ক্ষেত্র প্রস্তুতি। মধ্যযুগীয় দেব পরিবারকে স্বর্গের রাজ্য পাট থেকে উপড়ে এনে অতি সন্তর্পনে মর্ত্যের মাঠ-ঘাট বন-প্রান্তরে ঠাঁই দিয়েছেন যাঁরা, এবং তারও পরে প্রায় সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে হত্যা করেছেন যে পালাবদলের মাহেন্দ্রক্ষণটি উপভোগের প্রত্যাশায় তাঁদেরই পক্ষে সম্ভব এমন যুগান্তরের গান গাওয়া। এঁরা হলেন ক্রান্তি লগ্নের কবির দল। ক্রান্তি অর্থে যুগসন্ধি অর্থৎ অষ্টাদশ শতাব্দী। এবং অবশ্যই শতবর্ষের দীর্ঘ জীবন থেকে উঠে আসা সব কবিই নন — কবির দলে আছেন যুগের বাছাই প্রতিনিধিরা, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখেরা। আসন্ন শতাব্দীর সাম্যের জোয়ার একদিকে তাঁদের অকূলে ভাসার ভাটিয়ালি শোনায়, অন্যদিকে স্মৃতির তাগিদ 'ন হণ্যতে' - তাই কখনও পিছুটানে ফিরে তাকাতে হয় অধুনা হতশ্রী নন্দন কাননের দিকে। সুতরাং একদিকে প্রথা বিরোধিতার শপথ, অন্যদিকে ঐতিহ্য আনুগত্য - এ দুয়ের টানাপোড়েনে দ্বান্দ্বিক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি এবং কাব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের বিশিষ্টতা এখানেই যে তাঁরা প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে সংশয়ী হলেও ধর্মবিচ্ছিন্ন কোনো সাহিত্য রচনা করেননি। আসলে আবহমান কাল ধরে চলে আসা সাহিত্যের একপেশে ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার সাহস বা শক্তি তাঁদের অধিকাংশেরই ছিল না। স্বভাবতই আলোচ্য যুগের ক্রমবিপর্যস্ত জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে অসহিষ্ণু মানুষের মনে ধর্ম-বিশ্বাসে চিড় ধরলেও ঐতিহ্যানুরক্তির বিষয়টি প্রায় অটুট থেকেছে বলা যায়।

এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় স্বরূপ আলোচনায় আমরা চারটি সুস্পষ্ট স্তর দেখতে পাই।

১) ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসরণ।
২) ধর্ম সংঘাত।
৩) ধর্ম সমন্বয়।
৪) ধর্ম সংশয়।

মধ্যযুগের ধর্মীয় ঐতিহ্য দ্বিধারায় প্রবাহিত-লৌকিক ও পৌরাণিক। দেব-মাহাত্ম্য সূচক যে তিনটি সাহিত্যিক শাখা আমরা এই সময় পর্বে পাই, সেগুলি হল মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও কৃষ্ণকেন্দ্রিক অনুবাদ কাব্য এবং শাক্ত পদাবলী। এই সমস্ত সাহিত্যের দেব-দেবীর উৎস লৌকিক না পৌরাণিক এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবে জানাই সাধারণত, হিন্দুদের অষ্টাদশ পুরাণে যে যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, তারাই পৌরাণিক দেবতা এবং লোকজীবন উৎস থেকে যাদের জন্ম তারাই লৌকিক দেবতা হিসাবে পরিচিত। বাংলা মঙ্গলকাব্য বিষয়ক আলোচনায় কেউ কেউ বলেছেন যে, ঐ সমস্ত কাব্যের দেবদেবীরা মূলত পৌরাণিক দেব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে স্থানীয় দেবতারাই মঙ্গল কাব্যে একটা পৌরাণিক ভাবমূর্তি অর্জন করেছেন। সুকুমার সেন[১] ও সুধীভূষন ভট্টাচার্য[২] পূর্বোক্ত মত এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য[৩], শশিভূষণ দাশগুপ্ত[৪] ও ভূদেব চৌধুরী[৫] পরবর্তী মত পোষণ করেছেন।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, সমাজের নিম্নস্তরের চণ্ডী, মনসা প্রমুখ দেবীরা তুর্কি-আক্রমণের সামজিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগে ব্রাহ্মণ্য সমাজে জায়গা করে নিয়েছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[৬]। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, তুর্কি আক্রমণের অনেক আগে থেকেই মনসা এবং গোধাসনা চণ্ডীর পূজা ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রচলিত ছিল[৭]। সে যাই হোক, বাংলা মঙ্গল কাব্যের চণ্ডী ও মনসা এই দুই দেবী যে পৌরাণিক মূর্তি নন, প্রথমে তাঁরা অন্ত্যজ সমাজের দেবী ছিলেন, কীভাবে অনেক প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হলেন মঙ্গল কাব্যগুলিতে তাই বর্ণিত হয়েছে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যও এর অনুকূলে।

কিন্তু চণ্ডী ও মনসার লৌকিকত্ব মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও ডঃ সুকুমার সেন একে সমর্থন করেননি। তাঁর অভিমত হল বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা ও সম্পদের দেবতা হিসাবে মনসার পূজা বরাবর চলে আসছিল। আরোগ্য পুষ্টির রূপকাশ্রিত দেবতা বলে নদী দেবতার মহিমা বেদের সময় থেকে গীত। ইনি মুখ্যত সরস্বতী। এঁরই নামান্তর ইলা, পুষ্টি, শ্রী। ইনি বাক, যিনি নারীরূপে গন্ধর্বদের ছলনা করে দেবতাদের

সোম এনে দিয়েছিলেন। তাই অমৃত। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের প্রারম্ভে দেবীর এই যে প্রসন্ন রূপ সে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে গোড়া থেকেই ঢাকা পড়ে গেছে। এখানে মনসা চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী, শিব-ভক্তের প্রতি বিদ্বেষিণী।

ঋগ্বেদের আর একটি রূপক ভাবনাও পরে দেবীত্বে মূর্তি পেয়েছিল। সে রুদ্রের ক্রোধ 'মনা'। পৌরাণিক সাহিত্যে ইনি চণ্ডী হয়েছেন। তার পূর্বে ইনি সরস্বতী শ্রীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। 'মনসা' নামে তার প্রমাণ রয়েছে। নামটির মৌলিক অর্থ মনস্বিনী, 'মনা'র সঙ্গে অভিন্ন। পৌরাণিক যুগের আগেই সরস্বতী শ্রীর সঙ্গে বাস্তু দেবতার পূজা মিশে গিয়েছিল। তখন থেকে মনসা নিজে নাগ না হয়েও সর্পরাজ্ঞী। সরস্বতী শ্রী যখন দুই দেবতায় পরিণত (মনসা ও লক্ষ্মী) তার আগেই নাগপূজার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেছে। মনসার ভাগে পড়ল সর্পনাগ আর লক্ষ্মীর ভাগে পড়ল হস্তীনাগ। মনসা ও লক্ষ্মীর মৌলিক একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুজনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার পদ্মে আসন। লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে। মনসা কাহিনীর সূত্রপাত বৈদিক যুগে এবং পূর্বভারতে বৈদিক যুগ শেষ হবার অনেক আগেই তিনি বাস্তুদেবতায় ও গ্রামদেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। তারপর ধাপে ধাপে তাঁর অবনতি হয়ে আধুনিক সময়ে ভদ্রসমাজ-বহিষ্কৃত নারী পূজিত দেবীরূপেই তিনি রয়ে গিয়েছেন। গ্রামদেবীরূপে তাঁর নাম (বিষাইল আখি) এবং ধাম পশ্চিমবঙ্গে চণ্ডী (বিশালক্ষী) আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। অনেক প্রাচীন 'মিথ' মিলে মনসার কাহিনী গড়ে উঠেছে। মনসা-চাঁদের কাহিনীর গাঁথনে বৈদিক ঐতিহ্যের সরঞ্জাম ও মশলা আছে। মনসা প্রাক্ পৌরাণিক দেবতা। ইনি পুরাণে স্থান পাননি। অথচ লোকব্যবহার এবং লোকসাহিত্যে অর্বাচীন বৈদিক কাল থেকে রূপ পালটে চলে আসছেন।[৮]

সুকুমার সেনের মতে চণ্ডীমঙ্গলের অভয়াও আসলে বনদেবী।[৯] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের (১৪৬ সূক্ত) শেষের দিকে তাঁর বন্দনা আছে, সেখানে এই দেবী অরণ্যানী নামে অভিহিতা। বৈদিক অরণ্যানীই বহু শতাব্দীর পথ বেয়ে নানা কবি কল্পনার রঙে ডুবে ও নানা লোক-ভাবনার পাকে জড়িয়ে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। সুধীভূষণ ভট্টাচার্যও মনে করেন যে মঙ্গলচণ্ডী দেবী নন, পৌরাণিক দেবী।[১০] দুর্গাপূজা বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হলে মঙ্গলচণ্ডী পণ্ডিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে অসমর্থ হয়ে অপ্রধান গ্রাম্য দেবীতে পর্যবসিত হন।

অন্যদিকে আবার লৌকিক-মতের সমর্থক যাঁরা, তাঁরা বলেন মনসা ও চণ্ডী উভয়েরই উদ্ভব প্রাক্ পৌরাণিক, এমনকি প্রাক্ বৈদিক আর্যেতর সমাজে। আশুতোষ ভট্টাচার্য স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, "বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবনাশ্রিত নরনারী চরিত্রেরই জয়গান করা

হইয়াছে, তাহাদিগকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে।"[১১] অবশ্য লোকজীবন সম্ভূত এই কাব্যগুলির উপর পুবাণের প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি - "বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনী বাংলার যে সামাজিক স্তর হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন, কালক্রমে তাহা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের অনুশীলনের বিষয় হইবার ফলে তাহাদের উপর সংস্কৃত পুরাণগুলির প্রভাব দুর্নিবার হইয়া উঠে।"[১২] 'পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য' (১৯৮৩) গ্রন্থে এর সমর্থন আছে – "বাংলার বহুল প্রচারিত মঙ্গল কাব্য হইল মনসামঙ্গল। এই মনসার উৎপত্তি আর্যেতর সমাজে। অর্বাচীন পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ, দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে মনসাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসাদেবী যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমাজে উঠিতেছিলেন, ইহাতে তাহাই প্রমানিত হয়। মহাভারতে নাগরাজ বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা মনসামঙ্গলে কালক্রমে এই জরৎকারু ও মনসা অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। মনসামঙ্গলের ধারায়ও প্রথম দিকের কবিদের মধ্যে পৌরাণিক চেতনার একান্ত অভাব দেখা যায়। পরে যত শেষের দিকের কবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ততই তাঁহাদের কাব্যে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য নারায়ণদেব হইতে বিজয়গুপ্তের কাব্যে পুরাণের উপাদান বেশী। আবার জীবন মৈত্রে আরও বেশী। আবার একই কাব্যের অনুলিখন হইয়াছে বিস্তর। ইহার ফলে কাব্যের মধ্যে লেখকদের সময় অনুপাতে পৌরাণিক উপাদানের তারতম্য ঘটিয়াছে।

লৌকিক দেবী চণ্ডী একইভাবে আর্য সমাজে গৃহীত হইয়াছেন। এই চণ্ডীর লৌকিক রূপ দুইটি - প্রথম, তিনি শিকারী ও পশুকুলেব দেবী, কালকেতু ফুল্লরা কাহিনীর মধ্যে যে দেবী রহিয়াছেন; দ্বিতীয়, তিনি হইলেন মঙ্গলচণ্ডী, ভক্তকে যিনি সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ধনপতি শ্রীমন্ত উপাখ্যানের চণ্ডী। দুই কালের দুই স্তরের দেবী ও দেবকাহিনী একত্র মিশিয়া গিয়া উচ্চতর শ্রেণীর আরাধ্যা পৌরাণিক দেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। সমাজের স্ত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌবাণিক চেতনা অনেক পরে প্রবেশ করিয়াছে। বহুদিন এই স্ত্রী সমাজ রক্ষণশীলতায় আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের ধর্ম কর্ম করিয়াছে। পুরুষ সম্প্রদায় এই প্রভাব কাটাইয়া পৌবাণিক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। পরে ইতিহাসের অগ্রগতিতে এই দেবতা লৌকিক স্তর হইতে পৌরাণিক স্তরে উন্নীত হইলে পুরুষ সমাজও ইহার পূজা করে। ধনপতি সদাগরের চণ্ডী পূজার বিরোধিতা এই সত্য প্রমাণ করে।

শিবায়নের শিব পৌরাণিক প্রভাবে যেমন লৌকিক রূপ পরিহার করিতে পারেন নাই, চণ্ডীমঙ্গলের দুই লৌকিক দেবীও তেমনি পৌরাণিক দেবীর সহিত সবাংশে এক হইতে পারেন নাই। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধাবায় শেষের দিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পৌবাণিক চণ্ডীবই প্রাধান্য সুচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম বসু প্রভৃতিব হাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী বা দুর্গাবই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে।"[১৩]

ধর্মদেবতাকে নিয়েও মতান্তর আছে। তাঁর লৌকিক ও পৌরাণিক আবির্ভাব ক্ষেত্রটি সম্পর্কে নানামুনির নানা মত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'Discovery of Living Buddism of Bengal' (১৯০৬) নিবন্ধে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর এই মত পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হয়নি। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এ সম্পর্কে বলেছেন — "শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই কিছু সন্দিহান ছিলেন; আর শাস্ত্রী মহাশয়ের সময়ে - কোন লৌকিক দেবতার বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি এবং সে সময় বাংলায় হিন্দুশাস্ত্রে উল্লেখহীন যে সকল দেবতার পূজাপার্বন দেখা যেত সেগুলি লক্ষ্য করে বহু ব্যক্তিই ধারণা করতেন --- ঐ দেবতারা মহাযানী বৌদ্ধদের উপাস্য ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম পতনের পর অনুন্নত হিন্দু সমাজে ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করেছেন। বৌদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের বিশেষ পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হওয়া এবং ধর্মঠাকুরের পূজায় নৈবেদ্য ফুল দেওয়া এবং পূজাচারে তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের পূজাচারে মিল দু'একটি দেখে বর্তমানের গবেষকরাও ধারণা করেন - ধর্মঠাকুরের বা তাঁর পূজাচারের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের কিছু সম্পর্ক হয়ত আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরবর্তীকালে বহু মনীষী ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষক আলোচ্য দেবতার সম্বন্ধে আলোচনাদি করছেন ও করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি - আচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, স্বর্গীয় শশিভূষণ দাশগুপ্ত, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিনয় ঘোষ, শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল, শ্রী তুষার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অমলেন্দু মিত্র প্রভৃতি।

মনে হয় কোন লৌকিক দেবতার বিষয়ে এতগুলি মনীষীর আলোচনা এ পর্যন্ত হয়নি।"[১১]

সুকুমার সেন অবশ্য বলেন "জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত), সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে। অন্য দেবতার মিশালও আছে। ......"[১২] অর্থাৎ ধর্মঠাকুর তাঁর মতে মিশ্রিত দেবতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আবার ধর্মঠাকুরকে আদিতে আর্যেতর দেবতা বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ধর্মঠাকুরের নামটি এসেছে ধর্মের সমধ্বন্যাত্মক কোন অন-আর্য শব্দ থেকে। যেমন মুণ্ডারী ভাষায় 'দরম' বলে একটি শব্দ আছে, আদিবাসী সমাজে যার অর্থ শ্রদ্ধা বা ভক্তি।[১৩]

নৃতত্ত্ববিদ ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সুকুমার সেনের মতই মনে করেন, ধর্মঠাকুর বৈদিক বরুণের আধুনিক সংস্করণমাত্র। বরুণের কাছে নরবলি দেওয়া হত, ধর্মঠাকুরের কাছে যে নুয়ে ছাগবলি হয়, তা বর্তমানে সেই নরবলির স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু

আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত ভিন্ন। তাঁর বক্তব্য হল, "ধর্মঠাকুরের পূজা যদি বৈদিক দেবতা বরুণেরই পূজা, তবে তাহা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আবদ্ধ থাকিবে কেন ? বিশেষত যে ডোম জাতি এই ধর্মঠাকুরের পূজারী, তাহার সঙ্গে বৈদিক ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই; তবে তিনি যে বলিয়াছেন, লুয়ে পাঁঠা বলি নরবলির স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ধর্মঠাকুর যিনিই হউন, পূর্বে যে তাঁহার নিকট নরবলি দেওয়া হইত, ইহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয়। এই দেবতার বর্তমান পূজারিগণও ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে একমত নহেন। পূজারিগণও তাঁহাকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। পরিচয়ের এই বিভিন্নতার জন্য কোনও কোনও স্থানে এই দেবতা ধ্যানমন্ত্রে 'বহুরূপ' বলিয়াও উল্লিখিত হন। ......"[১]

অতঃপর আসে মঙ্গলকাব্যের আর এক অতি জনপ্রিয় দেবতার প্রসঙ্গ; তিনি শিব। 'শিবায়ন' কাব্য শাখায় তাঁরই মহিমা কীর্তিত। এই শিব চরিত্রের মধ্যে পুরাণ ও লৌকিকের মিশ্রণ সর্বাধিক। পুরাণে যেমন ইনি দেবাদিদের মহাদেব, মঙ্গলকাব্যেও ইনি দেবতাগ্রগণ্য শিব। শিব চরিত্রের মধ্যে আর্য-রুদ্র, পৌরাণিক শিব এবং লোকচেতনার মানব শিবের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রথমত বৈদিক রুদ্র অনেকখানি প্রাগার্য শিবের উপাদান আত্মসাৎ করেছিলেন। এই রুদ্র পরে পৌরাণিক শিবে পরিণত হন। পৌরাণিক শিবের মধ্যে আবার পরবর্তীকালের বহু প্রভাব এসে পড়েছে। বৌদ্ধ প্রভাবে এঁর রুদ্র মূর্তি বহুলাংশে শান্ত হয়ে গেছে। রুদ্র যোগীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। আবার বাংলাদেশে পৌরাণিক শিবের একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক রূপ গড়ে উঠেছে। বাংলার কৃষি সভ্যতার প্রভাবে এই শিব কর্ষণ-অধিপতি প্রমথ। এর ফলে শিব চরিত্রের একটি অদ্ভুত মিশ্ররূপ গড়ে উঠেছে। উচ্চকোটিক ও লোকায়ত, অলৌকিক ও লৌকিক চেতনার সমাবেশে বাঙালীর ধর্মে ও কাব্যে আর্যশিব বঙ্গশিবে পরিণত হয়েছেন। আবার তাঁর চরিত্রের মূলরূপ রুদ্র ও শিব, ঘোর ও অঘোর, উগ্র ও শম্ভু, বামদেব ও প্রসন্ন দক্ষিণ - এই ভাব বৈপরীত্যও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে।[২] শুধুমাত্র শিবমঙ্গলেই নয়, বিভিন্ন কাব্যে শিবকে আহ্বান করা হয়েছে বোধ হয় এইজন্যই যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ ও শান্তি যেমনভাবে শিব চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি। শিবহীন যজ্ঞ যেমন হয়না, তেমনি হয়না শিবহীন কাব্য। সমস্ত কাব্যের চরিত্রের সঙ্গেই তাঁর আত্মিক সংযোগ। তিনি ধর্মায়নে ধর্মের অধীন, রামায়ণে রামের অধীন, মনসামঙ্গলে মনসার, চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর, মহাভারতে কৃষ্ণের, বৈষ্ণবচরিতে চৈতন্যের, নাথ সাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর। শিব প্রকৃতির সঙ্গে যেখানে মিল সেখানে যেমন তিনি এসেছেন, যেখানে বিরোধ সেখানেও বাদ যাননি। বিপরীত চিত্র সমন্বয়ের এই কারুকার্য পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙালী কবি এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই শিবপ্রসাদ হালদার বলেছেন, "বাংলার মঙ্গলকাব্য এক হিসাবে জাতীয় কাব্য। ইহাদের মধ্যে বাংলার প্রাকৃত

জীবনধারা একটি নিটোলরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বল্প সুখ ও বিপুল দৈন্যের গৃহজীবন, দাম্পত্য জীবনের হাসি-অশ্রুর অদ্ভুত সমাবেশ, স্বজন পরিজন পরিবৃত সংসার - এই প্রাকৃত জীবনবোধের ভিতর বোধকরি একটি মাধুর্য আছে। বাংলার কবিকুল এই বেদনা মিশ্রিত মাধুর্যের কাব্যরূপ দিয়াছেন। ইহারই Great Patriarch হইলেন শিব। সেইজন্য শিবকে দৈন্যে বিভূষিত করিয়া, ভস্মকে বিভূতিজ্ঞান করিয়া বাঙ্গালী তাঁহাকে আরাধ্য দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছে।"[১২]

মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও শিব — বাংলা মঙ্গলকাব্যের কেন্দ্রীয় দেবচরিত্র মূলত এই চার জনই। আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই জাতীয় সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সুদূর অতীতে এঁরা অনার্য সম্ভূতই ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে এঁদের উপর পৌরাণিক প্রলেপ এত বেশী পরিমাণে পড়তে থাকে যে দ্রুত আর্যীকরণে প্রকৃত উৎস নির্ণয় জটিল হয়ে পড়ে। আসলে খ্রীষ্টীয়, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গল কাব্যের যে ধারা চলে আসছে, তার মধ্যে লৌকিক চেতনা ও অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই মুখ্য ছিল। তখন সমাজে লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি। অন্ত্যজ সম্প্রদায় যে দেবদেবীর কল্পনা করত তাঁদেরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। কিন্তু সমাজের অন্তস্তলে তখন একটা গোপন সংহতির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্য চেতনা অনেকখানি আভিজাত্য ক্ষুন্ন করে জনজীবনধারার সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। তখন উচ্চবর্ণের জীবনাদর্শ ও ধর্মবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য লৌকিক কাহিনীর ওপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা শুরু হয়। আবার সাধারণ জনগণের মনের ওপর মঙ্গল কাব্যগুলির বিশেষ প্রভাব থাকায় ব্রাহ্মণগণ এই সাহিত্য বিলোপের চেষ্টা না করে বরং একে সংস্কৃত মহাকাব্যের ছাঁচে ঢেলে নতুন রূপ দেন এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁদের বিশেষ ধর্মমত ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য চেষ্টিত হন।

যাইহোক, এই চার মঙ্গল দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন ছাড়া আরও অজস্র দেবমাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল মধ্যযুগে। তাঁদের কেউ কেউ সম্পূর্ণই লৌকিক, কেউ বা পৌরাণিক উৎসজাত। লৌকিক ধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মঙ্গলকাব্যগুলি হল — কালিকা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, কামাখ্যা মঙ্গল সুবচনী মঙ্গল ইত্যাদি। আর পৌরাণিক ধারার অন্তর্ভুক্ত হল — দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সারদা মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, কপিলামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য এই সব দেব-দেবীরা বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কোনোদিনই বিশেষ প্রাধান্য পাননি। গৌণ হয়েই থেকেছেন। তাই এঁদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বিষ্ণু তথা শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে দুটি জনপ্রিয় সাহিত্যশাখা গড়ে উঠেছিল। একটি হল পদাবলী সাহিত্য, অপরটি অনুবাদ সাহিত্য। ভারতীয় সাহিত্যের

পৌরাণিক যুগেই কৃষ্ণকথার বিকাশ পরিণতির একটা উচ্চসীমা স্পর্শ করেছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে দ্বিমত নেই। পুরাণ লক্ষণাক্রান্ত 'খিল হরিবংশ' থেকে আরম্ভ করে নানা পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ এই কৃষ্ণকথার আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। এই পুরাণসমূহের আগেও কৃষ্ণকথার নানা উপাদান ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য ঋগ্বেদের মধ্যেই আমরা কৃষ্ণ প্রসঙ্গের প্রাথমিক আভাসটি পাই। সত্যবতী গিরির মতে, "আজ আমরা যে কৃষ্ণকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপ্ত দেখি, তার মধ্যে মিলিত হয়েছেন 'বিষ্ণু', 'নারায়ণ', 'হরি' প্রভৃতি বিচিত্র দেবসত্তা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থাতে এঁরা ছিলেন পরস্পর পৃথক। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু' এবং 'কৃষ্ণ' আজ অভিন্ন হলেও এঁদের মধ্যে রয়েছেন বৈদিক 'আদিত্য বিষ্ণু', উপনিষদের 'বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণ ও মহাভারতের 'নারায়ণ'।"[২১] সুতরাং সঙ্গত কারণেই বিষ্ণু, কৃষ্ণ বা রামচন্দ্র - মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মূলত পৌরাণিক মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু লোকমানসে এঁদের প্রভাব এত গাঢ়তর ছিল যে লৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলিও এঁদের মধ্যে মিশে গেছে। পদাবলী ও পুরাণাদির অনুবাদ — উভয় ক্ষেত্রেই এই অভিমত প্রযোজ্য। ঐশ্বর্য বা মাধুর্য যে ভাবেই বাঙালী বিষ্ণু আরাধনা করুক না কেন, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সবচেয়ে কাছের মানুষ করে নিয়েছে তাঁকে। বৈদিক বা পৌরাণিক ঐতিহ্যের উত্তুঙ্গ মহিমা সেখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাগানুগা ভক্তির প্রাবল্যে 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ' হয়ে গেছেন ভক্তের প্রাণনাথ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মমতের ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই চলছে সমন্বয় ও স্বীকরণের পালা। ফলে বিশেষ কোনো দেবতা বা ধর্মমতের বীজ সন্ধান করতে গিয়ে মূল নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের শক্তিদেবী তথা শাক্তধর্ম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শাক্তধর্মের সুপ্রাচীনত্ব মূলত তন্ত্র নির্ভর — 'তন্ত্রা গৌড়ে প্রকীর্তিতা'। অনার্য জাতির প্রেরণাতেই হোক, বা আর্য ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবেই হোক, শক্তি উপাসনা প্রত্নভারতীয় ঋষিদের দ্বারা গৃহীত হয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তন্ত্রের সহায়তায় একটি বিশিষ্ট ধর্মপন্থায় পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে শক্তি উপাসনা নিজস্ব মন্ত্রতন্ত্র, উপাস্যতত্ত্ব, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কোনো ইতিহাসপূর্ব সংস্কার, অনার্য সংস্কৃতির মাতৃউপাসনা, প্রাচীন তান্ত্রিকতা সম্মত আচরণ ও সাধনপদ্ধতি এবং বৈদিক দর্শনের প্রভাবে পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠেছে। আর পরিণতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিতত্ত্বের উৎস সন্ধান নিয়েও গোল বেঁধেছে।

এই বিষয়ে প্রচলিত মতটির আলোচনা দিয়েই শুরু করা যাক। বাংলাদেশের জনসমাজ সাধারণভাবে বিশ্বাস করে "মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক আর্যসংস্কৃতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্যেতর আদিম জাতিগণের মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ সংস্কৃতির মধ্যে ছড়াইয়াছে এবং আর্যগণের তত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।"[২২] এছাড়া আর

একটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণা জনমানসে সঞ্চারিত হয়েছে। সেটি হল, "সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক আর্যগণ সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃ তান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য, আবার আর্যেতর সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃউপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।"[১১]

কিন্তু শশিভূষণ দাশগুপ্ত সর্বাংশে এই মত সমর্থন করেন না। তাঁর যুক্তি হল, "প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শক্তি সাধনা সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বা অনার্য একথা বলিবার যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেছি না। ..... প্রাচীনতম বৈদিক সূক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদাদিতে বিভিন্ন ভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতেছি। ...... ইহা ব্যতীত ..... মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃ পূজার প্রচলন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আরও বহু স্থানে এই জাতীয় মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিৎ ছিল; কারণ এই জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহুস্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। ......"[১২]

শক্তিতত্ত্বের আর এক গবেষক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী এর মূল সন্নিধানে যে পথগুলি দেখিয়েছেন সেগুলিকেই গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত মনে হয়। শক্তিতত্ত্বকে ভিত্তি করেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত পদাবলীর জন্ম। তাই শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব নিরূপণ করতে পারলে শক্তি তত্ত্বের জন্ম ইতিহাস অনেকটাই স্পষ্ট হবে মনে করা যায়। এই শাক্ত পদাবলীর উৎস একটি নয়, একাধিক। এগুলি হল — ১) বেদ-দর্শন-পুরাণ, ২) তন্ত্রশাস্ত্র, ৩) সংস্কৃতে রচিত ধর্মমূলক স্তোত্র ও কবিতা, ৪) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন কবিতাগুলি ৫) বৌদ্ধতন্ত্র ও সহজিয়া চর্যাপদাবলী এবং ৬) প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি।[১৩]

অবশ্য বেদ ও পুরাণকে স্বীকৃতি দিলেও জাহ্নবীবাবু 'শাক্ত পদাবলীর ভাব, উপাস্য ও উপাসনা-তত্ত্বের প্রধান উৎস' হিসাবে 'শক্তিপূজার বিশ্বকোষ' আখ্যা দিয়েছেন তন্ত্রশাস্ত্রকেই। তন্ত্রে বিভিন্ন দেবী মূর্তির ধ্যান, পূজা, স্তব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে এবং তন্ত্রের এই ক্রিয়া-প্রণালী কবিত্ববর্জিত নয়। সর্বোপরি বাহ্যপূজার অন্তরালে যে গূঢ় উদ্দেশ্য বিদ্যমান সে সম্পর্কেও তান্ত্রিক সাধক সম্পূর্ণ সজাগ; এইজনাই বাহ্যপূজার মধ্যেও মানস পূজার ব্যবস্থা। শাক্তপদকর্তাগণ 'জগজ্জননীর রূপ' কল্পনায় হুবহু তন্ত্রোক্ত ধ্যানগুলি অবলম্বন করেছেন এবং 'মাতৃপূজা' অংশে পরবর্তী মানসপূজার সাহায্য নিয়েছেন।

তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা যে শাক্তপদাবলী পাই, তার মূলে পুরাণ ও তন্ত্রলব্ধ শক্তি উপাসনার শক্ত জমি থাকলেও গৃহীর গৃহাঙ্গণে সেই জমিতেই জন্ম নিয়েছিল আর

এক নতুন লৌকিক ভাব। যে ভাবের মূল কথা - বাৎসল্য; যার পূর্ণ বিকাশ আগমনী - বিজয়া গানে। পূর্ণব্রহ্মময়ী জগজ্জননী সেখানে শুধুই মেনকা দুহিতা উমা। বস্তুত ধর্মাদর্শে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যই এখানে - সে কখনও তার দেবতাকে সুদূর স্বর্গের কল্প-সিংহাসনে বসিয়ে শান্তি পায়নি। তাঁকে সে আপনার সুখ-দুঃখ ব্যথা-যন্ত্রনার মধ্যে এনে আনন্দ পেয়েছে। বাঙালীর কল্পনায় বেদ-উপনিষদ, মন্ত্র-তন্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত গীতা-চণ্ডী-শ্রুতি-স্মৃতি সব একাকার হয়ে তার মানসলোককে অশ্রুশ্যামল ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, আর একটি দিক থেকেও শাক্তপদাবলী বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতার কারণ 'সমন্বয়'। শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, "আমাদের শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা, আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই - তিনিই আবার দশমহাবিদ্যা রূপে রূপান্তরিতা; একান্ন মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী; আমরা অসুর নাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই আমরা কালিকা বা কালীদেবীকে — শাক্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুরাণ তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূল দেবীর সহিত অভিন্নরূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শাক্তধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ সুবিধামতন ইঁহারাও মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারূপিনী সরস্বতী ও শ্রী ও সম্পদ্ রূপিণী লক্ষ্মীর কথাও ভূলিলে চলিবেনা। জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভৃতি দেবী সহজেই মূলদেবীর রূপভেদ বলিয়া গৃহীতা।"[১৩]

অষ্টাদশ শতাব্দী যুগসন্ধির কাল। সন্ধিলগ্নের মিলন-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই যুগ তাই সহজেই সমন্বয়ের প্রশান্ত ঔদার্যকে স্বীকার করে নিতে পেরেছে। ফলে, মূল সাহিত্য কীর্তিগুলি যে যে দেবচরিত্রকে উদ্দেশ্য করে লিখিত তাঁদের উৎস নির্ণয় করা এ যুগে জটিল হয়ে পড়েছে। পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রতি সশ্রদ্ধ কবিরা তাঁদের আরাধ্য দেব-দেবীর মধ্যে একদিকে যেমন বেদ-পুরাণ সম্ভূত মহিমা আরোপ করেছেন, অন্যদিকে লোক মানসের প্রতি সচেতন থাকায় লৌকিক ঐতিহ্যকেও সমান স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিব, ধর্ম, চণ্ডী বা মনসার মত অতি জনপ্রিয় দেবতাদের মধ্যে ঘটে গেছে এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ। তাঁরা শুধুই 'আর্য' বা 'আর্যেতর' বংশলতিকার সীমায় বাঁধা থাকেননি, স্বীকরণের অনাবিল আনন্দে নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েছেন নতুন যুগের উপযুক্ত করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় জীবনে দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দের প্রবল অস্তিত্ব লক্ষ্য করাযায়। শব্দ দুটি যথাক্রমে সংঘাত ও সমন্বয়। একদিকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বিভেদ জ্ঞানপ্রসূত বহু আচরিক সংঘর্ষ, অন্যদিকে ধর্মের উদার প্রাঙ্গনে সৌষম্য, সামঞ্জস্য আর সৌভ্রাতৃত্বের ঐকতান সংগীত। প্রাচীন ভারতের হোমাগ্নি আলোকিত তপোবনের কুটীর প্রাঙ্গণ থেকে সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষির কণ্ঠোচ্চারিত সেই অমোঘ সাম্যমন্ত্রকে —

"ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।"[১১]

বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমন্বয়কামী শক্তি সাদরে গ্রহণ করেছিল। আর ধীরেধীরে তা ছড়িয়ে পড়ছিল আপামর গণমানুষের মধ্যে, যুগ পরম্পরায়।

আলোচ্য শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই সংঘাত ও সমন্বয় - দু'টি শক্তির উপস্থিতিই সমভাবে ঘটেছে। প্রথমে সংঘাতের আলোচনা করা যেতে পারে।

সাধারণত ধর্মদেবতার পূজারী ছিলেন নিম্নজাতির। এই দেবতার পূজা-প্রথাও বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্মত নয়। বরং বৌদ্ধ পূজার্চ্চনা পদ্ধতির প্রভাব এঁদের উপরে পড়েছে। তাই বৌদ্ধধর্মের মতই এই পূজায় অংশগ্রহণকারীরাও জাতিভেদ মানত না। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অনার্য বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ এখানে পূজারীর সম্মান পেত। আর সেই কারণেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধর্মঠাকুরের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ছিলনা। এমনকি বর্ণশ্রেষ্ঠের পক্ষে ধর্মের গান রচনা করা সম্ভব হলেও সে গান আসরে গাওয়া চূড়ান্ত অপরাধ বলে বিবেচিত হত। জাতিচ্যুতিও ঘটত (সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরাম চক্রবর্তী এর প্রমাণ)। সেই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী স্বয়ং ধর্মদেবতার নির্দেশ সত্ত্বেও তাঁর মহিমা-সঙ্গীত রচনা করতে দ্বিধা করেছেন --

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।।
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে।।[১২]

অন্ত্যজ-পূজিত বলে ধর্মঠাকুর তাঁর প্রশস্তি কীর্তনের জন্য উপযুক্ত কবির সন্ধান পাচ্ছেন না - প্রাক উনবিংশ শতাব্দীর এমন মানসিকতা সত্যিই বিস্ময়কর। ফলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে হল -

... . আমি তোর জাতি
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন
ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন।
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া।[১৩]

মাণিকরাম প্রবোধ মানলেন ---

দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া।
এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেন দয়া।।[২৯]

বিদ্বেষ, শুধু বিশেষ এক দেবতা বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিই নয়, এক ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে অপরেরও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব — এই দুই প্রধান ধর্ম-গোষ্ঠীর নাম করা যায়।

বাংলাদেশে শক্তিবাদীদেব সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তদের দ্বন্দ্ব প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে দম্ভপূর্বক বিষহরীর পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মদ্যমাংস দিয়ে বাসুলী পূজাব উল্লেখ দেখতে পাই। সেই পটভূমির উপরে বৈষ্ণব ধর্মের জাগরণ। ফলে শাক্তধর্মের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-কলহ অবশ্যম্ভাবী। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, "নবদ্বীপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব রাসযাত্রার পূর্ণিমারাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির তেমাথা চৌমাথায় বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে পূজিতা হন।"[৩০] আসলে বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মেব পারস্পরিক বিদ্বেষ তথা ধর্মকলহ যে চূড়ান্ত প্রতিস্পর্ধিতার স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল, এবং আহার, বিহার, পূজাবিধি ও আচরণীয় কৃত্যাদিব মধ্যে পাবস্পরিক অসহিষ্ণুতা প্রবল হয়ে উঠেছিল তার কারণ ধর্মের সূক্ষ্মভেদ মীমাংসায় সাধারণের অধিকার ছিলনা। শাক্ত-বৈষ্ণবের ভেদবুদ্ধিপ্রসৃত লোকায়ত পরস্পর বিরুদ্ধতার লক্ষণগুলি সম্পর্কে একটি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় বলা হয়েছে —

"যিনি মাংস মদ্য পলাণ্ডু প্রভৃতি ব্যবহার করেন না, এবং জীবহিংসা প্রশ্রয় দেন না .... নামাবলীব দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করেন তিনিই বৈষ্ণব। ...... যিনি মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন, জীবহিংসায় (বলিদানে) প্রশ্রয় দেন, মদ্যপানে বিশেষ আপত্তি করেন না, তিলকের পক্ষপাতী নহেন, কালীতারা দুর্গা প্রভৃতির উপাসক তিনিই শাক্ত। .... হতভাগ্য বঙ্গদেশে আহার লইয়াই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রধান বিরোধ।"[৩১]

এইভাবে মঠ-আখড়া-কালীমন্দির, তিল-তুলসী জবা-গেরুমাটি-সিঁদুর, কিংবা কণ্ঠি-নামাবলী-তিলক ও রুদ্রাক্ষ, বক্তাম্বর বাঙালীর পারস্পরিক ধর্মবিদ্বেষের প্রতীকরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছিল। যে বঙ্গভূমি একদিন রাসলীলা জন্মাষ্টমীতে মেতেছিল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব আমল থেকে সে মাতল কালীপূজায়। এমনকি রামপ্রসাদের মত সাধক কবিও এই মাতনের ঘূর্ণিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁব কণ্ঠে শাক্ত-বৈষ্ণবের চিরাভ্যস্ত কলহের বেসুরো গান কখনও কখনও সমন্বয়ের মধুর আলাপকে অগ্রাহ্য করেছে। রামপ্রসাদী 'বিদ্যাসুন্দর'-এ এর নজির মিলবে। চোরবেশী সুন্দরকে ধরতে

কোতোয়াল পাঁচশত 'হরকরা' বা চর নিযুক্ত করে এখানে বলেছে —

কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানির ছলে দান সাধে মাটে।।
দশ বিশজন ধরে ব্রজবাসীর বেশ।
কত সব চুল কত মুড়াইল কেশ।।
কেহ কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস।।
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলো চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে।।
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীর মাথে।
চিকন গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে।।[২২]

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এই বর্ণনা বৈষ্ণব বিদ্বেষে ভরপুর হলেও, এর অন্তরালের নিহিত সত্যটুকুও অস্বীকার করার পথ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজের ব্যভিচার এবং ধর্মের নামে পাপাচরণ ও ভণ্ডামি যেন জীবন্ত হয়ে আছে এই বর্ণনায়।

শাক্ত-বৈষ্ণবের পারস্পরিক কলহ রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের কলম যুদ্ধে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব, হরিভক্ত এবং সবোপরি প্রত্যুৎপন্নমতি জীবনরসিক আজু গোঁসাই সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গে সমোচ্চাবিত হতে পারেন শুধু তার পরিহাস ব্যঙ্গমুখর শক্তি বিরোধী প্রত্যুত্তরগুলির জন্য। রামপ্রসাদেব সঙ্গীতের প্রত্যুক্তি হিসাবেই তাঁর পদগুলির যা কিছু জনপ্রিয়তা।

রামপ্রসাদের সুন্দর একটি ভাবাত্মক গীত —

মনরে আমাব এই মিনতি
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি।।
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।।
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে বাখ প্রীতি।[২৩]

আজু গোঁসাই এর উত্তরে গাইলেন —
হয়োনা মন পড়াপাখী।
ওরে বন্দী হলে হয়না সুখী।।
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি।।

রামপ্রসাদের আর একটি জনপ্রিয় পদ —

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।।[৩৫]

এর উত্তরে গোস্বামীর ব্যঙ্গানুকৃতিটিও মোক্ষম —

কেন মন বেড়াইতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাসনেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি।।

সবার মুখে মুখে ফেরা আর দু'খানি প্রসাদী সঙ্গীতের উল্লেখ করব, যাদের বিরুদ্ধেও আজুর লেখনী সমান তীব্র, সমান ব্যঙ্গাত্মক। গান দুটি যথাক্রমে —

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।।[৩৭]

এবং,

আমায় দেও মা তবিলদারী।[৩৮]

অন্যদিকে আজুর পদ দুটি হল যথাক্রমে —

ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।।[৩৯]

এবং

কেনে চাস্ ভাই তবিলদারী
ও কাজে আছে ঝুঁকি ভারি।
দু'দিনকার মুহুরী হয়ে তাইত এত বাড়াবাড়ি।।
পেলে তবিল ভাঙতে এক তিল তোমার আর সবে না দেরি।[৪০]

এই জাতীয় ধর্মদ্বন্দ্ব-ঘটিত পদ আছে আরও কয়েকটি। তার মধ্যে বৈষ্ণব আজু গোঁসাই শাক্ত রামপ্রসাদের বিরুদ্ধে যতখানি সরব, প্রসাদ কিন্তু ততটা নয়। আসলে রামপ্রসাদ সাধনার যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন তা শাক্ত, বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদ ও ভেদাভেদ জ্ঞানের অতীত। মানুষের এই ভেদবুদ্ধি দূর করার জন্য তিনি জগৎবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন —

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।।

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম
কত খোঁজ তল্লাসী।
এ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম
সকল আমার এলোকেশী।।[৪১]

এ তো গেল হিন্দুধর্মেব অন্তর্নিহিত বিবাদের কথা। আর অন্তর্কলহ যেখানে এতটাই প্রবল, বিধর্মও সেখানে উপেক্ষিত হয় পরধর্ম অসহিষ্ণুতার কারণে। আসলে বাঙলাদেশ (তদুপরি ভারতবর্ষ) চিবকালই বিজাতি শাসিত। তুর্কী আক্রমণের সময় থেকে (দ্বাদশ শতাব্দী) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বঙ্গভূমি মুসলিম রাজকর্তৃত্ব থেকে সামান্যতম রেহাই পায়নি। অথচ বাজনৈতিক পরাভবে, অর্থনৈতিক বঞ্চনায় এবং ধর্মীয় আঘাতে জর্জরিত হয়ে মুক্তি বাঞ্ছায় অন্তরাত্মা হাহাকার করেছে। আর মুসলিম শাসক এবং মুসলমান সমাজেব প্রতি হিন্দু গণমানসের এই পুঞ্জীভূত বেদনা থেকে জন্ম নিয়েছে বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা। গোপাল হালদাব এই দৃষ্টিকোণেই এই প্রতিক্রিয়ার সামাজিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন এই দষ্টিকোণেই।[৪২]

এই অনৌদার্য শুধু একা হিন্দু সমাজের নয়, হিন্দু মুসলিম উভযেই ধর্ম-সংকীর্ণতার শিকার হয়ে পবস্পরকে আক্রমণ করে গেছে। তফাৎটা শুধু বিজিতের সঙ্গে বিজেতার, শোষিতের সঙ্গে শাসকের, স্বভাষীর সঙ্গে বিভাষীব, বহু দেববাদীর সঙ্গে একেশ্বরবাদীর (সাকারবাদীব সঙ্গে নিরাকারবাদীর)। ফলে একদল শুধুই নিরুপায় আক্রোশে ছটফট কবেছে; অন্যদল ক্ষমতার দৌরাত্ম্যে দুর্বলের ধর্মকে কোনঠাসা করে দিতে চেয়েছে। এই বিভেদ-বিদ্বিষ্ট মনোভাবের নজির ছড়িয়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে।

রামায়ণ অনুবাদক রামানন্দ যোষ অযোধ্যাকাণ্ডের ৩২ পত্র ১ম পৃষ্ঠায় মুসলমান শাসন সম্পর্কে সক্ষোভে বলেছেন—

ম্লেচ্ছ ভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে।
দাসীরূপা হইলা লক্ষ্মী নীচ জাতি ঘরে।।
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার।
কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার।।[৪৩]

তাই তাঁব অভিপ্রায়,

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্রে বাজা কবি দারুব্রহ্মে দিব।।[৪৪]

মুসলিমের বিরুদ্ধে আবও মুখর ভারতচন্দ্র রায়। কবি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের

জন্য অন্নদার প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত করেছেন ভাবত সম্রাট জাহাঙ্গীরকে। ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে ধর্মের বিতর্কে জড়িয়ে ফেলে তাঁকে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকরূপে চিত্রিত করেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই সম্রাটকে দিয়ে হিন্দুধর্ম, দেব-দেবী ও লোকাচারের অজস্র নিন্দাবাদ শুনিয়েছেন শুধু এই আশায়, দেবী অন্নদার প্রকোপে তাহলে জাহাঙ্গীরকে যৎপরোনাস্তি শায়েস্তা করা যাবে। তাই জাহাঙ্গীর বলেন —

আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধবম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম।।
সয়তানে বাজী দিল না গেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ।।
গোসাঁই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর দিলা দাড়ি গোঁফ দিয়া।।
হেন দাড়ি বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ি গোঁফ সাঁই দিল তারে।।

মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূতে।।
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে।।
বিশেষে বামণ জাতি বড় দাগাদার।
আপনারা এক জপে আরে বলে আর।।
... ...
দেহ জ্বলিযায় মোর বামন দেখিয়া!
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া।।[৪৭]

আর যাঁর মনে পরধর্ম সম্পর্কে এত বিদ্বেষ তাঁর পক্ষে বিধর্মী প্রজাদের উপর নির্যাতন খুবই স্বাভাবিক। তাই অন্নদা যে যে কারণে জাহাঙ্গীরকে অত্যাচারী বলেছেন, সেগুলো খুব একটা অসঙ্গত মনে হয়না —

যতেক বেদের মত সকলি করিল হত
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলি মিলি মিছা জপে ইলিমিলি
মিছাপড়ে কলমা কোরাণ।।
যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানামতে করে অনাচার।

বামন পণ্ডিত পায় থু থু দেয় তার গায়
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর।।[৪৬]

এর প্রতিবিধানের জন্যই দেবী অন্নদা ভূত-প্রেত বাহিনী দিয়ে ছারখার করে দিলেন দিল্লীর আমীরশাহী। আর জাহাঙ্গীরও সবিনয়ে আত্মকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে হিন্দুধর্মের ঘোরতর অনুরাগী হয়ে উঠলেন —

অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি।।[৪৭]

'যবন' অধম, ইসলামধর্ম 'অসার'। তাই ভবানন্দের কাছে সম্রাটের কাতর প্রার্থনা

জাহাঙ্গীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভাল মতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা।।

অতঃপর —

জাহাঙ্গীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে।।[৪৮]

সম্রাট নিজেও মহাধুমধামের সঙ্গে পূজার ব্যবস্থা করলেন। সমবেত সকলকে নিয়ে দেবীর সামনে উপস্থিত হয়ে গড় করলেন —

কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত।।[৪৯]

ভারতচন্দ্রের এ কাহিনী কাল্পনিক। তাঁর কল্পরাজ্যের অধিশ্বরী দেবী অন্নদা। সেই অন্নদার অঙ্গুলী হেলনে নিরাকারবাদী মুসলিমের চরম হেনস্থা ঘটিয়ে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বস্তি পেতে চেয়েছেন কবি। আবার এও হতে পারে, মুসলিম বিদ্বেষের এই পরিচয় সাম্প্রদায়িক চেতনাদর্শের নিদর্শন ততটা নয়, যতটা মধ্যযুগের সাহিত্যিক ট্র্যাডিশন। বিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য —

"মধ্যযুগের আবহাওয়া এমন ছিল যে তখনকার কোনো গ্রন্থ সাম্প্রদায়িক না হইয়া পারিত না। অপর সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী ভুল ইহা প্রমাণ না করিতে পারিলে স্বসম্প্রদায়ের প্রসার সাধন করা তখন সম্ভব ছিল না। ...."[৫০]

কারণটা যাই হোক হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী পরস্পরিক আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে স্বধর্মনিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখতে চাইত। ইসলাম ধর্মকে অসার প্রমাণ করতে হিন্দুদের প্রচেষ্টার যেমন ঘাটতি ছিল না, তেমনি মুসলিম কবিগণও তাদেব লেখনীর মাধ্যমে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত লৌকিক দেবদেবীকে প্রথমে সজাগ ও শক্তিশালী চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করে অতঃপর তাদের ইসলাম ধর্মের বীর পুরুষদের বীর্যের কাছে হীন, অবনত, সন্ত্রস্ত চরিত্ররূপে চিত্রিত করে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন।

এই মনোভাবের বিশিষ্ট পরিচয় ধরা পড়েছে পুঁথি সাহিত্যের অন্যতর কবি শাহ গবীবুল্লাহের লেখনীতে। তিনি তাঁর 'সোনাভান' নামক পুঁথিতে বাংলার বীবাঙ্গনা সোনাভানের সঙ্গে আরবদেশের বীর হানিফার যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কৌশলে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বাংলার লৌকিক দেব-ধর্মের হীনত্বের কথা ব্যক্ত কবেছেন। এ কাব্যে দেখা যায় সোনাভান বীরাঙ্গনা, কিন্তু হিন্দু মূর্তি পূজক। তার বীবত্বের খ্যাতি আরবদেশের বীর হানিফার হৃদয়ে এ কারণেই ঈর্ষানল জাগিয়ে তোলে। মূর্তিপূজককে পরাজিত এবং পরাহত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা মুসলিম বীর পুরুষদেব ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। হানিফা সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই সোনাভানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সোনাভানের বীরত্বের কাছে হানিফা নগণ্য, তুচ্ছ। যুদ্ধে হানিফা সোনাভানের কাছে পরাজিত ও বন্দী হন। হানিফাকে সোনাভান বলির উদ্দেশ্যে তার আরাধ্য দেবতা শিব এবং কালীর নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অবতার রসুল মুহম্মদ এবং আলীর প্রতি শিব শ্রদ্ধাবনত, আলীর ভয়ে দেবী কালিকাও ভীত সন্ত্রস্ত। শিব এ কারণেই হানিফাকে বলির জীব হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ। দেবতা শিব হানিফাকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং সোনাভানকে উপদেশ দিয়ে বললেন —

হজরত আলীর বেটা রছুলের নাতি।।
ইহাকে খাইতে দেহ যাহা খেতে চায়।
ইহাকে মারিতে পারে কে আছে দুনিয়ায়।।[১১]

অনুরূপ কালীও হানিফাকে বলির উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানিয়েছে। কারণ আলীর ভয়ে শিব ও কালী উভয়েই কম্পমান —

শিব পলাইল দেখে আলী পাহলওয়ানে।
আমি গিয়া লুকাইয়া রহিলাম বনে।।[১২]

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ভারতচন্দ্র রায় হিন্দু দেবীর কাছে মুসলিমেব নতি-স্বীকারের কাহিনী বয়ন করে ঠিক এর বিপরীত চিত্রই এঁকেছেন। সুতরাং উভয় ধর্মেব কাব্যরচনার মূলে একটি সঙ্গতি আছে — তা হল পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা। সৈয়দ হামজার 'জৈগুনের

পুথি'[৭৮] -তেও ধর্মের অন্ধতা আর এক বেশে উপস্থিত। এই কাব্যের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের পরাক্রমের কাছে অনৈসলামিক শক্তির পরাজয় বর্ণন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের যে পদ্ধতি এখানে কবি দেখিয়েছেন তা সম্পূর্ণ এই তরবারির সাহায্যে - ধর্মমতের মাধুর্য বা ঔদার্যের জন্য নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে এই কেন্দ্রীভূত আবেগকেই কবি প্রকাশ করেছেন - চরিত্রসৃষ্টি বা কবিত্ব প্রকাশের সুযোগ নেন নি। কোন অমুসলমান চরিত্র যখন বাহুবলে পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি যে কেবল ইসলামের অকৃত্রিম অনুরাগীরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন তা নয়, এক নিমেষেই পূর্বের ধর্মমতের প্রতি তাঁর সীমাহীন বিদ্বেষ ও সেই ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাও প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রতি ভক্তির আতিশয্য তাঁর আর সব চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ নয়া মুসলমান জৈগুন কর্তৃক পিতৃহননের প্রস্তাব স্মরণ করা যেতে পারে। এখানে তাঁর দ্বিধাহীনচিত্ততা যে নীতিবোধের পরিচয় দেয়, তা ইসলাম ধর্মলব্ধ বলতে সকলেরই কুণ্ঠা জাগবে। এ এক ধরণের অন্ধতা, কিন্তু কবি একেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।"

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি খ্রীষ্টানরাও ধর্ম প্রচারে নেমে পড়েছিল। বাংলায় খ্রীষ্টানদের আগমন ঘটে বণিকরূপে এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথমে পর্তুগীজ, অতঃপর ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার, ফরাসি প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বঙ্গভূমিতে আসতে থাকে। এদের মধ্যে পর্তুগীজ পাদ্রীদের একদল প্রথমাবধিই এদেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরকম দু'জন জনপ্রিয় পর্তুগীজ পাত্রীর নাম পাই। একজন হলেন দোম আন্তোনিও দে রোজারিও, অপরজন মানোএল-দা-আস্সুম্প সাঁউ। দোম আন্তোনিওর গ্রন্থটির নাম 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। আলোচ্য গ্রন্থের প্রস্তাবনায় মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে - "জনৈকখ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রসম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার ঃ ইহাতে বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মের অভ্রান্ত সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ঃ একমাত্র এই ধর্ম্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান আছে।"[৮০] অন্যদিকে মানোয়েলের গ্রন্থটিও হিন্দুর সুদৃঢ় দার্শনিকতা ও ধর্মমতকে বিচূর্ণ করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। নতুবা খ্রীষ্টানধর্ম বাংলায় প্রসারিত হতে পারবেনা বলে তারা বিশ্বাস করতেন। উভয় গ্রন্থকারেরই আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। কারণ একটাই। দেশের চতুর্দিকে জাঁকিয়ে বসা কুশাগ্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণদের তর্কে পরভূত করে খ্রীষ্টান ধর্মকে দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কোপের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পেয়েছে মুসলমানেরা (যদিও ইসলামধর্ম খ্রীষ্টান বিরোধী)। আসলে মুসলমান ধর্ম রাজধর্ম। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বঙ্গভূমিতে আসার অন্তত এক শতাব্দী পূর্ব থেকেই আরব সাগর থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে মুসলমান ও পর্তুগীজ

বণিকদের মধ্যে ভয়াবহ দ্বন্দ্ব চলছিল। সেই স্মৃতি তখনও মলিন হয়ে যায়নি। তাই দোম আন্তোনিও এবং মানোয়েল সযত্নে মুসলিম বিরোধিতা এড়িয়ে চলতেন। এর থেকে বোঝা যায়, খ্রীষ্টানদের বৈষয়িক স্বার্থ ধর্মকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ধর্ম আর মৌলবাদ কখনও সমার্থক হতেপারে না; অন্ততহওয়া উচিত নয়। অব্যাখ্যাত প্রকৃতি, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, অত্যাচারের প্রতিকারহীন অসহায়তা বঙ্গদেশীয়ের ধর্ম বিশ্বাসকে হয়ত অনেকখানি অধঃপতিত করেছে, তবুও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম শুধুই দ্বন্দ্বের জমিতে নিজের ভিত প্রস্তুত করে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে বোঝা যায় ধর্ম কল্যাণকর সংহিতার মূর্তিতেও আবির্ভূত হয়েছে বার বার। সমাজের নিম্নার্গগামী মানুষদের একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছে, সহিষ্ণুতা ও পরহিতৈষনার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। সেই সমন্বয়ের বাণী সাধক যাঁরা, তাঁদের কাব্যসাহিত্যই বর্তমানে আমার আলোচ্য।

পৌরাণিক যুগে দেখতে পাই একটি লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, তন্ত্রের শিব ও শক্তি বা মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্ত্বের দ্যোতক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তার পরে আরার কৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার প্রতিষ্ঠা হল তখন এই যুগলের সঙ্গে কৃষ্ণ-রাধা এবং রাম-সীতাও যুক্ত হয়ে গেলেন। যাঁরা উমা-মহেশ্বর তাঁরাই যে রাধা-কৃষ্ণ এ সমন্বয়ের সত্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সহজভাবে গৃহীত হতে দেখি। রামেশ্বর চক্রবর্তী তাঁর শিবায়ন কাব্যে এই সহজ সত্যটিকেই প্রকাশ করেছেন। এখানে দেখি, একই যুগল মূর্তি ভক্তের আকাঙ্খা অনুসারে রাধা শ্যাম, সীতা-রাম, ভবানী ও শঙ্কর প্রভৃতি অনন্ত মূর্তি ধারণ করে অভিব্যক্ত হয়েছেন —

কেহ বলে রাধাশ্যাম কেহ বলে সীতারাম
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য যাহার ভজন জন্য
এক মূর্তি অনন্তরূপিণী।।[৫৬]

অন্যত্র দেখি, 'গৌরীর গুণ বর্ণনা'য় মহাদেব গৌরীকে একেবারে তত্ত্বতই কৃষ্ণপ্রেমদায়িনী কৃষ্ণপ্রেয়সী রাধা করে তুলেছেন।[৫৭]

আসলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে রামেশ্বরের শিবও একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে গেছেন। যেমন চাষ করার জন্য শিব কৈলাসধাম ত্যাগ করে যাওয়ায় বিরহিনী দেবী বলেছেন —

মহেশ মাধব হৈল মহী মধুপুরী।
কৈলাস হৈল ব্রজ আমি রাধা মুয়ি।।[৫৮]

আর, হরগৌরীর বর্ণনায় কবি যখন বলেন —

"যেন রাসমণ্ডলে গোবিন্দ পায়্যা রাধা।
প্রেম আলিঙ্গন কর‍্যা পিয়ে মুখসুধা।।[৫৯]

তখন ধর্মের সদাচারী সমন্বয় চেতনার ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শৈব-শাক্ত দ্বন্দ্বের হালকা তারল্য শিব-কৃষ্ণ অভেদত্বের নিগূঢ় দার্শনিকতায় হারিয়ে যায়।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও ধর্মসমন্বয়ের কথা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রধান দুটি সম্পদায়ের (শৈব ও বৈষ্ণব) কলহের প্রসঙ্গটি আগেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকতার নিরর্থকতা দেখিয়েছেন কবি ব্যাস প্রসঙ্গে, ভবানন্দ ও জাহাঙ্গীরের উক্তি -প্রত্যুক্তিতে। ব্যাসদেব বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে যখন প্রভেদ তৈরী করেছেন, তখন কবি ভাবছেন - 'অভেদ হইল ভেদ এবড় দুর্ব্বোধ।[৬০] গানে বলেছেন —

হরি হরে করে ভেদ নর বুঝে না রে।
অভেদ কহে চারি বেদ।।[৬০(ক)]

ব্যাসের উদ্দেশ্যে শিব ও বিষ্ণুর দৈববাণীও এই মুলতত্ত্বেরই পুনরুচ্চারণ। আর এই ব্যাস কাহিনীর উপসংহারে এসেছে শক্তিতত্ত্বের কথা। শক্তি বিনা যে সৃষ্টি নেই, গুণময় ঈশ্বর যে গুণময়ী শক্তির অধীন অন্নদামঙ্গলকারের এই বিশ্বাস থেকেই তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-মাতৃকাশক্তির তিন বিকাশ রূপ উল্লিখিত হয়েছে। মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ব্যাসকে দেবী-অন্নদা দৈববাণী করে এই অভেদত্বের কথাই বলেছেন —

হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর।।[৬১]

অন্যদিকে 'মানসিংহ' অংশে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করলেন তিনি ভবানন্দের মাধ্যমে। জাহাঙ্গীরের অদূরদর্শিতার প্রত্যুত্তরে ভবানন্দ যে উক্তি করেছেন তা হলো —

দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত।।
হিন্দু মুসলমান আদি জীবজন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত।।[৬২]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর ধর্মাচার ও শাস্ত্রমতের প্রতি আক্রমণের তেমন যোগ্য জবাব আর হয়নি। সাকার উপাসনার পক্ষে যে যুক্তি কবি দিয়েছেন, তার অধিক কথা পরবর্তীকালেও প্রায় কেউ বলেননি। সর্বোপরি, মঙ্গলকাব্যের কবি হয়েও তিনি শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব সমেত সমস্ত হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানকে এক করে দেখতে পেরেছেন।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের রূপ যখন জাতীয় সমস্যার বিষয়, তখন ভারতচন্দ্র তাকে না এড়িয়ে গিয়ে ধর্মক্ষেত্রে সমভূমি নির্মান করতে চেয়েছেন। ভবানন্দের অনেক কথাই ভারতচন্দ্রের, কিন্তু সব কথা নয়। সমন্বয়বাদী হয়েও কাহিনীর প্রয়োজনে ভবানন্দ ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দার উত্তেজনায় মেতে উঠেছেন, সেখানে তাঁর স্রষ্টা কবি ভারতচন্দ্র কেবল উভয় ধর্মের আচার নিরপেক্ষ মূলগত সত্যেরই গান করেছেন। সেই মূলগত সত্যটি হল সাকার-নিরাকারে অভেদ ঘোষনা। 'পাতশাহের দেবতানিন্দা' অধ্যায়ের সূচনায়,[২৬] এবং 'পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর'[২৭] অধ্যায়ের শীর্ষে এই সত্যেরই উদ্‌ভাষন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমন্বয় ভাবনা শাক্ত পদাবলীতে আরো সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। দুটি দিক থেকে এই প্রসঙ্গটির উপর আলোকপাত করা যায়। প্রথমত, সুপ্রাচীন তন্ত্রের চণ্ডমুণ্ডহন্ত্রী, ভয়ংকরী, করালবদনা, নরমালা-বিভূষণা, দ্বীপিচর্ম পরিধানা আবক্তনয়না, অতিবিস্তার বদনা কালিকার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিক্ষুব্ধ যুগজীবন-সম্ভূতা, বরাভয়দাত্রী শ্যামার সমন্বয়। আর সেই সমন্বয়ে মধুররস সর্বস্ব, মুরলীমোহন কৃষ্ণের সহাস্য মূর্তির ভূমিকাই প্রধান। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্যামারূপ নির্মাণের মধ্য দিয়ে শাক্ত কবিরা শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নত্বও প্রচার করেছিলেন।

এবং দ্বিতীয়ত, কায়াসাধন যোগে বিশ্বাসী বাউল ধর্মেব শাস্ত্রাচারবিরোধী সহজভক্তির সঙ্গে শাক্তধর্মের সমন্বয়।

তন্ত্র শব্দের অর্থ হল the regular order of ceremonius and rites; system; frame work; ritual অর্থাৎ ধর্মগত ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিয়মানুগ ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ ধর্মাচারানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র কাঠামো। মানুষের ধর্মজীবনে জ্ঞান- বুদ্ধি-অনুভূতিকে আশ্রয় করে ঈশ্বরচেতনা ও দার্শনিক সংস্কার গড়ে ওঠে এবং সেই অমূর্ত অনুভূতিকে বাস্তব করে তোলার জন্য আচার, ক্রিয়াকর্মপদ্ধতি ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটে। আদিম সমাজ জীবন থেকেই মানুষ এইভাবে নানাপ্রকার গুহ্য সাধনপ্রণালী এবং বিশ্বাসজাত ক্রিয়াকলাপ আবিষ্কার করেছে। এই গুলিই তন্ত্র নামে পরিচিত। শক্তিধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ মাতৃশক্তির উপাসনার সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে শক্তি উপাসনায় বহু গুহ্য সাধন পদ্ধতি, মুদ্রামণ্ডলীর বহুতর দুর্ভেদ্য সাধন সাপেক্ষ রহস্যাদি প্রবেশ করেছে। এবং এর সূচনা করেছেন রামপ্রসাদ। তন্ত্রের শক্তিপূজাপদ্ধতি, ভূতশুদ্ধি মানসপূজা, কুণ্ডলিনীযোগ — এককথায় উপাস্য ও উপাসনাতত্ত্বের অনেক কিছুই তিনি এবং তাঁর পরবর্তী শক্তি কবিরা গ্রহণ করেছেন।

তন্ত্র বলে, "ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী আছে। শরীরস্থ মেরুদণ্ডের বাম দিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার অবস্থিতি। তন্মধ্যে মেরুদণ্ড বাহিনী। মধ্যে সূক্ষ্ম বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার অভ্যন্তরে সূক্ষতরা চিত্রিনী নাড়ী বিরাজিত।

নাড়ীসন্নিবেশের সমষ্টি বা আবর্ত্তকে নাড়ীচক্র কহে। নাড়ীর ছয়টি চক্র আছে। ১) মূলাধার, ২) স্বাধিষ্ঠান, ৩) মণিপুর, ৪) অনাহত, ৫) বিশুদ্ধ, ৬) আজ্ঞাখ্য। এই ছয়চক্রের মধ্যে মূলধারা গুহ্যদেশে অবস্থিত। উহা চতুর্দ্দল, উহাতে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিত এবং তাঁহার সুধাক্ষরণ স্থলে মুখ সংলগ্ন করিয়া সর্পকারা কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম, লিঙ্গমূলে অবস্থিত। ইহা ষড়দল, ইহাতে বারুণী নাম্নী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। মনিপুর পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; মনিপুর ভিন্ন, ইহার দশদল ও তন্মধ্যে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল ও তন্মধ্যে শিব অধিষ্ঠিত। ইহাতে লাকিনী শক্তি থাকেন। আহত পদ্ম হৃদয়ে স্থিত ও দ্বাদশদল। ইহাতে বাণলিঙ্গ ও কাকিণী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠে স্থিত। ইহা ষোড়শ দল, ইহাতে জীব হংসাবলোকন করে ও ইহা শাকিনী শক্তির স্থিতি স্থান। আজ্ঞাখ্য পদ্ম ভ্রূ মধ্যে অবস্থিত ও দ্বিদল। ইহাতে ত্রিকোণাকৃতি মধ্যে শিব বিরাজিত হাকিনী শক্তি বাস করেন। এই ছয় চক্র ভেদ করিলে কৈলাস ও বোধিনী মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত সহস্রদল মধ্যে পরমহংস শিব বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বায়ুরোগে ও অন্তর্বর্তী অগ্নির আনুকূল্যে মূলাধার পদ্মের কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত ও ধ্যানবলে সচেতন করিয়া সুষুম্নার চিত্রিনী নাড়ী অবলম্বনে ক্রমশঃ ছয়টি পদ্ম ও তিনটি শিবকে ভেদ করিয়া সহস্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে। পরে ঐ মিলনে যে পরমামৃত নিঃসৃত হইবে তাহা পান করিয়া পুনরায় পূর্বতিক্রান্ত পথ দিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলধার পদ্মে আনয়ন করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম ষট্চক্রভেদ। এই সব প্রক্রিয়া গুরু সাহায্য ব্যতীত করা সম্ভব নহে। ষট্চক্রভেদ প্রণালী গুরুপদেশ সাপেক্ষ। নতুবা হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী।"[৫৭]

ষট্চক্রভেদের এই তান্ত্রিক তত্ত্বটি রামপ্রসাদ তাঁর একটি সঙ্গীতে সুন্দবভাবে প্রকাশ করেছেন —

আমার মনের বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ন, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিনী।।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মম, শিব লিঙ্গ চক্রযোনী।
চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী।।[৫৮]

আর একটি গানে তিনি বলেছেন —

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা আছ গো অন্তরে
মা আছ গো অন্তরে।।
একস্থান মূলাধারে আর স্থান সহস্রারে

আর স্থান চিন্তামনি পুরে।
... ...
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ ঘুচাও ভক্তের খেদ
হংসীরূপে মিল হংসবরে।।
চারি ছয় দশ বার ষোড়শ দ্বিদল আর
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা শুনে প্রসাদের কথা
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে।।[৬৮]

রামপ্রসাদের এই সব সঙ্গীত প্রমাণ করে যে, ষট্‌চক্রসাধন দ্বারাই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা - এই ষট্‌চক্র বিভাবণ পূর্বক হৃদয়ে সহস্রদল পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি বেষ্টিত ব্রহ্মময়ী মহাকালীর বিরাট তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলেই তিনি গাইতে পারতেন —

কালী বল মনরে।
ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।।[৬৯]

অর্থাৎ ষট্‌ চক্রসাধনার মধ্যে দিয়েই এই সাধক কবি মহামায়া, চৈতন্যস্বরূপিনী, ঐশ্বর্যময়ী মাহেশ্বরীকে অন্তরে ও বাইরে লাভ করেছিলেন। কালীনামের অমোঘ মন্ত্রে কালভয়কে অগ্রাহ্য করেছেন, নশ্বর জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের শঙ্কা ও পঙ্গু আতুরের মৃত্যুভীতির বিরুদ্ধে শমনজারি করেছেন। একাধিক পদে তাঁর এই আত্মপ্রত্যয়, মৃত্যু জয়ের অকম্পিত বিশ্বাস অভিব্যক্ত। একটি উল্লেখ করা হল —

তুই যারে, কী করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি
মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি।
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
এমন করেছি কায়দা পালাইলে নাইকো ফায়দা
হামেশা রজ্জু ভক্তি-প্যায়দা, দু নয়ন দারোয়ান দিয়েছি।
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি
তাই সর্বজ্বরহর-লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি।
শ্রী রামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি।[৭০]

সুতরাং একটা কথা পরিস্কার বোঝা যায়। গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার যেটি মূল কথা, অর্থাৎ শক্তির নারীরূপের অনুষ্ঠান ও তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা সেই শক্তির উদ্বোধন - রামপ্রসাদ

সাধকের অন্তর-পীঠে অভীষ্ট সেই নারীশক্তিকে মাতৃরূপে উদ্বোধনের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে সন্তানের অভিমান ও আকুতি, প্রার্থনার ক্রন্দনাবেগ ও ভক্তির ব্যাকুলতা, চপল বাসনা ও দুর্বিনীত আব্দার - এই সব বৃত্তিচয়ের নৈবেদ্যেই এই জননী সাধনার সকল উপচার রচিত হয়েছে। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই নারীশক্তির অন্যান্য রূপের সঙ্গেও ভক্ত পরিচিত। তিনি জ্বালামুখী গিরিদুহিতা, 'আঁখির নিমিষে অসুরবিনাশকারিণী', তিনি ঐশ্বর্যময়ী, তিনিই রাধা তিনিই কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু রামরূপিনী, তিনিই বৃন্দাবনে যুগল রাধাকৃষ্ণ, পাতালবাসিনী ভদ্রকালীও তাঁরই রূপভেদ। কেবল সাধকের উপাসনাকার্যের জন্যই রূপকল্পনা, অন্যথায় তিনি নিত্যনিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মসত্তা মাত্র 'একবাহং জগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। সুতরাং তত্ত্ববুদ্ধিতে সাধক জানেন শক্তি অদ্বিতীয়া পরমেশ্বরী, বিভিন্ন তন্ত্রের ভাষায় তিনি অক্ষরা পুরাণী, সর্বশক্তি স্বরূপা সর্বদেবময়ী তনু, মহাবিদ্যা মহামায়া মহাযোগীশ্বরীপরা, মহামায়া মূলীভূতা, সমস্ত শক্তিরূপা বিভূতি, ব্রাহ্মী কুমারী মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী বারাহী নরসিংহা ঐন্দ্রী চামুণ্ডা দেবীর দেহেই বিলীন হয়। দেহভাগে ইনিই শব্দব্রহ্মরূপে কুলকুণ্ডলিনী। এই কুলকুণ্ডলিনী একদিকে অঘটনঘটনপটিয়াসী অতিকুশলী মায়া, অন্যদিকে তিনি জ্ঞানরূপা। শিব ও জীবকে ইনিই মোহমুগ্ধ করে রাখেন। উপাসনা কারণেই দেবীর এই রূপকল্পনা।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তন্ত্রোক্ত দেবী কালিকাকে পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপাস্যা করে তোলার কারণ কি ? উত্তরটা ঐ শতাব্দীর ঘনীভূত দুর্যোগের মধ্যে নিহিত। এই দুর্যোগ ভঙ্গুর রাজশক্তির অব্যবস্থিত-চিত্ততায়, রাজসভার বিচারমূঢ়তায়, বৈদেশিকশক্তির উত্তরোত্তর আক্রমণে, অর্থনীতির চূড়ান্ত বিপর্যয়ে। স্বভাবতই এই শ্বাসরোধকারী দুর্বিষহতা এবং শাসন ব্যবস্থার সন্দিগ্ধ ষড়যন্ত্রের মধ্যে বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতি তার দোদুল্যমান ভারকেন্দ্রটিকে স্থানান্তরিত করল উৎকেন্দ্রিক জীবনের আশ্রয়দাত্রী করালবদনী শ্যামা জননীর চরণতলে। শাক্ত কবির কালী হয়ে উঠলেন অখণ্ড দুর্ভাগ্যের প্রতীক। তাঁর ভয়ংকরী মূর্তির মধ্যে ক্রমপ্রকাশ্য হতে থাকল সমস্ত দেশকালের ত্রস্ত বিপর্যস্ত চেহারা - সমগ্র দেশের শ্মশান পরিণামই অধ্যাসে উদ্‌বর্তিত হয়ে মহাকালীর শ্মশানপীঠে রূপান্তরিত হল। দেবী হলেন শ্মশানকালী এবং শ্মশানচারিণী। আর শ্মশানচারিণী বলেই কালভয়হারিণী। মৃত্যুর শঙ্কা সমগ্র যুগের পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে ইতিহাসের অমোঘ সর্বনাশের আলোক সম্পাতে যখন প্রক্ষেপিত হয়েছে তখন শ্যামা নামের অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণে কবিরা মৃত্যুভয় বিদূরণের পরম বিশ্বাস খুঁজে পেলেন। নশ্বর জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের শঙ্কা ও পঙ্গু আতুরের মৃত্যুভীতির বিরুদ্ধে কালীনামের প্রয়োগজনিত উপদেশ দিলেন। রামপ্রসাদের দুটি পদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ---

(১)

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয়।।

তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়।।[১০]

(২)

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।।
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।।[১১]

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী ক্রান্তিকালের স্থিতিস্থাপকতাহীন, শিথিল বিশ্বাসী যুগমানসকে ভয় থেকে মুক্তিদানের জন্য, দৈন্য থেকে সম্পদে উত্তীর্ণ করার জন্য শাক্ত কবিরা তন্ত্রোক্ত কালিকার শরণ নিলেন। আর তখনই তন্ত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন শক্তিধর্মের সমন্বয় ঘটল। কিন্তু এই দেবীর বিশেষত্ব এখানেই যে তিনি ভয়াল ভয়ংকরী চামুণ্ডারূপে, শক্তিরূপিণী শত্রুবিমর্দিনী ষড়ৈশ্বর্যময়ীরূপে আবির্ভূতা হলেন। কালক্রমে অনন্ত স্নেহময়ী ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরুতে পরিণত হলেন। বিপর্যয় ও সর্বনাশের অবসানকারিনীরূপে তিনি শ্মশানচারিণী, হরেব হৃদিবিহারিণী উন্মাদিনী মুণ্ডমালিনী রূধিরাননা হয়েও 'সভয়ে অভয়পানি', কৃপাহীনে কৃপাবারি বর্ষণ করলেন। রিক্তভূষণা রক্তাধরা দিগম্বরী হয়েও ভক্তের মনোদর্পণে অনিন্দ্যকান্তিতেধরা দিলেন। শক্তি কবিদের বিগলিত বাৎসল্যে, উপচিত ভক্তিপ্রাণতায়, স্নেহভিক্ষা ও অসহায় আর্তিতে তন্ত্রের কৃষ্ণবর্ণা করালবদনা কালী তিমিরবিনাশী সৌদামিনী পরাভূত অপরূপ মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। জীবনের বাস্তব নৈরাশ্য কালিমার বৈপরীত্যে জন্ম নিল এক উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা। সুতরাং "শ্মশানের বীভৎসতার মধ্যে মাতার স্নেহঘন কৃপা, রক্তপ্লাবিত প্রলয়ের মধ্যে দুটি পদ্মনিভ চরণের সৌগন্ধ্য, ভীষণতার মধ্যে স্নিগ্ধ মাধুর্য আবিষ্কারই শাক্ত কবিদের প্রধান কৃতিত্ব।"[১২] শাক্ত পদাবলীর পদে পদে এই বৈপরীত্যজনিত বিস্ময় ছড়ানো গাছে। যেমন - রামপ্রসাদের একটি পদে কালীমূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে পাই —

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজগরাসে।।[১৩]

কিন্তু ঐশ্বর্যরূপিনীর সর্বাঙ্গে মাধুর্যরসের এই প্লাবন আনলেন কে? কার অনির্বচনীয় স্পর্শে ভয়ংকরী হলেন শুভংকরী, ভীষণের সঙ্গে যোগ ঘটল মধুরের, রুদ্রের সঙ্গে সুন্দরের? ইনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের নাগরীবিমোহন নয়ন কটাক্ষে শাক্তকবি যেন চকিতে দেখলেন তাঁর চির-আরাধ্যা শ্যামার কুটিল ত্রিপুরারি মোহন নয়ন অপাঙ্গের স্মৃতি;

দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের স্মিতহাসিতে প্রচ্ছন্ন শ্যামাজননীর সংবরিত অট্টহাস্যের বিলীয়মান স্মিতরেখা। শ্রীকৃষ্ণের যমুনাপুলিনে আনন্দবিহারও তাঁর চিত্তে শ্যামার শোণিতসাগরে প্রলয়নৃত্যের স্মৃতি জাগাল। সমন্বয়ের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বাঁধা পড়লেন শ্যাম ও শ্যামা। এখানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক রামপ্রসাদের কবিপ্রজ্ঞার সার্থকতা। পরবর্তী কবিরা একযোগে প্রসাদ প্রবর্তিত এই সমন্বয়ধর্মিতাকে অনুসরণ করেছেন।

রামপ্রসাদের একাধিক পদে বৈষ্ণব ও শক্তিধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে —

ও মন তোর ভ্রম গেলনা
পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত
হরি হর তোর এক হলনা।
বৃন্দাবন আর কাশীধামের
মূল কথা মনে বোঝনা;
কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
করে আত্মপ্রতারণা।
অসিবাঁশির মর্ম বুঝে
তোমার কর্ম করা আর হল না।
যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাবনা।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে
এ যে কপট উপাসনা
তুমি শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর
চক্ষু থাকতে হলে কানা।।[৭৪]

পরবর্তী কবিরা এই অভেদ বাণীর যাদুস্পর্শে মোহিত হয়ে কালা ও কালীর দ্বৈতরূপকে একই মূর্তিরূপে ভজনা করেছেন। যেমন রামলাল দাসদত্ত গেয়েছেন —

অভেদে ভাবরে মন কালা আর কালী
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী।।[৭৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সমন্বয় চেতনা স্নিগ্ধ ভক্তচিত্তে পার্থিব দুঃখদাহের অপনোদন ঘটাতে সাহায্য করেছে। আর তখন নিষ্কলুষ হৃদয়ে ভক্ত মাতৃ-আরাধনাকে করে তুলেছে বিচিত্রস্বাদী। তাই নবাই ময়রা বলেন —

হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে

একবার হয়ে বাঁকা দে মা দেখা
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।[৭৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিগীতি পদাবলীতে শ্যাম ও শ্যামার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার এই তাত্ত্বিক অদ্বৈতবাদ অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবিসংগীতে মালসী, আগমনী ও সখীসংবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসা যাক। বাউলের সঙ্গে শক্তিধর্মের সমন্বয়ই আলোচ্য। প্রচলিত শাস্ত্রবিধি, অভ্যস্ত আচার- অনুষ্ঠানের সংকীর্ণতা অস্বীকার করে যারা নিজেদের পাগল, বা বাতুল বলে পরিচয় দেন তারাই লোকসমাজে সাধারণভাবে বাউল নামে পরিচিত। এদের দেবতা মন্দির-মসজিদে বিগ্রহ রূপে বিরাজ করেন না। কারণ, বাউলের ঈশ্বর সাধনা বিশ্বাসের নিকুঞ্জে সহজ সাধনা। অনুষ্ঠানের পাষাণফলকে বিগ্রহের লগ্নানুমোদিত উপচার প্রদানে নয়। দেবতাকে দুর ভক্তের প্রণতি হয়, বাঞ্ছিতের হৃদয়তাপ প্রদানই তাঁদের সাধনার মুল উদ্দেশ্য। সাধনার এই সহজ পন্থায় অনেক বাউল শ্রেণীর রচনার সঙ্গে শাক্ত পদে গভীর সাধর্ম্য মেলে।

মধ্যযুগে ধর্ম এক অসহ্য ক্ষমাহীন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল। সহিষ্ণুতা ও তন্ময়তার কোনো রেশ তাতে ছিলনা। শুধু প্রথাসর্বস্বতা, ছুঁৎমার্গ, এবং আত্মকেন্দ্রিক ভীতিকে কেন্দ্র করে ধর্ম ব্যাপারটা মানুষের বহিরঙ্গে ঘোরাফেরা করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য থেকে দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'স্বর্গারোহণ পালা'য় কলিযুগে কিরূপ দুরবস্থার সৃষ্টি হবে তার বিস্তৃত চিত্র আছে। তাতে সমসাময়িক সমাজের নানা কুকীর্তির কাহিনী পাই। ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং দর্শনকে উপলব্ধি না করে ধর্মীয় সাধনাকে ব্যক্তিগত সুখ, ভোগ, লালসার পরিতৃপ্তিতে পরিণত করার মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে এসেছিল। ব্যক্তিগত বাসনাকে ধর্মীয় আবরণে ঢাকা দেওয়ায় যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। যেমন বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় দার্শনিক উপলব্ধি সম্পর্কে কবি বলেছিলেন —

বৈষ্ণবতা ধর্ম্ম   দেবারাধ্য কর্ম্ম
ব্রহ্মপদে মতিলীন।[৭৭]

কিন্তু তিনি এও দেখেছেন যে, অধিকাংশেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি না করে ধর্মীয় আবরণে নিজের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ও পার্থিব সুখভোগ করে চলেছে —

তাহে কত ভণ্ড   হইবে পাষণ্ড
রণ্ড ভণ্ড রণ্ডাধীন।।[৭৮]

মধ্যযুগের বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজের উচ্চ কোটিতে অনুসৃত হলেও সাধারণভাবে সমাজে উক্ত দুটি ধর্মীয় সাধনাই অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু শুধু বৈষ্ণব সাধনাতেই নয়, শাক্ত সাধনাও বাংলাদেশে নানা আভিচারিক প্রক্রিয়ায় ধর্মের আবরণে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। চতুর্বর্গের প্রথম ও চতুর্থ বর্গ গ্রহণ না করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গ গ্রহণ করেছিল —

শিব শক্তি যুক্তি জীব সবে মুক্তি
কলিকালে হেন পদে।
না বুঝয়ে তত্ত্ব পরদ্বারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে।।[৭৯]

কেবল তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের দিকে নজব দেওয়া হয়েছে।

ধর্ম সেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পারলৌকিক উন্নতির উপায় হিসাবে ধরা পড়েছে। ইহলৌকিক সুখের উপায়রূপে পরিগণিত হয়েছে,

মহতের দায় মিছা দিবে রায়
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র
কেবল কড়ির উদ্দেশ।।[৮০]

ধর্মের নামে এই যে অসদাচার তার নজির আছে জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণেও। তক্ষক ও ধন্বন্তরির বাদানুবাদের মধ্যে কবি তৎকালীন নিমন্ত্রণ লোভী ব্রাহ্মণদের একটি কৌতুকপূর্ণ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন —

বিহানে ব্রাহ্মণ সভ উঠিঞা দাঁড়ায়।
আকাশে নজর করে কাক কোথা যায়।।
ঝাঁক ঝাঁক কাউয়া উড়িঞা যেহিদিকে যায়।
কাক কলরবে দ্বিজ সেই দিকে ধায়।।
কেহ দেয় অর্দ্ধচন্দ্র কেহ দীর্ঘ ফোঁটা।
কেহ পরে বামন ধুতি করে ভূণী ফোতা।।
ফলার দেখিলে করে পূর্ব্ব দিনে উপবাস।
পরে যে ভোজন করে না পড়ে নিশ্বাস।। [৮১]

শুধু নামেমাত্র ব্রাহ্মণ নিষ্কর্মা বেদবিধি বর্জ্জিত এই সব কূপমণ্ডুকদের সার্থক জীবনচিত্র এটি।

আর ধর্মসাধনে অন্তরের তাগিদ ছিলনা বলেই কেবল আচার সর্বস্বতা গ্রাস করল তৎকালীন ধর্মজীবনকে। তাই ধর্মের নামে সমাজে জায়গা করে নিতে লাগল পশুবলি এমনকি নরবলির মত বিকৃত মানসিকতা। যেমন 'কমলা' পালায় নরবলি দিয়ে কালীপূজার কথা পাই - 'নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে।'[৮২]

এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন শাক্তকবি ও বাউলেরা। সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কুসংস্কারপন্থীদের প্রতি তাঁদের ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল। যেমন শ্যামা মায়ের পূজা উপলক্ষে পশুবলি সম্পর্কে রামপ্রসাদের উক্তি —

মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে,
তুমি জয়কালী, জয়কালী বলো.
বলি দেও ষড়রিপুগণে।[৮৩]

আর একটি পদে বলেছেন —

জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদবে তাও কি জাননা।
তবে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।[৮৪]

বাউল লালনও এক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবাদী, ঈশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয় সেকথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মানুষকে-

যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।
রাম-রহিম-করিম কালা এক আত্মা জগৎময়।।[৮৫]

তাই তাঁর সিদ্ধান্ত —

ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর জাতের বিচার নাই।।[৮৬]

ফোঁটা-তিলক, টিকি-টুপি নিয়ে ধর্মের বাহ্যিক আচার, অর্থহীন লোক দেখানো অনুষ্ঠান, মন্দির -প্রাঙ্গণে অসাম্য-বিভেদের আবিলতা আর কদর্য জীবন-সংস্কারের বিরুদ্ধে লালন সর্বদা সাম্যের ঘোষক —

মানুষ তত্ত্ব জার সত্য হয় মনে।
শে কী অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটীর টিপী কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সর্ব দেবা দেবী
ভোলেনা সে এসব রুপি
ও যে মানুষ রতন চেনে।।[৮৭]

মানুষ তাঁর উপাস্য। শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার আর অবজ্ঞার মরণকলে পিষ্ট সমাজকে জাতগর্বী উদ্ধত কুসংস্কারীদের কবল থেকে মুক্ত করে শ্রেণীহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনায় তিনি সোচ্চার হয়েছেন, আবার কখনও ছুঁৎমার্গীদের রক্তবীজ বিস্তার দেখে আকুল হয়ে বলেছেন —

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান
জাতিগোত্র নাহি রবে।।[৮৮]

আবার মন বাঁধেন লালন; যুক্তির আালোয় অন্ধ মানুষকে ভগবৎসেবার পথ দেখান —

একবার জগন্নাথ দেখরে যেয়ে.
জাত কেমন রাখে বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই লয় খেয়ে।।[৮৯]

লালনের মুক্ত চৈতন্যে জাতি সম্পর্কে অনুভব খুব যুক্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক। তিনি মানেন, সমাজে বহু রকমের জাতি বর্ণের অবস্থান বাস্তব। কিন্তু বিভাজিত সেই জাতির মানুষ যে এক এমন চেতনার প্রচার ও প্রসারই তাঁর কাম্য। তাই ঋজুকণ্ঠে তিনি বোঝান —

কেউ মালা কেউ তসবিগলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায় ?
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায় জেতের চিহ্ন রয় কারণে।[৯০]

লালনের সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দী। পটভূমিকা গ্রাম। কৃষি ও হস্তশিল্পযুক্ত অর্থনীতির অন্তর্গত ছিল তাঁর জীবনযাপন। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জল-অচল, বর্ণহিন্দু এবং মুসলমানদের নানা গোষ্ঠীর যৌথ অংশগ্রহণ ছিল। সকলে পরস্পরের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করত। তবু সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতি প্রায় একই থাকা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানে স্পষ্ট বিভাজন ছিল। জাতপাতের প্রবল দ্বন্দ্বে

সামান্য ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য 'জাত' চলে যেত। বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের 'জাত' অবস্থানটি এত ক্ষণভঙ্গুর ছিল যে উচ্চঅবস্থান থেকে জাত হারাতেন অনেকে। গুরু সিরাজের গৃহে খাদ্যগ্রহণের অপরাধে জাত হারিয়ে লালন খেলকা গ্রহণ করে তাঁর সামাজিক অবস্থানকে একটা যুক্তি সঙ্গত রূপ দেন। সুতরাং, ধর্মীয় জাতবিচারের প্রশ্নেই সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল লালনকে। তাই জাতভেদাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িত। আর সমাজের প্রান্তঃশায়ী জীবনে তাঁর বিশেষ কিছু হারাবার ভয়ও ছিল না। এই নির্ভীকতা লালনের গানে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বস্তুত, ধর্মকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে তিনি মনে করেননি। সেজন্য আচার-বিচারের পরিবর্তে, প্রকৃত উদ্দেশ্যের মধ্যেই তিনি ধর্মের মূল তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। তাই তাঁর ঘোষণা করতে কুণ্ঠা হয়নি —

ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয়
আল্লার নির্ণয়
তাহলে সকল ধর্মেই
তারে পাওয়া যায়।।
এক লক্ষ চব্বিশ হাজার
পয়গম্বরের হোল খবর
উনিশটি নাম কোরাণ ভিতর
আর সকল কোথায়।।
তালেবুল মওলা যে হয়
সকল ধর্মেই সে তারে পায়
আল্লা কারো একান্ত নয়
চেয়ে দ্যাখরে
এই দুনিয়ায়।।[২১]

এরূপে লালন তাঁর স্রষ্টা সম্পর্কীয় ধারণাকে উদার ও পরধর্ম সহনশীলতার ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাসী, অদ্বৈতবাদী। তথাপি অন্যান্য ধর্মের প্রতি সন্দেহপরায়ণ নন। কারণ,

আরবী ভাষায় বলে আল্লা।
ফার্সীতে হয় খোদা তা'লা।
'গড' বলিছে যিশুর চ্যালা।
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে।[২২]

সমভাবাপন্ন সুরে প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন শাক্ত কবি রামপ্রসাদও। বলেছেন —

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতে তুমি হওমা রাজি।
মগে বলে ফারা তারা গড বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।।[১৩]

কাজেই এদের উভয়ের মতই হল - স্রষ্টা এক। তিনি অপ্রকাশ স্বয়ং সত্য। তাঁকে প্রকাশ্যরূপে উপলব্ধির জন্য মানুষ নানা দেশে, নানা ধর্মে, বিবিধভাবে ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনার সৃষ্টি করেছে। লোক চারের ধার ধারতেন না বলেই এঁরা প্রচলিত শাস্ত্রবিশ্বাস বা প্রথাসর্বস্বতাকে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করেননি। এমনই একটি শাস্ত্র বিগর্হিত সিদ্ধান্ত - তীর্থদর্শনে সর্বপাপক্ষয়ের ধারণা মিথ্যা। বরং প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে মনোরাজ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রামপ্রসাদ একাধিক পদে এই মত পোষণ করেছেন। যেমন —

(১)
আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী।[১৪]
(২)
কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের গান গাইব।।[১৫]

লালন-গুরু দরবেশ সিরাজ শাহ তাঁর পদের একাংশে বোধহয় এই কথাই বলতে চেয়েছেন —

..... হীরে বাই আর কষ্টি কান্তি
সেই ঘরে মনুরায় শান্তি
ঘুচলো না তোর মনের ভ্রান্তি
বেড়াচ্ছ ঘুরে।। ....[১৬]

বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত কবিদের ধর্মীয় ঔদার্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পর বোঝা যায় উভয়ের চিন্তাস্রোত দুটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হলেও মূলে একটি অবিচ্ছিন্ন চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল — তা হল সর্বধর্মসমন্বয়। এবং সেই সমন্বয়ের সূত্র ধরেই বাংলা সাহিত্যে তাঁরা উভয়েই প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানব প্রাধান্য। মানবধর্মের মহিমাকীর্তনে শাক্তকবি ও বাউলগায়কের কণ্ঠ মিলে মিশে গেছে। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।[১৭]

আর মানবজীবনের মহিমা উপলব্ধির এই লৌকিক ভঙ্গির পাশে লালনের কণ্ঠেও বেজে উঠেছে—

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।[৯৮]

সাদৃশ্যের দিক আরও একটা আছে। সেটি হল কায়া সাধনা। এই কায়াসাধনা শাক্ত ও বাউল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত। উভয় সাধনার পিছনেই আছে তন্ত্রের প্রভাব। বাউল কিছু গুহ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই শরীরের মধ্যে অনির্বচনীয়ত্বের উপলব্ধি ঘটাতে জানে। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে এই প্রাচীন কায়া সাধনের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে বলেছেন— "বিশ্বকায়ার সঙ্গে মানবকায়ার সমতা না করিলে বিশ্বনাথ এই সংকীর্ণ কায়াতে বিহার করিবেন কি করিয়া ? তাই আপনাকে বিশ্বের মতো অসীম ও ব্যাপ্ত করা চাই। নহিলে ব্রহ্মসংকোচ দোষ হয়। তাই সাধনা করিতে গিয়া অসীম শূন্যে ধ্যানকে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। শূন্য সমাধিই হইল খ-সম সমাধি। .... তাহাই সহজ সমাধি। আপন কায়ার সহায়তায় কর্মে-রূপে-যোগে-ধ্যানে-প্রেমে ক্রমে এই সীমাহীন সাধনার দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব কায়াযোগই সার সাধনা।[৯৯] ফকির লালন এই তত্ত্বের কথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর একাধিক গানে —

খেলতেছে মনের মানুষ নীরে ক্ষীরে।
আপন আপন ঘর
খোঁজ মন আমার
কেন ঘুরে বেড়াও অন্ধকারে।[১০০]

লালন গুরু সিরাজ শাহ্ রচিত একটি গানে সেই কায়া সাধনার কথাই বিবৃত হয়েছে অন্যভাবে —

আঠারো মোকামের খবর বুঝে নাও তাই হিসাব করে।
আছে আউয়ল মোকাম
রাগের তালা
পাঁচ পাঞ্জাতন সেই ঘরে।।[১০১]

এই দেহচারী গুহ্য প্রক্রিয়া শাক্ত সাধকদেরও সাধনতত্ত্ব। সেখানেও কুণ্ডলিনী জাগরণে মহাসুখের উদ্বোধনের কথা আছে। যেমন —

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুল কুণ্ডলিনীর কূলে।[১০২]

লালনের মতে শুধুমাত্র ভক্তিমার্গ ধর্মপিপাসা নিবারণ করতে পারেনা, যদি না তার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের যোগ থাকে। 'আত্মজ্ঞান' কথাটি লালন শাহ্ কুহেলিকাময় (মিষ্টিক) অর্থে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন - 'আত্ম' অর্থ 'নিজ' আর নিজ হল স্বদেহ। দেহ রক্ত, মাংস, শিরা এবং স্নায়ুতন্ত্র -মণ্ডলীর সমষ্টি মাত্র। আর মস্তিষ্কই মানুষের জ্ঞান ও ধারণার উৎস। কিন্তু এ সবই বস্তু। তাঁর মতে এই সব বস্তুর ধারণা - জ্ঞানের উৎস। অতএব এই বস্তুর জ্ঞান লাভই 'আত্মজ্ঞান'। বস্তু অক্ষয়, বস্তুই শ্রেষ্ঠ — নাম কিছু নয়। তাই বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবোধের সামঞ্জস্য স্থাপন করে তিনি ধর্মের দৃঢ়ভিত্তি নির্মাণ করেছেন। ধর্মের লক্ষ্য হিসাবেও তিনি কোনো পারমার্থিক লাভালাভের কথা বলেননি। অটল প্রাপ্তিকেই তিনি ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন —

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে
গোলমালে মাল মিশাল আছে।[১০৩]

আর তখন কর্মপাশবদ্ধ জীবনের মুক্তিকামনায় অধীর হয়ে তিনি বলেছেন —

যেতে সাধ হয়রে কাশী কর্মফাঁসি বাঁধে গলায়
আমি আর কতদিন ঘুরব এমন নাগরদোলায়।

কলুর বলদ যেমন ঢেকে নয়ন পাকে চালায়
অধীন লালন পল তেমনি পাকে হেলায় হেলায়।[১০৪]

বাউল পদের এই আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মাবগাহন ও আত্মশুদ্ধির কথা শাক্ত পদেও সুলভ। যেমন - রামদুলাল নন্দীর গানে পাই —

'মন কি ভুলে ভুলিয়াছ ভুলে কি ভুলিতে নার
ভুলে মূল হারাবে গাছে মূলেরই সন্ধান কর।'[১২৪]

ভুলের ভিড়ে উদভ্রান্ত সাধকের এই মূলানুসন্ধানের নিগূঢ় তত্ত্বটি পূর্বোক্ত বাউল পদেরই প্রতিধ্বনি।

বাউলরা আচার-ভ্রষ্ট, মন্ত্রহারা, ব্রাত্য। মূর্তি-প্রতিমায় তাদের প্রণতি নেই, তাদের নৈবেদ্য দেবার্চনায় নিবেদিত হয় না। তাদের বিনম্র ভক্তি জ্ঞান-বেদে নয়, প্রেমোপনিষদে। কৃত্রিমতার প্রতি, অন্ধ কুসংস্কারের প্রতি, প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি তাদের দাসত্ব নেই। সংকীর্ণ ভেদ-চিহ্নের তিলকপরা ঔদ্ধত্য থেকে তারা মুক্ত হয়েছে বলেই তারা বাউল। তাই তাদের পূজা-রেজ-নামাজ নেই। শরিয়তি ইসলামের অনুশাসন নেই, মানুষের অতিরিক্ত কোন বস্তুতে তাদের দেবতাব অস্তিত্ব তারা কল্পনা করে না। এই অপৌত্তলিকতার সঙ্গে তথাকথিত শক্তি উপাসক এবং দুর্গা-কালী মূর্তির পূজারী শাক্ত কবিদের অবশ্যই

কোন মিল নেই কিন্তু সাদৃশ্য আছে শাক্ত সাধনার সেই অপৌত্তলিক লোকায়ত মনোভাবটির সঙ্গে যার ধারক রামপ্রসাদের মতো কবি সাধক। বস্তুত শক্তি সাধনায় রামপ্রসাদ ছিলেন সহজিয়া। বাহ্যিক উপচারের আড়ম্বর আয়োজনকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। ভক্তির আত্যন্তিক নিষ্ঠাই তাঁর কাছে সাধনার পূজার্ঘ্য, হৃদয়ের পবিত্র একাত্মতাই তাঁর নৈবেদ্য, ধ্যান-সমাহিত আত্মাবগহনই তাঁর পূজামন্ত্র। কিন্তু আঠারো শতকের বাংলাদেশে এই উপচার সর্বস্ব জাঁকজমকপূর্ণ পূজাবিধিকেই প্রভূত প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। বৈষয়িক বিপন্নতায় ভীত সংসারী সম্পদ অপহরণের আশঙ্কায় সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীর আরাধনা করেছে ষোড়শোপচারে, ধনগর্বে ঐশ্বর্যের চাঁদমালায় দেবীর পৌত্তলিক মূর্তির জয়বাদ্যে দিগ্বিদিক মুখরিত করেছে। কেবল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বেই রাজানুকূল্যে এক বছরে দশহাজার কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বয়ং মহারাজা বিপুল অর্থব্যয়ে বিশাল ঐশ্বর্যের দৃষ্টি বিভ্রমকারী আয়োজনে শ্যামাপূজা করেছেন। রামপ্রসাদ ভক্তিপ্রকাশের এই তামসিক প্রদর্শনে ক্লিষ্ট কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দেবী যেমন চিন্ময়ী, তাঁর পূজাবিধিও সেরূপ মনোময়ী। রামপ্রসাদ পৌত্তলিক আরাধনার স্থূলতাকে অতিক্রম করেছিলেন নিজস্ব একটি সহজিয়া উপাসনা পদ্ধতির দ্বারা —

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে।[১০৮]

আনুষ্ঠানিক ব্রত-উপচারবিরোধী বাউল ধর্মের সঙ্গে এখানেই শাক্তধর্মের নিহিত সাদৃশ্য।

জগৎ ও জীবনকে দেখার এই প্রথাবহির্ভূত ভঙ্গিটি সুফীধর্মকেও বাউলের সমগোত্রীয় করেছে। আসলে 'ধর্ম' হল তাই, যার সঙ্গে যোগ রয়েছে মর্মের। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে বাণী উত্থিত হয়, গোপন গহন মনে উৎসারিত হয় যে প্রেম, তারই রহস্য ব্যক্ত হয় মরমীবাদ বা সুফীবাদের ভিতর। সুফী শব্দটি আরবী শব্দ 'তসাউওফ্' বা সুফ শব্দ থেকে এসেছে। 'তসাউওফ্' শব্দের অর্থ পবিত্রতা। আবার 'সফ' শব্দের অর্থও পবিত্রতা। ভিন্ন অর্থে 'সফ' মানে শ্রেণী বা সারি। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণীতে বা সারিতে যাঁরা অবস্থান করেন তারা 'সফ্' পদবাচ্য। এই শ্রেণী মানে প্রথম। অতএব, প্রথম শ্রেণীতে অবস্থানকারীগণ অর্থাৎ যাঁরা কোরাণ, হাদিশ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ এবং নমাজ ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটান ও জাগতিক বন্ধনমুক্ত, তারাই ঈশ্বরের নিকট প্রথম 'সফ্' বা সাফ-ই-আউয়াল বা সামনের সারিতে আছেন বা থাকার যোগ্য। আক্ষরিক শব্দ 'সুফী' থেকে জন্ম নিয়েছে সুফীবাদ। এতে প্রেমই ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেম থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। নিজের সৃষ্ট এই প্রেমময় জগতের স্বরূপ আস্বাদন করার জন্য ভগবান বহুরূপে লীলা করে থাকেন। জীব হল লীলাময়ের প্রধান শরিক। তিনি এক অথচ নিজে লীলা আস্বাদনের জন্য বহুবিধ হয়ে যান; তবু আপন প্রেমস্বরূপকে বিস্মৃত হন না। কিন্তু জীব ভুলে যায়। ভগবান পরম দয়িত। সুতরাং জীবকে সেই

পরমদয়িতের প্রেম দিওয়ানি হতে হবে। এই যে প্রেমভাব এবং ঈশ্বরপ্রেম, মানবপ্রেম, আশুক-মাশুকের-প্রেম জাতীয় ভাব ও অভিব্যক্তি সর্বোপরি সুফীপ্রেমসাধনার তত্ত্ব ও ধারা প্রকাশ পেয়েছে গানের ভাষায়। সুফী কবি সৈয়দমর্তুজার আত্মবোধনের একটি গান উদ্ধৃত করছি —

সাঁই এক বিনে মওলা এক বিনে
আর নাহি কোন কোই।।
আপে হরে, আপে রাখে সখি।
মাওলা আপে করে কেলি।
আনন্দমোহন মাওলা খেলাও ধামালী।।
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে মুরারি।।
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি,
মাওলা গোপতের চিন।
পরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন।।[১০৭]

সুফী সাধকের এই প্রেমসাধনা লালনের গানেও উদ্ভাসিত। লালন বলেন —

ইশকে আল্লা ইশ্‌কে রসুল,
ইশ্‌কেতে ভাই জগতের মূল।
ইশ্‌ক বিনা ভজন-সাধন
সবকিছু হয় ভুল।।[১০৮]

সৈয়দ মর্তুজার গানটি থেকে আবেকটি জীবন-সত্যের সন্ধান পাই। তা হল হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয়। বিশেষীকরণ করে বলা যায়, বৈষ্ণব সম্পদেব উত্তরাধিকার গ্রহণে সুফীধর্মের সমৃদ্ধি। সৈয়দ মর্তুজার অজস্র গানে এই কৃষ্ণানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। শুধু মর্তুজাই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা আরও কয়েকজন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির সাক্ষাৎ লাভ করি, যাঁদের মধ্যে আছেন চম্পাগাজী, রহিমুদ্দিন প্রমুখ। এঁদের দু'একটি পদ উল্লেখ করছি।

সৈয়দ মর্তুজা লিখেছেন —

শ্যামবন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোর সনে পাশরিতে নারি আমি।।[১০৯]

পদটি আত্মনিবেদনের। আত্মনিবেদন প্রগাঢ় হয় দয়িতের অনুরাগে। চম্পাগাজীর একটি পদে আছে সেই পরমসুন্দর প্রণয়াবেশ — 'রাখিমু তোমারে হিযার মাঝারে পরাণ যতন করি - রাখিমু তোমারে।।[১১০]

বৈষ্ণব-সুফীর এই একাত্মিকা আসরে সামিল হয়েছে বাউল-শরীফও। বৈষ্ণবধর্ম ও পদাবলীর অধঃপতনের যুগে এঁদের হাতেই নতুন করে জীবন পেয়েছে 'কানুর পিরীত'। সেই নব-উন্মেষিত প্রেমভাব লালনের গানে আরও অন্তরঙ্গ—

সে ভাবে কি সবাই জানে।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।।[১১১]

সুফী সাধনা মধুর রসের সাধনা। রাগাত্মিকা ভক্তির পথ বেয়ে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দয়িত মনে করে প্রেমিকার মন নিয়ে সাধক দিব্যোন্মাদে তাঁর সঙ্গে মিলে যেতে চান। চৈতন্যদেবের থেকেই বৈষ্ণবধর্মে এই রাগাত্মিকা ভক্তির সূচনা। তবে সুফীপন্থীদের রাগাত্মিকা ভক্তি বৈষ্ণব রাগাত্মিকা ভক্তির চেয়ে আরো স্পষ্ট, আরও প্রাঞ্জল। বৈষ্ণবীয় ভাষায় রাগানুগা কান্তাপ্রেমের স্বরূপ লক্ষণ হল — 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা'কে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা'য় রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই রূপান্তরের পর্যায়ক্রমগুলো ঠিক নির্দেশিত হয়নি। অন্যদিকে সুফীপন্থায় বলা হয়েছে এই রাগাত্মিকা ভক্তি তথা দেহ থেকে দেহাতীতে, কায়া থেকে কায়াতীতে যাবার শক্তি অর্জন করতে হয় গুপ্তবিদ্যা বা দেহতত্ত্ব সাধনা আয়ত্ত্ব করার মধ্যে দিয়ে। এই বিদ্যা তন্ত্রাচারসম্মত এবং গুরুপ্রদত্ত। গুরু পরম্পরায় শিখে নিয়ে সুফী প্রেমসাধনা ধীরে ধীরে যায় পার্থিব থেকে অপার্থিব রাগসাধনার লক্ষ্যে। এইখানে উত্তর চৈতন্য সহজিয়া ধর্মের সঙ্গে সুফীসাধনার অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব জীবন-দর্শনের মূল উৎস থেকে তাঁদের মতবাদের উপকরণ সংগ্রহ করলেও মূলবৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে তার লক্ষণীয় রকমের স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। সহজিয়ার বিষয় চেতনা আরও বেশী গভীর, ভাবাকাশ আরও বাস্তব, আরও প্রত্যক্ষ। তাঁদেরও সাধনা প্রেমের পথে পরম পুরুষের সঙ্গ লাভে দেহাতীতের সাধনা। কিন্তু দেহকে বাদ দিয়ে তাঁরা সিদ্ধি চাননি। দেহতত্ত্ব যদি ঠিকভাবে জানা যায়, তবে অন্তর সহজ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, কারণ - 'ভজনের মূল এই নরবপু দেহ'। এই সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বক্তব্যে।[১১২]

সহজিয়া মতে এবং সাধারণ বৈষ্ণব মতেও সাধনার দুটো দিক আছে - বাহ্য ও আন্তর দিক। উভয় সাধনার উচ্চতব মার্গ হল পরকীয়া এবং নিম্নতর মার্গ স্বকীয়া উপলব্ধি। এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তা বা মননের স্থান নেই, হৃদয়ানুভূতিই সত্যের পরিমাপক। হৃদয়ানুভূতির দৃষ্টিতে সবই মাধুর্যময়, প্রেমময়। শাস্ত্রীয় বিধি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির স্থানও এখানে নেই। আছে, সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম-চেতনা থেকে বিমুক্ত হয়ে শুধু মধুর রসে স্বরূপের সাধনা--

ছাড় অন্য জ্ঞান কর্ম্ম বিধি আচরণ।
নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম স্বকীয়া সাধন।।

জ্ঞান কাণ্ড কর্ম্ম কাণ্ড বিধি আচরণ।
পিতৃ মাতৃ ক্রিয়া কান্ড কুটম্ব ভোজন।।[১১৩]

প্রাণহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে অর্থহীন শাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে যে সত্যকে পাওয়া যায় না, তাকে উপলব্ধি করা যায় প্রেমের মধ্যে।

ছয় রিপু হিংসা করি কর উপকার।
সুখ দিয়া মারিলে সে প্রেমের সঞ্চার।।[১১৪]

সহজিয়া ধর্মের এই কায়া-সাধনা তথা মানুষ-ভজনার কথা সুফীবাদ ও বাউলধর্মের মূল কথা। পরবর্তী দুই ধর্মগোষ্ঠীও ভাবে যে, মানবদেহেই পরম দ্যুতির দীপনা, মনুষ্য-বলয়ই চিৎ সত্তার পরিচয়, নশ্বর নরশরীরেই নিরঞ্জনের আনন্দলীলা, রূপে রূপে সেই অরূপের অপরূপের বিচিত্র প্রকাশ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন সুফী মনোভাবাপন্ন কবি হলেন শেখচান্দ। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ হল - হরগৌরী সম্বাদ[১১৫] ও তালিবনামা।[১১৬] এই দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু অভিন্ন। পার্থক্য শুধু, 'হরগৌরী সম্বাদে' উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব জগৎ সৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব তথা মহাজ্ঞানের কথা বলেছেন, আর 'তালিবনামা'য় ঐ কথাগুলিই শেখচান্দের জিজ্ঞাসার জবাবে পীর শাহদৌলা একটু বিস্তৃতভাবে কয়েকটি মুসলিম পরিভাষা সহযোগে প্রয়োগ করেছেন। এই ভাবে একই ব্যক্তির দ্বারা হিন্দুর আরাধ্য দেব-দেবীর সঙ্গে মুসলিম-আরাধ্য পীরের উপাসনা মধ্যযুগের ধর্মকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। শুধু তাই নয়।'দেহপরিচয়' প্রসঙ্গে কবি তন্ত্রের কায়া সাধনাকেই স্মরণ করেছেন —

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বামে স্থিতি।
কণ্ঠেত সুষুম্না নাড়ী ভবানী মুরতি।।
বাসত্তর কোঠা তাতে নাভি দেশে ঠাম।
অষ্টকলে কণ্ঠদেশে বাজে নিজ নাম।।[১১৭]

সমন্বয় ঘটে গেছে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যের। অষ্টাদশ শতাব্দীর সহজিয়া সাধনাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'বৃহৎ বঙ্গ' (২য় খণ্ড. ১৯৯৩) প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত

"সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চুফকির মুসলমান - শত শত হিন্দু তার শিষ্য। সহজিয়াদের সাহেব ধনী সম্প্রায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রাদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের

নিকট সালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইঁহাদের প্রধান আড্ডা। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইঁহারা বিগ্রহ পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ়রূপে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। ..... দরবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা - 'কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল জুলকে কর সাঁইজীকো নাম। .....' রামবল্লভী সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান এইরূপ 'কালী কৃষ্ণ-গড খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টল। মন-কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা বল রে।'

হিন্দু-মুসলামানের মৈত্রীর বাণী আর একটি সহজিয়া পদেও সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। রচয়িতার নাম লাল মামুদ। ইনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার নারায়ণ ডহরের কাছে বাওইডহর গ্রামের অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান। পদটি নিম্নরূপ —

হিন্দু কিম্বা হৌক মুসলমান।
তোমাব পক্ষে সবাই সমান।।
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত সকল জাতিব শ্রেষ্ঠ চণ্ডাল কি চামার।।[১২২]

আবার কোন কোন মুসলমান বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ নামের দ্বারা ভগবানকেই নির্দেশ করেছেন। শ্রীহট্ট জেলার হাছেন রজা (চৌধুরী)র কাছে রাধা ও খোদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি রাধাকে রহিম ও রব্বানী বলে সম্বোধন করেছেন।

হিন্দুয়ে বলে তোমায় রাধা আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সীয়ে দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা।
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।।[১২৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীব কর্তাভজা সম্পদায়ও এই সমন্বয়ের আদর্শে দীক্ষিত। আউলচাঁদ বা আউল ফকির এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্তাভজা ধর্মের প্রবর্তন করেন অধুনা ঘোষপাড়াতে। এই ধর্মমত অনুযায়ী গুরু কর্তা এবং গুরু সত্য। এই গুরুবাদ বা গুরু আরাধনা থেকেই 'কর্তাভজা' নামের জন্ম। স্বভাবতই আলোচ্য ধর্মের কর্তা বা স্রষ্টা আউলচাঁদকে নিয়ে হিন্দু-খ্রীষ্টান-মুসলমান নির্বিশেষে অনুরাগীদল গান বাঁধে —

এভাবের মানুষ কোথা হতে এলো।
এর নাইক রোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল।।

এর সঙ্গে বাইশজন সবার একটি মন।
জয়কর্তা বলি বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢল ঢল।
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায় এর হুকুমে গাঙ্গ শুকালো।।[১১১]

কর্তাভজা দলে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ভক্তের সমান অধিকার। নর নারীর অবাধ মিলনেও কোনো বাধা নেই। তথাপি সমকালীন সমন্বয়ধর্মী মতবাদগুলোর চেয়ে এদের নীতিবোধ কিছুটা বেশী। ধর্মসাধনার নামে পরকীয়া তত্ত্বকে এরা অন্যদের মত অবৈধভাবে প্রশ্রয় দেয়নি। এদের একটি অনুশাসন এই রূপ - 'স্ত্রী হিজড়ে', পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্তাভজা।"[১১২]

সমন্বয় প্রসঙ্গে আর একজন দেবতার আলোচনা করেই উপসংহার টানছি। ইনি একজন মিশ্রদেবতা। নাম সত্যপীর। কখনও সত্যনারায়ণ, মাণিকপীর কিম্বা গাজীপীর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দেবতার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছিল।

পীরপাঁচালি মূলত অসাম্প্রদায়িক মনের সৃষ্টি। পীরের 'সেবা' 'হাজোত-মানোত' প্রভৃতি কৃত্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার। এই শ্রেণীর পাঁচালিতে হিন্দু মুসলিম পুরাণের একটি সমন্বিত রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। সমস্ত পীরগাথায় তাই ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে আমাদের লোকমানসের একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লভ্য।

১৫৩৮ সনে শেরশাহের বঙ্গবিজয়, সম্রাট ইসলাম সুরের মৃত্যুতে বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, ১৫৫৪ থেকে ১৫৭৫ সন পর্যন্ত ঘনঘন শাসকবদল ও যুদ্ধবিগ্রহ, মুঘল বিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত সম্রাটের দ্বান্দ্বিক অবস্থান ও তজ্জাত নৈরাজ্য, মঘ-হার্মাদদের নদীপথে লুন্ঠনবাজ, মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষন এবং ইওরোপীয় বেণেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাবে জনজীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় গীতায় কোরাণে মহত্ত্বে ও আদর্শে আস্থা কিংবা মন্দির মসজিদে বিশ্বাস রাখাও অসম্ভব। স্বভাবতই আশু বিপন্মুক্তির জন্য বিপন্ন মানুষ জরুরী নিদান ও দ্রুত ফলপ্রাপ্তি কামনা করে। মানুষ জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়। আর এই মনোভাব থেকেই ষোল-সতেরো শতকের সন্ধিক্ষণে জন্ম নিলেন 'সত্যপীর'। নির্জিত, পরাভূত মানুষের শক্তিমন্ত্র হল 'সত্য'। কারণ সত্য নির্ভেজাল, সত্য অকৃত্রিম। পৌত্তলিক হিন্দুর কাছে তিনি নারায়ণের প্রতিভূ, আর একেশ্বরবাদী মুসলমানের কাছে তিনি পীর। রাজ্যেশ্বর তখন মুসলমান। তাই তাঁর সম্মানে সত্যও উর্দুভাষী, জন্মসূত্রে মুসলমান আর শিরনী-ভোজী। এইভাবে 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির'। বস্তুত বাংলাদেশেই মুসলমান অধিকারের শেষ পর্বে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রয়াসে এই ধর্ম-সম্মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ কাহিনীর উদ্ভব এই সূত্রেই।

ড. সুকুমার সেনের মতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসাম পর্যন্ত বহু হিন্দু ও মুসলমান মক্কার রহিম ও অযোধ্যার রামের সাঙ্গীকরণ করে সত্যনারায়ণ এবং সত্যপীর পাঁচালী রচনা করেন। ফৈজুল্লার পীর কাহিনীর সঙ্গে এই কারণেই রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পাঁচালীর সাদৃশ্য লক্ষ্য কর যায়।

ফৈজুল্লার কাহিনীতে সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। উপক্রমে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্যদেরই সমানভাবে বন্দনা করেছেন। তাবপর লিখেছেন —

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।
শুন গাজী আপনি আকরে দেহ মন।।[১২৩]

মুসলমান রচিত পাঁচালীর মধ্যে এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে উভয় সম্প্রদায় যে কতটা এক হয়ে এসেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ফৈজুল্লার গাথায় পাওয়া যায় ।[১২৪]

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথা এর পরেই উল্লেখ করতে হয়। এই রচনাটির সম্পাদক শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে, ব্রাহ্মণ সন্তান রামেশ্বর মুসলমান ফকিরের আকৃতিতে বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর উদার ধর্মমতের প্রতিফলন। রামেশ্বর রচনাবলীর সম্পাদক পঞ্চানন চক্রবর্তী সত্যপীরের পাঁচালীকে স্কন্দপুরাণের রেবা ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের অনুবাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, স্কন্দপুরাণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখানে ফকিররূপে চিত্রিত হয়েছে। পুরাণের সত্যনারায়ণ এবং অর্বাচীন কালের সত্যপীর নারায়ণ এখানে অভিন্ন —

সত্যপীর নারায়ণ ত্রিবিধ প্রকার।।
ত্রিপ্রকার নামের তাৎপর্য্য শুন আগে।
মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্যপীর জাগে।।
নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।
পীর হৈলে প্রাণ গেলে না পূজে হিন্দব।।
অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম।
হুকুম মাফিক হৃদ্দ বিরচিত রাম।।[১২৫]

বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পাঁচালীতে শুধু সাম্প্রদায়িক ব্যবধান উত্তরণের চেষ্টাই নেই, ধর্মের ব্যবধানকেও অতিক্রম করার চেষ্টা আছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এটাই বিশেষ একটা ধারা যেখানে কবিগণ হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় সাধনায় বিভেদের রূপকে বড় না করে ঐক্যের আদর্শটিকেই প্রধান করে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন কবির লেখনীতে রাম-রহিমের অভিন্নরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের এই অভিন্ন রূপ-সাধনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের

হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। আর রামেশ্বর, ঘনরাম, ভারতচন্দ্রের মত অনুভূতিপ্রবণ কবিরা গণমনের সেই আলোড়নকে সাহিত্যে নথিভুক্ত করে ফেললেন। যেমন - কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'সত্যপীরের কথা'য় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অভেদাত্মতা প্রমাণ করার জন্য সত্যপীরের পরিচয় তুলে ধরেন এইভাবে —

ষড় দরশনে কয়　　এক ব্রহ্ম দুই নয়
জন্য জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবনদুষ্ট　　হৈন্দবি করিল নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈল রাম।।[১২৬]

পীর নিজেই বলেছেন —

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।
* * * * *
ফকীর হইয়া আসি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।।[১২৭]

অবশ্য পীরের মুখনিঃসৃত ভাষাতে মুসলমানী রাজ কর্তৃত্বের পড়তি আমেজটুকু সযত্নে রক্ষা করেছেন কবি। সমঝোতা সেখানে মুসলমানের সঙ্গেই —

ফকীর শরীর হয়্যা　　সাধুর নিকটে গিয়া
জিজ্ঞাসেন ক্যা লে যাও বাওয়া।
আধা চিজ্ দে যা মুঝে　　পীরকা দোহাই তুঝে
করোঙ্গা বহুত কুছ দোওয়া।।[১২৮]

গাথা-গীতিকার শ্রোতা ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। কোনো বিশেষ গোত্র, সম্প্রদায় বা বর্ণের জন্য গীতিকারগণ কাহিনীর মালা গাঁথেননি। তাই গীতি-কথকদের মনোজগতে কোনো সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা স্থান পায়নি। এ কারণেই 'মহুয়া'র কবি দ্বিজ কানাই গীতিকার শুরুতে সমাজের হিন্দু-মুসলমান এবং তাদের আরাধ্য দেবদেবী, তীর্থস্থান ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গীত শুরু করেছেন।[১২৯] অনুরূপভাবে 'কবরের কান্না' বা 'নুরুনিচ্ছা ও মালেকের পালা'য় কবি প্রথমে আল্লা রসুলের বন্দনা গাইলেও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথাই ঘোষণা করেছেন —

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডের দড়ি।
কেহ বলে আল্লাহ আর কেহ বলে হরি।।

বিছমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গেয়ান।

দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান।।[১৩০]

মধ্যযুগে এই ধর্মসমন্বয়ের বার্তাবাহক ছিলেন মূলত পীরেরা। 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় জনৈক পীরের আগমন ঘটে - যিনি ব্রাহ্মণ পুত্র কঙ্কের বাঁশির সুর ও করিত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজের ঔদার্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা তাকে মুগ্ধ করে শিষ্যত্বে বরণ করে নেন। কঙ্কের 'মলয়ার বারমাসী' গান শুনে পীর আনন্দ পেয়েছিলেন। মুসলমান পীর হয়ে হিন্দু কাহিনী শুনে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি উদার ও সহনশীল মনের পরিচয়ই সুস্পষ্ট।[১৩১]

অতঃপর সত্যপীরের পাঁচালি রচনার আদেশ দেন —

দেখিয়া শুনিয়া পীর কঙ্কেরে করিলা স্থির
উপযুক্ত ভক্ত এহি জন।
সত্যপীরের পাঁচালি কঙ্কেরে লিখিতে বলি
একদিন হৈল অদর্শন।[১৩২]

কঙ্ক পীরের আদেশে যে পাঁচালি রচনা করেন তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক সমাদৃত হয় —

হিন্দু আর মোসলমানে সত্যপীরে উভে মানে
পাঁচালীর হৈল সমাদর।।[১৩৩]

পীর পরিক্রমায় অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন কবির নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ফকির গবীবুল্লাহ। তাঁর রচনার নাম 'সত্যপীরের পুথি — মদন-কামদেবের পালা'। কাব্যমধ্যে বেশ কয়েকবার সত্যপীরের মহিমা সম্বলিত ভণিতা পাই —

১) 'হুকুম সত্যের যে অধীন গরীব গায়।'[১৩৪]
২) 'সত্যের কদমে যে হীন ফকির গায়।'[১৩৫]
৩) 'অধীন গরীব কহে সত্যপীরের পায়।'[১৩৬]

এই কাব্যে সত্যপীর 'গাজী' রূপেও উল্লেখিত হয়েছেন —

এতেক কহিয়া গাজী দয়ার সাগর।
হজরতি দেস্তা বাঁধে ছেরের উপর।।[১৩৭]

গবীবুল্লাহর আর এক কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'র কাহিনীতেও সত্যপীর 'গাজী' নামে আখ্যাত হয়েছেন। —

'বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।'[১৩৮]

সর্বোপরি আলোচ্য কাব্যের শেষে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার জন্য আল্লার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনায় সৌহার্দের এক অনন্য নজির সৃষ্টি হয়েছে —

গরীব ফকীর কহে সব এয়াদগারে
সের সালামৎ আল্লা রাখ সবাকারে।
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি
সবাকারে সালামতে রাখিবে রব্বানি।
আসরে বসিয়া যত হিন্দু-মুসলমান
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।[১৩৯]

শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যেই নয়, লোকজীবন থেকে উঠে আসা স্থানীয় ছড়াতেও পীরের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে সরফরাজ খাঁর প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ সুতীতে (গিরিয়ার কাছে) মুর্তজা ফকিরের দরগায় জয়লাভ প্রার্থনা করে শিরনি দিয়েছিলেন। নীচের ছড়াটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে —

জলদি করে হুকুম দেরে নবাব জলদি কবে
ঘোড়া করে যাব আমি সুতীর দরগাতে।
সওয়া সের আটার মোয়া পাওয়াভর ঘী
একালবে গোয়াস খাঁ সকলের জী।।[১৪০]

ঐতিহাসিক দিক দিয়েও ছড়াটি গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমিতে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের যে বিশেষ প্রবাহ শুরু হয়েছিল, সত্যপীব বা সত্যনারায়ণ হিন্দু-মুসলমানের কল্পিত অভিন্ন শক্তির উৎস হিসাবে তারই প্রতিনিধিত্ব করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্যচিন্তায় শাশ্বত মানবধর্মের প্রতিষ্ঠার মূলে এই শক্তির প্রভাব অনেকটাই ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।

অবশ্য শুধুই সমন্বয় নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মূলে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন আছে। সেটি সংশয়। আগেই বলেছি এই সংশয়ের পথ ধরে এগিয়েই মানুষ আশ্রয়চ্যুত করেছে দেবদেবীদের। ধর্ম সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর নিজস্বতা এখানেই।

আলোচ্য শতাব্দীর সাহিত্য সংশয় বা দ্বন্দ্বের শিকার বলেই পূর্বজের অটল নিষ্ঠাকে অগ্রাহ্য করে হয়ে উঠেছে বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়

রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন কাব্যের নাম। শিব — যিনি এ কাব্যের নায়ক তাঁকে তাঁর এযাবৎ অর্জিত যাবতীয় দেবী অহংকার খুইয়ে সর্বহারা যুগের তাগিদে হতে হয়েছে নিরন্ন মানুষের প্রতিনিধি - ভিক্ষাজীবী থেকে হেলে চাষী। পতন-স্খলনের দুরন্ত ঢল বেয়ে তীব্রগতিতে কৈলাস থেকে মাটির পৃথিবীতে অবতরণের সময় বৈদিক রুদ্রের ভাবমূর্তি, কিংবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমুখী পৌরাণিক মহিমা কোথায় ভেসে গেছে — এমনকি 'ধ্যানমৌনী নিবাত নিষ্কম্পদীপ শিখারূপী রজতগিরিনিভ' শিবশম্ভু, ভোলানাথ নামের আড়ালে আত্মভোলা হয়ে থাকার আলস্যটুকুকেও টিকিয়ে রাখতে পারেননি। পরিবারের বুভুক্ষা মেটাতে নিরুপায়ে লাঙল ধরতে হয়েছে তাঁকে। এইভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সূত্রকারকে শুধু ধানভাঙার গানবাঁধার ভার দিয়ে কবি রামেশ্বর অনাদি মহেশ্বরের মহিমাচ্যুতি ঘটালেন। বিবাহসভায় শাশুড়ীর শ্লেষবাক্য দিয়ে তাঁর রোজনামচায় দখল নিল এক অসহ্য গ্লানিময় অধ্যায়। উদাসীন, কর্মবিমুখ এই দেবতার এখন শুধুই ঘরে বাইরে গঞ্জনা আর উপহাস - -

ছি ছি ছি কি বলিব তারে।
খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মার‍্যা বারি কর
আইবুড় ঝি থাকুক মোর ঘরে।।[১]

শিব মহিমা হারালেন বটে - তবে শুধুই দেব মহলে। গণমানসে তাঁর প্রতিপত্তি আরো নিষ্কণ্টক হল। পরান্নজীবী থেকে কৃষিজীবিতে উত্তোরিত হয়ে তিনি যখন ইন্দ্রের কাছ থেকে সামান্য কর্ষণোপযোগী ভূমি, কুবেরের কাছ থেকে কিছু বীজধান মূলধনরূপে সংগ্রহ করে ভাগচাষীর মতই জমি চাষ করেছেন, কিংবা ভৃত্য ভীমকে দিয়ে করিয়েছেন; জমি থেকে মশা, জোঁক তাড়িয়ে চাষীকুলের অবাঞ্ছিত সমস্যা কমিয়েছেন; আর ক্লান্ত দিনান্তে অবসন্নতা ঘোচাতে অবসর খুঁজেছেন কৌতুকে বা কামচর্চায় - তখন একথা বলতে বাধেনা যে, শিব বাঙালী কৃষকের মনের মানুষ হয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে। তাঁর দিনলিপিতে কোথাও এতটুকু স্বর্গীয় সৌরভ নেই - বরং ভাবী কৃষকনেতার সম্ভাবনা আছে। আসলে সামাজিক দিক থেকে সর্বনিম্ন জাতি এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সর্বনিম্ন শ্রেণীর দেবতা হয়ে তিনি নিজেকে তাদেরই উপযুক্ত করে তুলেছেন।[২]

কিন্তু একথাও মানতে হবে যে, কবিমাত্রেই যেমন মুক্তকণ্ঠ, তেমনি কবিমাত্রেই দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধতা সমকালীন যুগের কাছে। আর সে যুগ যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সংশয়াচ্ছন্ন হয় তাহলে রামেশ্বরের মত কবিপ্রতিভাও কিছুটা দোলাচলচিত্ত হতে বাধ্য। পাথুরে ঈশ্বরকে মাটির মানুষে রূপ দিতে গিয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তের রহস্যালোক তাঁকে তাই কখনও কখনও বিভ্রান্ত করেছে। শিল্পীর একাগ্রতায় চিড় ধরেছে মাঝেমধ্যে, স্বাধীন তুলির টানে এসেছে যুগের তথা অতীত ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রমজনিত সঙ্কোচ। সেইকারণেই প্রথাভঙ্গের সিদ্ধির পাশাপাশি ঐতিহ্যানুরক্তির সীমাবদ্ধতা কবির সৃষ্ট শিব চরিত্রকে

পুরোপুরি লৌকিক হতে দেয়নি। অভুক্ত পরিবারকে স্তম্ভিত করে শিব যখন পত্নীকে ভিক্ষাঝুলি উপুড় করতে বললেন তখন তাই এক অজানা চমৎকারিত্বে তা থেকে অঝোরে বর্ষিত হয় রত্নরাজি। মুহূর্তে আমাদের পরিচিতির সীমা ছাড়িয়ে আবার রামেশ্বরের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হয়ে ওঠেন কোন অধরা জগতের যোগীরাজ —

ঝাড় মোর কাছে ঝুলি ঝাড় মোর কাছে।
সেবকের সম্পদ সকল লও পাছে।।
কাত্যায়নী কৌতুক কান্তের কথা শুন্যা।
ঝম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি ঝাড়িছেন আন্যা।।
অধোমুখে আধার ধূননে ধায় ধন।
প্রবাল মুকুতা হীরা রজত কাঞ্চন।।
যোগীর যোগের ঝুলি যোগিনীর ঠাঞি।
যত ঝাড়ে তত পড়ে অবশেষ নাঞি।।[১৮৫]

আর এর পরেই শুরু হয়ে গেল দীর্ঘ শিবপ্রশস্তি ও হরিনাম মাহাত্ম্যবর্ণন। অবশ্য 'চাযপালা' থেকে কবি আর বিশেষ পিছন ফিরে তাকাননি। দেবতাকে মানুষ করার সাধনায় পুনরায় মেতে উঠেছেন। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে শিব নিতান্তই ছাপোষা গৃহস্থে পরিণত হয়ে গেছেন।

বাঙালী সম্পর্কে একটা প্রচলিত ধারণা হল, বাঙালী ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। পুরুষকারকে সে নিয়তির চেয়ে হীনশক্তি মনে করে। তাই বাংলা সাহিত্যেও ভক্তির ছড়াছড়ি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে নবযুগের হাওয়া লাগলেও ভক্তিরেশটুকুকে কবিরা অস্বীকার করতে পারেননি। তাই দেবতাকে সাহিত্য প্রাঙ্গণ থেকে বিদায়সম্ভাষণ জানানো যায়নি। তবে দেবতাকে বরণ করার মানসিকতায় কবিদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখা দিয়েছে। এইখানেই সংক্রান্তি আমলের বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গ ল' কাব্যের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

ভারতচন্দ্রের ধর্ম — জিজ্ঞাসার, সন্ধানের, পরীক্ষার - কেবল উত্তরাধিকার-প্রাপ্ত বিশ্বাসের নয়। ধর্ম বা ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে গতিশীল ছিল তার অখণ্ড প্রমাণ - তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ ও সন্ন্যাসত্যাগ। শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথায় - "ভারতচন্দ্র ভঙ্গব্রত মানুষ। এ ধরণের মানুষ কখনো শ্রদ্ধা পাননা যদি না তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন তাঁর ব্রতভঙ্গ আসলে নূতন বোধের তাগিদে।"[১৮৮] এই নতুন বোধের তাগিদটি এসেছে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর সূক্ষ্মতা থেকে। আর তাই ব্যক্তিগত জীবনে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবভেক ধারণ করে বাহ্যত বৈষ্ণব হলেও তাঁর বুদ্ধিবাদী মন ও নির্মোহ দৃষ্টি তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মের ভাবদৃষ্টি কিংবা অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বাল্যাবস্থা

থেকে নানা সাংসারিক বিপাকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে সমকালীন ধর্ম সম্বন্ধে কোনো মোহ তাঁর আর অবশিষ্ট ছিল না। জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন ধর্ম অনাচারগ্রস্ত ও অন্তঃসারশূন্য। তাই গভীরভাবের প্রেরণায় বা আন্তরিক শ্রদ্ধায় তিনি বৈষ্ণবের গেরুয়া বসন গ্রহণ করেননি। বৈষ্ণবের ভেকধারণ করে সমসাময়িক বৈষ্ণবসমাজের অভিজ্ঞতামাত্র সংগ্রহ করেছিলেন; এবং সেই অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্তে কোনো ভক্তির তরঙ্গ তুলতে পারেনি। আসলে ভারতচন্দ্র অসংসার বৈরাগ্যে আস্থা হারিয়েছিলেন। সন্ন্যাসজীবন তাঁর কাছে আদৌ বরণীয় ছিলনা। অন্তত সুন্দর ও বিদ্যার সন্ন্যাসখেলা থেকে তাই প্রমাণিত হয়। রাজসভায় উপস্থিত সন্ন্যাসীবেশী সুন্দরের নানা ছলাকলায় কিংবা বিদ্যার সঙ্গে কথোপকথনে সন্ন্যাস সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের মানসিক বিরূপতা অস্পষ্ট থাকেনি। তাই সুন্দরের কণ্ঠে শুনি —

বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম দাস হব তারি।।[১৪৫]

আর যদি বিদ্যা হারে - নবীন সন্ন্যাসীর রক্তিম সুখ কল্পনা —

ধরাইব জটাভস্ম, পরাইব ছালা।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মালা।।
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে।।[১৪৬]

সর্বোপরি সন্ন্যাস সম্বন্ধে কবির অশ্রদ্ধা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই উক্তি থেকে - 'সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ, দিবসে রাজার কাছে বিদ্যাব প্রসঙ্গ।'[১৪৭]

আসলে ভারতচন্দ্রে সচল মানুষ। সেযুগের পক্ষে বিস্ময়কর চরিত্র। ধর্মক্ষেত্রে উদ্যত জিজ্ঞাসু। আর সেই জিজ্ঞাসার চাপান উতোরে তাঁর অনমনীয় সিদ্ধান্ত — জীবনে ধর্ম আছে, কিন্তু ভোগজীবন বা সংসারজীবনকে বঞ্চিত করে নয়। কারণ, বাসনা পারবশ্যকে অতিক্রম করে জীবন কখনও সচ্ছন্দ হতে পারেনা।

মঙ্গলকাব্যে দেবতার স্তুতিই মুখ্য, প্রকরণও গতানুগতিক প্রথাসিদ্ধতায় পর্যবসিত এবং আধ্যাত্মিকতায় বিশেষভাবে আচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে আধ্যাত্মিক শৈথিল্য লক্ষ্য করার মত। অন্নদামঙ্গল কাব্যের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যুবতী স্ত্রীদের নিয়ে কামমদমত্ত থাকার জন্য দেবী নলকুবেরের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে কোনোরকম আপদ বিপদের কথা চিন্তা না করেই সে দম্ভভবে জবাব দেয় —

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে

কার পূজা করে কেটা।।
এ সুখযামিনী এ নবকামিনী
এ আমি নবযুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেনো বক।।[১৪৮]

দেবীর সঙ্গে নলকুবেরের রসিকতা ভারতচন্দ্রের বিশিষ্ট কবিস্বভাব এবং যুগ পরিবর্তনের স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।। দেবীকে অস্বীকার এবং নলকুবেরের ভোগবাসনাপূর্ণ নৈশবিহার দেখে মনে হয়, আধ্যাত্মিকতার আতিশয্যপূর্ণ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে সেক্যুলার মনোভাবের খোলা রাস্তায় নামছে মানুষ। ঠাকুরের মানুষালি নিয়ে তামাসা করার আয়োজনে ত্রুটির অভাব থাকছে না এতটুকু। রামেশ্বরের হাতে শিবের দৈবীখোলস প্রথম অনাবৃত হতে শুরু করেছিল ঠিকই, তবু সম্ভ্রমের আড়াল একটা ছিলই। কিন্তু যুগ যত এগিয়েছে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের প্রকোপে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ততই দেবতাকে ব্রাত্য করে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত যুগপরিস্থিতিতেই ভারতচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন অন্তঃসারশূন্য একদল অতি-মানুষ চরিত্র। প্রথমেই নাম করতে হয় শিবের। স্যাটায়ারের চাবুকে তাঁর চরম হেনস্থা ঘটিয়েছেন কবি। ভূতপ্রেত সহযোগে শিবের বিবাহযাত্রায় —

এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া
হর লয়ে মুনি যায়।
প্রেত-ভূতগণ ধায় অগণন
আন্ধার কৈল ধূলায়।।
... ...
হিমগিরিরাজ করিয়া সমাজ
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ।।[১৪৯]

বিবাহসভায় দিগম্বর জামাই দেখে ভাবী শাশুড়ীসহ পড়শীদের খেদোক্তিতে -

আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল।।
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে।
কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ীর কাছে।।
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়।।

আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে।।[১৫০]

ভিক্ষারত শিবকে ঘিরে গ্রাম্য বালকদের দৌরাত্ম্যে —

দূর হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা।।
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।।[১৫১]

সর্বোপরি গৌরীর দাম্পত্য কলহে —

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া।।
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন।।[১৫২]

কোথায় হারিয়ে গেছে স্বর্গীয় দম্ভ আর লালিত্য; বরং নির্লজ্জ বুভুক্ষায় বেশীরকমের শ্রীহীন হয়ে পড়েছেন শিব। তাই অন্নদার কাছে ভিক্ষালব্ধ অন্নভক্ষণ কালে তাঁর আগ্রাসী ক্ষুধা কোনো দৈবীসংযমের শাসন মানেনি। আসলে ইহসচেতন ভারতচন্দ্রের কাছে ধর্মের ভড়ং আর ভণ্ডামি ধরা পড়েছে। সর্বহারা যুগের তাগিদে ধর্মের জাঁক ঘুচিয়ে অভ্যন্তরের কঙ্কালটাকে তিনি ছুঁয়ে দেখেছেন।

মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রজ্ঞাঘন মূর্তিকে তছনছ করে দিয়ে ভারতচন্দ্র আরও একবার প্রমাণ কবলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক রুচি বিকারগ্রস্ত। তারই ফলশ্রুতিতে পৌরাণিক যুগের স্থিতধী মুনিশ্রেষ্ঠ সমন্বয় বুদ্ধিকে অনায়াসে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়ে হরিহরে প্রভেদ ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, স্বার্থক্লিষ্ট যুগের প্রভাবে ব্যাসদেব নিজের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ামাত্রই ইষ্ট দেব-দেবীকে লাঞ্ছিত করতেও এতটুকু দ্বিধা করলেন না। যেমন ব্যাসকাশী নির্মাণের তাগিদে একদা যে গঙ্গাকে তিনি আপ্লুত কণ্ঠে আরাধনা করেছিলেন—

তুমি নারায়ণী পতিতপাবণী
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি প্রকাশহ কাশী
তারহ সঙ্কট ঘোর।।[১৫৩]

তাঁরই অপযশে মুখর হয়ে উঠলেন স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে —

পুরাণে বর্ণিনু যেই পুণ্যতীর্থ হল্যে তেঁই
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত।।
* * * *
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ জাতিকুল নাহি বাছ
রূপগুণ যৌবন না চাও।
মা বলিয়া সেবাদেই ক্ষীরপান করে যেই
পতি কর কোলে মাত্র পাও।।
শাপ দিয়া করি ছাই অথবা গণ্ডূষে খাই
ব্রাহ্মণের তোর অল্পজ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই ব্রহ্মাতেজ জানে সেই
অগস্ত্য করিয়াছিল পান।।[১০৪]

বিশ্বকর্মার সঙ্গে আচরণেও ব্যাসের একই মানসিকতা। সুতরাং শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যের দৈবী প্রেক্ষাপটটির দিকে তাকালে বোঝা যায়, এতদিনের একপেশে ধর্মবিশ্বাসে রীতিমত ফাটল দেখা দিয়েছে।

এই ধর্মীয় অস্থিরতার রেশ ছড়িয়ে গেল পরবর্তী সাহিত্য- প্রজন্মের মধ্যেও। রাধাকান্ত মিশ্র দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে এবং রামানন্দ ঘোষ সরাসরি দৈবানুগ্রহ ও ঈশ্বরোপাসনার অসারত্ব ঘোষণা করলেন। যেমন - 'শ্যামার সঙ্গীত' গ্রন্থে রাধাকান্তের উক্তি —

আর এক নিবেদন শুন মহাজন প্রাচীন কবির সম কৈরাছি রচন।
কেহো কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ কেহো কহে দিলা দেখা ধরি নিজবেশ।
কেহো বলে জিহ্বাতে কবিতা দিলা লিখি কেহো কেহো বলে আমি স্বপনেতে দেখি।
যে পদ ধিয়ান করি না পান বিধাতা মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথা।
কেমনে এমন কথা লইয়ে হিয়ায় কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়।
বেদে বলে ভকতবৎসলা মহামায়া কে জানিবে কেমন কাহার তরে দয়া
আপন সম্বাদ বলি সপুট বিনয় ভজিলে তাঁহার নাম ভক্তি উপজয়।[১০৫]

আর রামানন্দ ঘোষ তাঁর রামায়ণ অনুবাদে (লঙ্কাকাণ্ড, ৭ পত্র) মন্তব্য করেছেন —

দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল।।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ।।

সৎকার্য্যে বিকার্য্য হৈল কবি নিবেদন।
করিতে না পারি আব ভৌতিক সেবন।।[৮৮]

সমসাময়িক কালের (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) আর এক কবি, 'চণ্ডীমঙ্গল' বচযিতা বামানন্দ যতিও ধর্ম সম্পর্কে অনাস্থাবাদী —

অধর্ম্মেতে তিনপাদ এক পাদ ধর্ম্ম।
চারিবর্ণ এক হবে সদাপাপ কর্ম্ম।।[৮৯]

এই অনাস্থা আর সংশয়ই অষ্টাদশ শতাব্দীব ধর্মীয় অবস্থাব শেষতম সিদ্ধান্ত।

সুতবাং দেখা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় চেতনা বৈচিত্র্যময়। পৌবাণিক ঐতিহ্য স্বীকবণের প্রবণতায়, সংঘাত আর সমন্বয়ের মানবিক দ্বৈধতায়, সর্বোপরি একপেশে ধর্মবুদ্ধির প্রতি সন্দিগ্ধতায় সেই বিচিত্র চেতনার বহুমুখ উৎসাবণ ঘটেছে। বিশেষ করে প্রাক্-বেণেসাঁস মুহূর্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম প্রহরে দৈবী-অনাস্থার মধ্য দিয়েই ব্রাহ্মমুহূর্তের আহ্বানে গাঢ় সুষুপ্তি কাটিয়ে আচ্ছন্ন বাঙালীর হৃদযে এক সুদৃঢ় শপথ প্রোথিত হয়ে গেছে। আসন্ন ঊষাকালে মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় নতুন মন্ত্র সংগীতের স্পষ্ট আলাপনে যে শপথের পরিপূর্ণতা।

উল্লেখপঞ্জী

১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ১৫৫।
২) মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ১৯৬৫, ভূমিকা, পৃ: ১/৯-১।।/
৩) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৪, পৃ: ৬১,৭১।
৪) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ১৩৯৯, পৃ: ৮-৯।
৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, ১৯৮৮, পৃ: ১৮৭-১৮৮।
৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৯৪, পৃ: ৫-১০।
৭) বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১৪০২, পৃ: ১৮/ ১॥/০
৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ১৫৮ ১৫৯।
৯) তদেব, পৃ: ৪১২-৪১৩।
১০) মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ১৯৬৫, ভূমিকা, পৃ: ১/ ৯ ১।।/.
১১) বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৪, পৃ: ৬১।
১২) তদেব, পৃ: ৬৪।
১৩) শিবপ্রসাদ হালদার, পৃ: ১৩-১৪।
১৪) বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৯৮, পৃ: ১৮৩-১৮৪।
১৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯১, পৃ: ১১০ ১১১।

১৬) গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৯৮, পৃ: ১৮৪।
১৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ১৯৯৪, পৃ: ৬২১।
১৮) শিবপ্রসাদ হালদার, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য, ১৯৮৩, পৃ: ১৩-১৪।
১৯) তদেব, পৃ. ১২।
২০) বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৩৯৪, পৃ: ১।
২১) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৯৯, পৃ: ৮-৯।
২২) তদেব পৃ. ৯।
২৩) তদেব, পৃ: ১০।
২৪) শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা, ১৩৬৩, পৃ: ৩৭-৩৮।
২৫) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৯৯, পৃ: ১।
২৬) দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ সম্পাদিত, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত উপনিষদ্, ১৯৮৩, পৃ: ৫।
২৭) শ্রী বিজিত কুমার দত্ত ও শ্রী সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ২৩।
২৮) তদেব, পৃ: ২৩।
২৯) তদেব, পৃ: ২৩।
৩০) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৯৯, পৃ: ২২৩।
৩১) অরুণকুমার বসু, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৯৯২, পৃ: ৫২।
৩২) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৯১৩, পৃ: ৯০-৯১।
৩৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৯৩-৯৪।
৩৪) তদেব, পৃ: ৯৪।
৩৫) তদেব, পৃ: ৯৪।
৩৬) তদেব, পৃ: ৯৫।
৩৭) তদেব, পৃ: ৯৩।
৩৮) তদেব, পৃ: ৯৭।
৩৯) তদেব, পৃ: ৯৩।
৪০) তদেব, পৃ: ৯৭।
৪১) তদেব, পৃ: ৩৩৩।
৪২) বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ: ৪২-৪৩।
৪৩) হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃ: ২৩৫।
৪৪) তদেব, পৃ: ২৩৫।
৪৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৪১-৩৪২।

৪৬) তদেব, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯।
৪৭) তদেব, পৃ: ৩৫৯।
৪৮) তদেব, পৃ: ৩৬০।
৪৯) তদেব, পৃ: ৩৬১।
৫০) বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্যচরিতের উপাদান, ১৯৩৯, পৃ: ৩১৫।
৫১) আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ: ৮১।
৫২) তদেব, পৃ: ৮১।
৫৩) সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৯৭৩, পৃ: ৩৫।
৫৪) সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ: ১১৮।
৫৫) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৩, পৃ: ৪৪।
৫৬) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৯৯, পৃ: ১৫১।
৫৭) তদেব, পৃ: ১৫২।
৫৮) তদেব, পৃ: ১৫২।
৫৯) তদেব, পৃ: ১৫২।
৬০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১১৫।
৬০ (ক) তদেব, পৃ: ১১৯।
৬১) তদেব, পৃ: ১৩০।
৬২) তদেব, পৃ: ৩৪৩।
৬৩) তদেব, পৃ: ৩৪০-৩৪১।
৬৪) তদেব, পৃ: ৩৪৩।
৬৫) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ১১৪-১১৬।
৬৬) তদেব, পৃ: ১১৬।
৬৭) তদেব, পৃ: ৩১০।
৬৮) তদেব, পৃ: ১১৮।
৬৯) তদেব, পৃ: ৩২২।
৭০) তদেব, পৃ: ৩৩৫।
৭১) তদেব, পৃ: ৩৩৫।
৭২) অরুণকুমার বসু, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৯৯২, পৃ: ৮।
৭৩) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, ১৩৯৯, পৃ: ২১০-২১১।
৭৪) অরুণকুমার বসু, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৩৯২, পৃ: ৯৩।

৭৫) তদেব, পৃ: ৬৪।

৭৬) তদেব, পৃ: ৮৬।

৭৭) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৭০৬।

৭৮) তদেব, পৃ: ৭০৬।

৭৯) তদেব, পৃ: ৭০৬-৭০৭।

৮০) তদেব, পৃ: ৭০৭।

৮১) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, ভূমিকা, পৃ: ২৬৩।

৮২) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৫১।

৮৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩৩৮।

৮৪) তদেব, পৃ: ৩৩৭।

৮৫) তৃপ্তি ব্রহ্ম, মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির, ১৯৯৪, পৃ: ২২।

৮৬) তদেব, পৃ: ২৪।

৮৭) শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই-দেশ-কাল এবং শিল্প, ১৯৯৫, পৃ: ১৬।

৮৮) তৃপ্তি ব্রহ্ম, মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির, ১৯৯৪, পৃ: ৩০।

৮৯) তদেব, পৃ: ২৫।

৯০) তদেব, পৃ: ২৯।

৯১) তদেব, পৃ: ৪০।

৯২) তদেব, পৃ: ৪১।

৯৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩১৯।

৯৪) তদেব, পৃ: ২৯১

৯৫) তদেব, পৃ: ৩১২।

৯৬) এস. এম লুৎফর রহমান, লালন জিজ্ঞাসা. ১৯৮৪, পৃ: ৭।

৯৭) অরুণকুমার বসু, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৯৯২. পৃ: ১৩৪।

৯৮) তদেব, পৃ: ১৩৪।

৯৯) তদেব, পৃ: ২৮।

১০০) এস. এম লুৎফর রহমান, লালন জিজ্ঞাসা, ১৯৮৪, পৃ: ১৩০।

১০১) তদেব, পৃ: ৭।

১০২) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩১৯।

১০৩) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃ: ৬৭৮।

১০৪) তদেব, পৃ: ৫৬৭।

১০৫) অরুণকুমার বসু, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৯৯২, পৃ: ১৩৫।

১০৬) তদেব, পৃ: ৯৩।

১০৭) ওয়াকিল আহমদ, মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা, ১৯৯৪, পৃ: ৬৬-৬৭।

১০৮) খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত লালন সাহিত্য ও দর্শন, ১৯৭৬, পৃ: ৯৪।

১০৯) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, ১৯৮৪, পৃ: ৩১০।

১১০) তদেব, পৃ: ৯৭।

১১১) তদেব, পৃ: ২৪৮।

১১২) Obscure Religious Cults, 1995, P.127-128.

১১৩) অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, ১৯৯৪, পৃ: ১৭৮।

১১৪) তদেব, পৃ: ১৭৯।

১১৫) খন্দকার মুজাম্মিল হক, মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্রকথা, ১৯৮৭, পৃ: ২৪।

১১৬) তদেব।

১১৭) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ৯৩৩।

১১৮) দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ: ৮৯২।

১১৯) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, ১৯৮৪, পৃ: ২৫০।

১২০) তদেব, পৃ: ৩৩৮।

১২১) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ: ৫২৭।

১২২) দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৮৯৪।

১২৩) সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০, পৃ: ৭১।

১২৪) তদেব, পৃ: ৭০-৭১।

১২৫) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫১৬।

১২৬) তদেব, পৃ: ৫১১।

১২৭) তদেব, পৃ: ৫১৩।

১২৮) তদেব, পৃ: ৫২৩।

১২৯) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৩-৪।

১৩০) বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট, ১৯৯৩, পৃ: ৭০।

১৩১) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ২৭৬।

১৩২) তদেব, পৃ: ২৭৭।

১৩৩) তদেব, পৃ: ২৭৮।
১৩৪) সায়ের মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেব, সত্যপীরের পুথি, মদনকামদেবের পালা, ১৩৫৬, পৃ: ২।
১৩৫) তদেব, পৃ: ৭।
১৩৬) তদেব, পৃ: ১২।
১৩৭) তদেব, পৃ: ৬।
১৩৮) সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০, পৃ: ৯২।
১৩৯) তদেব, পৃ: ৯২-৯৩।
১৪০) নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, (পরিশিষ্ট), ১৯৮৮, পৃ: ৩৮৯।
১৪১) পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৮৮।
১৪২) তদেব, পৃ: ১৭১-১৭২।
১৪৩) তদেব, পৃ: ৪০০-৪০১।
১৪৪) কবি ভারতচন্দ্র, ১৩৮১, পৃ: ২২৭।
১৪৫) তদেব।
১৪৬) তদেব।
১৪৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৭৪।
১৪৮) তদেব, পৃঃ ১৭৫।
১৪৯) তদেব, পৃ: ৫১-৫২।
১৫০) তদেব, পৃ: ৫৮।
১৫১) তদেব, পৃ: ৮১।
১৫২) তদেব, পৃ: ৭৪।
১৫৩) তদেব, পৃ: ১৩৬।
১৫৪) তদেব, পৃ: ১৩৯।
১৫৫) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ: ৪৩২।
১৫৬) নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৪৩।
১৫৭) অনিলবরণ গাঙ্গুলী সম্পাদিত রামানন্দ ঘোষের চণ্ডীমঙ্গল, ১৯৬৯, পৃ: ৩৯১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন

প্রাচীনকালে বিদ্যাশিক্ষা ছিল ধর্মচর্চারই একটি অঙ্গ। মধ্যযুগে পদার্পণ করেও সেই উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হয়নি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষাব যোগ তখনও অবিচ্ছেদ্য ছিল। এই কারণেই টোল, চতুষ্পাঠী, মক্তব বা মাদ্রাসাগুলোকে সেকালের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা শাস্ত্রীয় সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীব শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধর্মমনস্কতা তো ছিলই, উপরন্তু তাব উপরে পড়েছিল রাজনৈতিক পালাবদলজনিত অস্থিরতাব প্রভাব। ক্রান্তিকালের এই শতাব্দীতে পুরোনো রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে ব্যাপক অবক্ষয়ের সুযোগে বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। কারণ স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদেব অভিরুচির উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেনতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদের টিকে থাকাব সংগ্রামেই বেশী ব্যস্ত থাকায় জ্ঞান-চর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় আদৌ আগ্রহী হননি। জ্ঞান চর্চা ও মননশীলতার এই শূন্যগর্ভ ময়দানে বসে কোনো মৌলিক সৃষ্টিশীলতার, কিংবা শিক্ষা বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার স্বপ্ন দেখাও বাতুলতা। আর সেইকাবণেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিজেব নিজের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার বাঁধাধরা গণ্ডিতে ঘুরপাক খেতে বাধ্য হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্বযুগের তুলনায় চমকপ্রদ কোনো স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার ধারাটি এ শতাব্দীতেও বজায় আছে। তবে তক্ষশীলা বা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য কিংবা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষা অনুপস্থিত থাকলেও মোটামুটি একটা নিয়মানুবর্তিতা বজায় ছিল। আর এই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার মূলে ছিল বিদ্যোৎসাহী নবাব, অভিজাত এবং জমিদারদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা।[১]

রাজন্যবর্গ কর্তৃক স্থানীয় কবিদের প্রেরণাদানের নজির ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রচুর মেলে। যেমন - রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন কাব্য রচনার অনুপ্রেরক বর্ধমানের নবপতি যশোবন্ত সিংহ।[২] দ্বিজ ভবানীর রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নোয়াখালিব জমিদার জয়চন্দ্র। কথিত আছে, ইনি প্রাত্যহিক দশ টাকা হিসাবে কবিব মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত আছে রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরে। কবির ধনী বান্ধবরূপে তাঁর নাম একাধিক বার স্মরণ করেছেন কবি। দেবীব কাছে কৃপা প্রার্থনাও করেছেন তাঁর জন্য।

শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট সুতজ্ঞানে
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে।
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মোহান্ধের ঔষধ রঞ্জন।[৩]

সুকুমার সেন বলেছেন, "মনে হয় এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলির দেওয়ান। ভূকৈলাসের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা পথে তীর্থযাত্রা করেন তখন হুগলিতে ইঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে আহার করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলে বিজয়রাম বলিয়াছেন।"[৪]

সর্বোপরি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলোড়ন তুলেছিল নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্যোৎসাহিতার কথা। তাঁর শিক্ষানুরাগ শুধু জমিদারির চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাক্‌লার পণ্ডিতেরা তাঁর অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জমিদারির মধ্যে সংস্কৃত টোল ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য তিনি নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। এছাড়া প্রতি মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নবদ্বীপে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আগত বিদেশী ছাত্রদের জন্য অন্তত দু'শ টাকা করে অনুদান ধার্য করেছিলেন। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষণেই বিরচিত। কবি ভারতচন্দ্র কাব্যের উপক্রমণিকায় সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন --

কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া।।[৫]

কে. কে. দত্তের 'Studies in the History of Bengal Subah' গ্রন্থে এই ক'জন শিক্ষানুরাগী রাজার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস আরো বেশ কয়েকজন গুণগ্রাহী নৃপতির গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করছে। যেমন - বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র এবং পরবর্তী তেজচন্দ্র বা তিলকচন্দ্র।

ঘনরাম চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন —

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি   মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি   কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।[৬]

অন্যদিকে অকিঞ্চন চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এনেছেন তেজচন্দ্রের প্রসঙ্গ —

ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন।।[৮]

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বীরভূমের রাজনগরের আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের রাজ-পরিবারের গুণকীর্তন করা হয়েছে।[৯] কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর ভারত পাঁচালীতে আবার বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্য সিংহের প্রেরণার প্রসঙ্গ আছে।[৮] এই গোপালসিংহ এবং বিষ্ণুপুর রাজবংশের শেষ রাজা চৈতন্যসিংহ দুজনেই আবার রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদও রচনা করেছিলেন।[১০]

বস্তুত বঙ্গভূমির রাজন্যেরা শুধু টাকা ব্যয় করেই ক্ষান্ত হতেন না। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভালভাবে পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত উদ্‌যোগও নিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিক অবস্থার খোঁজখবর নিতেন। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' এর সাক্ষ্য দেয়।[১১]

যে সমস্ত রাজার কথা বলা হল তাঁরা সকলেই ছিলেন আঞ্চলিক নরপতি, এবং এঁদের দ্বারা হিন্দুদের শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু দেশের শাসক তখন মুসলমান। এঁরা হিন্দুর বিদ্যা শিক্ষা বা জ্ঞান প্রসারে ততখানি মনোযোগী হননি, যতটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন মুসলমানদের শিক্ষাচর্চায়।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ যথেষ্ট বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সৈয়দ গোলাম হোসেনের মতে, তখন বহু জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য জ্ঞানচর্চাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১২] নবাব শুজাউদ্দিনও বিদ্বান ব্যক্তিদের কদর করতেন। নবাব আলিবর্দী খানের দরবারে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাগম হত। এঁদের সঙ্গে নবাব আনন্দে সময় অতিবাহিত করতেন। এঁরা হলেন, মৌলবী মোহাম্মদ আরিফ, মীর রুস্তম আলি খান, শাহ মোহাম্মদ আমিন, শাহ হায়াত বেগ, শাহ আদম, সৈয়দ মীর মোহাম্মদ সাজ্জাদ, ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের পিতামহ আলিমুল্লাহ, শাহ হায়দরী ও মুর্শিদাবাদের কাজি গোলাম মোজাফফর প্রমুখ।[১৩]

এই যে জ্ঞানী-সংবর্ধনা ও জ্ঞানানুরাগ তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার একটি উজ্জ্বল দিক। নবাব আলিবর্দী যেভাবে তাঁর দরবারকে বিদগ্ধমণ্ডল করে গড়ে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনি জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাগৃহ। তাঁর সভাসদদের মধ্যে হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্বভৌম

ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। প্রাণনাথ ন্যায় পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতি ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন ছিলেন ষড়দর্শনে ভূয়সী পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন জ্যোতির্বিদ রামরুদ্র বিদ্যানিধি। তাঁর জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম 'সারসংগ্রহ'। বিজয়রাম সেন তাঁর 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যের 'ত্রিবেণীগঞ্জ হইতে নদীয়াযাত্রা' অংশে রামরুদ্রের নামোল্লেখ করেছেন।[১১] আর এঁদের সঙ্গে সভাকবির স্থান অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতচন্দ্র রায় ও বাণেশ্বর রায়। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশে সভাসদদের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১২] ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি রামপ্রসাদ সেনও কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

পশ্চিমবাংলায় যেমন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ববঙ্গে তেমনি রাজবল্লভ রায় হিন্দুদের শিক্ষা সংস্কৃতিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি রাজনগরে চতুষ্পাঠী, টোল, মক্তব এবং পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষার প্রসারে যত্নবান হন। রাজনগরের মেধাবী ছাত্রদের তিনি নবদ্বীপে উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে তিনজন - নীলকণ্ঠ সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত কৃতি হয়ে রাজনগরে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য টোল খুলেছিলেন এবং পণ্ডিত হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। রাজবল্লভের দরবারে সংস্কৃত ভাষার দিক্‌পাল রায়নারায়ণ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী অবস্থান করতেন।

কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনীষার অভাব ছিল এমন কথা কোনোমতেই বলা যাবে না। উপরন্তু ছিল রাজানুকূল্য। ফলে প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এই শতাব্দীতে শিক্ষার সার্বজনীন রূপটি খুব একটা আশার ছবি দেখায় না। পুরাতনের অনুবর্তনে কোনোরকমে টিকে থাকার ইচ্ছাই সেখানে মুখ্য। এর কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, শিক্ষাবিস্তারে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অভাব, এবং দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদরদী আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রাধান্য। এঁরা সার্বজনীন শিক্ষার চেয়ে বেশী নজর দিতেন অনুগৃহীত কবি-পণ্ডিতদের সমাদরে এবং তাঁদের দিয়ে নিজস্ব রুচি-মাফিক কাব্য রচনা করিয়ে নেওয়ায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) হিন্দুদের পাঠশালা এবং হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের জন্য মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তোলাবখানা।

খ) মুসলমানদের নিজস্ব প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মক্তব এবং উচ্চশিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসা।

গ) হিন্দু ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা বা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ও টোল।

পাঠশালা সমূহে শিক্ষা দেওয়া হত অক্ষর পরিচয়, ফলা বানান, যুক্তাক্ষর ও লিখন প্রণালী। দলিল কবলাদি লেখাও শেখানো হত। এছাড়া অঙ্ক বিভাগে থাকত শঠকে, কড়াকে, গণ্ডাকে, বুড়িকে, সেরকে, মনকে, নামতা, সইয়ে, আড়াইয়ে, তেবিজ, জমাখরচ, গুণ, ভাগ, বাজার দরকষা, সুদকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি, পুষ্করিণী কালি, ইটের পাঁজাকালি ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যবহারিক বিষয়। আসলে সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিকে অঙ্ক শেখানো হত। বঙ্গভূমিতে মুখে মুখে অঙ্ক শেখানোর রীতির স্রষ্টা ছিলেন শুভঙ্কর (ভৃগুরাম দাস)। এছাড়া ছিলেন শিবরাম। এঁদের রচিত মানসাঙ্কের ছড়া ও আর্যাগুলি পাঠশালায় ছাত্রদের কণ্ঠস্থ করতে হত।[১৮] শুভঙ্কর এবং শিবরামের দু'টি আর্যা এখানে উদ্ধৃত হল—

(১)

জমাবন্দির আর্যা (শুভঙ্কর)

জমি বিঘা যত তঙ্ক করিবে বর্ণন।
তঙ্কা প্রিতি ষোল গণ্ডা কাঠাঅ ধরন।
জত আনা তত গণ্ডা পাই প্রিতি রট।
গণ্ডা প্রিতি ষোল তিল জানি অকপট।
কড়া প্রিতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে।
জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে।[১৯]

গণ্ডা কোড়ির আর্যা (শিবরাম)

কাহনে লইবে গণ্ডা করিআ জতন।
পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ।
গণ্ডায় লইবে তিল কড়াঅ ধুল হঅ।
এইমত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কঅ।[২০]

এইসব আর্যায় শুধু অঙ্কের নীরস বৌদ্ধিক চিন্তাই প্রকাশিত হয়নি, আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোথাও কোথাও তা সাহিত্যরসের দ্বারা নিষিক্ত করে তোলা হত। 'গণিত পদাবলী'তে বিধৃত একটি আর্যা এইরকম —

সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ।
দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাত।।
বিরহে ব্যাকুল চিত না শুনে বারণ।
নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণ ধন।।
তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত।

দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছাগত।।
বাগ বসবান বসু একত্র করিয়া।
গরাসি তেজিবে প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া।।[১৯]

সমালোচকের ভাষায় এটি অঙ্ক শেখানোর 'শর্করা মাখানো পদ্ধতি'।[২০] কেননা প্রকৃত অঙ্কের সমস্যাকে এখানে বৈষ্ণব পদকর্তার পদ বলে মনে হচ্ছে। দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন ---

"এইরূপ আর্য্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের জানা আছে - কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিদ্যা যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও অপরিহার্য্য, তাহা একবারে নষ্ট হইবে।

গণিতের অনেক সূত্র নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের কাগজ-কলম লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া অঙ্ক কষিতে হইত না। তাহারা অতি জটিল হরণ পূরণ, ও বাজার দরের সূক্ষ্মতম হিসাব মুখে মুখে করিতে পারিত।"[২১] পাঠশালা ও মক্তব উভয় স্থানেই এই ধরণের গণিতচর্চার রেওয়াজ ছিল।

বস্তুত এই সময় পড়া-লেখার জন্য মুদ্রিত বই বা শ্লেট ছিলনা। ছাত্ররা তাল বা কলার পাতা লেখার জন্য ব্যবহার করত। মাটিতে বালি ছড়িয়ে তার উপরে আঙুল দিয়ে লেখার প্রথা ছিল, খড়ি দিয়ে মাটিতেও লেখা হত। শিক্ষকেরা অনেক সময় ছোট ছোট পাথরের টুকরো অথবা সামুদ্রিক শঙ্খ দিয়ে গণনা শিক্ষা দিতেন।

এই সব পাঠশালায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হতেন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বর্ণের কোনো ব্যক্তি। জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা গুরু মহাশয়ের কুটিরে পাঠশালা বসত। চাটাই বা মাদুরে ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা হত। আবহাওয়া ভাল থাকলে গাছতলাতেও পাঠশালা বসত। সমাজে শিক্ষকের আসন ছিল পূর্ণ সম্ভ্রমের। ছাত্ররা কড়ি দিয়ে তাঁদের বেতন দিত। আর ফসল ওঠার সময় গুরু মহাশয় দক্ষিণা হিসাবে ফসলের একটা সামান্য অংশ পেতেন।

একই সঙ্গে মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র মকতবের কথাও বলে নেওয়া যায়। এখানে মুসলমান পড়ুয়াদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল নামাজ ও অজু। এছাড়া কোরাণ মুখস্ত করা এবং হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও ছিল শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি। তবে এদেশের মুসলমান ছাত্ররা আরবির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি এবং দেশীয় ভাষা বাংলা শিক্ষার ওপরেও গুরুত্ব দিত। তোলাবখানায় এই ধরণের শিক্ষা প্রচলিত ছিল।

শেখমনোহর রচিত 'শমসের গাজীনামা'য় এর সমর্থন পাই —

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরাণ পড়াএ সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলবী আনিল
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
যুগাদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গলার বাণী।
ঢাকা হৈতে মুনশী আনি ফরাসী পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।[১২]

আসলে সেকালে ধর্মীয় বিধিসূত্রেই গুরু-ওস্তাদের অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তার রেশ আজো অনুভূত হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে। পণ্ডিত, মৌলবী, মুনশী, ওস্তাদ, মোল্লা, খোন্দকার প্রমুখেরা গ্রামের উৎসব পার্বণ বিবাহের শাস্ত্রীয় অংশ সম্পন্ন করতেন। তাছাড়া মুরগী জাবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজার ইমামতি এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের ও ইমামের কাজও তাঁদের দ্বারা নিষ্পন্ন হত —

মোল্লা পড়ায়া নিকা দানপায় শিক শিকা
দোয়া করে কলেমা পড়িয়া।।
করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দানপায় কড়ি ছয় বুড়ি।।[১৩]

এবার ছাত্রশাসন-পদ্ধতির প্রসঙ্গ। সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বালক কিশোর শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিলনা। ছাত্ররা শিক্ষকের চোখে ছিল নেহাৎই ক্ষুদ্রমানের। ফলে বেত্রাঘাতকেই তাঁরা শিক্ষাপ্রদানের একমাত্র উপায় বলে ধার্য করেছিলেন। এক কথায় এই শাস্তি ছিল প্রায় অমানুষিক। দয়ানন্দ তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন -

শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে।
মারিয়া বেতের বাড়ি এ ঠেঙ্গা করে।।
কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়।
উচিত করএ শাস্তি যে দিন যে হয়।।[১৪]

যাহোক, হিন্দু বালকদের 'হাতে খড়ি' আর মুসলমান বালকদের 'বিসমিল্লাহখানি' অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে মোটামুটি চার-পাঁচ বছর বয়সে তাদের শিক্ষা আরম্ভ হত। লাউসেনের বিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে কবি ঘনরাম জানিয়েছেন, প্রাথমিক স্তরে প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর যুক্তাক্ষব ও বানান শিক্ষার প্রথা ছিল। ব্যাকবণ, অঙ্কও বাদ যেত না —

অকাবদি ক কারান্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষ কারান্ত হল বর্ণাপর।।
অভিলাষে আঙ্ক আস্ক ফলাদি বানান।
তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান।।
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবন্ত অনর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর।।
ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর।।[২৫]

অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বেদাধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল।[২৬]

আবার মাণিকরাম গাঙ্গুলী জানিয়েছেন, একজন গুরু দশ বার দিনের মধ্যেই একজন শিক্ষার্থীকে বর্ণপরিচয়সহ লেখা শেখাতে সক্ষম হতেন।[২৭]

আর এই প্রাথমিক শিক্ষান্তে শিশু পড়ুয়া আত্মচরিত্র গঠনের এবং সামাজিক ব্যবহার-বিধির জ্ঞান লাভ করত। পাঠশালায় এই জাতীয় উপদেশ দানের কথা পাই দ্বিজ দুর্গারামের 'শিশুজ্ঞানচরিত্র' পুস্তিকায়। সেখানে অক্ষর শেখার পর বানান শিক্ষা, তারপর অঙ্ক, আস্ক, কড়ির অঙ্ক, সটকে, বুড়িকে, গুনকে, টোকে শেখার পর শিক্ষক ছাত্রকে উপদেশ দেন—

মাতা পিত্যার বার্ক্য কেহ না করিবে হেলন।
পিত্যামাতা মহাগুরু জানি করিবে স্যেবন।।
ব্রাহ্মণ দেখিলে সভে হবে দণ্ডবত।
অবোহেলে এড়াইবে ষমনের পত।।
বৈষ্ণব দেখিলে সভে হবে দ্রঢ়ভক্তি।
বৈষ্ণব কবিলে দআ হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।।
পড়ুআ পড়ুআ দন্দ্ব না করিহ কেহ।
মনে করো সকলে হইবে একগ্রহ।।[২৮]

হিন্দু ছাত্ররা এরপব সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে টোল এবং চতুষ্পাঠীতে গমন করত। শিক্ষক হিসাবে এখানে ব্রাহ্মণদেরই একাধিপত্য ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার বিষযক্রম ছিল তিন শ্রেণীর —

ক) ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য (কবিতা ও নাটক), অলঙ্কার শাস্ত্র ও পুরাণ।

খ) আইন - 'দায়ভাগ', 'মিতাক্ষরা' ও 'প্রাচীন স্মৃতি', 'শ্রদ্ধাচিন্তামণি' (রচয়িতা মিথিলার বাচস্পতি মিশ্র), এবং নদীয়ার রঘুনন্দন রচিত আইন শিক্ষার গ্রন্থ।

গ) ন্যায়শাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা। এই পর্যায়ের অধিবিদ্যার জন্য বাংলার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং বঙ্গীয় পণ্ডিতদের তা গর্বের বিষয় ছিল।

নদীয়া ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। শান্তিপুর ও গোপাল পাড়ায় তার শাখা ছিল। আর এই নদীয়াতেই ন্যায়শাস্ত্রের দুটি প্রধান শাখার জন্ম হয়েছিল - যাদের প্রধান হলেন বাসুদেব সার্বভৌম এবং তাঁর ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি।

রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সংস্কৃত ভাষাসাহিত্য চর্চায় পরিচয় পাওয়া যায় সুন্দরপুত্র পদ্মনাভের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে।[৯]

মাণিকরাম গাঙ্গুলীও অনুরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন —

ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ শত শত।।[১০]

ভারতচন্দ্রও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের তার্কিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের শেষ শাস্ত্র বেদান্ত।[১] আসলে এই সময় উচ্চমানের যে কোনো সাহিত্য-সভায় সংস্কৃত, দর্শন ও সাহিত্য আলোচনাই ছিল একমাত্র উপজীব্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যোৎসাহী ছাত্ররা বঙ্গভূমিতে আসত উচ্চশিক্ষার পাঠগ্রহণ করতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া, শান্তিপুর, বর্ধমান, বিক্রমপুর এবং চট্টগ্রাম জ্ঞানচর্চার উন্নত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র রায় এবং রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে বর্দ্ধমান শহরের উল্লেখ পাওয়া যায় —

পরম পবিত্র রাজ্য পরস্পর পুণ্যকার্য্য
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক।।[১২]

আবার ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'সুরিক্ষাপালা'য় নদীয়ার উল্লেখ পাই, নদীয়া থেকে পণ্ডিত এনে সুরিক্ষা তার গোলাহাট নগরকে সমৃদ্ধ করেছিল —

বিদ্যা পড়িবার তরে না কর ভাবনা।
নদ্যা হতে পণ্ডিত এসেছে কতজনা।।[৩৩]

হিন্দুদের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সংস্কৃত হলেও বৈষয়িক উন্নতির জন্য তাদের আরো কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করতে হত। এগুলি হল - বাংলা, নাগরী, ফারসী, উৎকল প্রভৃতি। দয়ারামের 'সারদামঙ্গল' কাব্যে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে—

চারিশাস্ত্রে সমুদয় পড়াবে সকল।
নাগরি ফারসী কিংবা বাঙ্গালা উৎকল।।[৩৪]

মুঘল আমলে সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। সামাজিক তথা রুজি রোজগারের তাগিদে তাই ফারসী জানার প্রয়োজন ছিল। তখন সুবাহ্ বাংলা গঠিত হয়েছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে। স্বভাবতই চাকরি পেতে সংস্কৃত নয়, বরং বাংলা, হিন্দুস্তানী (নাগরী), উৎকল ও রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসী জানা আবশ্যিক ছিল। সেকারণেই নাবালক অবস্থায় পিতৃহীন নরসিংহ বসুকে তাঁর পিতামহী সযত্নে পরিবর্ধিত করেছিলেন এবং সেকালের একজন গণ্যমান্য কায়স্থ ভদ্রলোকের মতই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন যুগোপযোগী ভাষা শিক্ষা দিয়ে।[৩৫] ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর কবি প্রভুরাম মুখোপাধ্যায় ও গৌড় দরবারের বর্ণনায় সেকালের কায়স্থদের লেখাপড়ার সামান্য আভাস দিয়েছেন যাতে নরসিংহ বসুর আত্মকাহিনীর সমর্থন আছে।[৩৬]

অন্যদিকে নিজের অধিগত বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র রায় সংস্কৃতের সঙ্গে সমমর্যাদায় স্থান দিলেন নাগরী, আরবী ও ফারসী ভাষাকে। দেবী অন্নদার দৈববাণীর আড়ালে কবির মনোগত অভিলাষ গোপন রইল না —

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী।।[৩৭]

ভারতচন্দ্রের বাংলা কাব্যে আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রচুর ব্যবহারের একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, ফারসী শিক্ষা, দ্বিতীয়ত, ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, এবং তৃতীয়ত, রাজসভার কবি হওয়া - ফারসী তখন দরবারী ভাষা। তাই মানসিংহ-জাহাঙ্গীরের কথোপকথন বর্ণনাকালে তিনি অনায়াসে বলেছেন —

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী।।
পড়িয়াছি সেই মতো বর্ণিবারে পারি।[৩৮]

কিন্তু জনসাধারণের কাছে এই ভাষাগুলো অনেকটাই দুর্বোধ্য বলে মিশ্রভাষা প্রয়োগকেই ('যাবনী মিশাল') তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। কারণ, সাহিত্যে প্রসাদগুণ সৃষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য —

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।[৩৯]

আর কবি তাঁর অবলম্বিত নীতির পক্ষে প্রাচীন পণ্ডিতদের সমর্থন উদ্ধৃত করতেও ভোলেননি —

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।।[৪০]

কবি ভারতচন্দ্র রাজা বীরসিংহ ও ভাটের কথোপকথনে এই মিশ্রভাষা প্রয়োগ করেছেন।[৪১]

রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে মিশ্র ভাষার ব্যবহার আরও বেশী। সুন্দরের প্রতি মাধব ভাটের উক্তি, বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাজার ক্রোধ, কোটালের চোর অন্বেষণে যাত্রা, বর্ধমানে সুন্দরের আগমন —প্রভৃতি অংশে এই মিশ্রভাষা শৈলীর প্রয়োগ লক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ মাধব ভাটেব উক্তি উদ্ধৃত করা হল —

বাবুজি কুর্নিশ মেরা বর্ধমান বিচ ডেরা
নামতো হামারা মাধো ভাট।
আরোজ করোগে পিছে ঘড়ি এক বৈঠে নীচে
আর তো লাগায় তোম হাট।।[৪২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বিভিন্ন সত্যপীর পাঁচালিতে এই মিশ্রভাষা প্রয়োগের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি সৈয়দ হামজার 'আমির হামজা' কাব্যের নামোল্লেখ করা যায়।[৪৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রহরের কবি রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) গানে কেবল সঙ্গীত কুশলতা নয়, অধ্যায়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যেমন দখল ছিল, তেমনি পারসী, হিন্দী বা ইংরেজী ভাষাতেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক। যেমন 'গীতরত্ন' গ্রন্থে আছে নিম্নোক্ত গানটি —

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পূর
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাখান।।[৪৪]

ভারতচন্দ্রের মতই পারস্য থেকে ভাব আহরণ করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। যেমন নিম্নোক্ত পদটি অবিকল হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অনুবাদ —

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে।।[৪৫]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, নিধুবাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

বেশ বোঝা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষার বাহন শুধু সংস্কৃতই ছিলনা, হিন্দুব জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে মুসলমানের সঙ্গে নির্বিশেষে আরবী, ফারসী কিংবা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোও শিক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন কাব্যে কবিদের উল্লেখ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ দিকে মুসলমানরাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠতে লাগলেন। মুসলিম শাসন আমলের প্রথম দিকে বাংলা ভাষায় তথা 'হিন্দুয়ানী' ভাষায় শাস্ত্রকথা রচনার ব্যাপারে ইসলামী সমাজে যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের কথা প্রচার করতে লাগলেন মুসলিম কবিরা। উদাহরণস্বরূপ সৈয়দ নাসিরের বাংলাভাষার স্বপক্ষে বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায় —

বাঙ্গালা অক্ষর দেখি ন হিংসিঅ তার।
কদলির সুতে গাথি পুষ্প দিব্য হার।।
বহু শ্রধা করি পুষণ পিন্দে সর্বতাএ।
কদলির সুতা দেখি পুষণ ন ফেলাএ।।[৪৬]

মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল মাদ্রাসা। এখানে পড়ানো হত অঙ্ক, নীতিশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, প্রশাসন বিদ্যা, কারীগরী বিদ্যা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়। যেমন - অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'শরীয়তনামা', 'নসিহতনামা' প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর অন্তিমকালে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজকে আত্মরক্ষার কিংবা আত্ম সংশোধনের পথ দেখাবার জন্যই মূলত নীতিকাব্য জন্মলাভ করেছিল। 'শরীয়তনামা' গ্রন্থে এর সমর্থন পাই।[৮৭]

মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মসজিদ এবং ইমামবাড়াতেও এবং এই শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী হতেন উচ্চবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। আসলে সুযোগটা তাঁদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে নিম্নবিত্তরা

সামান্য পড়াশুনা করেই তাদের কৌলিক বৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য হত। উচ্চশিক্ষা তখন সামাজিক মর্যাদার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের টোল আর মুসলমানদের মাদ্রাসা। হিন্দু গুরুমশাইদের মতো মৌলবীদের কেউ কেউ ছাত্র প্রতিপালন করতেন। আবার কোনও কোনও মাদ্রাসাকে সরাসরি আর্থিক সাহায্যদানে পুষ্ট করে তুলেছিলেন নবাব, সুলতান, সুবাদারেরা।

সুতবাং সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে দেখা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার মান খুব একটা উন্নত না হলেও তাকে একটা গণতন্ত্রসম্মত রূপ দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকের পরিবারেই অন্তত দু'এক জন করে শিক্ষিত ছিল। এই প্রসঙ্গে কবি বালক ফকির বলেছেন —

ঘরে বসি এই পোতা পড় যথ জনে।.
দেশী ভাষা কথা সব বুঝিব আপনে।।
সকলে না বুঝে যদি কিঞ্চিৎ বুঝিব।
মন্দভাব অনাচার তথাচ তেজিব।।
পরিশ্রম বিনে যথ অল্প জ্ঞানীগন।
ঘরে বসি পাইবেক দ্বীনের রত্তন।।[৪৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষালোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল পুরাণ। আগেই বলেছি ধর্মচর্চার একটা অঙ্গ হিসাবে এযুগে শিক্ষাকে মুলত গ্রহণ করা হয়েছিল। আর ধর্মের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছিল পুরাণ। কথকতা, গান, যাত্রাভিনয় ও পাঁচালী গানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালা, চতুষ্পাঠীতেও পুরাণ-চর্চার ব্যবস্থা ছিল। অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-বাদকদের সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রের দলকে পুরাণাভিজ্ঞ করে তুলতেন এই শতাব্দীর পুরাণ শিক্ষিত কবিরা। ভারতীয় পুরাণ নীতিবাদকে সমর্থন করে; আর সে কারণেই শিক্ষকেরা রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অবলম্বন করে শিক্ষার নামে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সদাচার ও সদগুণসম্পন্ন চরিত্র গঠনের নির্দেশ।

এই শতাব্দীর প্রতিনিধি স্থানীয় দু'একজন কবির কাব্য আলোচনা করে পৌরাণিক ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণের বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। প্রথমে ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের কথা স্মরণ করা যায়। এই কাব্য রচনায় রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আদর্শকে অনুসরণ করেছেন কবি। তবে চরিত্র ও ঘটনা বিন্যাসে পৌরাণিক মহাকাব্যের সাহায্য নিলেও তাদের তিনি পুরাণের অবিকল প্রতিলিপি করে তোলেননি। যখন যেভাবে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে তখন সেভাবে পৌরাণিক আবহ রচনা করে গেছেন কবি। এতে নাটকীয়তা রক্ষাও সম্ভব হয়েছে। যেমন এই কাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য হল রাজসভায় পুরাণ পাঠ বিষয়টি। সভাস্থলে যখন যে কাহিনী কেন্দ্রিক

পুরাণ পাঠ হয়েছে, তখন তার ঠিক অনুরূপ ঘটনা কাব্য মধ্যে ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'লাউসেনেব জন্মপালা' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

বারভূঁয়ে বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর।।
পাত্রমিত্র সগোত্র সহিত সত্ত্ব গুণে।
বাল্মীকি গোসাঁই গ্রন্থে রামায়ণ শুনে।।
আদ্যকাণ্ড পণ্ডিত প্রকাশে ভক্তিমতে।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মিলা জগতে।।

হেন কালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি।।
পাতি দিয়া কন কিছু রাজার সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড়াহাত বুকে।।
এত কালে ঠাকুর হলেন পরতক।
কর্ণসেন রায়ের বালক হল এক।।[৫৯]

বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে পঠিত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে লাউসেনের জন্মসংবাদ এখানে একটা ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

'অঘোর বাদল পালা'য় দেখি মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ ধর্মের পূজা করতে উদ্যোগী হলেন বটে, কিন্তু সুসম্পন্ন করতে পারলেন না। ফলে নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে গৌড় ডুবে গেল। তখন গৌড়রাজ ঝড়বৃষ্টি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য লাউসেনকে আনতে ময়নায় দূত পাঠালেন। দূত যখন লাউসেনের দরবারে প্রবেশ করল, তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হচ্ছিল—

রাজ্যের সহিত রাজা মজি সত্ত্বগুণে।
গোবর্দ্ধন ধারণ গোবিন্দগুণ শুনে।।
লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রের পূজা ব্রজের নন্দন।
পূজালো গোয়ালাগণে গিরি গোবর্দ্ধন।।
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র কৈল কোপদৃষ্টি।
গিরি ধরি গোবিন্দ রাখিল সব সৃষ্টি।।[৬০]

বস্তুত 'অঘোর বাদল পালা'টি শ্রীমদ্ভাগবতের ইন্দ্রের রোষ, গোকুলে ঝড়বৃষ্টি এবং গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করে কৃষ্ণের গোকুলকে রক্ষার চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দুটি ঘটনার কাহিনী উপস্থাপনা এবং বর্ণনা পৃথক। ঘনরাম নিপুণভাবে এখানে মহাকাব্যিক আবহ রচনা করেছেন।

পৌরাণিক চরিত্র সমূহকে কবি নিতান্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচ্য কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র সমূহের আলোচনায় গ্রহণ করেছেন। সার্থক উপমা প্রয়োগ করেছেন পুরাণ থেকে। তাই লাউসেন ও কর্পূর কখনও শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, কখনও কৃষ্ণ-বলরাম, কখনও বা লব-কুশ। লাউসেনের বাল্যকালেব কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। লাউসেনকে অপহবণের কাহিনীও শ্রীমদ্ভাগবত ভিত্তিক। লাউসেনকে চুরি করতে এসে ইন্দ্রজাল কোটাল তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছে। 'চোর বলে মোর ভাগ্যে সীমানাই আর'[৫১] এবং সে তুলনা দিয়েছে —

শ্রীনন্দকুমার নিতে যেমন অক্রুব।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর।।[৫২]

আবাব লাউসেন ও কর্পূরকে বাল্যাবস্থায় দেখে কেউ কেউ 'মনে ভক্তি কবি ভাবে কৃষ্ণ বলবাম। তাদের ইচ্ছা হয়, 'আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা।'[৫৩]

শ্রীমদ্ভাগবতেব দশম স্কন্ধে কংসের রাজসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক কুবলয় হস্তী নিধনেব যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ধর্ম্মমঙ্গলেব 'হস্তীবধ পালা'য় লাউসেন কর্তৃক গৌরবাজেব পাটহস্তী নিধনে সেই চিত্রের অনুসরণ পাই।[৫৪]

'মায়ামুণ্ড পালা'য় রামায়ণের প্রভাব সর্বাধিক। পরবর্তী 'ইছাইবধ পালা'য লাউসেন ও ইছাইয়ের যুদ্ধে রাম-রাবণেব যুদ্ধের ছায়াপাত ঘটেছে। যুদ্ধযাত্রা করে লাউসেনের প্রতি কালুডোমের উক্তি —

নফরে সহায় করি রঘুবংশ নাথ।
সবংশে রাবন রাজা করিলা নিপাত।।[৫৫]

আবার পার্বতীর ভক্ত ইছাইয়ের পরাজয়ে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে যখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি লাউসেনকে বধ করবেন অন্যথায় 'মৈনাক মহেশ গুহ গনেশের' দিব্য দিলেন, তখন দেবগণ সমস্যায় পড়লেন। কারণ, 'ইছাই বধিতে হেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা'। এ অবস্থায় দুই কুল কিভাবে রক্ষা যায় দেবগণ ভাবতে লাগলেন। ঘনরাম মহাভারতের কাহিনী দিয়ে ঘটনার সারূপ্য বক্ষা করেছেন —

দুই রক্ষা কেমনে এমন চাহি যুক্তি।
সুধন্বা অর্জ্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি।।
আপনি রাখিল কৃষ্ণ দুজনারি পণ।
সেইরূপে সুযুক্তি করেন দেবগণ।।[৫৬]

ঘনরামের কাব্যের প্রায় সর্বত্র এমন পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। একই ভাবে রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যেও পুরাণ চেতনার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। আমরা

জানি, রামেশ্বরের কাব্যে শিব ধ্যানযোগ ছেড়ে ক্ষেত্রপতি কৃষকে পরিণত হয়েছেন। স্বর্গীয় পটভূমিতে মানবতার জয়গান করেছেন কবি, কিন্তু পৌরাণিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নয়। তাঁর কাব্যের মধ্যে আমরা উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, চণ্ডী, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কৃষিপরাশর ইত্যাদির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করি।

নিজের কাব্যরচনার প্রেরণা সম্পর্কে তাই কবি বলেছেন —

ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভাব্যা ভাগবত।
জশমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসত।।[৫৭]

বা,

নিরন্তর কৃষ্ণনাম নিতে বলি কেন।

পদ্মাপুরাণোক্ত পূর্ব্ব উপাখ্যান শুন।।[৫৮] ইত্যাদি।

সুতরাং বোঝা যায়, পুবাণ অনুধ্যান করেই রামেশ্বর শিবমঙ্গল রচনা করেছিলেন। কাব্যেব মধ্যে অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারী দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বাণ-অনিরুদ্ধের উপাখ্যানে জ্বর ও শিব কর্তৃক কৃষ্ণের দু'টি স্তব পাওয়া যায়। বামেশ্বর এই স্তব দুটির অনুবাদই করেছেন বলা যায়। বাণরাজ রুদ্রভক্ত ছিলেন। মাহেশ্বর জ্বর নিজেকে মহাশক্তিমান মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে এবং পরে বৈষ্ণব জ্বব কর্তৃক পীড়িত হয়ে এবং শরণার্থী হয়ে শ্রীকৃষ্ণেব স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাণাসুরের সমস্ত বাহু ছিন্ন হলে ভক্তানুকামী ভগবান রুদ্র ভক্তকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেছিলেন। প্রথম স্তরের সামান্য অংশ উদ্ধৃত হল —

জ্বর উবাচ —
নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্বাত্মানং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধ হেতুং যত্তদ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্।।[৫৯]
এরই অনুসারে শিবায়নকার লিখেছেন —

ভীত মাহেশ্বর জ্বর জুড়িয়া যুগল কর
কৃষ্ণের চরণে করে স্তুতি।
তুমি দেব পরাৎপর মনোবাক্য অগোচর

আদিদেব অনন্ত শকতি।।
তুমিব্রহ্ম তুমি ধর্ম্মসেতু।
সকলাত্মা সনাতন কেবল বিজ্ঞানধন
বিশ্বসৃষ্টি স্থিতিনাশ হেতু।।[৬০]

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্তবটি এইরূপ —

রুদ্র উবাচ —
ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যাতিগূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্।।[৬১]

রামেশ্বর চক্রবর্তী এরই অনুসরণে বলেছেন —

তুমি ব্রহ্ম পরজ্যোতি বাঙ্‌মনোনিগূঢ় অতি
স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর সব।
অমলাত্মা সব থাকে, আকাশের প্রায় দেখে
যত দেখে তোমার বৈভব।।[৬২]

এছাড়া 'শিবায়ন' কাব্যের 'ষষ্ঠ দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ' অংশে কবি রামেশ্বর যে 'শিবরাত্রি বিধি'র উপস্থাপনা করেছেন তার ওপর লিঙ্গ পুরাণের শিবরাত্রি ব্রতকথার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার 'একাদশী মাহাত্ম্যপালা'য় বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় —

একাদশীদিনে যে অধম অন্ন খায়।
সকল পাপের দেখা এক অন্নেপায়।।
পাপপুঞ্জ হৈয়া পরিতাপ পায়্যা মরে।
পশুপক্ষী পতঙ্গাদি নানা দেহ ধরে।।[৬৩]

তুলনীয় —
একাদশ্যাং ভোজনাচ্চ নান্যৎ পাপতরং পরম।।
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ।
অন্নমাশ্রিত্য তান্যেব তিষ্ঠন্তি হরিবাসরে।।[৬৪]

পুরাণ অনুমত করে 'দশকর্ম্মবিধি' অনুযায়ী পূজাপদ্ধতির বিবরণও এখানে মেলে --

মহীগন্ধ শিলাধান্যদূর্ব্বা পুষ্প ফল।
স্বস্তিক সিন্দুর ঘৃত সুশঙ্খ কজ্জল।।
গোরোচনা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র আদি।

চামব দর্পণ দীপ ছিল যথাবিধি।।
বন্দিল প্রশস্তপাত্র সূত্র বান্ধি করে।[৬০]

'দশকর্ম্মবিধি'র 'প্রশস্তিপাত্রবন্ধন' অংশে পাই —

মহীগন্ধঃ শিলাধান্যং দুর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিক সিন্দুবং শাঙ্খ কজ্জল বোচনাঃ।।
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রশ্চামরদর্পনৌ।
দীপঃ প্রশস্তিপাত্রঞ্চ বন্দনীয়ং শুভে দিনে।।[৬১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ বাংলা কাব্যেই এ ধরণের প্রত্যক্ষপুরাণ প্রভাব লক্ষিত হয়। এ থেকে বোঝা যায়, কবিরা পুবাণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাব কল্যাণেই এ পরিচয় সাধিত হয়েছিল।

এই শতাব্দীতে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনাও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জ্যোতিষচর্চা আঠার শতকের শিক্ষার একটা অঙ্গই হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। অবশ্য ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বৈদিক যুগ থেকেই কালোচিত বিবর্তন ও বিকাশ লাভ করে অগ্রসব হয়েছে। বেদেব যে আনুষঙ্গিক ছয়টি শাখা বেদাঙ্গ নামে পবিচিত তাব মধ্যে পঞ্চম বেদাঙ্গ হচ্ছে জ্যোতিষ। ভারতীয জ্যোতিষ তিনটি শাখায় বিভক্ত— গণিত, হোবা এবং সংহিতা। যে শাখায় গ্রহদেব গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে গণিত জ্যোতিষ বা তন্ত্র বলা হয়। হোবা শাস্ত্রে গ্রহগণের অবস্থান ও লগ্ন অনুযায়ী যাত্রা, বিবাহ প্রভৃতির শুভাশুভ নির্ণয় কবা হয় এবং জন্মকালে গ্রহদের অবস্থান দৃষ্টে জাতকের কোষ্ঠী নির্ণয় কবা হয়। যে শাস্ত্রে জ্যোতিষের সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয় তাকে সংহিতা বলে। সংহিতার আবাব দুই ভাগ একটি ব্যবহারিক, অন্যটি ফল ভাগ। তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী কাজ কবার বিধানসমূহ যে ভাগে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে ব্যবহার ভাগ বলে। আব যে ভাগে নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে কর্মেব শুভাশুভ নির্ণয করা হয় তাকে ফলভাগ বলে। ফলভাগেব ওপব নির্ভর করেই গণক গোষ্ঠীব সৃষ্টি হয়েছে। সংহিতা তথা ফলিত জ্যোতিষের কাজ বিবিধার্থ সংগ্রহ। যেমন - আবহিক ঘটনার সাহায্যে যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়, বাজ্যের ভবিষ্যৎ বর্ণনা, দ্রব্যের লক্ষণজ্ঞান, হস্তবেখা বিচার, স্বপ্নফল নিরূপণ, শাকুন বিদ্যা ইত্যাদি।

দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে বঙ্গভূমিতে তথা ভারতবর্ষে গণিত জ্যোতিষের চর্চা একটা হয়নি। হোরা জ্যোতিষ, এবং বিশেষত ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনই জোরদার হয়েছিল। জ্যোতিষের এই আত্যন্তিক প্রভাব সমাজে যেমন সাহিত্যেও তেমনি বিস্তার লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব কবি মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' গ্রন্থটি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রেরই এক ছন্দোবদ্ধ রূপ। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'ভূমিকম্পবাখান'

পর্যায়ে কবি নৈসর্গিক ঘটনার সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন —

সাবান চান্দে যদি মেদিনী কম্পএ।
ব্যাধি হৈয়া লোকসব মরিব নিশ্চএ।।
কোন কিতাবেত বোলে ভূখিল হইয়া
হাহাকার করি লোক যাইব মরিয়া।[৬৮]

নববস্ত্র পরিধানের রীতিনীতি ও জ্যোতিষ দ্বারা নির্ধারিত হত। কবি মুজাম্মিল বলেছেন —

'শনিবার কেহো যদি ফাড়এ বসন।
ব্যাধিএ পীড়িব নিত্য না যাএ খণ্ডন।।[৬৯]

গৃহনির্মাণ বিষয়েও জ্যোতিষনীতি বাঙলাদেশে বিশেষ মান্য করা হত। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সব বাঙালীই এই নীতি মেনে চলত। যেমন —

বৈশাখ মাসেতে যদি সে ঘর নির্মিএ।
ভাল দিনে সেই ঘর বাহিতে জুয়াএ।।[৭০]

বা,

সোম বুধ বৃহস্পতি ঘর সুশোভন।
বান্ধিলে অনেক লাভ বাড়ে ধন জন।।[৭১]

একইভাবে আঠার শতকের কবি নওয়াজিসের 'গুলে বকাউলি' কাব্যেও কর্মের এবং যাত্রার শুভাশুভ নির্ণীত হয়েছে।[৭২] এছাড়া স্নান, নিদ্রা, যাত্রা, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ, রজঃস্রাব, স্বপ্ন, হাজামত, রতিকর্ম, নারী লক্ষণ, নর লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্যোতিষ নীতি-আলোচিত হয়েছে। এছাড়া খঞ্জন, কাক, কোকিল, পেচক প্রভৃতি পাখীর ডাক থেকেও বহু নীতি নির্দেশ আবিষ্কার করেছেন জ্যোতিষীগণ। এগুলো শাকুনবিদ্যার অন্তর্গত হলেও ফলিত জ্যোতিষেরই আলোচ্য বিষয়। কবি মুজাম্মিলের কাব্যে এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে।[৭৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে হোরা জ্যোতিষের প্রসঙ্গও আছে। ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেনের জন্মের পর তার কোষ্ঠী নির্ণয়ের কথা বলেছেন —

শুভ বার সিত পক্ষে সুতিথি অদিতি ঋক্ষে
সুলক্ষণে জন্মিল কুমার।
হেমকান্তি কুলপদ্ম রূপে প্রকাশিল সদ্ম

যারে অনুকূল করতার।।
ববি রাহু গুরু তুঙ্গী শশীসুত সিত সঙ্গী
সুত গৃহে শনি শুক্র রাশে
কর্ম্মে গুরু জম্মে চাঁদ বিনানে বিপদ ফাঁদ
অষ্টবর্গ কুজ রুজ নাশে।।[১৩]

সুতবাং জ্যোতিষ গণক সেকালে অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রী রূপে পবিচিত হয়েছিল।

শুকুর মাহমুদ বিরচিত 'গোপী চাঁদের সন্ন্যাস' কাব্যেও এ প্রথাব উল্লেখ পাই —

ছএদিনে করাই ছাইলার যষ্ঠীর বার।
পণ্ডিত লেখিল কোষ্ঠী করিয়া বিচার।।[১৪]

রামানন্দ ঘোযের রামায়ণ অনুবাদেও হোবাজ্যোতিষ পদ্ধতিতে কোষ্ঠীনির্ণয়ের উল্লেখ পাই। তাঁর রামায়ণ থেকে জ্যোতিয সংক্রান্ত একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

আদিকাণ্ড, ১১১ পত্র, ২য় পৃষ্ঠাঃ —
সিতপক্ষ নবমী পুষ্যাতে উপযোগ।
বৃহস্পতি লগ্নে ক্ষেত্রি মাহেন্দ্র সংযোগ।।
লগ্নে চন্দ্রে চতুর্থ স্থানেতে ভূমিসুতে।
শশিসুত তৃতীয় কেন্দ্রীয় রাহুতাতে।।
যষ্ঠমেতে রবিসুত তৃতীয়ে ভাস্কর।
পঞ্চম স্থানেতে কেতু অধ দুই কব।।
শুক্রাচার্য্য সপ্তমে লগ্নেতে উদয়।
নবগ্রহ তুঙ্গী কেতু ক্রমভঙ্গ নয়।।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন।
কৌশল্যা রাণীর গর্ভে প্রসব বেদন।।[১৫]

(২)

অন্যদিকে দেখা যায়, মানুযের দৈনন্দিন জীবনাচরণে কোনো সমস্যা উপস্থিত হলেই সে দ্বারস্থ হয় জ্যোতিষীর. যেমন— লাউসেনের অপহরণে রঞ্জাবতী উতলা হলে জ্যোতিষীর ছদ্মবেশে ধর্ম তাঁকে আশ্বস্ত করেছে —

মায়াধারী গ্রহ বিপ্র ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র
খড়ি পাতি কবিছে গণনা।।
খড়ি পাতি বলে খুড়ি যে কিছু বাড়ীর ভেড়ী
খড়ি পাতি বুঝিনু বিস্তর।

দুষ্টমতি ভাই তোর হরিল পাঠায়ে চোর
তোর ভাগ্যে রাখিল ঈশ্বর।।[illegible]

কবি শেখসাদী রচিত 'গদামালিকা সম্বাদ'এ শরীরে বিভিন্ন রাশির সংস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন —

অজুদ আসমানে জান সিংহরাশি রএ
কন্যারাশি গর্দানেত ফকিরে বোলএ।
মেষ জানুতে থাকে বৃষ পদমূলে।
মিথুন পদ্ম মূলে রহে কহিল সকলে।[illegible]

আবার শরীর চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতির অবস্থান তত্ত্বও বর্ণিত হয়েছে।[illegible]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি হোসেন ফকির একটি রাশিগণনার পুঁথি রচনা করেছিলেন। রাশিবিচারের উদ্ভবতত্ত্ব প্রসঙ্গে কবি মুসলিম ঐতিহ্যের শরণ নিয়েছেন। তিনি বলেন, একদিন 'নিরঞ্জন' জিব্রাইল (আঃ) কে ডেকে রাশি জ্ঞান দিয়ে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে পাঠালেন। সুলায়মান (আঃ) 'আরাদি' নামক দেওকে রাশিচক্র বোঝানোর সময় গুণিগণ তা লিখে রাখলেন। এ কাব্যেতে বার রাশি ও নবগ্রহ পরিচিতি এবং তার শুভাশুভ ফল বর্ণিত হয়েছে।[illegible]

মধ্যযুগে একটা প্রবাদ খুব চালু ছিল--- 'নারীদের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা'। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষাকে স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়, সেই দেশে নারীর স্থান যে ঠিক কোথায় তা চিন্তা করতে ভয় হয়। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের পাতায় বেশ কয়েকজন বিদূষী রমণীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন কবিরা। চারিত্রিক বিশুদ্ধির ঊর্ধ্বে শুধু বিদ্যাবত্তার দিকটিকেই আলোকিত করেছেন তাঁরা। ফলে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের বিদ্যা, শেখ সাদীর 'গদামালিকা সম্বাদ'-এর মল্লিকা প্রমুখের মত সচ্চরিত্র নারীরাই নয়, এই কোটায় পড়তে পারে ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্ম- মঙ্গল'-এর বারবণিতা সুরিক্ষাও।

'গদামালিকা সম্বাদ' কাব্যের নায়িকা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় এবং সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শিনী ছিল। মল্লিকা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল, যে পুরুষ সাহিত্য সংক্রান্ত বিতর্কে তাকে পরাভূত করতে পারবে তাকেই সে বরমাল্যে বরণ করবে। বহু যুবরাজ ও বিদ্বান পুরুষ তার সঙ্গে তর্কে পরাজিত হতে থাকেন। অবশেষে আবদুল হালিম গদা নামে একজন সূফী পণ্ডিত মল্লিকার হাজার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন। মল্লিকার প্রশ্নে সত্যিই বৈচিত্র্য ছিল। কিছু কিছু প্রশ্ন শাস্ত্রবিষয়ক, আবার কোনো কোনোটি ভৌগোলিক, পৌরাণিক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক। এছাড়া ধাঁধা-হেঁয়ালির সংখ্যাও

কম ছিলনা। একজন নারীকে এই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শিনী করে শেখ সাদী অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়ত প্রথম নারীপ্রগতির সূচনা করে দিলেন। আল্লাহ্র উদ্ভব, রসুল সৃষ্টি ও জগৎ-পত্তনের দীর্ঘ বর্ণনা করেছে এই নারী। এই গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর পর্বটি খুবই আকর্ষণীয়।[১০]

শেখ সাদী কবি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত সুরসিক, বিরল প্রতিভাধর ছিলেন না। তাই তাঁর মল্লিকা ভারতচন্দ্রের নায়িকা বিদ্যার চেয়ে অনেকটাই নিষ্প্রভ। এরা উভয়েই বোদ্ধা, কিন্তু বিদ্যা সেই সঙ্গে প্রেমিকাও। তার আবেগ, তার প্রেম, তার লাস্যময় চাপল্য নিটোল পরিপূর্ণতা দিয়েছে তার বৈদগ্ধ্যকেও। বিনা ভূমিকায় কবি বিদ্যাকে কাব্যে অবতীর্ণ করিয়েছেন। বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, সে প্রচলিত রাজকুমারী রীতিতে বীর্য শুল্কা হবে না - হবে বিদ্যা শুল্কা। বিচারে হারলে তবে সে আত্মদান করবে। রূপযৌবনের উপঢৌকন নিয়ে সে প্রতীক্ষা করছে প্রতিভার। সে চায় বিদগ্ধকে। বিদ্যা বিদুষী, কিন্তু তার গ্রন্থের মতই পাণ্ডিত্য তার জীবনরসকে শুষ্ক করে দেয়নি, বরং আরো ভোগবাদী করেছে। তাই তাকে বৈরাগিনী কখনও বলা যাবে না। বিবাহের প্রয়োজন তার কাছে বিকল্পহীন। আসলে বিতর্ক বা বিচারের আড়ালে সে আশ্রয় নিয়েছিল নিজের চরিত্র, নিজের বিদ্যোৎসাহিতাকে রক্ষা করার জন্য। নতুবা রাজপুত্র নামক 'রাজবংশে চাষা'র হাতে পড়ে তার সরস-জীবনটা ছারখার হয়ে যেত। কিন্তু যতই তার সূক্ষ্ম ও উচ্চবুদ্ধির কাছে নির্বোধ রাজপুত্রের দল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, ততই বিদ্যার যৌবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অবশেষে সুন্দরের আবির্ভাব; এবং বিদ্যার প্রায় নিঃশর্তে আত্মসমর্পন। পরাজয়টাই এখন পরম কাঙ্ক্ষিত। ফলে সুন্দরের চিত্রকাব্যের উত্তরে তার চিত্রকাব্যটি প্রেমোল্লাসে ভরপুর এক আত্মনিবেদনের পদ হয়ে রইল। কাব্য থেকে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করা হল -

চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি।।
কবিতা কমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়।।
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিনবার।।
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে।।[১১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আর এক বুদ্ধিমতী রমণী হল সুরিক্ষা। জ্ঞানে ও সৌন্দর্যে সে মল্লিকা কিংবা বিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু তবুও তার অনৈতিক জীবনাচরণ পাঠকের কাছে তাকে এতটুকু সমাদৃত করেনি। সুপণ্ডিত লাউসেনকে সে নিজের রূপ ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল এমন একটি প্রশ্ন করে যার মোকাবিলায়

লাউসেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রশ্নটি - 'ধাতু কোথা বৈসে নারীব অষ্টাঙ্গ থাকিতে।' লাউসেন অসহায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে ভবিতব্যকে - মৃত্যুর অধিক সে শাস্তি - দুশ্চরিত্র বারবনিতার গৃহে তারই হস্তকৃত অন্নগ্রহণ। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অন্তিমে কখনও অধর্মকে জয়ী করে না। তাই অন্নস্পর্শের প্রাক-মুহূর্তে দৈবী পরামর্শে লাউসেনের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে তার অজানা উত্তরটি —

লাউসেন বলে নটী শুন সাবধানে।
পুরা দিব সুমস্যা সবাব বিদ্যামানে।।
কামেশ্বরী কামিক্ষা আছে কামিক্ষাতে।
নারীর ধাউত বসে বাম লোচনেতে।।[১১]

বস্তুত 'সুবিক্ষাব পালা' পড়লে বোঝা যায়, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-দর্শনে সুবিক্ষা কতটা অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু বিদ্যাবত্তার চেয়েও বড় হল চরিত্র; যা খুইয়ে সে তাব পাণ্ডিত্যকে নিজের হাতেই ম্লান করে দিয়েছে।

প্রশ্ন হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নারীর বিদ্যাবত্তার প্রসঙ্গটি কি কবিদের স্বকপোলকল্পিত, নাকি তার বাস্তব ভিত্তি আছে? উত্তর খুঁজতে হবে সমসাময়িক কালের ইতিহাসে। সুদূর অতীত কাল থেকেই নারীর অধ্যবসায় তার সার্বিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী, মৈত্রেয়ী,খনা, লীলাবতীর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। যুগ ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়েছে। শতাব্দীর ঝুলিতে একটা করে সংখ্যা যুক্ত হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় প্রাচীন যুগের তুলনায় খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। কারণটা নিহিত পুরুষতন্ত্রে; আট বছরের গৌরীদান থেকে রান্নাঘর আর আতুরঘরের চৌহদ্দিতে। তবু এরই মধ্যে কেউ কেউ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সমাজের কাছ থেকে 'আপন ভাগ্য জয় করার' অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে শিক্ষার পাঠগ্রহণ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস খুঁজে এমন কয়েকজন মহীয়সী ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথমেই নামোল্লেখ করা যায় আনন্দময়ী দেবীর। ইনি ফরিদপুর যপসা গ্রামনিবাসী লালা রামগতি সেনের কন্যা। অথর্ববেদ থেকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনেক বৃত্তান্ত ও যজ্ঞকুণ্ডের ছবি এঁকে ইনি রাজা রাজবল্লভ সেনের যজ্ঞের জন্য দিয়েছিলেন। বেদ নির্দিষ্ট সেই যজ্ঞকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক সানন্দে গৃহীত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে আনন্দময়ী অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' (১৭৭২ খ্রীঃ) কাব্যে তাঁর রচিত অনেক পদ পাওয়া যায়। সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গানসমূহ বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিকউৎসবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আনন্দময়ী বিবাহিতা ছিলেন। পয়গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত

অযোধ্যা নারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। পিতৃগৃহে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অনুমৃতা হন।

ব্রাহ্মণকন্যা বৈজয়ন্তী দেবী ফরিদপুরের খানুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কোটালিপাড়া নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যের জন্য বৈজয়ন্তী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইনি সুন্দরী ছিলেন না বলে বহুদিন যাবৎ শ্বশুরালয়ে যেতে পারেননি। পরে সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে বৈজয়ন্তী স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে 'আনন্দ লতিকা' নামে এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে কৃষ্ণনাথ লিখেছেন 'যেনা কারি স্ত্রীয়া সহ'। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্র হয়ে শাস্ত্রালোচনা ও গ্রন্থরচনার দৃষ্টান্ত বিরল।

প্রিয়ম্বদা দেবীও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা ও মহাভারতের শান্তি পর্বের মোক্ষধর্মের একটি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। বাঙালী মহিলার মীমাংসা-দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ তাঁর সৃষ্টিকর্মে পাওয়া যায়। রহিমুন্নিসা অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক উল্লেখযোগ্য নারী। ইনি একই সঙ্গে লিপিকার এবং কবি ছিলেন। মনে হয় পুঁথি অনুলিপির কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। দৌলত উজীর বাহারাম খানের 'লায়লী মজনু' গ্রন্থটি নকল করেছিলেন তিনি।

রহিমুন্নিসা পূর্বোক্তদের মত খুব একটা শিক্ষিতা ছিলেন না। কারণ স্বরূপ বলেছেন —

আপদকালেতে পিতা গেলেন স্বর্গগতি।
পিতাশোকে ভাবিতে চিন্তিতে তনুক্ষতি।।
তেকারণে শাস্ত্রপাঠ শিখিতে নারিলুম।[৮৩]

মনে হয় আর্থিক অনটনই রহিমুন্নিসাকে লিপিকার হতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে এমন কিছু বলেননি যাতে বোঝা যায় যে, তিনি বিবাহিতা ছিলেন। গুরুর চরণে শরণ নিয়ে তিনি বলেছিলেন —

গুরুর চরণ স্মরি বিরচিলুম পদ।
আশীর্বাদ কর গুণি ত্বরিতে আপদ।
হীন ক্ষীণ অল্পজ্ঞান মুই কলঙ্কিনী।
সতীত্ব থাকিতে আশীর্ব্বাদ কর গুণী।।[৮৪]

সৎভাবে জীবন কাটাবার আগ্রহ ও আকৃতি কবি রহিমুন্নিসাকে সত্যিই রমনীয় করে তুলেছে।

হটি বিদ্যালঙ্কারের পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ইনি ছিলেন রাঢ় দেশের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিলবা। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্য-ন্যায়ে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে হটির সবচেয়ে বিস্ময়কর ভূমিকা হল, বারাণসীতে চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং সেখানে অধ্যাপনা। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৮৫]

আরেকজন হলেন হটু বিদ্যাহঙ্কার। এই হটু বিদ্যালঙ্কারের আসল নাম রূপমঞ্জরী। ইনিও রাঢ়দেশের অধিবাসিনী ছিলেন, তবে অব্রাহ্মণ। হটুব পিতা নারায়ণদাস অল্প বয়সেই মেয়ের অসাধারণ মেধা দেখে, তাঁর ১৬-১৭ বছর বয়সে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্যয়ন করে রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। নানা স্থান থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চড়ক সংহিতা, নিদান ও আয়ুর্বেদের নানা বিভাগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে আসত। হটি বিদ্যালঙ্কার অবিবাহিতা ছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় শিখা রেখে পুরুষের বেশ ধারণ করেছিলেন।[৮৬]

শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্যবাদী ধর্মান্দোলনের প্রভাবে নারীশিক্ষার সচেতনতা প্রথম প্রবেশ করেছিল বৈষ্ণব সমাজেই। বৈষ্ণবী তথা 'মা গোঁসাই'দের অনেকেই ছিলেন শিক্ষিতা। কে. কে. দত্ত লিখেছেন, "Many female mendicants among the Vairagini's and Sannyasinis had some knowledge of sanskrit, and still greater number were conversant with the popular poetry in the dialects of the country."[৮৭] এই প্রসঙ্গে নামোল্লেখ করা যায় শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর। ইনি বৈষ্ণব সমাজে 'আচার্যা'র আসন অধিকার করেছিলেন। ইনি বেশকিছু বৈষ্ণব পদেরও স্রষ্টা ছিলেন। আঠার শতকেব আগে পরে এমন শিক্ষিত বৈষ্ণবীর সংখ্যা কম ছিল না। চিত্রা দেব মন্তব্য করেছেন, "ইংরেজ গভর্নেস ও শিক্ষয়িত্রী আসার আগে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন বৈষ্ণবীরাই।"[৮৮] আসলে বৈষ্ণব আখড়ায় নিয়মিত গ্রন্থপাঠ ও শাস্ত্রচর্চা হত; এবং বৈষ্ণবীদের সুবিধা ছিল এটাই - মুসলমান আমলেও এঁরা পর্দানসীন ছিলেন না। ফলে শিক্ষায় নারী-পুরুষ অবাধে অংশগ্রহন করতে পারত।

রাজান্তঃপুরেও শিক্ষার হাওয়া প্রবেশ করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরের 'হরিনামবিলাসী' মল্লরাজা গোপালসিংহ দেবের পাটরাণী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী, বিষ্ণুপুরের রাজকন্যা সাবিত্রী কোঁয়ারি, মহারাণী আনন্দকুমারী এবং নাটোরের রাণী ভবানীর নাম করা যায়। এ যুগের অভিজাত বংশীয়া মুসলমান রমণীরাও শিক্ষাক্ষেত্রে খুব একটা পশ্চাদপদ ছিলেন না। গোলাম হোসেন আলিবর্দ্দীর বেগমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি স্বামীর পাশে পাশে থাকতেন। রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক বিষয়ে স্বামীকে সুপরামর্শ দিতেন। বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলীর বেগমও

একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। ইনি একক চেষ্টায় জামাতা সুজাউদ্দিন ও দৌহিত্র সরফরাজ খানের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বঙ্গভূমিকে রক্ষা করেছিলেন। সুজাউদ্দিনের কন্যা দরদানা বেগম, সরফরাজ খানের মাতা জিন্নাতুন্নেসা বেগম, ভগ্নি নাফিসা বেগম এযুগের মুসলিম অভিজাত মহিলাদের মধ্যে বিদূষী ও বুদ্ধিমতী বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[৮৯]

এছাড়া এই শতাব্দীতে অক্ষয় বাইতিনী নামে এক কবিগায়িকার সন্ধান পাওয়া যায়, যিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা দাশরথী রায়ের গুরু স্থানীয়া ছিলেন। আর এঁদের দৃষ্টান্ত ছিল বলেই হয়ত কে. কে. দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর নারীশিক্ষাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলতে চাননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — "Thus we see plainly enough that the women of the age were not universally steeped in the darkness of ignorance is in the distant corners of the villages there flurished female poets and writers, who can be regarded as worthy predecessors of their more educated sisters of the present day........ It was under tutors, employed by their parents at home, that the girls received their education, which aimed chiefly at equipping them with the knowledge and materials necessary for an honest and happy domestic life in the world."[৯০]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য নিয়ে আর নতুন কিছু বলার থাকত না যদি মুসলমান শাসনই স্থায়ী হত। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ব্যাপারটা বড় দ্রুতসঞ্চারী। ক্ষুরধার বুদ্ধির মারপ্যাঁচে দিনেকের মধ্যেই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে ইতিহাসের ধারাবাহিক কাহিনী। অবশ্য তলে তলে গোপন রাজনীতির খেলা চলেই - উদাসীনের চোখে শুধু ধরা পড়েনা। ১৭৫৭র পলাশীযুদ্ধে এমন নিঃশব্দ পদচারণাতেই ইংরেজের আবির্ভাব। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতি পর্ব, আর তারপর থেকে নিরন্তর প্রতিষ্ঠার যুগ। এই ইংরেজ আমলের সূচনাতেই বিদায় নিতে হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীকে। আর সেই বিদায়ী সায়াহ্নে পুথিভারাক্রান্ত, দেব-দেবী নির্ভর কাব্য সাহিত্যের জীর্ণ স্তূপে আলো জ্বালিয়ে দিল ইংরেজের গবেষণাধর্মী শিক্ষাপদ্ধতি - আঠার শতকের গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যা এক অভিনব সংযোজন।

হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ - সেই বিপ্লব সঞ্চারী গ্রন্থ। বঙ্গবাসীর শিক্ষাপ্রসারে এই গ্রন্থের ভূমিকা আলোচনার আগে সমসাময়িক গভর্ণরের বাংলা ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার খানিকটা আগে থেকেই লুপ্ত প্রাচ্যবিদ্যার উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আর এ কাজে সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিদেশীরা। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন বাংলাদেশে প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের অগ্রপথিক।

বাঙালীর শিক্ষা বিষয়ে হেস্টিংস কী চেয়েছিলেন তা জানা যাবে ১১ই নভেম্বর (১৭৭৩) তারিখে বোর্ড অব ডিরেক্টরকে লেখা একটি চিঠি থেকে। তিনি লিখেছেন, পূর্ববর্তী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লাভ নেই। কারণ এত বড় সাম্রাজ্য একটা ব্যবসায়ী সংস্থা সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে পারবে তা আশা করা যায়না। কর্মচারীরা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করত, তাদের মধ্যে ছিল 'সোস্যাল ফীলিংসের' অভাব। প্রশাসনে এই সামাজিক অনুভূতি সৃষ্টি করাই ছিল হেস্টিংসের লক্ষ্য।

দ্বৈতশাসন দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী-সরকারকে শাসিতদের মুখোমুখি দাড়াতে হল। আর তখনই প্রত্যক্ষ পরিচয় সুদৃঢ় করতে দেশীয় মানুষের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার প্রয়োজীয়তা দেখা দিল। ভারতীয়দের আস্থাভাজন হতে হেস্টিংস স্থির করলেন, হিন্দুরা শাসিত হবে তাদেরই প্রাচীন আইন অনুসারে। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও আদালত তাদের নিজস্ব আইন দিয়েই সব মীমাংসা করবে। ফারসী জানা ইংরেজের তখন অভাব ছিলনা। অভাব ছিল এমন লোকের যে সংস্কৃত পুথি থেকে হিন্দু আইনের মর্ম উদ্ধার করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেবে মক্কেল, উকিল ও বিচারকের ব্যবহারের জন্য। হেস্টিংসের এই পণ্ডিতেরা হলেন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্ক সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্টাচার্য, কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত। তাঁরা পুথি ঘেঁটে ঘেঁটে নির্বাচন করলেন প্রয়োজনীয় বিধি। তা অনুবাদ করা হল ফারসীতে। ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড তা অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে 'এ কোড অব জেন্টু লজ' (১৭৭৬) নামে।[১১]

শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে শিক্ষার বিস্তার যে অপরিহার্য তা হেস্টিংস উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। সে সময় এদেশে শিক্ষার মান ঠিক কি ধরণের ছিল - তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। হেস্টিংসের অভিনবত্ব এখানেই যে তিনি প্রথম আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হল কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১)।

শুধু হেস্টিংসই নন, আরো বেশ কয়েকজন বিদেশী বঙ্গীয় শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন জোনাথান ডানকান - বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (১৭৯২)। দ্বিতীয়জন - চার্লস উইলকিন্স, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে স্মরণীয় মনীষা। ভগবদ্গীতা (১৭৮৫), হিতোপদেশ (১৭৮৭), শকুন্তলা আখ্যান (১৭৯৩ এবং ১৭৯৫) -এর অনুবাদ ছাড়াও স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীন সংস্কৃত লিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা সূত্রপাতের সামগ্রিক কৃতিত্ব

তাঁরই প্রাপ্য। এবং তৃতীয়জন হলেন নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড্ ইংরেজীতে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা।

হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। মূলত ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে হেস্টিংস কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে হ্যালহেড এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের ভাষা ইংরাজী, কিন্তু সংযোজিত দৃষ্টান্তগুলি বাংলা অক্ষরে রচিত। এই বাংলা অক্ষর নির্মানে চার্লস উইলকিন্সের নাম স্মরণীয়। আর এঁকে সহায়তা করতে যিনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন তার নাম পঞ্চানন কর্মকার। ইনি ছেনি কেটে বাংলা হরফ মুদ্রণ করেন। ফলশ্রুতি অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভূমিতে ছাপাখানার উদ্ভব।

প্রায় আড়াইশ বছর আগে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিশিষ্টতাগুলি অনন্য।

ক. ইংরেজী ভাষায় রচিত হলেও এই গ্রন্থের উদাহরণ সমূহ বাংলা হরফে মুদ্রিত। তাই এটি বাংলা হরফ ছাপা প্রথম পুস্তক।

খ. এই ব্যাকরণের ছন্দ বিষয়ক অধ্যায়টি বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখা প্রথম আলোচনা।

গ. স্যর উইলিয়ম জোন্‌স ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাদৃশ্য সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন, তার অনেক আগেই (১৭৭৮ খ্রীঃ) হ্যালহেড এই তিনটি ভাষার সাদৃশ্যের কথা বলেন।

বলাই বাহুল্য এই প্রয়াস ও চিন্তাধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুগান্তকারী আলোড়ন তুলেছিল। ইতিপূর্বে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানুয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও সংকলিত বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ (ভোকাবুলারিও এম ইডিওমা বাঙ্গালা-ই পর্তুগীজ) লিসবন শহর থেকে প্রকাশিত হয়। পর্তুগীজ ভাষায় রচিত এ গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাকরণটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। সে কারণে বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব হ্যালহেডেরই প্রাপ্য। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন — "The path which I have attempted to clear was never before trodden; it was necessary that I should make my own choice of the course to be pursued, and of the landmarks to be set up for the guidance of future travellers."[২২]

তবে একটা কথা পরিষ্কার। ব্রিটিশরা নিঃস্বার্থ হয়ে, কিংবা নিছকই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিস্তারে অগ্রণী হননি। হয়েছিলেন

সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনের তাগিদে। বেণারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান, পয়লা জানুয়ারি, ১৭৯২ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ

সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার দরুণ প্রধান উপকার হবে ব্রিটিশদের, হিন্দুদের চোখে আরো উজ্জ্বল হবে ব্রিটিশদের ভাবমূর্তি; হিন্দুরা যখন দেখবে তাদের দর্শন ও শাস্ত্র সম্পর্কে অনীহা বা অবজ্ঞা দূরে থাক, সেসব বিষয়ে স্থানীয় রাজন্যবর্গের চেয়েও সরকারের আগ্রহ ঢের বেশি, তখন স্বভাবতই বৈদেশিক সরকারের প্রতি হিন্দুদের মনে সম্ভ্রম ও সম্প্রীতির ভাব আরো জোরদার হয়ে উঠবে।[৩]

এই মনোভাবেই ব্রিটিশদের সত্যকার পরিচয় নিহিত। অবশ্য স্বার্থ যাই থাক মোদ্দালাভটুকু হয়েছে বাঙালীরই। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হলেও এই গ্রন্থের রসগ্রহণে সমর্থ হবার ক্ষমতা এই শতাব্দীর এমন কি পরবর্তী শতাব্দীর সাধারণ মানুষেরও ছিলনা। তাই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

সুন্দর এবং সামগ্রিক জীবন চেতনার নামই সংস্কৃতি। চলনে-বলনে, মনে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচারে-আচরণে অনবরত সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিবানতা। সুরুচি ও সৌজন্যেই তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

কিন্তু বীজের আত্মবিকাশের জন্য যেমন কর্ষিত ক্ষেত্র প্রয়োজন, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের জন্যেও তেমনি সুকর্ষিত মনোভূমি বা পরিশ্রুত চেতনা আবশ্যক। আর চেতনা মঙ্গলময় বা আনন্দময় হয়ে ওঠে তখনই যখন দেশ-কাল-সমাজে থাকে স্থিতি। নতুবা আনুপাতিক ভারসাম্য খুইয়ে সংস্কৃতি তার বিশুদ্ধি হারায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্যাসঙ্কুল, নৈরাজ্যময়, অশান্ত যুগজীবনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গীয় সংস্কৃতি তাই খুব সঙ্গ ত কারণেই তার সৌন্দর্য, তার সুস্থতা হারাতে বসেছিল।

এই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বরূপ বর্ণনার আগে সংস্কৃতির বিভিন্নরূপ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

টমাস মান্ তাঁর 'Joseph and his Brothers' উপন্যাসের কথারম্ভে বলেছন, "very, deep is the well of the past, should we not call it bottomless ? " বঙ্গ সংস্কৃতির 'well of the past'ও কম গভীর নয়। সুদূর বৈদিক কালে, অথবা সুদূরতর সিন্ধুসভ্যতার কালে পিছিয়ে গেলে হয়ত তার তল খুঁজে পাব। আমরা জানি, বাংলাব সংস্কৃতিতে আর্যেতর মৌলিক সংস্কার এবং আগন্তুক আর্য সংস্কার একাকার হয়ে মিশে রয়েছে। স্থানীয় লৌকিক ধ্যান-ধারণাগুলো যেমন আপন খুঁটি আঁকড়ে টিকে রয়েছে, তেমনি পৌরাণিক কালের, বৌদ্ধ যুগের, উপনিষদের সময়ের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কার সবই এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। আর এই ভাবে লৌকিক ও

পৌরাণিক ঐতিহ্য মেশামেশি হয়ে একদম নিজস্ব একটা সংস্কৃতি-র জন্ম হয়েছে বাংলায়। কিন্তু বঙ্গভূমি আকারে ছোট নয়। নানা জাতি-বর্ণ-ধর্মের অবস্থান সেখানে। আর তাদের সাধনার মাত্রা বা পদ্ধতিও সমান নয়। তাই বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে এসেছে গৌত্রিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, আর্থিক এবং আত্মিক বৈষম্য ও বিভিন্নতা। আলোচনার সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সংস্কৃতিকে ৬টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

১. বস্তু-আশ্রয়ী সংস্কৃতি
২. বাক্-আশ্রয়ী সংস্কৃতি
৩. অঙ্গভঙ্গি-আশ্রয়ী সংস্কৃতি
৪. খেলাধূলা-আশ্রয়ী সংস্কৃতি
৫. লিখন-আশ্রয়ী সংস্কৃতি বা অঙ্কন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি
৬. বিশ্বাস-অনুষ্ঠান আশ্রয়ী সংস্কৃতি।[১৪]

।। বস্তু আশ্রয়ী সংস্কৃতি ।।

বস্তু আশ্রয়ী সংস্কৃতির অন্তর্গত হল — খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান, পরিধান-প্রসাধন দ্রব্য, যানবাহন, নেশাদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। মানুষের জীবনে এবং সমাজে সম্পদ ও সমস্যা, সমৃদ্ধি ও দৈন্য, আনন্দ ও যন্ত্রণা যে পাশাপাশি চলে নিত্য সহচরের মত, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য থেকে বস্তু আশ্রয়ী সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করলে তা বোঝা যায়। যেমন—

খাদ্য-পানীয়

কবি ভারতচন্দ্র তার সমসাময়িক কালের ভদ্র-সমাজের পাক-প্রণালীর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে। এখানে দেখি, ভবানন্দ মজুমদারের পত্নী পদ্মমুখী দেবী অন্নদার পূজাপোলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য রন্ধনের ব্যবস্থা করেছেন। নিরামিষ, আমিষ, অম্ল-মধুর, তিক্ত-কষায় - কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি নেই সেখানে।[১৫]

বাঙালীর রন্ধন তালিকায় মাছ-মাংসের আয়োজন হ'ত শুধু উচ্চ-সম্পন্ন পরিবারেই। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের 'হরিশ্চন্দ্র' পালায় রাণী মদনা স্বহস্তে মাংস রান্না করেছেন (তবে সে মাংস ধর্মের বরে প্রাপ্ত পুত্র লুইচন্দ্রের)। সেকালে মাংস রান্নার রেওয়াজটা যে বেশ প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায় —

পরিপাটি মাংসের রন্ধন হৈল সব।।
অপর উত্তম অন্ন করিল রন্ধন।
পরিপাটি পাঁচ মিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।।[১৬]

সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে অবশ্য মাছ মাংস নয়, পরিপাটি করে নিরামিষ রান্নাই করতেন গৃহিণীরা। রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যে এমন ছবি বেশ আন্তরিক ভাবে ফুটে উঠেছে। অভুক্ত স্বামী-সন্তানকে এখানে যত্ন করে অন্ন পরিবেশন করছেন পার্বতী —

দড় বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।
খাত্যে খাত্যে গিরীশ গৌরীর গান যশ।।
সিদ্ধদল কোমল ধুতুরা ফুল ভাজা।
মুখে ফেল্যা মাথা মাড়ে দেবতার রাজা।।
উল্বণ চর্ব্বণে ফির্যা ফুরাইল ব্যঞ্জন।
এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন।।
সুরবাদ্যে সুপদ্যে নৃত্যকী যেন ফিরে।
সুবস পায়েস দিল পিষ্টকের পড়ে।।[৯৭]

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুরিক্ষা বারবণিতা। কিন্তু স্বহস্তে নানাবিধ রান্না করে অতিথি সেবার ব্যাপারে তারও আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। সে লাউসেন ও কর্পূরের খাওয়ার আয়োজন করেছে পঞ্চ-ব্যঞ্জন সহযোগে।[৯৮]

তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজেব আহার-বিহারে আবার বিবিধ মিষ্টান্নের বর্ণনা পাওয়া যায়। নবহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস'-এ মালসাভোগের 'চিড়া মহোৎসব'-এর উল্লেখ আছে। এই চিড়া মহোৎসব মূলত মিষ্টান্ন নির্ভর। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে যে সব আহার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে এটুকু স্পষ্ট যে সেযুগে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু পিঠা, পায়েস ইত্যাদি মিষ্টান্ন দ্রবের বহুল ব্যবহার ছিল।

নিম্নবিত্ত মানুষজনের খাদ্য-পানীয়ের দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। যেমন - মাণিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল কাব্যে গরীব কালু ডোমের খাদ্যতালিকায় রেখেছেন 'শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ' এবং তাদের চাহিদা ও বেশী নয় - 'হাণ্ডা দশ হলে হয় উদর পূরণ।[৯৯]

মৈমনসিংহ গীতিকার 'মলুয়া' পালায় দরিদ্র কৃষক চান্দ বিনোদের কাঁচালঙ্কা সহযোগে পান্তাভাত ভক্ষণের কথা পাই —

ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা দিল মায়।
কাচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায়।।[১০০]

তবে দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙালী অতিথি বাৎসল্য হারায় নি। চান্দ বিনোদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল মলুয়ার পিতৃগৃহে চান্দ বিনোদকে আপ্যায়নের জন্য রান্না হয়েছিল —

মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্যা লইছে রুইমাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা।।[১০১]

এসবের সঙ্গে পিঠে পায়েসের ব্যবস্থাও ছিল —

পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি।
পোয়া বই খাইল কত রসে ঢলাঢলি।।[১০২]

সুতরাং রাজকীয় বৈভব না থাকলেও সাধারণ মানুষের ঘরে মাঝেমধ্যে বেশ উন্নতমানের বসনাতৃপ্তির ব্যবস্থা হত দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এমন কিছু মানুষের সন্ধান পাই যারা নিরন্ন। সামান্য দুটো ভাতের প্রত্যাশী। এই বিত্তশূন্য মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জটিল, বিপর্যস্ত অর্থনীতি এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়েছে। রাজসভাকবি হয়েও ভারতচন্দ্র মানবতার খাতিরে এদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদার কাছে সমবেত দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যে বর প্রার্থনা করেছিল ('আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে') কিছু পরবর্তীকালে রচিত রামপ্রসাদের শাক্তপদগুচ্ছ পড়লে বোঝা যায় দেবী তার সে চাহিদা পূরণ করেননি। নতুবা এই বিরাট সংখ্যক অন্নহীনের জন্ম হত না। বিত্তের তারতম্য দু'টি শ্রেণীর মানুষের খাদ্য তালিকায় যে কতখানি ফারাক তৈরী করেছিল প্রসাদী পদ তার প্রমাণ —

করুণাময়ি কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (গো তারা)
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ।।[১০৩]

বা,

কেবা বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি।
কেহ সারাদিনে পায়না খেতে, কেহ দুধে খায় সাঁচা চিনি।।[১০৪]

বাসস্থান

এবার আলোচনা করব বাসস্থান নিয়ে। ধনবৈষম্য গৃহনির্মানেও ছায়া ফেলেছে।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশে বর্ধমানরাজের গড় বর্ণনা করেছেন কবি। রাজপুরীর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এখানে নিখুঁত কৌশলে উপস্থাপিত। সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি —

এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া।।
সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর।
নৈবেত বাজিছে বালাখানার উপর।।[১০৫]

উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হীরা মালিনীর বাগানবাড়িটিও ভারতচন্দ্র ছবির মত ফুটিয়ে তুলেছেন —

দুর্গা বলি সকৌতুকে লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি কুচা
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি।।[১০৬]

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র একাধিক গাথায় ধনীব্যক্তির গৃহনির্মাণের প্রসঙ্গ আছে। যেমন - 'দেওয়ান ভাবনা' গাথার দেওয়ানের বাড়িতে ছিল বার বাংলার ঘর — 'বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বার বাংলার ঘরে'। তাছাড়া এ গাথায় জমিদার পুত্র মাধব সুনাইকে তাদের প্রলুব্ধ করতে তাদের সমৃদ্ধির যে বিবরণ দেয়, তাতেও জমিদার গৃহের ঐশ্বর্য পরিস্ফুট। মাধবের পিতার ছিল লাখ টাকা আয়ের জমিদারি, বাড়ির সামনে উদ্যান, বাড়ির পিছনে সানে বাঁধানো ঘাটসহ পুষ্করিণী, আর সেই পুষ্করিণীর মধ্যে গ্রীষ্মকালীন আমোদ-প্রমোদ, বিশ্রামের জন্য নির্মিত হয়েছিল 'জলটুঙ্গীর ঘর'। এছাড়া বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বৈঠকখানা ঘরও ছিল, যার নাম 'কামটুঙ্গীর বাসা' —

বাপের আছে ধন দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
... ...
বাড়ীর আগে ফুল বাগিচা লাল আর নীল।
... ...
বাড়ীর পাছে বান্ধা ঘাট আছে পুষ্করিনী।।
... ...
বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর।
... ...
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর বাসা।[১০৭]

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' গাথায় দেওয়ান ফিরোজ খান জঙ্গল কেটে পুরী নির্মাণ করিয়েছিলেন। চল্লিশ বিঘা জমির আগাছা পরিস্কার করে তাঁর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। বড় বড় দীঘি, সামনে সান বাঁধানো ঘাট, বার বাংলার ঘর, তাতে সোনার কপাট, কপাটে আয়না, বাড়িতে অপূর্ব পুষ্পোদ্যান সিংহদরজায় উড়ন্ত স্বর্ণপতাকা — সব মিলিয়ে দেওয়ানের প্রাসাদকে সুরম্য পরী-স্থান বলে ভ্রম হত।[১০৮]

'কমলা' গাথায় জমিদারের অধীনস্থ একজন চাকলাদারের বাসগৃহ নির্মাণেও সম্পদের ছাপ সুস্পষ্ট। চাকলাদারের বাড়িতে চৌচালা, আটচালা মিলিয়ে মোট কুড়িটি ঘর। তাতে উলুছনের ছাউনি, সুন্দরবনের সুন্দি বেতের বাঁধন সেসব ঘরে। পাঁচমহালে বিভক্ত তার অট্টালিকায় ছিল কাছারিবাড়ি, পূজাবাড়ি, অন্দরমহল, রান্নাবাড়ি ও গোহালবাড়ি —

চৌচালা আটচালা তার ঘর যত খানি।
সুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি।।
পাঁচ খণ্ড বাড়ী তার বিশ গোটটা ঘর।
হাজারে বিজারে খাটে দাঙ্গর গাবর।।[১০৯]

এছাড়া 'রূপবতী' গাথাতেও রামপুররাজ রাজচন্দ্রের ফুলেশ্বরী নদীর তীরে বারবাংলার ঘর ও লক্ষ টাকার জমিদারির বিবরণ পাওয়া যায়।

এইসব প্রাচুর্য ও চোখধাঁধানো বৈভবের আড়ালে দরিদ্র মানুষেরা কোনোরকমে নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছিল। তবে বিপদে পড়ত হত অতিথি এলে। তাকে বসতে শুতে দেবার মত সামান্য স্থানও সেইসব কুঁড়েয় বাড়তি থাকত না। তাই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের হরিহোড় আতিথ্য গ্রহণে অভিলাষী বৃদ্ধাবেশী অন্নদাকে তার পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট বাসায় জায়গা দিতে নারাজ —

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।।[১১০]

রামপ্রসাদের পদে দেওয়ালে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কুঁড়ে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। তাও প্রয়োজনে চাল ছাইতে খড়েব যোগান দিতে পারত না এই সব গরীব মানুষের দল —

মাটির ঘরে বাঁশের খুঁটি মা
তায় পারি না খড় জোটাতে।[১১১]

রামপ্রসাদ প্রতিবাদী কবি। মাতৃভক্ত হয়েও তিনি স্পষ্ট ভাষার ধনী-দরিদ্রের আবাসগত বৈষম্যের প্রতি মায়ের নজর আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। বলেছেন —

কেহ শুয়ে তেতালাতে, পালঙ্কে মশারি টানি।
আমরা মড়ি শুড় শুড়য়ে, ভাঙ্গা ঘরে নাইক ছানি।।[১১২]

অর্থাৎ সেই সময় তিন-চারতলা অট্টালিকার প্রচলন ও ছিল।

পরিধান-প্রসাধন

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিধান-প্রসাধন সম্পর্কে এক এক কবি এক একরকম মত দিয়েছেন। তবে দেব-দেবী কিংবা উচ্চবিত্ত নরনারীর আবরণ ও আভরণ বর্ণনায় তাঁদের ঐকমত্য লক্ষিত হয়। পরিধানের মধ্যে 'কাঁচলি' এই সময় সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এছাড়া মূল্যবান বিভিন্ন শাড়ী কিংবা ঘাগড়ার কথা পাওয়া যায়। তবে পরিধানের থেকেও প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে বহুমূল্য অলংকার এবং পুষ্পাভরণ সম্পর্কে কবিদের আকর্ষণ বেশী ছিল বোঝা যায়।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের তিনটি পালায় মূলত নারীর সাজসজ্জার বিস্তৃত বিবরণ পাই। এগুলি যথাক্রমে, 'শালে ভর পালা' (রাণী রঞ্জাবতীর অঙ্গসজ্জা), 'আখড়া পালা' (দেবী পার্বতীব প্রসাধনকলা) এবং 'মায়ামুণ্ড পালা' (কানড়ার প্রসাধন প্রসঙ্গ)। রত্নময় বিচিত্র কাঁচুলীর প্রসঙ্গ তিনটি ক্ষেত্রেই পাই। যেমন 'আখড়া পালায়' —

কুচযুগ হিমগিরি হরমনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব অগোচর।।[১১৩]

রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যে তো ' বিশ্বকর্মা কর্তৃক পার্বতীর কাঁচলি নির্মাণ' নামে স্বতন্ত্র একটি পালার অবতাবণা করা হয়েছে।[১১৩(ক)] নারীর অঙ্গ-সজ্জায় এবং কেশ-প্রসাধনে বিভিন্ন ফুলের সাহায্য নিয়েছেন কবি ঘনরাম। যেমন, 'শালেভব পালা'য় রাণী রঞ্জাবতীকে সাজতে দেখি এই ভাবে —

শশীমুখী রাণীর রচিল লাসবেশ।।
আচাড়িয়া চাঁচড় চিকুরে চিত্র বেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনি।।
কবরী মণ্ডিত মাল্যে মনোহব ফুলে।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রম অলিকুলে।।
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারা গায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা।।[১১৪]

আর কানাড়াকে খোঁপা বাঁধতে দেখা যায় মল্লিকা বকুল ফুল দিয়ে —

কবরীমণ্ডিত মালা মল্লিকা বকুল।
মকরন্দ লোভে যেন মত্ত অলিকুল।।[১১৫]

এছাড়া বহুমূল্য রত্নখচিত অলঙ্কার বর্ণনা তো আছেই। আখড়া পালায় দেবী পাবর্তী পরেছেন —

অলকামণ্ডিত মনি মুকুতার পাঁতি।।
কবরী মণ্ডিত মালা মুকুতার ফুল।

সে দেবী পরেছে কত রত্ন অলঙ্কার।।
গজমতি হার পুঁতি দোমতি তেমতি।[১১৬]

'শিবায়ন' কাব্যের 'ভবানীর বাসরসজ্জা' অংশেও প্রায় একইরকম বর্ণনা আছে।[১১৭]

'শঙ্খপরিধান জন্য পার্ব্বতীর সজ্জা' অংশে নানাবিধ অলঙ্কারের উল্লেখ পাই। সেই সময় নূপুরের চল ছিল খুব বেশী। প্রত্যেক কবির কাব্যেই অঙ্গসজ্জা বর্ণনায় 'নূপুর'-এর উল্লেখ আছে। যেমন - বিদ্যা-সুন্দরেব 'বিহার' অংশে ভারতচন্দ্র কঙ্কণ, ঘুঙুর এবং নূপুরের কথা বলেছেন —

ঝন ঝন কঙ্কণ রণ বণ নূপুব
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে।[১১৮]

'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অনেকগুলি পালায় নারীর প্রসাধন কলার পবিচয় পাই। যেমন 'ভেলুয়া সুন্দরী ও আমির সাধুর পালা'য় দেখা যায় আমিরের সঙ্গে ভেলুয়ার বিয়ের পর স্বামী-গৃহে যাত্রার সময় সাত ভাইয়ের বউ এসে ভেলুয়াকে সাজিয়ে দেয় —

হার পরাইল গলায় আর দিল হাসুলি।
নাকে দিল করম ফুল কানে দিল বালি।।
তোড়ল্ তাড়ন্ দিল দেসরা বাজুবন্।
দোনো হাতে পরাই দিল সোনার কঙ্কণ।।
চুলেতে মাখাই দিল আতরেব পানি।
মাথার উপরে দিল সিঁথির ঢাকনি।।
ঘুঙ্গুরু পরাইয়া দিল দোনো পায়ের মাঝে।
সোন্দরী ভেলুয়া সাজিল অপরূপসাজে।।[১১৯]

'কমলাকন্যাব পালা'য় কমলার বিয়েব সাজ বর্ণিত হয়েছে এইভাবে —

আচড়িয়া চিকণ কেশ মাথায বান্ধে খোপা।
কাঁটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা।।
তারপর পরাইল শাড়ী নামে আশমান তারা।[১২০]

এখানে 'আশমান তারা' শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া 'দেওয়ান ভাবনা' পালায় 'অগ্নি পাটেব শাড়ী' নামে আর এক ধরণের শাড়ীর প্রসঙ্গ পাই —

বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী।
তোমারে দিয়াম কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী।।[১২১]

এই সব শাড়ীর পাশাপাশি বাংলার বিখ্যাত বুটিদার ঢাকাই মসলিনের নামও পাই। রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের 'বাজার বর্ণন' অংশে আছে —

বনাত মখ্‌মল পট্টু ভূষনাই খাসা।
বুটাদার, ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।।[১২২]

পরিধান-প্রসাধনের রাজ্যে নারীর অধিকারই একচেটিয়া। তাদের সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা করেছেন কমবেশী সব কবিই। কিন্তু পুরুষের প্রসাধন বর্ণনায় কবিদের নীরবতা খুব বেশী রকমের চোখে পড়ে। অবশ্য দু'এক জায়গায় পুরুষের অঙ্গসজ্জার বর্ণনা পাই। যেমন, 'রঙ্গমালা সুন্দরী চৌধুরীর লড়াই পালা'য় রাজচন্দ্র সম্পর্কে গাথাকারের উক্তি —

এই না কথা রাজচন্দর যখন শুনিল।
সাজন পরণ করণ লাগি আপন ঘরত্ গেল।।
সোনালী ধুতির কোঁচা তেপেঁচি করিয়া।
গোলাবী চাদ্দর কান্ধে দিল ত তুলিয়া।।
গন্ধ তৈল মাথায় দিল চাদরে গুলাবী আতর।
বেঁকা টেরি কাড়ি দেখে আয়নার ভিতর।।
তারপরে ত জরির জুতা পায় লাগাইয়া।
শ্যামপ্রিয়ার কাছে গেল নাগর সাজিয়া।।'[১২৩]

উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নিম্নবিত্তদের পরিধান প্রসঙ্গও বারে বারে পাই। 'কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায়না ছেঁড়া টেনা'- এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরাই সেসময়ে ছিল সংখ্যাধিক।। মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লোহাটা বজ্জরের অতি তীব্র ভাষণে দরিদ্র কালুর বসন-ভূষণের বর্ণনা পাওয়া যায়—

পরিধান ছিল কলাপাতের কৌপীন।।
হরিসর হেঁটে ছিল হোগলের কুড়্যা।
দিবসে বাতাসে যাইত দশবার উড়্যা।।[১২৪]

কবি রামেশ্বরের 'আখোটি পালা'র ব্যাধ-পত্নীর পরনের সম্বলও এর চেয়ে খুব একটা উন্নত ছিল না।[১২৫]

অবশ্য 'শিবায়ন' কাব্যে বাগ্‌দিনীর বেশভূষার পারিপাট্য চোখে পড়ে —

দু হাতে দুগাছি মাঠ্যা　　কাপড় পর্যাছে আঁট্যা
খাট কর্যা আঁটুর উপর।
গলায় রসের কাঠি　　হিঙ্গুলের পলাদুটি
পুঁতি বেড়া সাজ্যাছে সুন্দর।[১২৬]

অন্যদিকে সাধারণ বাঙালী ঘবেব দরিদ্র কুলবধূরা সামান্য শাঁখা আর লালপাড় শাড়িতেই পরম আনন্দ পেত। 'শিবায়ন' কাব্যের পার্বতীর শাঁখা পরার আগ্রহে এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ কবিপত্নীর জবানীতে এই সত্য পরিস্ফুট। অবশ্য সবসময় তাঁদের ভাগ্যে এই সামান্য দুটো বস্তুও মিলত না। তাই আক্ষেপ করে কবিপত্নী বলেছেন —

শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।[১২৭]

আর যদি মিলত তাহলে দাম্পত্য জীবনের অম্লরস 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এ পরিণতি লাভ করত অনায়াসেই। শিবায়ন-কার শাঁখার বিনিময়ে হর-পার্বতীর মিলনদৃশ্যটি এইভাবেই জমজমাট করে তুলেছেন।

মানবজীবনের মৌল চাহিদা — খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়। বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতিব কেন্দ্রীয় বিন্যাস এগুলি নিয়েই। আর এই তিনটিকে পুষ্টি দিতে আরও কতকগুলি উপাদান বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথা, যানবাহন, নেশাদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন বৃত্তির সরঞ্জাম বা দৈনন্দিন জীবনচর্যায় ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি।

যানবাহন

অষ্টাদশ শতাব্দীর যাতায়াত ব্যবস্থায় পশ্চাদ্‌পদতার পরিচয় আছে। নৌকা এবং পালকি এই শতাব্দীর মুখ্য বাহন ছিল।

বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে খিদিরপুরের ভূস্বামী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের নৌকাযোগে কাশীযাত্রার বর্ণনা পাই। ভাজনঘাটের পুঁটিমারি থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত জলপথের এবং নদীতীরস্থ বিভিন্ন অঞ্চলের কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মৈমনসিংহগীতিকার 'রূপবতী' পালায় রাজা রাজচন্দ্র নবাবের মুর্শিদাবাদ শহরে যাবার জন্য নৌকা ব্যবহার করেছেন। এই উপলক্ষে কানা চইতা ও উভুতিয়া নামে দুই ভাই পানসি সাজাবার নির্দেশ পেয়েছিল —

কানা চইতা উভুতিয়া তারা দুইটি ভাই।
পানসী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই।।
ষোল দাঁড় জুইত করে আরও তুলে পাল।[১২৮]

'দেওয়ান ঈশা খাঁ' পালায় ঈশা খাঁর দিল্লী গমনোপলক্ষে নৌকাযাত্রার কথা পাই। তার পানসি সাড়ে সাত হাজার হাত দীর্ঘ এবং দাঁড়ীর সংখ্যা দুই সহস্র —

সাড়ে সাত হাজার হাত দীর্ঘ তার ছিল।
ফাড়ে হাজার হাত উচা পঞ্চাশ দিল।।
দুই হাজার দাঁড়ী আছিল সেই নায়ের।
মাঝি আছিল সাধন পদ্মার পাড়ের।।[১২৯]

যাতায়াত ও গমনাগমনের বিষয়টি বণিকবৃত্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। নদীপথে পাল তুলে বণিকের সারি সারি নৌকা চলাচলের বর্ণনা একাধিক গীতিকায় পাওয়া যায়। যেমন —

কত সাধু আইসে যায় কত ডিঙ্গা বাইয়া।
নানা দেশে যায় তারা এই পত দিয়া।।[১৩০]

স্থলপথে পালকির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। অবশ্য শুধুই সম্পন্ন গৃহস্থের। যেমন — 'কমলা'য় চাকলাদার কন্যা কমলা ও তার মায়ের পালকিতে চড়ে মাতুলালয়ে যাবার বিবরণ পাওয়া যায় — 'পালকী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।'[১৩১]

রাজন্যবর্গও পালকির ব্যবহার করত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'মানসিংহ' অংশে ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা বর্ণনা উপলক্ষে কবি লিখেছেন —

বাপ মায় প্রণমিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর।[১৩২]

বহু স্থান ঘুরে নীলাচল হয়ে তিনি দিল্লীতে উপনীত হলেন। তাঁর সঙ্গী মানসিংহ অবশ্য হস্তীপৃষ্ঠে যাত্রা করেছিলেন —

জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ।।
গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার।।[১৩৩]

কিন্তু পালকির আরোহীর সঙ্গে পালকি বাহকের জীবন-ছন্দের বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন একমাত্র রামপ্রসাদ। পথ অতিক্রমণের জন্য তাদের পা দুটোই একমাত্র ভরসা। কবি তাই বলেছেন —

কেউবা বেড়ায় পাল্‌কী চড়ে আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়েছি গো মই।।[১৩৪]

আবার কখনও বলেছেন ,

কেহ যায় মা পাল্‌কি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।[১৩৫]

নেশাদ্রব্য

নেশাদ্রব্যের আলোচনায় বিশেষ কোনো একটা শতাব্দীর ওপর জোর দেওয়া যাবে না। কারণ, ভাঙ-চণ্ডু-চরস-গাঁজা-মদ-তামাক প্রভৃতিতে বঙ্গদেশীয়ের আসক্তি আবহমানকালের। আর এই আসক্তিকে খুব একটা নিন্দনীয় বলেও মনে করা হত না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল। অবশ্য তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব তাকে দেবভোগ্য হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে খুঁজে মূলত তিন ধরনের নেশাদ্রব্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়— তামাক, মদ এবং সিদ্ধি। আহ্‌মদ শরীফ তামাক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "মধ্যযুগেই এই নতুন ঔষধির এ দেশে আমদানি। সম্ভবত এও পর্তুগীজদের দান। শোনা যায়, রাজা- বাদশাহ্‌র মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরই প্রথম তামাক-সেবী। এতেই বোঝা যায়, তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল, এ ছিল পুরোপুরিই বিলাস-ব্যসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব অবলম্বন। আভিজাত্য, ধন ও মানের বড়াই পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিসে সামাজিক আড়ম্বর প্রকাশের প্রতীকরূপে সুদীর্ঘ সুন্দর জরি-জড়ানো নল ও কারুময় রৌপ্য-খচিত সুগোল কলিকাযুক্ত দামী বৃহৎ ধাতব হুক্কায় ধূমপান বা সুগন্ধ তামাক সেবন একটি আনুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা পায়। ....

সস্তা, সহজলভ্য, সুসেব্য ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাবিহীন হওয়ায় তামাক সেবন শীগগিরই গণ অভ্যাসে পরিণতি পেল। বলতে গেলে এমন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নিরপেক্ষ গণসেবা বস্তু বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই।"[১৩৬]

তামাকের এই বহুল ব্যবহার এবং জনচিত্তজয়ী ভূমিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর দু'একজন কবিকে কাব্য রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করল। রচিত হল, 'তামাকুপুরাণ', 'হুক্কাপুরাণ' ইত্যাদি। রচয়িতা — সিত কর্মকার, শান্তিদাস এবং রামপ্রসাদ। কবিরা তাঁদের কাব্যে তামাক-সেবনের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। যেমন - সিত কর্মকার তাঁর 'তামাকুপুরাণ' কাব্যের উপসংহারে বলেছেন —

ভারতে জন্মিয়া যেবা তামাকু না খাএ
অন্তকালে সেই পাপী স্বর্গেত না যাএ।

পরলোক জন্ম হএ শৃগাল উদরে
হুক্কা হুক্কা বলি ডাক ছাড়ে উচ্চৈস্বরে।[১৩৭]

শান্তিদাসের 'হুক্কাপুরাণেও তামাকের দৈবী ভূমিকা স্বীকৃতি পেয়েছে —

তামাকু হইল দেখ পৃথিবীর সার
গাঁজা ভাং ধুতুরা তবে হইল অবতার। [১৩৮]

অবশ্য তামাক-সেবন না করেও স্বর্গের প্রত্যাশা করা যায়. যদি 'তামাকু পুরাণ এই শুনে কোনজনে' এবং 'একমনে শুনিলে সে স্বর্গপুরে যাএ।'[১৩৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শেখসাদীর 'গদামালিকা সম্বাদ'এ তাম্রসেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলা হয়েছে —

গদাএ কহে যেইক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।[১৪০]

আর'লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হাতে' — এটাই সম্ভবত কলিকালের মুখ্য লক্ষণ।

নিঃসন্দেহে তামাক-আচ্ছন্ন দেশে এই বক্রোক্তি গ্রাহ্য হয়নি। তবে এই নেশাকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীরই এক কবি আফজল আলি। 'নসিয়তনামা' কাব্যে তিনি গাজা-তামাক সেবনকে 'পাপকর্ম' বলে চিহ্নিত করেছেন।

'গাঁজা'র মাহাত্ম্যও কীর্তন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন কবি। নাম - রামানন্দ। 'মনের গৌরবেতে চিন্‌লি না রে অরে গাঁজাখোর।' [১৪১]— পদটি সেই সময় বেশ সাড়া ফেলেছিল।

নেশাদ্রব্যের তালিকায় মদের স্থানও বেশ উঁচুতে ছিল। সেকালে গুড় থেকে প্রস্তুত সব রকমের গৌড়ীয় মদের খ্যাতি ছিল সর্বভারতীয়। ভাত, গম, মধু, আখ, তালরস প্রভৃতি মজিয়ে নানারকম মদ প্রস্তুত করা হত। বাংলার আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এমনকি হতদরিদ্র মানুষের মধ্যেও মদ্যপানের প্রচলন ছিল। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কালুডোমের মত পানাসক্ত চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে। তার বীরত্ব, তার মহত্ত্ব, তার আত্মত্যাগ, মদ-মাংসের প্রতি আকর্ষণের আদিম বন্যাতায় অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। এই পানাসক্তির জন্যই সে কানড়ার রাজ্যে বিপদে পড়েছিল। কারণ, মাদকদ্রব্য দেখলে কালু দিগবিদিক জ্ঞান হারায় —

ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি পিয়ে পোস্ত মদ।
ভাজাভুজা পেয়ে বলে পেলাম ইন্দ্রপদ।।

* * * *

খেতে খেতে অজ্ঞান গরল গলে গালে।
তখন বান্ধিয়া দাসী থুইল বন্দিশালে।।[১৪২]

শুঁড়িবাড়ির প্রতি কালু এবং তার অনুচরদের অশালীন আনুগত্যের পরিচয়ও আছে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে।

অন্যায়ের প্রতিবাদে কালু সরব। তার জীবন বিসর্জন লাউসেনের প্রতি তার গভীর নিষ্ঠাই প্রমাণ করে। অসীম সাহস, অমিতশক্তি ও আত্মত্যাগে কালু অনন্য হয়েও আমৃত্যু অবিচল থাকে তার মদ্যাসক্তি। তাই দেবীর বরে জেগে উঠে স্বর্গে যাবার পূর্বমুহূর্তে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর কালু বেঁকে বসে। কারণ —

কালু কয় মহারাজ মনে অবিসার।
জিউ গেলে না ছাড়িব জেত্যের ব্যবহার।।
স্বর্গে গেলে সদ্য যদি মদ্য মাংস পাই।
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গে যাই।।[১৪২(ক)]

এমনকি দেব-দেবীর দর্শনের প্রলোভনেও তাকে ভোলানো যায় না —

কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ।
মদ্য মাংস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ।।[১৪৩]

অর্থাৎ স্বর্গের সুখভোগের চেয়ে ইহজাগতিক স্থূল চাহিদা তার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বস্তুত, কালুর মতই মদ্যাসক্তি তৎকালীন সমাজে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু মানুষের মধ্যে ছিল।

সমাজে সিদ্ধি-ভক্ষণের রেওয়াজও ছিল যথেষ্ট। বিশেষত সিদ্ধিতে নেশা জমে উঠত বলে নিদ্রাবিলাসী বাঙালী এর কদর করত। তার ওপর দৈব দৃষ্টান্ত তো ছিলই। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'সিদ্ধি ঘোটন' ও 'সিদ্ধিভক্ষণ' অংশে যথাক্রমে সিদ্ধি তৈরীর কৌশল এবং শিবের সিদ্ধিগ্রহণ করে নেশাচ্ছন্ন হবার ছবি এঁকেছেন।

সিদ্ধি তৈরীর উপাদান হল, গুঁড়োসিদ্ধি, ধুতরা ফল, মহুরী, মরিচ, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা। ঘন দুধে এই সব উপাদান মিশিয়ে ভালভাবে নেড়ে 'সিদ্ধি' তৈরী হয়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন —

দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা।।[১৪৪]

আহারান্তে বাঙালীর পান চিবোনোর অভ্যাস বহুদিনের। মুখকে সুবাসিত এবং ঠোঁটকে রঞ্জিত করার জন্যই অবশ্য পান খাবার রেওয়াজ চালু হয়েছিল। পানের সঙ্গে মিশ্রিত হত খয়ের চুন সুপারি-সহ বিভিন্ন প্রকার মশলা ও সুগন্ধিদ্রব্য—

দুপাশে পূর্ণিত পানে পুরট সাপুড়া।।
লবঙ্গ কর্পূর আদি সুরসাল গুয়া।
বাটাপূর্ণ পরিমল সকস্তুরী চুয়া।।[১৪৫]

আর গৃহিণীরা স্বামীর অবসর বিনোদনের সময় এই 'ছেঁচা গুয়া তাম্বুল যোগান হাতে হাতে।।'

বস্তুত, পান সঠিক অর্থে নেশাদ্রব্য না হলেও বিনোদনের অঙ্গ-হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

বাদ্যযন্ত্র

বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আলোচনায় বাদ্যযন্ত্রও উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বাদ্যযন্ত্রের ঘন ঘন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এর প্রয়োগের দিকে কবিদের সচেতন দৃষ্টি ছিল। যেমন — বাদ্যযন্ত্র কখনও যুদ্ধের, কখনও পূজানুষ্ঠানের, কখনও বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের, কখনও শুভযাত্রায় আবার কখনও বা সঙ্গীত নৃত্যাদির সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার রূপ বদল ঘটে গেছে।

যুদ্ধ বাদ্য হিসাবে কবিরা মুখ্যত ব্যবহার করেছেন তূরী, ভেরী, শিঙ্গা, দামামা প্রভৃতি গম্ভীর নাদী বাদ্য। যেমন - 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'-এ একটি যুদ্ধ চিত্রে পাই —

পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে।।
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় শুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগড়ি সঘনে পড়ে কাড়া।
ধাও ধাও ধামাসা দামামা দাম দুম।
শিকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম।।[১৪৬]

ভারতচন্দ্র শব্দসিদ্ধ কবি। তাই বাদ্যের সুনির্বাচিত প্রায়োগের সময় তার ধ্বনিটুকুকেও তিনি তুলে ধরেন —

ধূ ধূ ধুধুধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্‌দম্

ঝনন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে।
কত নিশান ফরফর নিশান ধরধর
কামান গর গর গাজে।[১৪৭]

পূজানুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাদ্যের আদল আবার কিছুটা পৃথক। এক্ষেত্রে ঢাক, ঢোল শিঙার পাশাপাশি শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, বাঁশী প্রভৃতি গৃহবাদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ইছাইয়ের পূজা বাদ্যের সঙ্গে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর লাউসেনের পূজাবাদ্যের অমিল বিশেষ নেই। ঘনরাম দেবী পার্বতীর পূজার বর্ণনায় বলেন বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয়রোল।

শিঙা কাড়া কাঁসর দগড় ঢাকঢোল।।[১৪৮]

তুলনায় লাউসেনের ধর্মপূজায় বাদ্যের আয়োজন সংক্ষিপ্ত। তবু মাণিকরামের নির্বাচন সঠিক —

ধর্মশীলা আমিনী মাথায় পোড়ে ধুনা।
শঙ্খ ঘণ্টা ঢাল ঢাল সঘনে ঘোষণা।।[১৪৯]

বিবাহ-বাদ্য বর্ণনায় অভিনবত্ব কিছু নেই। যুদ্ধ-বাদ্য ও পূজা-বাদ্য — উভয়ের একত্র উপস্থিতি এখানে ঘটেছে। ঢাক, ঢোল, মাদল, শঙ্খ ও ঘণ্টার পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় সব কবিই। 'শিবের বরযাত্রা' বর্ণনায় রামেশ্বরও নতুন কিছু বলেননি ।[১৫০]

'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা'য় অবশ্য ঘনরামের বর্ণনা অনেক বেশী বাস্তবধর্মী —

কৌতুকে কামিণিগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলিময়।।
শুভক্ষণে কন্যাবরে করিয়া ছাউনী।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি।।[১৫১]

আলোচ্য শতাব্দীর কোনো কাব্যে বিবাহে 'সানাই'-য়ের উল্লেখ নেই। এ থেকে বোঝা যায় এ সময়ে এটি অপ্রচলিত ছিল।

যাত্রা প্রসঙ্গেও বাদ্যের প্রয়োগ করেছেন কবিরা। ভবানন্দের রাজসভা-যাত্র উপলক্ষে ভারতচন্দ্র সাড়ম্বর বাজনার ব্যবস্থা করেছেন ।[১৫২]

সঙ্গীত-নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গ খুব স্বাভাবিক। বাদ্যের সহযোগেই এ দুটির পূর্ণত ও সিদ্ধি। এবং এসব ক্ষেত্রে কবিদের বর্ণনাও সঙ্গত কারণেই স্বতঃস্ফূর্ত।

খোল, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, বাঁশী, তানপুরা ইত্যাদি যন্ত্র এই সময়ে বাজানো হত। 'অন্নদামঙ্গল' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন।।
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিনীর সঙ্গ।।
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ।।
অঙ্গুলে ঘুঙ্ঘুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।[১৫৩]

এই সব বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ-সঙ্গীতের সহযোগে বেজেছিল, বাজিয়েছিল বিদ্যার সখীগণ, সুন্দরের সঙ্গে তার মিলনকে মধুময় করতে।

।। বাক-আশ্রয়ী সংস্কৃতি ।।

ছড়া

বাক্-আশ্রয়ী সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন 'ছড়া'। উদাহরণস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দু'টি ছড়ার উল্লেখ করছি।

প্রথমটি হল - 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে'। সুপরিচিত এই ছড়াটি বর্গী হাঙ্গামার স্মৃতিবাহী। আলিবর্দীর শাসনকালে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত , টানা নয় বছর পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চলেছিল বর্গী হাঙ্গামা। লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ড আর নরহত্যার পাশবিক লীলায় মেতে ওঠা মারাঠা- বর্গী সৈন্যের হাতে ধ্বংস হচ্ছিল একের পর এক গ্রাম। স্বভাবতই গণমানসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আলোচ্য ছড়াটির মধ্যে সেই আতঙ্কের স্মৃতিটুকু জড়িয়ে আছে। আর আছে খাজনা দানে অনিচ্ছার মনোভাব —

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।।[১৫৪]

বুলবুলি তো ধান খায়না। খাজনা না দেওয়ার পক্ষে এ একটা অছিলা মাত্র। আসলে, বর্গীদমনে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হলে আলিবর্দি বাড়তি রাজস্ব আদায়ে বাধ্য হন। ইজারাদার থেকে তালুকদার হয়ে ক্রমে সে দাবি পূরণের দায় বর্তায় কৃষিজীবী সাধারণ প্রজাদের ওপর। প্রজারা ঐ রাজস্বের দাবিটুকু সহজে মেনে নিতে পারেনি। ডঃ মানস মজুমদার জানিয়েছেন, ছড়াটি বাঁকুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত।[১৫৫]

ইংরেজ আমলের শাসন ও বিচারব্যবস্থা নিয়ে বেশ কয়েকটি ছড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে চালু ছিল। দু'টি উদ্ধৃত করা হল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ গ্রহণকালে ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব লাভ না করলেও কার্যত তাঁরা সেই ক্ষমতাই ভোগ করতেন। কোম্পানীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, নবাব-প্রদত্ত দেওয়ানী পত্তনীর মধ্যে মোট চব্বিশটি জেলা ছিল এবং এই পত্তনীর বহির্ভূত চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান এই তিনটি জেলার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার সম্রাট শাহ্ আলম কর্তৃক ফরমানে প্রদত্ত হয়।[১০৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর ছড়াকার রামপ্রসাদ তাঁর রচনায় তৎকালীন শাসন ও বিচার বিভাগের এই বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ হলেও ছড়া দু'টো তেমন সুসংবদ্ধ নয়। অবশ্য কবিকে এজন্য বিশেষ দায়ী করা চলেনা। কারণ কোম্পানীর শাসনকালেব বিবরণ বর্তমানে সহজলভ্য হলেও তখন সুলভ ছিলনা।

প্রথম ছড়ায় শাসন বিভাগের পরিচয় পাই —

বাঙ্গালায় কৈরা দিলা　　পাঁচ আফিল ছাব্বিশ জেলা
কেলেক্টর জজ ফৌজদার।
কেলেক্টার তহশীলেতে　　জজ কর্ত্তা আদালতে
ফৌজদারী আইন মতে লিখে।।
চুরি ডাকাতি ফেলশানি　　মাইর পীট লুটিখুনি
এসব ফৌজদার মোতালকে।।[১০৭]

আর একটি কবিতাতেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। এটি 'নাটোরের কবিতা' —

আদালত ফৌজদারি　　কেহ কর্ত্তা কেলট্টরি
আফিলের কর্ত্তা কেহ হৈলা।
বুঝিলাম হক বটে　　জজসাহেব ধর্ম বটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান।।[১০৮]

এই ছড়া দুটির বর্ণনানুযায়ী দেওয়ানী আদালতের কর্তা ছিলেন কালেক্টর এবং তিনি দেশীয় দেওয়ানের সহায়তায় অন্যান্য আমলাদের নিয়ে বিচার করতেন এবং ফৌজদারি আদালতে তিনি জেলার কাজী এবং মুফ্‌তিদের সহায়তায় বছরে দুবার ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করতেন। বক্সী নাজির এবং মোল্লা, গঙ্গাজলীর উপস্থিতিতে বিচারকার্য চলত। এই বর্ণনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই তা নিম্নোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে —

"on May the 14th 1772, the Governor and Council came to a determination as to 'the constitutional ground work of all their

subsequent preccdings' and their decision may be summarised as follows:

3) The servants of the company employed in the districts under the designation of 'supervisors or supravisors were henceforth to be termed 'colectors'.

4) In each of the several districts a native office under the title of Diwan, should be appointed to inform or check the collectors."[১৫৯]

কোম্পানীর শাসনবিভাগের পাশাপাশি বিচার বিভাগের উপভোগ্য বিবরণ আছে আর একটি ছড়ায়। এখানে দায়রা বিচার কাহিনীর নীরস তথ্যকে ছড়াকার প্রতিমাপূজার উপমার সাহায্যে রসাল করে পরিবেশন করেছেন —

দিনেক দুই গতে হুকুম জারি ফৌজদারীতে
যেমত প্রতিমা পূজা হয়।[১৬০]

সঙ্গীত

বাক্ আশ্রয়ী সংস্কৃতির আর একটি অঙ্গ হল সঙ্গীত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে। সঙ্গীতের যাথাযথ্য এখানে স্বীকৃত হয়েছে।

রামেশ্বর চক্রবর্তীর 'শিবায়ন' কাব্যের আখ্যানে আছে ছড়া-গীত-কৃত্যের আদল। এ কাব্যের আসর বন্দনায় রামেশ্বর বলেছেন —

বন্দিব গন্ধর্ব্ব গায়েনের পায়।
গীতবাদ্য সে রাগ রাগিনী সমুদায়।।[১৬১]

ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ' অংশে বিদ্যা-সুন্দরের প্রথম মিলনকে সার্থক ও সুন্দর করতে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছেন। এখানে যুগ্মসঙ্গীতের প্রয়োগ লক্ষ্য করি —

সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা।।
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন।।[১৬২]

দুর্নিবার প্রকৃতিকে বশীভূত করতেও সঙ্গীতের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকার একাধিক পালায় খরাক্রান্ত দেশে গান গেয়ে বৃষ্টি নামানোর কাহিনী পাই (যেমন — 'ধোপার পাট', 'দেওয়ান মদিনা', 'কমলা কন্যা' ইত্যাদি)।

এছাড়া স্ত্রী আচারকে সাফল্যমণ্ডিত করতেও সঙ্গীতের ভূমিকা অপরিহার্য। যেমন — বিবাহের দিন ভোররাতে গীতসহকারে এয়োস্ত্রীদের জল আনতে যাবার কথা পাই 'কমলা' পালায় —

কাকেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী।
জল ভরিতে যায় সবে পাছে বাদ্যগীতি।।
নদীর ঘাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলাদিয়া।
গীতজুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া।।[১৬৩]

এই জাতীয় উদাহরণের অভাব নেই আঠার শতকের বাংলা সাহিত্যে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ অবদান বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব। এটা ধ্রুপদেরই একটা বিশেষ ঘরানা। এই ঘরানার বিশিষ্ট কলাবিদ্‌দের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, মাধব ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, নিতাই নাজীর ও বৃন্দাবন নাজীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক এই ঘরানার সাংগীতিক খ্যাতি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে টপ্পা গানের গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত। তাঁর টপ্পাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়।

শ্যামাসঙ্গীতে অদ্বিতীয় ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর রচিত গান 'প্রসাদী সঙ্গীত' নামে এবং তাঁর গীতি-ভঙ্গী 'প্রসাদী সুর' নামে প্রসিদ্ধ। রামপ্রসাদের গানের আবেদন চিরন্তন। শুধু সেযুগেই নয়, এযুগেও এই গান বাংলার মানুষকে মাতিয়ে দেয়।

এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর এক নতুন ধরণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক প্রতিযোগিতাধর্মী আসর-কেন্দ্রিক সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছিল। তা হল 'কবির গান'। সেই সময় কবির গান বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নাগরিক রসরুচির পৃষ্ঠপোষকতাতেই কবিগানের জন্ম। অবশ্য এর উৎস হল নৃত্যযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক আদিরসাত্মক হালকা ধরণের শিথিলছন্দের লৌকিক ঝুমুর গীতি।

।। অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ।।

নৃত্য

অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মূল আশ্রয় নৃত্যে এবং নাট্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নৃত্যের ভূমিকাও কম নয়। এক একটি নৃত্য এক একরকমের আবেদন নিয়ে উপস্থিত। 'শিবায়ন' কাব্যে কোচনগরে প্রবেশ করে শিবের নৃত্য কোচনারীদের আহ্বান সূচক —

সুরসাল বাজে গাল নাচে ভালবিধু।
শিঙ্গা গায় দ্রুত আয় আয় কোচ বধূ।।[১৬৪]

এবং শিবের আহ্বানে সবাই ছুটেও আসে —

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র।।[১৬৫]

কখনও কখনও নৃত্য ক্রোধ-প্রকাশক। শিবের তান্ডব নৃত্যের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে দেবসভায় ধর্মরাজের নৃত্যটি এই জাতীয়।[১৬৬]

আর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'অন্নপূর্ণার শিবকে অন্নদান' অংশে ভোজনান্তে শিবের যে তাণ্ডব-নৃত্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবরণ দিয়েছেন কবি, তার মধ্যেও শুধু তাণ্ডবের ভঙ্গি টাই আছে, ক্রোধভাবটা নেই। পরিবর্তে রয়েছে উদরপূর্তির উল্লাস।[১৬৭]

নৃত্যে অপ্সরী-কিন্নরীদের একচেটিয়া অধিকার। নৃত্যশিল্পের জন্ম মূলত তাদের চরণ-ছন্দেই। তাই নৃত্যের বর্ণনায় স্বর্গের নর্তকীদের প্রসঙ্গ আসবেই। বলাই বাহুল্য তাদের নৃত্য লাস্যোদ্দীপক। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে দেবনর্তকী অম্বুবতীকে দিয়ে ইন্দ্রের সভায় নৃত্য পরিবেশন করিয়েছেন। আর তাকে সহায়তা করার জন্য হাজির করেছেন 'ছয়' সহচরী, গায়েন, বায়েন ও দোহারের দলকে —

অশেষ বিশেষ করি লাসবেশ
নাচিতে চলিলা নটী।
মুনি মনোরমা অপর উত্তমা
সঙ্গে সহচরী ছটি।।
সঙ্গে বাদ্যকর অতি মনোহর
গরবে না চলে পা।[১৬৮]

রাজমনোরঞ্জনোপলক্ষে কামোদ্দীপক নৃত্যেরও ব্যবস্থা ছিল। মাণিকরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের 'নবম পালা'য় হীরা নটিনীকে দিয়ে এই জাতীয় নৃত্য পরিবেশন করিয়াছেন।[১৬৯]

আবার নৃত্য কখনও প্রেমকেউদ্বোধিত করে, সমৃদ্ধ করে। মিলনের সহায়ক হয়। 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ' অংশে ভারতচন্দ্র এরূপ নৃত্যেরই আয়োজন করেছেন —

নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায়।।[১৭০]

নৃত্য প্রাচীন শিল্প। ভারতীয় নৃত্যের কিছু সনাতন রীতি আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো কোনো কবি তাঁদের সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেইসব রীতিরও উল্লেখ করেছেন। যেমন —— মনসামঙ্গলকার ষষ্ঠীবর দত্ত বেহুলার নৃত্যে প্রারম্ভিক নমস্ক্রিয়ার কথা বলেছেন —

করজোড় নমস্কাব প্রদক্ষিণ সপ্তবার
অন্যে অন্যে শিরিতে বন্দিয়া।[১১১]

এছাড়া গীত ও তাল সহযোগে ক্ষুদ্র পাত্রে বেহুলার নৃত্যের বর্ণনাও পাই তাঁর কাব্যে —

সচকিত মনকবি নৃত্য করে সুন্দরী
আওয়া সরাতে ভর দিয়া।[১১২]

অর্থাৎ 'ক্ষুদ্র পাত্র'টি হল কাঁচামাটিব সরা। ক্ষণভঙ্গুর পাত্রে নৃত্যকৌশল প্রদর্শনের প্রথা সেই সময়ে প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহ গীতিকার 'দস্যু কেনারামের পালা'তেও দেব-সভায় নর্তকী ঊষা একই প্রকার নৃত্য পরিবেশন করেছে —

কাঁচা মৃত্তিকাব সরা তাতে ভর করি।
দেবেতে মোহিত নাচে ঊষা যে সুন্দরী।।[১১৩]

নাটক

অঙ্গভঙ্গি আশ্রয়ী সংস্কৃতির দ্বিতীয় প্রযোজনা হল নাটক। আমাদের দেশের নাটক বাংলার জনপদের চিরায়ত শিল্পরীতির স্বাভাবিকতায় বিবর্তিত হয়েছে। ফলে নাটক হয়েও গান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, নৃত্যকে করেছে নিজের ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র কবেছে নিজের অঙ্গাভরণ, আর এইভাবে লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বন করে তা আসর থেকে আসরে পবিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেই বাংলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে। শিব, ধর্ম, চণ্ডী, গাজী, মাণিকপীরের কৃত্যের অবলম্বন যখন আখ্যান তখন তার উপস্থাপনা আসর ও দর্শক অবলম্বন করেই বিস্তারিত হয়েছে। আসলে কৃত্যকে বাদ দিয়ে বাংলা নাটকের রূপ-রীতি অন্বেষণ নিরর্থক বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলা নাট্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক ও অভিনয়ের বর্ণনাধর্মিতা। শুধু সংলাপ ও চরিত্রাভিনয়ের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের নাটকে প্রায় দুর্লভ। এই সময়কার নাটক পাঁচালি, লীলানাট, যাত্রা, গীতিনাট বা নাটগীতপালার আকারে প্রধানত মৌখিক রীতিতে সৃষ্ট।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি অন্নদার দৈববাণীতে ভারতচন্দ্র যে 'নাট্যশাস্ত্র' বিষয় সুপণ্ডিত, তার উল্লেখ আছে — 'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক, অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।'[১৭৪] পাঁচালীর আকারে কাব্যটি পরিবেশিত হলেও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে তা ব্যাঘাত ঘটায়নি। প্রথমত, মধ্যযুগীয় নাট্যরীতি অনুসারে কবি গায়েনের উপর কাব্য উপস্থাপনার ভার দিয়েছেন —

ডীউ সাঁই নীলমনি কণ্ঠ আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন।।[১৭৫]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ভারত রচিত পাঁচালীর পরিবেশনগত দায়দায়িত্ব গায়েনেব, এবং সেই গায়েনের নাম 'ডীউ নীলমনি'।

দ্বিতীয়ত, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপের বুনন ও সুপরিকল্পিত কাহিনী বর্ণনায় ভারতচন্দ্রেব 'বিদ্যাসুন্দর' পাঁচালির অনুবর্তী হলেও মধ্যযুগের নাট্যধারায় নাট্য হিসাবে অভিনন্দিত হবাব যোগ্য। চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্রের দক্ষতা প্রসঙ্গে হীরামালিনীর উল্লেখ বহুল পরিচিত —

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁতছোলা মাজাদোলা হাস্য অবিরাম।।[১৭৬]

এ হচ্ছে চরিত্র বর্ণনার পাশাপাশি চরিত্রব্যাখ্যাও। কাজেই গায়েন চরিত্র-বর্ণনার সঙ্গে চরিত্র-রূপায়নেও সংসিদ্ধ হতো। পাঁচালির নাট্যধর্মিতার আদ্যোপান্ত কৌশলই এই।

সংলাপের পারম্পর্য 'বিদ্যাসুন্দর'-এ কিরূপ বর্ণনাত্মক নাট্যকৌশলে বিন্যস্ত হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি —

বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে।।[১৭৭]

তারপবই আছে চরিত্রগত সংলাপ —

শুনলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি।।[১৭৮]

চরিত্রভিত্তিক সংলাপের সূত্রটা ভারতচন্দ্র বহুক্ষেত্রে চরিত্রেব বদলে, ভণিতা ছলে নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন —

ডগ মগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে।।[১৭৯]

এর ফলে, গায়েনের বর্ণনাত্মক রীতির মধ্যে একটি নতুন বৈচিত্র্য তৈরি হত।

এছাড়া 'অন্নদামঙ্গল'-এ চরিত্রানুগ ভাষাতে সংলাপ দৃষ্ট হয়। স্থান-কাল-পাত্র বিচারে সংলাপের যাথার্থ্য রচনায় ভারতচন্দ্র নাট্যিক কুশলতা দেখিয়েছেন। কাব্যমধ্যে দাসু-বাসু, মানসিংহ, পাতশা, মালিনী, কোটাল, বিদ্যা, সুন্দর প্রমুখ চরিত্রের বাস্তবতা অনুসারেই সংলাপের ভাষা বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

এ স্থলে প্রমাণ স্বরূপ 'মানসিংহ' খণ্ডে মানসিংহ ও জাহাঙ্গীরের কথোপকথন উদ্ধৃত হল ---

কহ মানসিংহ রায়   গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ   কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ।।
মানসিংহ যোড়হাতে   অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে   মহিম হইল ফতে
কেবল তোমারি কিরামত।।
হুকুম শাহনশাহী   আর কিছু নাহি চাহি
জের হৈল নিমকহারাম।[১৮০]

'বিদ্যাসুন্দর'-এ সুন্দরের নানা বেশ ধারণের কথা আছে। নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে এক্ষেত্রে সাদৃশ্য করা যায়। ছদ্মবেশী এই রাজপুত্র রাজদর্শনে গিয়ে নানা চরিত্রের অভিনয় করে নিজের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে রাখে। সে কখনও নট, কখনও বিদূষক কখনও পুরাণ-পাঠক কিংবা গায়ক অথবা গণক —

কখন নাটক কখন চেটক।
কখন ঘটক কখন পাঠক।।
কখন গায়ক কখন গণক।
ভারতের মনোহর হে।।[১৮১]

সুন্দর নাটুয়ার মতই রূপসজ্জাপটু —

আগে হইতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে যত সাজদ।।[১৮২]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রণয়- পাঁচালিকার সৈয়দ হামজা তাঁর 'মনোহর মধুমালতী' কাব্যে মধুমালতীর রাজ্যে মনোহরের আনয়ন অধ্যায়ে রাজপুত্র মনোহরের সামনে নৃত্য ও নাটক পরিবেশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন —

রাজার আদেশ পায় পাত্র মন্ত্রীগণ।
নর্ত্তকী নাটুয়া কত আনিল তখন।।[১৮৩]

তাছাড়াও সেকালে নাটগীত, নাটক ও নৃত্য পরিবেশনের জন্য অর্থ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল —'কত টাকা কত বস্ত্র কৈল পুরস্কার।'[১৮৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম নাটক অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। এই শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই প্রকৃতপক্ষে 'যাত্রা' নাটকের প্রচলন হয়। এ সময়ে রচিত একটি পদ্যে সেকালের আসরকেন্দ্রিক পাঁচালি, পালা, জারি, তরজা, যাত্রা ও অধুনালুপ্ত কিছু বাংলা গানের সুর সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায় —

হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার।
বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্নরীতি তার।।
সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর।
গড়াহাটি রাণিহাটি বিরহ মাথুর।।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার।
কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর।।
পাঁচালি অনেক ভাতি রামায়ণ সুর।
কত কথা তরজাতে সারিতে প্রচুর।।
ভবানী ভবের গান মালসী মায়ুর।
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর।।
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর।
গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
শ্রবণে যাহার জানে ভকত আতুর।।
কালিয়দমন রাস চণ্ডযাত্রাধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপুর।।
সাপুড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্গালার নবগানে নূতন ঝুমুর।।[১৮৫]

এখানে 'কালিয়দমন' ও 'রাসযাত্রা'র সঙ্গে 'চণ্ডীযাত্রা' ও 'চৈতন্যযাত্রা'র উল্লেখও আছে।

।। অঙ্কন-আশ্রয়ী সংস্কৃতি ।।

অঙ্কন আশ্রয়ী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হল আলপনা, মাটির ঘট বা সরার উপর চিত্রিত নকশা, কাঁথার নকশা, দেওয়াল- চিত্র ইত্যাদি।

চাল ভিজিয়ে বেটে তা দিয়ে ঘরের মেঝেতে বিভিন্ন রকম আলপনা আঁকার রেওয়াজ উচ্চবিত্ত সমাজে নারীর গুণ হিসাবে বিবেচিত হত। মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'কাজলরেখা' পালার নায়িকাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন আলপনা অঙ্কন করতে দেখি। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে আমাদের লোকাচার তথা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আলপনার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা যেমন জানতে পারি, তেমনি আলপনা অঙ্কনের উপকরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কেও ধারণা হয়ে যায় —

উত্তম সাইলেব চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া।।
পিটালি করিয়া কন্যা পরথমে আঁকিল।
বাপ আব মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল।।
জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীব পারা।।
শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ।।[১৮৬]

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' গীতিকাতেও আলপনার প্রসঙ্গ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি দোনাগাজীর 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল'এ চিত্রপটের প্রসঙ্গ আছে। এই চিত্রপট দর্শনের ফলেই সুদূরের এক অপরিজ্ঞাত নারীর জন্য সয়ফুলের প্রেমাবেগ জাগত হয়। এই চিত্রে শুধু ছবি নয়, লেখাও আছে —

লেখিছে সুন্দরী নাম বদিউজ্জামাল
কন্যার পিতার নাম নৃপ শাহ্বাল।[১৮৭]

এই শতাব্দীর অপর কবি আব্দুল হাকিম তাঁর 'ইউসুফ জলিখা' কাব্যেও চিত্রপটের প্রসঙ্গ এনেছেন।[১৮৮]

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান - সখিনা বিবি'র পালাতেও 'তসবির'-এর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তসবির আলীর আনা চিত্র দেখেই ফিরোজ খাঁ সখিনাবিবির প্রতি আসক্ত

হয়েছে। সখিনার তসবিরকে তার ঈশ্বরপ্রেরিত প্রেমচিত্র বলে মনে হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই ছবিতে নারীরূপেরই গতানুগতিক বর্ণনা আছে —

কিবান্ মর্জি কইরা আল্লা
তসাবির দিলাইন পাঠাইয়া।।
হাত পাও গইড়্যাছে কইন্যার
যে মুন বেলইনে বেলিয়া।
চিক্চিকা কালো মাথার কেশ
পইড়্যাছে কইন্যার হাটু ভারাইয়া।।
....
যাহার তসবির কইরাছে
এমুন দুনিয়া উজলা।
নাজানি নসিবে কারবান্
লিইখ্যাছে খোদাতালা।।[১৮৯]

তসবিরওয়ালী এই চিত্র বিক্রয়ের বিনিময়ে অর্থ চেয়েছিল, এবং ফিরোজের মা তাকে সানন্দে নিজের গলা রহার খুলে দিয়েছিলেন মূল্য হিসাবে। সুতরাং বোঝা যায়. সেইসময় চিত্র ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ ছিল।

।। খেলাধূলা আশ্রয়ী সংস্কৃতি ।।

খেলাধূলা আশ্রয়ী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য শরীরচর্চা, অবসর বিনোদন এবং আনন্দলাভের মাধ্যমে দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন।

ঘনরাম চক্রবর্তী এবং মাণিকরাম গাঙ্গুলী তাঁদের ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন ও কর্পূরের শরীরচর্চার পরিচয় দিয়েছেন। মল্লবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে তারা শরীরচর্চা করেছে। ঘনরাম লিখেছেন —

অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে।।
....
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি।
মহাযুদ্ধ মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি।।
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম বুদ্ধি বাড়ে।।[১৯০]

এই যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ছিল পাশা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই খেলায় অংশগ্রহণ করত। নববিবাহিত দম্পতি কিংবা প্রণয়ী যুগলের মধ্যেও পাশা খেলার

রেওয়াজ ছিল। মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ান ভাবনা'-য় জমিদার পুত্র মাধব তার প্রণয়িনীকে একান্তে বসে পাশাখেলার প্রস্তাব দিয়েছিল —

বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা।।[১২১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি আইনুদ্দীন তাঁর 'বিবাহমঙ্গল' কাব্যের 'আখের জুলুয়া' অংশে নারী-পুরুষে পাশাখেলার বর্ণনা দিয়েছেন।[১২২] 'আখের জুলুয়া' শব্দের অর্থ পাশার রাগ।

নসরুল্লাহ খোন্দকারের 'শরীয়ত নামা' কাব্যেও পাশাখেলায় নারী-পুরুষের স্বাধীন অংশগ্রহণ এবং খেলাচ্ছলে ভাব বিনিময়ের ইঙ্গিত আছে —

আর দোহানরে মুখামুখী বৈসাইয়া।
পাশা খেলা ওন্ত কুপুরুষ যুক্তি দিয়া।।
ভিন্ন নারী পুরুষ হৈয়া একান্তর।
খেলাছলে হাস লাস করন্ত বিস্তর।।
ভিন্ন পুরুষের ভয় না রাখন্ত মনে।
পুরুষেহ ভিন্ন নারী হেন জানে।।[১২৩]

রামপ্রসাদের শক্তি আরাধনার পদে পাশা খেলার প্রসঙ্গ আছে। অবশ্য পাশাখেলা এখানে রূপকার্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো।।[১২৪]

রামপ্রসাদের পদ থেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর আরো দু'ধরণের খেলার সঙ্গে পরিচিত হই। এগুলি হল যথাক্রমে ডাণ্ডা-গুলি এবং ঘুড়ি।

প্রথমটির উল্লেখ আছে, নিম্নোক্ত গানে —

মন খেলা রে দাণ্ডা গুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি।।[১২৫]

ঘুড়ি ওড়ানোর কথা পাই —

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যেন, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।।[১২৬]

বলাই বাহুল্য, ডাণ্ডাগুলি খেলা কিংবা ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্র বাস্তবঘেঁষা হলেও গভীরে নিহিত আছে গূঢ় পরমার্থতত্ত্ব।

আতসবাজী পুড়িয়ে অবসর বিনোদন করা হত অনেক সময়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মুহম্মদ রাজা তাঁর 'তমিম গোলাল চতুর্থ ছিলাল' কাব্যে এর উল্লেখ করেছেন এইভাবে —

ছাড়ি দিল পরী বাজী যেন উড়ে পরী
তিমিরে দিবস করি চলে সবে ঘিরি।[১২৭]

বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে বিশেষ ধরণের ক্রীড়ার প্রচলন ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ফকির গবীবুল্লাহর 'জঙ্গনামা' কাব্যের হোলি খেলার বর্ণনা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় —

ডাডুয়া নাটুয়া লোক মেলুক আসিয়া।
জরদ গোলাপী রঙ পিচকারী করিয়া।।
দিবেক সবার গায় যে আসিবে হেথা।
এনাম করেন বেহা কেবা এই কথা।।[১২৮]

সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহায্যে নানা প্রকার খেলা, যথা - গুঁটি বা ঘুন্টি খেলা, বাঘবন্দী, ষোলঘর, দশ-পঁচিশ, আড়াইঘর প্রভৃতির প্রচলন ছিল।

ছোট মেয়েরা খেলত কড়াকড়ি, আঁটুল-বাটুল এবং বর-কনে দান। শিবায়ন কাব্যে গৌরীর-ক্রীড়া বর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর এ ধরণের খেলার পরিচয় তুলে ধরেছেন —

খেলে দশ-পঁচিশ ছ কড়া লইয়া কড়ি।
দান ধর্ম্ম বুঝ্যা দান ফেলে বুড়ি বুড়ি।।
আঁটুল বাঁটুল খেলে পশারিয়া পা।
আর লীলা খেলে যত কত কব তা।।[১২৯]

বালিকা-কিশোরীদের মধ্যে লুকোচুরি খেলার চল ছিল। 'শিবায়নে' গৌরীকে সহচরীদের সঙ্গে এ জাতীয় খেলাও খেলতে দেখা যায় —

খেলে লুকলুকানি আপনি হইয়া বুড়ী।
এক চোরে সভা কারে করে তাড়াতাড়ি।।[১৩০]

'দেওয়ান ঈশাখাঁর পালা'তেও এই খেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। — 'সখীগণের সাথে কইন্যা পলাখুঁজি খেলে।'[১৩১] 'পলাখুঁজি' শব্দের অর্থ লুকোচুরি।

।। বিশ্বাস-অনুষ্ঠান আশ্রয়ী সংস্কৃতি ।।

বিশ্বাস-অনুষ্ঠান আশ্রয়ী সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে পড়ে লোকসমাজের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান বা পালা-পার্বণের দিকগুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গণজীবন মূলত গ্রামকেন্দ্রিক এবং সংস্কার-চালিত। যাত্রা, বিবাহ, কন্যা-নির্বাচন - সবক্ষেত্রেই সংস্কারের কঠোর শাসন। এই শাসনের পিছনে অশিক্ষার ব্যাপক প্রভাব তো আছেই, কিন্তু তার থেকেও হয়ত বেশী আছে অনিশ্চিত জীবনোপলব্ধির প্রভাব। জীবনের যেসব ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বেশী, সেই সব ক্ষেত্রেই অভিলাষিত সাফল্য লাভের আশায় মানুষ সংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করেছে। আর সংস্কারও এই সুযোগে তার পক্ষ বিস্তার করে বেড়িয়েছে। গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ থেকে শুরু করে স্নান, নতুন বসন- পরিধান, রোগ-ব্যাধি, বার-তিথি সবকিছুতেই সংস্কারের অশরীরী উপস্থিতি । আর অশরীরীকে শরীরী রূপ দিতেই আচারের আবির্ভাব। হাজার রীতি-নিয়মের বেড়াজালে মানুষের স্বাধীন সত্তার দমবন্ধ করে হাঁপিয়ে ওঠা। যদিও আচার-সৃষ্টির পিছনে অশুভ প্রভাবকে কাটিয়া ওঠার মানসিকতাই ক্রিয়াশীল।

যাত্রার ক্ষেত্রে নানা প্রকার লক্ষণ মানা হত, এবং এই সমস্ত লক্ষণ দেখেই যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয় করা হত। কবি নওয়াজিসের 'গুলে বকাউলি' কাব্যে সোম থেকে রবি পর্যন্ত সাতটি বারকে সামনে রেখে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে মঙ্গল-অমঙ্গলের পাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যেমন—

এবে কহিবারে বেলা বুঝ যেই মতে।
সেই ক্ষণে কদাপি না যাও কার্য গতে।।
অর্কেত তপন দণ্ড পরে এক যাম।
বারবেলা বুঝিয়া না কর কোন কাম।।
সোমে চারি দণ্ড পরে চারি দণ্ড নষ্ট।
নেত্র প্রহরের পাছে চারি ঘড়ি কষ্ট।।
কুজে বিংশে দণ্ড পরে নষ্ট চারি ঘড়ি।
দিন সে চারি দণ্ডে কার্যে না নিঃসারি।[২০২] ....ইত্যাদি

শুভ-অশুভের আতঙ্কে ভুগত রাজা-বাজড়া থেকে সাধারণ মানুষ - সকলেই। তাই ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় গৌড়েশ্বর যখন সসৈন্যে বিবাহ-মানসে সিমুলা চলেছিলেন তখন অমঙ্গলের নানা লক্ষণ দেখে সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁকেও শিহরিত হতে দেখা যায়। অশুভ লক্ষণগুলি এই প্রকার —

অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচিল।
শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্।।

কিচি কিচি কালপেঁচা ডাকে কাছে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে কপিগণ গাছে।।
বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।[২০৩]

বলাই বাহুল্য ঘনরাম গৌড়েশ্বরের বিবাহযাত্রাকে সাফল্য দেননি।

আর এই ব্যর্থতা বা বিপদ-আপদ যাতে স্পর্শ না করে, সেইজন্যই যাত্রাকালে নানা লক্ষণের সমাবেশ ঘটানো হত। ভবানন্দের দিল্লী যাত্রাকালে ভারতচন্দ্র সে কথা বিস্মৃত হননি। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে ভবানন্দ যখন যাত্রা শুরু করলেন তখন দেখা যায় —

ধেনু বৎ একস্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।

অশ্ব গজ পতাকায় রাজা মানসিংহ রায়
আগে আগে সকল মঙ্গল।।
পূর্ণ ঘট বাম পাশে রামাগণ যার বাসে
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধুমাসে রজত লইয়া হাসে
কুজরাণী দেখাইয়া ডালি।।
দেখি যত সুমঙ্গল মজুন্দারে কুতূহল
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে।।[২০৪]

মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরকে পুরুষকারের প্রতীক বলে মনে করা হয়। আর স্বাধীনচেতা পুরুষ বলেই সংস্কারের অন্ধতাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে এই স্পর্ধিত আচরণ সমর্থনযোগ্য ছিল না। ফলে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ষষ্ঠীবর দত্ত অনুরূপভাবে চাঁদ সদাগরের ভাগ্য বিপর্যয়ের পিছনে যাত্রাপথের অশুভ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করার কারণই অনুসন্ধান করেছেন —

সোনেকারে বিদায় দিয়া চলিল তৎকাল।
ঘর হতে বাহিরিতে মাথে লাগে চাল।।
বসন পরিতে চাঁদ আঠুতে ঠেকে কোঁচা।
আচম্বিতে চোখে লাগে আঙ্গুলের খোঁচা।।
শঙ্কর পূজি চলে সাধু ললাটিতে ফোটা।
নগরের মধ্যে দেখে হস্তপদ কাটা।।

আবলুল চুলে দেখে বিকৃত শরীরে।
কান্দয়ে বার্ধক ভিক্ষা মাগি ঘরে ঘরে।।
মুক্তকেশী দিগম্বরী মাগএ যোগিনী।
আকাশে ভ্রমন্ত দেখে সাচান গৃধিনী।।
তাহা না গণিয়া চাঁদ চলিল সকাল।
বাম হতে দক্ষিণ দিকে যাওন্তি শৃগাল।[২০৫]

এছাড়া যাত্রাকালে হাঁচি, টিকটিকি, কাকের আর্তনাদ ইত্যাদি তো অশুও বলে বিবেচিত হতই।

বিবাহ শুভ কার্য। কিন্তু তার পরিণতি চরম অনিশ্চয়তায় ভরা। সেই কারণে, সুখী দাম্পত্য জীবনের কামনায় বিবাহের পাত্রী, এমনকি মাস নির্বাচনেও নানা সংস্কার মেনে চলার রীতি প্রচলিত হয়েছে। যেমন শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। 'মলুয়া' পালা থেকে কারণটি জানা যায় —

শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাঢ়ি হইছে।[২০৬]

ভাদ্র মাসও অকাল বলে বিবেচিত —

ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা।।[২০৭]

আর পাত্রী নির্বাচনে 'সুলক্ষণা' কন্যার প্রসঙ্গে রূপবতী'তে পাই —

পায়ের দুখানি গোছ যেমন চিরুণী।
এই লক্ষণ থাকলে কন্যা হয় রাজরাণী।।[২০৮]

মধ্যযুগীয় সংস্কার শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তার অতন্দ্র নিয়ন্ত্রণ।

সংস্কারের চাপ যখন প্রবল হয়, তখন তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য, বিপদ্ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মানসিক করার প্রথা চালু হল। যেমন্ - ভূতদৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে প্রচলিত ছড়া —

ভুত দৃষ্টে হয় জান।
অজা বৃষ দিব দান।।[২০৯]

আবার 'মহুয়া' পালায় দেখি খেতে বসে নদ্যার ঠাকুরের গলায় কাঁটা বিঁধলে মহুয়া নদ্যার বিপদ মুক্তির কামনায় মানসিক করেছে —

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাঁটা।
বাদ্যার ছেরি মান্যা থুইছে কলা ধলা পাঠা।[২১০]

বাঙালী সমাজে আচার পালনের ধূম এইজন্যই। অর্থাৎ অমঙ্গলের কবল থেকে জীবনকে দূরে রাখা। স্ত্রীসমাজে ভীতির ভাবটা প্রবল। তাই যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে (নবজাতকের নামকরণ, অন্নপ্রাশন, গর্ভবতীব সাধভক্ষণ, বিবাহ,অধিবাস, গায়ে হলুদ ইত্যাদি) স্ত্রী আচারের ভূমিকা এত বেশী। শিব-পার্বতীব বিয়ে উপলক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্তী স্ত্রী-আচারের বর্ণনা দিয়েছেন।[২১১]

ঘনরামের কাব্যের 'রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা' অংশেও নিখুঁত ভাবে বাঙালীর শাস্ত্রসম্মত বিবাহের বর্ণনা পাই।[২১২]

উৎসব-অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশ উৎসব-পার্বণের দেশ। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙালীর বারমাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনে উৎসুক সুন্দবকে এই উৎসবের দোহাই দিয়েই নিজের কাছ রাখতে চেয়েছিল বিদ্যা। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'এর 'বারমাস বর্ণন' অংশ বিদ্যার মুখে শুনি —

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার।।
কার্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্তি অনন্ত মহিমা।।[২১৩]

এই দুর্গাপূজা এবং কালী পূজা এখনও আমাদের দেশে জাতীয় উৎসবের স্বীকৃতি পায়।

অন্নদামঙ্গলের 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে চৈত্রমাসে দেবী অন্নপূর্ণা পূজার ইঙ্গিত রয়েছে —

আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে।।[২১৪]

এই দেবী অন্নদারই ষোড়শপচাব পূজার বর্ণনা রয়েছে 'মানসিংহ' অংশে।[২১৫]

বাংলাদেশ সর্প-অধ্যুষিত বলে নিন্দিত। স্বভাবতই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কদর এখানে। মৈমনসিংহ গীতিকার একাধিক পালায় মনসা পূজার প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'দেওয়ান ভাবনা'য় দেখি —

শায়ন মাসেতে দূতি পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিল গো আমার মনের আশা।।[২১৬]

কার্তিক মাসে সন্তান কামনায় কার্তিক পূজা-র রীতি বর্ণিত হয়েছে 'মহুয়া' গাথায় -

কার্তিক মাসে কার্তিক বরত পুত্রের লাগিয়া।[২১৭]

'কমলা' পালায় এই উৎসবেরই সাড়ম্বর বর্ণনা পাওয়া যায়।

ধর্মদেবতার পূজার কথা পাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে। উপবাসী থেকে এই পূজা কবতে হয়। মাণিক গাঙ্গুলী লিখেছেন—

উপবাস প্রতপ্ত নিয়ম অনাহার।
কৃপাযুত না হল্যেন প্রভু করতার।।[২১৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এইরকম আরও অজস্র পূজাব উল্লেখ অছে।

শিল্প এবং জীবন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। হয়ত তাব মধ্যে স্রষ্টার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাবে; কিন্তু জীবনের সামগ্রিক আবেদনকে উপেক্ষা করে নয়। বস্তুত, শিল্প অনেকটা আগুনের মতো; তার দীপ্তিও আছে, দাহও আছে। সে আলোকিতও করতে পারে, পুড়িয়েও মারতে জানে। কখনও নিয়ত সম্মুখে, কখনও বা পশ্চাতে আকষণ করতে পারে রসভোক্তাকে। কাবণ তার মধ্যে স্বীকৃতির এবং অস্বীকৃতির, নীতির এবং দুর্নীতির, গড়াব কিংবা ভাঙার — উভয় প্রেরণাই এক সঙ্গে ক্রিয়াশীল। আব এই দুটি প্রেরণাই মুলত সামাজিক। তাই শিল্পকে জীবন তথা সমাজ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। যায় না কারণ, শিল্প জীবনেরই শিল্পিত প্রকাশ। আঠার শতকেব বাংলা সাহিত্যের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে এই সার্বজনীন সত্যটি স্মরণে রাখা উচিৎ। নতুবা ইতি ও নেতির দাঁড়িপাল্লায় এ যুগের সাহিত্যের পক্ষপাতটা নেতির দিকেই বেশী ঝুকে পড়লে আমাদের আশঙ্কার সীমা থাকবে না। অবক্ষয়, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, আর শ্লীলতাহানিকর ব্যাপারগুলো এই শতাব্দীর সাহিত্যকে আধুনিক সমালোচকদের কাছে কলঙ্কিত করে তুলেছে। আর তখনই মনে জেগেছে এমন প্রশ্ন, বাঙংলায অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি যা যুগপ্রতিনিধি সাহিত্যিকদের রুচিভ্রষ্ট করেছিল ?

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন —

"বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব কখনই খুব সুস্পষ্ট ছিলনা — বাঙ্গালী কবি কোনদিনই ইতিহাসেব বহির্ঘটনার দ্বারা তাদৃশ প্রভাবিত হন নাই। যুগে যুগে অন্তর প্রেবণার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ যে এক একটি কাব্য তথা. মানুষের দেবতা সম্বন্ধে ধারণার এক একটি নূতন কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল, কবিগোষ্ঠী সমসাময়িক ইতিহাস সংঘটনকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহারই অনুসরণ কবিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন শাখা, সহজিয়া সাহিত্য, শাক্তপদাবলী — এ সবই বাঙ্গালীব ধর্মচর্চা ও অধ্যাত্মসাধনার এক একটি অধ্যায় — হয়ত ইহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ইতিহাসেব ক্ষীণ স্মৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু মোটেব উপব ইহারা ইতিহাস নিরপেক্ষ। . ...

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অশ্লীলতা ও কুরুচি কি যুগ প্রভাবের ফল ? ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন হইতে সমস্ত পরবর্তী ঐতিহাসিক মহাবাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব রাজসভা ও ব্যক্তিগত প্রভাবকে এই কুরুচির উৎসরূপে নির্দেশ কবিযাছেন। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না! কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান উদ্ভাবন করেন নাই। ভারতচন্দ্রও উহার সর্বপ্রথম প্রবর্তক নহেন। .... নবাবী যুগ বঙ্গদেশে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয নাই। সুতরাং মুসলমানী আদর্শের বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচাব যে এই যুগের রুচিবিকারেব কারণ তাহাও ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থিতনয়।"[২২]

কিন্তু তবুও আমাদের স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতি জগতে স্থূলতার আমদানি হয়েছিল এই শতাব্দীতেই এবং সাহিত্যকে বিবসন করতে অষ্টাদশ শতাব্দীব আরাজকতা-পীড়িত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক নৈরাশ্যই দায়ী। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শেষপর্যন্ত এই চূড়ান্ত সত্যটি প্রকারান্তরে মানতে বাধ্য হয়েছেন —

"অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এতটুকু স্বীকার করা যায় যে, ইহার প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশ কার্যত দিল্লী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তার উগ্রতর ও প্রত্যক্ষতর কুশাসনের পাপচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে।... ... . যে আবিল প্রবাহ কর্দমাক্ত চূর্নীর স্রোতের ন্যায় কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা সুদূর অতীত হইতে আগত জলধারারই একটি অশোধিত, অসংস্কৃত রূপ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রবাহের খাত খনন করেন নাই। সুতরাং যুগেব রুচিনিয়ামকের গৌরব বা অগৌবব তাঁহার প্রাপ্য নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অভিযোগ যে, তিনি এই মলিন প্রবাহে রামপ্রসাদকে অবগাহন করাইয়া তাঁহার কালী-নামাবলীর উজ্জ্বলতা কথঞ্চিৎ ম্লান হইবার হেতু হইয়াছেন।"[২২৩]

কিন্তু বামপ্রসাদ তো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় অবসান লগ্নেব কবি। শতাব্দী সূচনা থেকেই দেখি কবির দল নিম্নমার্গগামী রুচির শিকার হয়েছেন। ঘনরাম ও রামেশ্বরের কাব্য থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করছি।

মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত প্রথা পতিনিন্দা। এর মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের শিবাই দত্তের স্ত্রী নয়ানী সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিন পুত্রের জননী সে; অথচ শিশু পুত্রদের উপেক্ষা করে সাজসজ্জায় ডুবে পুরুষের মন ভোলাতে চায় —

ধেয়ে ধেয়ে কেন্দে ছেলে ধরিল কাপড়।
কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড়।।
ফিরে যারে সাপে খেকো বাপের মাথা খাগা।
হেথা কি আসিস মোর আশে দিতে দাগা।।[২২১]

লাউসেনের কাছে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে —

পুত্রে এনে পাপিনী ডুবায়ে মেলে কূপে।[২২২]

তারপর ছলভরে কাঁদতে বসে লাউসেনকে অপদস্থ করতে। তাঁর বক্তব্য, লাউসেন একা পেয়ে তার প্রতি লুব্ধ হয়েছে এবং ডাকাডাকি করায় নয়ানীর ছেলেকে কূপে ফেলে দিয়েছে। লাউসেনকে যখন কারাগারে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে —

তখন নয়ানী নারী বলে আঁখি ধরি।
কথা রাখ এখনও ছাড়ায়ে দিতে পারি।।[২২৩]

সমস্ত সত্য ফাঁস করে বসে নয়ানীর ছেলেই —

বারুই বালক বলে শুন সত্য ভাষা।
জননী জগতে মোর জাতিকুল নাশা।।[২২৪]

কিন্তু তাতেও নয়ানী দমবার পাত্রী নয়। ক্রুদ্ধ আক্রোশে বলে 'পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় কুলোবাদী।' নয়ানী কামে অন্ধ। সতীত্ব, শালীনতা এমনকি পুত্রস্নেহও তার কাছে তুচ্ছ, দেহের তাড়নায় সে উন্মাদিনী। অসংস্কৃত সমাজের আদিম প্রবৃত্তিই নয়ানী চরিত্রের নিয়ন্তা।

'গোলাহাট পালা'র ভাজনবুড়ি ও সুরিক্ষা নয়ানীরই অনুরূপ চরিত্র। মালিনীর বাড়িতে যখন লাউসেন ও কর্পূর বসে তখন —

দূর হতে ভাজন বুড়ী দেখে আন ছলে।।
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।[২২৫]

আর,

দেখিয়া বুড়ির প্রাণ করে লক্‌পক্।।
মনে করে সাজিতে সামাল যদি পাই।
এখনি ইঙ্গিতে চেয়ে নাগর ভুলাই।।[২২৬]

মালিনী ভাজন বুড়ির অভিপ্রায় বুঝতে পারে —

আজ কাল মধ্যে বুড়ী যাবে যম ঘরে।
এখন এমন সাধ নাগরের তরে।।[২২৭]

শিথিলবদ্ধ সমাজে কামনার এই নগ্ন প্রকাশে তাই অবাক হইনা। গোলাহাটে সুনাগর এসেছে শুনে সুরিক্ষা দাসী গুরিক্ষাকে তো পাঠালই, উপবন্ত নাগর পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেও চলল —

সাজা আল্যা সুরিক্ষা ছকুড়ি নাগর লয়্যা।।[২২৮]

আর তারপরে নারীর সেই নির্লজ্জ আত্মনিবেদনেরই পুনরাবৃত্তি চলে। বস্তুত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের এই সব নারীরা স্ত্রীজাতির দীর্ঘলালিত চারিত্রিক বিশুদ্ধিকে ধুলোয় লোটাতেই যেন নির্মিত হয়েছে। তাদের যেন 'অসতী' হবারই তাড়না —

ত্যজি নিজপতি   সতী কুলবতী
যুবতী অসতী হবে।[২২৮(ক)]

আর সেজন্য কুলধর্ম বিসর্জন দিয়ে বলে —

পরের রমনী মোরা পিরীতকে মরি।
রসিক পুরুষ পেলে হাব করে পবি।।[২২৯]

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের সুরিক্ষা আরও কিছুকাল পরের সৃষ্টি। যুগের কলুষিত আবহাওয়ার প্রভাব তার অভিব্যক্তিতে তাই আরও প্রকট, আরও নগ্ন। আদিরসঘটিত বীভৎসতার বর্ণনায় কবি ভারতচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। গোলাহাটে উপনীত লাউসেন ও কর্পূরকে একই কৌশলে সুরিক্ষা নিজের অন্তঃপুরে হাজির করিয়েছে এবং শ্লীলতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করেছে।[২৩০] সুতরাং আলোচ্য শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মান যে অধঃপতনের কোন অন্ধকারে গিয়ে ঠেকেছিল উপরিউক্ত অংশগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভিক্ষান্নজীবী শিবের অবসর বিনোদনে কোচনীপাড়ায় গমন ব্যাপারটাও রুচিকর নয় —

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ কর তালি দেয় সবে এক তন্ত্র।।

কোচনী সকল হৈল কুসুম-উদ্যান।
শঙ্কর-ভ্রমর তায় করে মধু পান।।[২৩১]

একদিকে স্ত্রী-পুত্র ভরা সংসার পালনে অক্ষমতা, অন্যদিকে পরস্ত্রী-লুব্ধতা দু'য়ে মিলে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের শিব অষ্টাদশ শতাব্দীর অসুস্থ জীবনাচরণকে কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। সাহিত্যে শিবের ভূমিকা চিরদিনই কিছুটা অলস, কিছুটা উদাস, কিছুটা নারী আসক্ত। কিন্তু রামেশ্বর দেবাদিদেবের কামনার প্রকাশকে খুব বেশীরকমের কুণ্ঠাহীন করে দিয়েছেন। প্রথমত, শিবের কোচের নগরে প্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত, মহামায়ার বাগদিনীরূপের প্রলোভনে ভুলে পরস্ত্রী- লুব্ধতা। এক সামান্যা বাগদিনীর আলিঙ্গন লাভ করার জন্য শিব যেভাবে সর্বস্ব খোয়াতে বসেছেন তা হাস্যরসের যোগান দিলেও এটা বোঝা যায়, তৎকালীন অভাবী মানুষের চারিত্রিক সংযম কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল—

শিব বলে বল বল তুমি চাও কি।
অষ্ট বসু অষ্ট সিদ্ধি সব লহ দি।।
কিরাতের বেটী বলে কাজ নাঞি তাতে।
পিত্তলের অঙ্গুরীটা দেহ মোর হাথে।।
পূর্ণ কর্‌য়া পিত্তল পরিতে যদি পাই।
বাগদির মেয়্যা আমি কিছুই না চাই।।
পিত্তল অঙ্গুরী নহে কহে ত্রিলোচন।
মাণিক অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন।।
দয়া কর্‌য়া দামোদর দিয়াছিলা মোরে।
ধর ধর করিয়া ধূর্জ্জটি দিল করে।।[২০২]

এই অসম্বৃত চরিত্র, স্খলিতবাক্ দেবতাটিকে আবার পাওয়া গেল ভারতচন্দ্রের কাব্যে।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'এ অশ্লীলতার প্রশ্ন তর্কাতীত। তবু এই গর্ভ-কাব্যটির আগের খণ্ডেও শিবচরিত্র নির্মাণে তিনি খুব একটা মহত্ত্ব দেখাননি। ভারতচন্দ্রের কাব্য পরিকল্পনায় ক্লাসিক ও লৌকিক উভয় প্রভাবই ক্রিয়াশীল। ক্লাসিক বলতে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র তথা সাহিত্যকে, এবং লৌকিক বলতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তথা লোকরুচিকে ধরা যায়। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে কালিদাসের অনুসরণ এই প্রথমখণ্ডে মূলত দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' ও 'রতিবিলাপ' এই দু'টি অংশের উল্লেখ করা যায়। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদনভস্ম অধ্যায়টি মহত্তম কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রতিবিলাপের মধ্যেও কবির শিল্পনৈপুর্ণ্য সমুজ্জ্বল। কিন্তু ভারতচন্দ্র কালিদাসকে ভালভাবে জেনেও 'শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম' অংশে যে অশ্লীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সমসাময়িক সমাজের অধোগামী রুচি এবং অনুগ্রাহক-নির্ভর কবিদের সেই রুচিবিকৃতিকে পরিতৃপ্ত করতে নিম্নগামী পিচ্ছিলস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার প্রমান পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট অংশে। এখানে দেখি,

ধ্যানস্থ শিবকে বিবাহে আগ্রহী করতে রতিদেব তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্পশর নিক্ষেপ করেন। কামজর্জর অবস্থায় ধ্যান ভেঙে সামনেই মহাদেব দেখেন মদনকে, এবং তাঁর ত্রিনয়ন থেকে ললাটাগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়ে কামদেবকে ধ্বংস করে। কাহিনীটি বহু প্রচলিত। ভারতচন্দ্রীয় চমক এর পরে। অর্থাৎ —

মরিল মদন তবু পঞ্চানন
মোহিত তাহার বাণে।[২৩]

এবং সেই মুগ্ধতায় আবেশ যে কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে পরবর্তী অংশেই তার নিদর্শন রেখেছেন কবি —

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া
ফিরেন সকল স্থানে।।
কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া পশ্চাত তাড়িয়া
ফিরেন শিব চঞ্চল।।[২৪]

অবশেষে নারদের পরামর্শে শিব স্থির হলেন; কিন্তু নিরস্ত করা গেলনা কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের আদিরসাত্মক চাহিদাকে। অন্নদামঙ্গল এবং অন্নপূর্ণামঙ্গলের মধ্যমণিরূপে সৃষ্টি হল 'বিদ্যাসুন্দর' — আলোচ্য কাব্যের যেটি 'রাজফরমায়েশী অংশ' বলে চিহ্নিত।

'বিদ্যাসুন্দর'-এর উপজীব্য অসামাজিক গুপ্ত প্রেম। সমাজশৃঙ্খলাকে অস্বীকার করেছে বলেই এই প্রেম অবৈধ। আর অবৈধ বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার এত জনপ্রিয়তা। সে সময়ে নদীয়ায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় খেউড় সংস্কৃতির সাধনা চলছে। সেই সঙ্গে যদি বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরস-প্রধান রোম্যান্টিক কাব্যচর্চা হয় তাহলে মন্দ কি?

অন্নদামঙ্গলের অন্নদা ভারতচন্দ্রের কুলদেবী। প্রথমে তাঁর মহিমা ঘিরেই কাব্যরচনার অনুরোধ করেন কৃষ্ণচন্দ্র। অবশ্য নেপথ্যে রক্তের ঋণশোধের একটা ব্যাপার ছিলই। তা হল পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মাহাত্ম্যকথন। কিন্তু রচনা শেষ হলে বিদ্যাসুন্দরের রসঘন উপাখ্যানটিও কালিকামঙ্গল কীর্তনের ছদ্ম আবরণে মুড়ে রাজসভায় পেশ করতে হল ভারতচন্দ্রকে, রাজনির্দেশে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আন্দাজ করেছেন, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান রাজপরিবারকে অশালীন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল।[২৫] চেষ্টা চলেছিল উভয় দিক থেকেই। অর্থাৎ নদীয়ারাজের বর্ধমান-রাজত্বের প্রতি অর্থ ও কুলকৌলীন্যজনিত ঈর্ষা, এবং বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের অত্যাচারে একদা উৎপীড়িত,

সর্বস্বান্ত এবং কারারুদ্ধ ভারতচন্দ্রের প্রতিহিংসা। ভারতচন্দ্রের আগে যে 'কালিকামঙ্গল'-এর কাহিনী প্রচলিত ছিল তার মধ্যে কোথাও বর্ধমানের উল্লেখ নেই। কাজেই এটা ভারতচন্দ্রের আমদানি।

'আর্থ-সামাজিক' অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীকে দেখেছি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ঘনীভূত রূপকে। আর সেই মন্বন্তরী অভাবের অশুভ দিনের মধ্যেই এই শতাব্দী শেষ হয়েছে। কিন্তু এ দারিদ্র্য শুধু আর্থিক নয়, তার চেয়ে আরো মর্মান্তিক, নৈতিক। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তার প্রমাণ। সেকালের মানুষ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অপূর্ব ধ্বন্যাত্মক কাব্যরস —

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।।
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।।[২৩৬]

—উপেক্ষা করে বর্ধমান শহরে 'দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম' হীরা মালিনী এবং বিদ্যা ও সুন্দরের মিলনপথের সুড়ঙ্গ খুঁজে হয়রান হয়েছে।

বর্ধমান শহরে অনুপ্রবেশের পরে যে হীরামালিনীর সঙ্গে সুন্দরের সাক্ষাৎ হয়েছে তার সমস্ত কায়-মন-বাক্য জুড়েই ভ্রষ্টাচারের ছায়া। কবি বলেছেন —

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।।
ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি।।[২৩৭]

নারীর ব্যভিচার, নারীর স্বেচ্ছাচার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পাতায় পাতায়। হীরার সঙ্গেই মনে পড়ে, 'মানসিংহ' অংশের ঘেসেড়ানীর কথা। ঘেসেড়ানীর মুখে শুনি —

বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার।।[২৩৮]

পনের-ষোল বছর বয়সে দ্বাদশ সংখ্যক ভর্তা হারিয়ে ঘেসেড়ানীর বিলাপ নিঃসন্দেহে সামাজিক সুস্থতার নজির নয়।

এর পরের প্রসঙ্গ রাজ অন্তঃপুরের নিভৃত শয়নকক্ষে সিঁদ কেটে নারী-পুরুষের মিলন। শুধুই দেহসম্ভোগ, শুধুই রূপলালসা, শুধুই ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত দিবা- রাত্রির

বর্ণনায় কবি ভারতচন্দ্র বেশী রকমের অসংযত। স্বাভাবিক পরিণাম গর্ভসঞ্চার। 'লুকায়ে পীরিতি কৈনু' উক্তিতে রাজকন্যার অবৈধ, গুপ্ত আচরণের প্রতি আসক্তির পরিচয় স্পষ্ট। আর অনূঢ়া কন্যার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সংবাদে বর্ধমান রাজেশ্বরীর ত্রস্ত হবার ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। তাঁর ভয় কুলকলঙ্কের। কন্যাকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন —

না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আইমা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে।
রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে।।[২৩৯]

কলঙ্ক সত্যিই ছড়িয়ে পড়ল। শুধু দেশ-বিদেশেই নয়, শতাব্দী অতিক্রম করে পরবর্তী শতাব্দীতে। সে কলঙ্ক বিদ্যা-সুন্দরের গোপন অবাধ শরীরী সম্ভোগকে ছাড়িয়ে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য — "'কৃষ্ণনাগরিক' ভারতচন্দ্র দূষিত দরবারী আদর্শে দীক্ষিত: সামাজিক অনাচারের ধূম্র নিঃশ্বাসী দীপতলে বসিয়া তাঁহার কাব্যসাধনার শুরু ও শেষ। সুন্দর শুধু বিদ্যার শয়ন মন্দিরে সন্ধি খনন করে নাই, সে আমাদের সমাজ জীবন ও আদর্শের মূলেও গভীর সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছে।"[২৪০]

সংবাদ পৌঁছোলো রাজার কানে। 'সদানিদ্রিত রাজা অকাল জাগরণে রক্ত আঁখি যথারীতি ঘূর্ণিত করে' কোটালের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলেন —

রাজা কহে শুনরে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল।।[২৪১]

প্রাণভয়ে কাতর কোটাল বিরস মনে বিদ্যা সম্বন্ধে একটি মর্মান্তিক রসিকতা করেছিল — 'রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা।'[২৪১(ক)] বোঝাযায়, রাজসংস্কৃতির মেকি আভিজাত্যের খোলস সর্বসাধারণের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চোর ধরা নিয়ে নারী -বেশধারী কোটালের সঙ্গে সুন্দরের বোঝাপড়ায় যে মাত্রাতিরিক্ত আদিরসের ফোয়ারা তুলেছেন কবি, তাতে প্রণয়ী হিসাবে সুন্দরকেও আদৌ বিশ্বাসী মনে হয়নি। এমনকি শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মত ভারতচন্দ্র-অনুরাগীও 'ভালগার' বলে নিন্দিত করেছেন ঘটনাটিকে।[২৪২]

আর একটি বিষয়ে আলোচনা করেই ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গের উপসংহার টানছি। বিষয়টি 'নারীগণের পতিনিন্দা'। বারমাস্যা, চৌতিশা প্রভৃতির মত পতিনিন্দাও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি প্রথাবদ্ধ প্রসঙ্গ। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদিতে নারীরা পতিনিন্দায় সরব। আর এর পিছনে কবিরা স্বেচ্ছাচারিণী নারীদের চরিত্রভ্রংশের দৃষ্টান্ত সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। যেমন 'জামতি পালা'য় ঘনরাম লাউসেন এবং কর্পূরকে দর্শনে বারুজীবী নারীদের কামোন্মত্ততার ছবি এঁকেছেন —

অনুপম সুঠাম নাগর দেখি দুই।
মনে করে রাত্রিদিন হিয়া মাঝে থুই।।
....
পরস্পর পতিনিন্দা করে নারীগণে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রসভণে।।[২৪৩]

ভারতচন্দ্রের সত্যদর্শন আরো তীব্র। আলোচ্য অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে - চোর সুন্দর ধরা পড়েছে, তাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই দেখে কুলবতীগণ বিচলিত হয়ে সুন্দরের মাপে যাচাই করে নিচ্ছে পতিদেবতাদের। এই বিচারের কালে তারা নিজ পতিপক্ষে রায় দিতে পারেনি। নীতিবিগর্হিত, সতীত্বের পরিপন্থী তাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি। যেমন - বধির পতি প্রসঙ্গে এক নারী বলে —

সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত।।[২৪৪]

আর এক রমণীর ভাগ্যে জুটেছে বৃদ্ধ স্বামী —

বদনে বদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত।।[২৪৫]

বলাই বাহুল্য কুলস্ত্রীর পক্ষে এমন অসামাজিক মানসিকতা পোষণ সাংস্কৃতিক শুচিতাকে বিঘ্নিত করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর নারীসমাজকে নিন্দিত করার সময় আমরা ভুলে যাই তাদের ভোগেচ্ছা ও ভোগাশ্রয়েব শোচনীয় অসামঞ্জস্যের বিষয়টি। আর সেই সামাঞ্জস্যহীনতার কারণ নিহিত স্বেচ্ছাচারী পুরুষতন্ত্রের মধ্যে। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে নারীদের এহেন কুরুচি ও দুর্নীতির মূলে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজের পরুষ প্রবঞ্চনাই দায়ী। মৈমনসিংহ গীতিকাব বেশ কয়েকটি পালায় কামুক পুরুষের হাতে নারীনিগ্রহের কাহিনী পাই। আর তার বিপরীতে নারীচরিত্রের ত্যাগ ও সতীত্ব মহিমার অপূর্ব প্রকাশ দেখি। বস্তুত, গীতিকাগুলোয় যে পরিবেশ চিত্রিত তা নারীর মর্যাদা রক্ষার অনুকূল ছিলনা। হার্মাদদের অত্যাচার, ডাকাতদের অতর্কিত আক্রমণ,

লুব্ধ পুরুষের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি সুন্দরী রমণীদের এতটুকু স্বস্তি দেয়নি। 'কাফেনচোরা' পালায় নববধূকে সলজ্জকণ্ঠে বলতে শুনি ---

বিয়ার দিনে ডাকাইত্যার হাতেতে পড়িয়া।
লাগড় বভু কানর লতি গিয়াছে ছিড়িয়া।[৮৬]

গীতিকার কাহিনী কঠোর বাস্তবকে অনেক সময়েই কোমল কল্পনার মেদুর স্পর্শে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তাই উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত পুরুষের কামনাকে অতিক্রম করে রমণীরা কান্ত-কোমলা, সর্বংসহা হয়েও নিজেদের মানসিক সতীত্বকে রক্ষা করতে চেয়েছে। 'নছর-মালুম' পালায় তাই শুনি ---

নারীর দৌলত সন্তিপনা রাইখত যদি চায়
এমন পুরুষ কেহ নাই কাড়ি লৈয়া যায়।[৮৭]

মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ভারতচন্দ্রের পরেই রামপ্রসাদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। কবি হিসাবে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পরবর্তী। অবশ্য কালের হিসাবে কিছুটা নবাগত হলেও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা হিসাবে মনমেজাজের আধুনিকতার দাবিতে তিনি ভারতচন্দ্রের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। ভারতচন্দ্রের কলমের যাদুতে বিদ্যাসুন্দরের রুচিবিগর্হিত শৃঙ্গার রোম্যান্সরসায়িত কাব্য হয়ে উঠেছে। আর তাকে অনুকরণ করতে গিয়ে রামপ্রসাদ কেবলি 'সার' টুকু সম্বল করেছেন, 'নির্যাসের' ছিটেফোঁটাও আস্বাদন করতে পারেননি। ফলে ভারতচন্দ্রীয় 'বিদ্যাসুন্দর' যেখানে যুগ-শৈথিল্যকে স্বীকার করেও কল্পনার ঐশ্বর্যে, চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে কিংবা ভাষা ব্যবহারের অমোঘ নৈপুণ্যে যুগোত্তীর্ণ, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' সেখানে নেহাতই আদিরসের চড়া মেজাজের বশংবদ হয়ে সম্পূর্ণরূপেই অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচি-বিকৃতির শিকার। আসলে উভয় কবির প্রধান আর শেষ পার্থক্য আভিজাত্যে। ভারতচন্দ্র মুঘল আমলের পড়ন্ত জমিদার বংশের সন্তান। ফলে রাজকীয় কৌলীন্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরোপিত নয়, বংশগত। তাই বর্ধমান রাজপরিবারের কাহিনী বর্ণনায় তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ। অন্যদিকে রামপ্রসাদের ধমনীতে অভাবী মানুষের গ্রাম্য ঐতিহ্য। রাজকীয় বৈভব বা আভিজাত্যের সঙ্গে কোনোকালেই কোনো পরিচয় ঘটেনি তাঁর। আর এর প্রভাব পড়েছে বিদ্যাসুন্দরের রাজকাহিনীতে।

বিষয়-বিন্যাস অনুযায়ী কাব্যদুটির তুলনা করেছেন ডঃ দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'রাজসভার কবি ও কাব্য' গ্রন্থে। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে দু'একটা সহজদৃষ্ট ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন - বিদ্যাসুন্দরের দর্শন প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র

যে আভিজাত্য দেখিয়েছেন রামপ্রসাদের কাব্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। কেয়াপাতার কৌটোর মধ্যে পুষ্পময় রতিকাম নির্মাণ করে কেয়াপাতার চিত্রকাব্যে বিদ্যার জন্য সুন্দরের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক হেঁয়ালিশ্লোকে ভারতচন্দ্রের সুনিপুণ নাগর বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, প্রত্যুত্তরে সুন্দরের উদ্দেশ্যে বিদ্যারও আত্মপরিচিতি শ্লোকের চতুর হেঁয়ালি। কিন্তু রামপ্রসাদের কাব্যে আছে মাল্যগ্রন্থনের বিশাল আয়োজন, আর মাল্যের মধ্যে কলাকুশলীহীন আত্মবিবরণ — বিদ্যার প্রত্যুত্তর সেখানে অনুপস্থিত।

বিদ্যা-সুন্দরের প্রথম মিলন বা কৌতুকারম্ভ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র যে অভিজাতজনোচিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, রামপ্রসাদের কাব্যে তা অনুপস্থিত। মালিনীর কাছে বিদ্যার সঙ্গে মিলনেব কথা গোপন করে ভারতচন্দ্র সুন্দবের আভিজাত্য বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে রামপ্রসাদের সুন্দর অবাঞ্ছিত কামুক লম্পটের মত কূটনী চরিত্রের হীরার সঙ্গে আলাপ করে নিজের বিদ্যাসমাগম বর্ণনা করেছেন —

সুকবি সুন্দর গেল মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে।।[২৪৮]

বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের মিলন ব্যাপারটা রামপ্রসাদ এক কথায় অশ্লীল করে তুলেছেন। প্রথম দিনেই নায়ক-নায়িকার বিপরীত শৃঙ্গার বর্ণনা কিংবা নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে প্রথম মিলন রাত্রিতেই প্রগলভতা কখনই শোভন বা কামশাস্ত্র অনুমোদিত নয়। ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বিদ্যা-সুন্দরের উক্তি-প্রত্যুক্তি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে নবোঢ়ার ভাব চমৎকার ফুটেছে।[২৪৯] কিন্তু রামপ্রসাদ বিদ্যাকে লজ্জাব আবরণ থেকে রেহাই দিয়েছেন শুরুতেই, জ্ঞাতরতিরসা প্রগলভা যুবতীর মতই তার আচরণ ও উক্তি অস্বস্তিকর —

ক্ষনেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতি।।
নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি।
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি।।[২৫০]

ভাষা ব্যবহারেও রামপ্রসাদকে কখনই শালীন মনে হয় না।

এছাড়া ভারতচন্দ্রের 'রাণী' চরিত্রটি একান্তই রাজরাণী গোত্রের। তাই বিদ্যাব গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় কবি আভিজাত্যের সঙ্গে বাক্-সংযমকে মিলিয়েছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের বিবরণে তা নিছকই দুজন গ্রাম্য,সাধারণ নারীর নিম্নমানের গৃহবিবাদের রূপ নিয়েছে। 'বাণীর বিদ্যা প্রতি ভর্ৎসন', 'রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী', 'রাণীসহ বিদ্যা ও সখিগণের পুনর্বাক্‌ছল' অংশগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৫১]

ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় সাধকদের সমন্বয়ধর্মী ও সৃষ্টিধর্মী সাধনার ধারা, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সৃষ্ট মধুর রসাশ্রিত কাব্যৈতিহ্য এবং মাধুর্যভাবের আলোকে জীবনের দিকে নতুন করে ফিরে তাকানোর দৃষ্টিকোণ চৈতন্যদেবে পরিণতি লাভ করেছিল। জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ চৈতন্যদেবের মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্খা, আকৃতি ও মোক্ষলাভের প্রেরণার রসঘন অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছিল। তাঁর তিরোধানের পর চৈতন্য-ভক্তরা স্বল্পকালের মধ্যেই দুটো প্রধান ধারায় ভাগ হয়ে যায়। এক, বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রবর্তিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা; দুই, নবদ্বীপে উদ্ভাবিত মতবাদ, যার লক্ষ্য চৈতন্যদেবকেই চরম ও পরম আরাধ্যরূপে উপাসনা। তবে এই দুটো বিশেষ সাধন-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য যাই থাক না কেন চৈতন্য মতবাদে যাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরা তার মধ্যে একটা নতুন সংশ্লেষের সন্ধান পান। এই সন্ধান - প্রেমের সন্ধান। প্রচলিত সংস্কার সংস্কৃতির কলুষ ও মলিনতা দূর করে আশায়, উদ্দীপনায় মানুষের হৃত বিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করার সন্ধান; নতুন বিশ্বাসে, নতুন আদর্শে জীবনকে অনুপ্রাণিত করার সন্ধান। প্রচলিত সমাজ জীবনের না পাওয়ার বেদনাকে পাওয়ার আনন্দে, খণ্ডিত জীবনবোধকে অখণ্ড জীবনবোধ ও অসীম মুক্তির আস্বাদে ভরে দিতে চেয়েছিলেন বলে এবং সমাজ সম্পর্কের পরিবর্তে সত্য মানবিক সম্পর্ককে সংস্থাপিত করে সমাজকে পুনঃসংগঠিত করার বাণী ঘোষণা করেছিলেন বলেই বৈষ্ণব গীতিকারগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে — সাহিত্যে-সংগীতে-সমাজে নতুন শক্তির উদ্বোধক। এই শক্তির প্রধান কথা আত্মশক্তিতে তথা মানবিক শক্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস শিথিল হতে থাকে। বৈষ্ণব চিন্তায় ও ব্যবহারে স্থান করে নেয় অবাঞ্ছিত মলিনতা। ফলে দীর্ঘলালিত সুস্থতা অপসৃত হয়ে বিকৃতি প্রাধান্য লাভ করে। বৈষ্ণবপনা নেহাৎ একটা ভঙ্গিতে পরিণত হয়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রত্যক্ষ সামাজিক আচরণের মধ্যে এই বিকৃতি আরও বেশী ধরা পড়ে।

সহজিয়া সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল দৈহিক কামচর্চা। কামচর্চার পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়েই সাধকেরা নিষ্কাম প্রেমের চূড়ায় উপনীত হতে চেয়েছিলেন। সুতরাং সহজিয়া যুক্তিতে ইন্দ্রিয়ভোগলিপ্সু মন ও মননের, স্থূল বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার নিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ক্রমশ দেখা যেতে লাগল, সহজিয়াগণ সাধন মার্গের প্রথম সত্যটি নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে সহজিয়া সাধনা নিছক নারীপুরুষের অবাধ মিলন জনিত স্বেচ্ছাচারের রূপ নিল। বৈষ্ণবীরা তখন সমাজে 'রসিকা নাগরী' হিসাবে খ্যাত ছিল। 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যে কবি বিজয়রাম তীর্থযাত্রা বর্ণনার অনুষঙ্গে ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী বৈষ্ণবীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন —

চলিল বৈষ্ণবী দুই শ্যামপ্রিয়া নাম।
সর্বদা গায়ন করে মুখে কৃষ্ণনাম।।

আর আর যাত্রীগণ দেবে অনুরাতা।
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর সদা কেলী কথা।।[২৩৬]

দুই বৈষ্ণবী সম্পর্কে কবির এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কবি নবদ্বীপের বর্ণনা দিতে গিয়েও চৈতন্যদেবের কোনরূপ উল্লেখ করেননি। সেকালে বৈষ্ণদের মধ্যে যে নৈতিক অবনতি ঘটেছিল কবি শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর আচরনে তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরিশেষে শ্যামপ্রিয়ার পরিণতিও কবি ব্যঙ্গ সহকারে বর্ণনা করতে ভোলেননি—

শ্যামপ্রিয়া আদি করি জন জনে।
*   *   *   *   *
দিয়া সভাবে পাঠাল্যা বৃন্দাবনে।।
তার সঙ্গে জত জনের রতি-প্রীত ছিল।
তাহার বিচ্ছেদে সবে কান্দিতে লাগিল।।
পঞ্চমাস গর্ভ প্রিয়া করিলা গমন।
বালক হইলে নাম হবে বৃন্দাবন।।[২৩৭]

এই অন্তঃসারশূন্য বৈষ্ণবধর্মের আদর্শে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম নিল খেউড়-আখড়াই-কবিগান। লোকরঞ্জক সংস্কৃতি কলা হিসাবে এই গানগুলি সেই সময়ে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। অবশ্য সুরুচির বাহন ছিল না বলেই এরা এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায়, "এই গানের রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে গীত সমুদয় রচনা করিতেন, তৎকালে তাহা অত্যন্ত আমোদ হইত। এই মহাশয়দের সময় যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিলনা, সামান্য টপ্পার ন্যায় সুরের গান করিয়া তাহাকেই আখড়াই বিখ্যাত করিয়াছিলেন।"[২৩৮]

এই আখড়াই গানের উদ্ভবেরও আগে নিছক চটুল খেউড় গান আলাদাভাবে গাইবার রীতি ছিল নদীয়ায় আর শান্তিপুরে। 'বিদ্যাসুন্দরে' ভারতচন্দ্র লিখেছেন, 'নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাঁটে খেঁড়ু শুনাইব।' নদীয়ার খেউড়ের প্রসঙ্গে বিশ্বকোষে বলা হয়েছে: "নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমী পূজার দিন মহিষ বলিদানের পরে কাদাখেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর রাজকুমার- দিগকে নিজে নিজে এক একটি স-কার ব কারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন কথাকাটাকাটি ও উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে পাওয়া যায়।"[২৩৯]

এই উল্লেখ থেকেই বোঝা যায় খেউড় কবিগানের আদিরসাত্মক পূর্বরূপ। প্রথমদিকে খেউড় শুধু গান হিসাবেই গাওয়া হত। পরে শুরু হল খেউড়ের সংগীত লড়াই। পক্ষ-

প্রতিপক্ষে শাণিত চটুল বাক্যবিন্যাসে গানে বা ছড়ায় আক্রমণ রচিত হত, প্রকাশ্য আসরে জনমণ্ডলীর মধ্যে। অশ্লীল ছড়া ও পদ্যবচনার মধ্যে দিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতাই পরবর্তী যুগের কবিগানের আদি আভাস দিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই ধরণের সংগীত লড়াইয়ের প্রবর্তক। এই সংগীত সংগ্রাম কেবলই খেউড় গানে। কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে প্রচারিত খেউড় গানের লড়াই পরবর্তীকালে কবির লড়াই এ রূপ বদলাল। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্রের আগেই কবিগানের উদ্ভব ঘটেছে। শুরুতে বৈষ্ণবীয় ভাব সম্পদের নমুনা রেখে খেউড়ে ও চটুল শব্দভারে ছড়া বচনা আখড়াই গানেরও প্রথাবদ্ধ রীতি। সমাজ নেতা কৃষ্ণচন্দ্র এর পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় এর বহুল প্রচার ঘটে গেল। আপামর জনরুচিতে বিকৃতির প্রসার ঘটল। প্রথমে নদীয়া, তারপর ধীরে ধীরে সপ্তগ্রাম, চুঁচুড়া এবং শেষ পর্যন্ত নতুন সভ্যতার জন্মভূমি কলকাতায় নির্মিত হল আখড়াই সঙ্গীতের ঐতিহাসিক যাত্রাপথের পীঠস্থান।

ব্যবসার লীলাভূমি কলকাতা। এখানে মনোরঞ্জক উপাদান নিয়ে ব্যবসা শুরু হতে দেরী হয়না। সেই ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সদ্য গজিয়ে ওঠা ধনীবাবুরা। সেই প্রথমপর্বে কলকাতার হালসীবাগানে নিয়মিত গানের লড়াইয়ের কথা গুপ্তকবি শুনিয়েছেন। নব্যধনী ও শৌখিনবাবুরা নিজেরাই দল বেঁধে দরকার হলে ছড়া বেঁধে বা অশিক্ষিতপটু কবিদের সাহায্য নিয়ে বাজনা বাজিয়ে গানের মহড়া দিতেন। আমোদ-আহ্লাদে খরচ করার মত নতুন বিষয় পেলে কলকাতার বাবুদের আর বোখা যেতনা। দল করে গানের লড়াইয়ের রেষারেষি প্রথম প্রথম কলহ বিবাদে গিয়েও পৌঁছোত। হালসী বাগানের সঙ্গে একই কালে শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, নিমতলা ও রামবাগানে আখড়াই দল গড়ে উঠেছিল।

কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ আখড়াই গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। নদীয়ায় যে কাজটি একদা করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কলকাতায় সেই ভূমিকা নেন হেষ্টিংসের মুন্সী নবকৃষ্ণ। তাঁরই আশ্রয়ে ছিলেন কুলুইচন্দ্র সেন। নবদ্বীপ চুঁচড়োর আখড়াই গানকে ইনি ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন।

কবিগানের জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আখড়াই গানের সমসময়েই এর আবির্ভাব। প্রসংগত কবিগানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

এই সময়ের বঙ্গভূমি অভাবিত দুর্যোগের মেঘে ভারাকান্ত। রাষ্ট্রীয় নৈরাজ্য, বিপর্যস্ত আর্থিক ব্যবস্থা, পড়ন্ত সামন্ততান্ত্রিক শাসন, বিত্তসর্বস্ব কৌলিন্য-বর্জিত নগরমুখী ইজারাদারী সংস্কৃতি, শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মের অনাচার সেই সময় এক বৃহৎ সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় একটানা বর্গীর হাঙ্গামা, জলপথে পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের উৎপাত, সুযোগসন্ধানী বিদেশী বণিকদের লোলুপ বাহুবিস্তার

বাংলার জনজীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এই দীর্ঘ অবক্ষয়ী যুগের দুই কৃতী সাহিত্যিক। কিন্তু নিজেদের প্রতিভাকে এঁরা যুগসম্ভূত অপসংস্কৃতির প্রভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। বস্তুত এই পরিবেশেই লৌকিক সংস্কৃতি চর্চায় কবিগানের প্রসার ঘটেছিল।

সংস্কৃতির মূল্যায়নে যখন পরিশীলিত রসোপলব্ধি ও ভাবের গভীরতার সঙ্গে উন্নত সমাজমনস্কতা স্থান পায়না, মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় বাকচাতুর্যে ও চটুলভারের তাৎক্ষণিক প্রয়োগে তখন সংস্কৃতির আবেদন নির্ধারিত করতে হয় হারজিতের প্রসঙ্গ এনে। কবিগানের প্রাসঙ্গিক মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা, রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল ? তখন নূতন রাজধানী সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া দুইদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"[২১৬] কবিগানের উত্তর-প্রত্যুত্তরে অতি নিম্নমানের গালিগালাজ খুবই প্রচলিত ছিল। যেমন - কবিয়াল নীলুঠাকুরের ভাই রামপ্রসাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কবিয়াল রাম বসু তাঁকে 'রাত ভিখিরির ধামা বওয়া'বলে কুৎসিত্ ইঙ্গিত করেছিলেন অনায়াসে। আসলে কবিওয়ালাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাবকবির শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন ছিল না তেমন পারিবারিক সামাজিক রুচির পরিচ্ছন্ন স্তর থেকে তাঁদের মানসিক বিকাশও ঘটেনি। তৎকালীন সমাজ বিচারের মানদণ্ডে নিচু তলার যে সব মানুষ স্বভাবকবি হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁদের কটাক্ষ না করেও বলা চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমিতে রুচিবিকৃতির স্থানই সাহিত্য দরবারে সর্বোচ্চে ছিল।

কবিগায়কদের মধ্যে আদি হিসাবে সম্মানিত হলেন 'গোঁজলা গুই'। ঈশ্বর গুপ্ত 'কবিজীবনী'তে জানিয়েছেন আঠার শতকের সূচনাকালে গোঁজলা গুই পেশাদারী দল গড়ে ধনীদের গৃহে গাহনা করতেন। সমাজে পেশাদারী গানের দলের চল থাকলে ধরেই নিতে হবে এই ধরনের সংগীতানুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট না হলে পেশাদারী দলের প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। গোঁজলা গুই মূলত গান বাঁধতেন বৈষ্ণব গীতির বিষয় ও আঙ্গি ক নিয়ে। সরল বাংলায় জনচিত্তজয়ী প্রেমের গান লোক-মজানো ভঙ্গিতে সহজসুরে আসরে দাঁড়িয়ে গাওয়া হত। সুশীলকুমার দে বলেছেন,

"It must be noted that the latter (songs of Kaviwalas) in many cases debased and ulgarised, while they borrowed the ideas and conceptions of Baisanab poetry. One particular section of Baisnab poetry, remarkable for its passion and its poetic quality, which is

generally grouped under the heading of প্রেম বৈচিত্ত্য is practically non-existent in Kabi literature."[১৩৭]

বৈষ্ণব কবিতার অতীন্দ্রিয়তা কবিগানে থাকল না, থাকল রক্তমাংসের স্থূলতাটুকু। এই অতীন্দ্রিয়তাই রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে অসামান্য করে তুলেছে। তা না হলে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বহুকাল প্রচলিত গ্রাম্যকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকজীবনের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণ নিয়ে লৌকিক কাহিনীর ধারা চৈতন্যধর্মের পূর্বে এবং পরেও অব্যাহত রূপে চলে এসেছে। এর ইতিহাস বহু প্রাচীন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন --- সবেতেই লৌকিক গ্রাম্য কৃষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে বিশেষ রুচির বৈভবে অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী উঁচুমার্গের ভাববাদী দার্শনিক কল্পনায় পরিণতি লাভ করেছিল। নিম্নরুচির আকর্ষণে ঐ একই বিষয়বস্তু কবিগানে স্থূল ও চটুল রুচিবিকারে নেমে এসেছিল। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব চিরকালই আদিরসের উৎস। চৈতন্যধর্মের প্রাণবন্ত ঐতিহ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে সজীবতা হারাল, তখনই রাধাকৃষ্ণের লীলার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য চটুল রুচিবিকারের আশ্রয় নিতে বাধা পায়নি, কেননা এই ঐতিহ্য চৈতন্যধর্মের আগে থেকেই দেশে বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই কবিগানের সংস্কৃতি লৌকিক কৃষ্টিচর্চায় প্রধান আসন নিতে থাকে। চৈতন্য পরবর্তী যুগে খেউড় গান নিয়ে সংগীত লড়াই সে যুগে রাজা-জমিদারদের পোষাকতা পেয়েছে। খেউড়ের চাপান-উতোর ও বিষয়বস্তুর আদিরস প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে কবিগানকে। ভবতোষ দত্ত এই প্রসঙ্গে ঝুমুর ও ধামালী গানের প্রভাবের কথাও বলেছেন ('কবিজীবনী')। তবে মূল বিষয়বস্তুতে এবং গানের আঙ্গিকে বৈষ্ণবীয় প্রেম সংগীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়লেও এর চটুল উদ্দীপনা ও রুচিবিকৃতির ধার সরাসরি খেউড় গান থেকেই উদ্ভূত।

বস্তুত মঙ্গল কাব্যে যেমন কবিওয়ালাদের গানেও তেমনি বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটা দিক প্রতিফলিত হয়েছিল এবং সেই সাংস্কৃতিক দিকটি আদৌ বলিষ্ঠ নয়। ভবতোষ দত্তর ভাষায় - "যে নৈতিক দুর্গতির পরিচয় এর মধ্যে আছে সেটা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রবল হয়ে উঠেছিল। শুধু খেউড়েই নয়, সখীসংবাদ বা বিরহেও সেই দুর্গতির ছাপ আছে। কৃষ্ণের ব্যবহার কলঙ্কে ও ছলনায় ক্লেদাক্ত। তারসঙ্গে রাধার অভিমান প্রণয়ের দুর্বল রুগ্ন ভাবালুতা মাত্র। জীবনে বলিষ্ঠ আদর্শ নেই। এমন একটি সর্বজনপরিচিত চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন, যার স্বাস্থ্যকর প্রভাব কবির কল্পনাকে ঋজু ও শক্তিমান করে তুলতে পারে। যাঁরা এসব গান শুনতেন, ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শও অকলঙ্ক বা ঋজু ছিলনা। কৃষ্ণের প্রবঞ্চনা ও রাধার লাঞ্ছনা এবং তাই নিয়ে সখীদের প্রতিকারহীন অনুযোগ শুনতে বিবেকের অসম্মতি ছিল না। এগুলি যে বাঙালী সংস্কৃতির উত্তম এবং প্রাণবান ফল - একথা অবশ্যই স্বীকার্য নয়। শেষ পর্যন্ত তাই তারা স্থায়ী হল না; যদিও একে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যথেষ্টই হয়েছে। কবিগান ফিরে গিয়েছে সেইখানে, যেখান

থেকে একদিন সমাজের চিত্তশূন্যতার সুযোগ নিয়ে উঠে এসেছিল। গ্রামাঞ্চলে ও নিম্নতর লোকসমাজে এখনও কবিগানের চর্চা হয়, কিন্তু বলিষ্ঠতর চিন্তা এবং কল্পনায় যে আসন পূর্ণ, সেখানে আর সে স্থান পায় না।"[২৫৮]

বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে কবিওয়ালাদের যোগাযোগ বড় স্পষ্ট। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণায় কবিগানের জন্ম হলেও এর না আছে বৈষ্ণব কবিতার মত ধর্মীয় পরিবেশ, না বৈষ্ণব পদকর্তা শ্রেণীর ধর্মীয় মানুষ, যারা কেবল কবিতাকার হয়ে থাকেননি, দেখা দিয়েছিলেন মুখে কবিতা এবং গায়ে নামাবলী জড়ানো এক বিচিত্র অথচ একক মূর্তিতে। ধর্মের প্রবল বাঁধন কেটে এঁরা বেড়িয়ে এসেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো উন্নত রুচির তাগিদে নয়। তাই কবিগানে রাধাকৃষ্ণেব কথা থাকলেও রাধা-কৃষ্ণ লীলা এখানে এমন স্তরে নেমে গেছে যা কিনা আর বৈষ্ণব পদাবলীর 'নিকষিত হেম' নয় — মানব-মানবীর দৈহিক ক্ষুধা তাড়নারই অকুণ্ঠ প্রকাশ। সামাজিক সংস্কার, নীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে এ প্রেম দেহমুখী। কবিগানের এই দৈহিক প্রেমচেতনা বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক আচ্ছন্নতার বাইরে আধুনিক বাস্তববাদী মনোভাবেরই পরিচয়বাহী। যেমন - রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রণয়ে দেহচেতনার নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি কবিগানে। গানটি 'লালু-নন্দলাল' (লালচন্দ্র এবং নন্দলাল) ভণিতাযুক্ত —

ওকি অপরূপ দেখি ধনি।

....

কিবা কামকুকহ কি তড়িত পুচ্ছ
কিবা হয় তনুখানি।
কি কুচ গিরি বুঝিতে না পারি
কি কোক বিহীন পানি।।
কি মৃণালদণ্ড কিবা করিশুন্ড
কিবা বাহুর সুবলনী।
ত্রিবলি ত্রিগুণ কি কাম সোপান
কিবা নাভি তরঙ্গিনী।।
কিবা কটিদেশ কিবা পয়ূহয
মধ্যে শোভিছে কিঙ্কিরী।[২০১]

সামগ্রিক আলোচনায় এটা স্পষ্ট, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিগান সাহিত্য হিসাবে আদৌ উৎকৃষ্ট মানের নয়। কিন্তু তবুও আধুনিক সমালোচকদের কেউ কেউ কবিগানের মধ্যে ইতিবাচক দিকটি সন্ধান করে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এঁদেরই একজন হলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি —

"সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিগানের একটি চিরন্তন তাৎপর্য আছে। ইহা রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাববেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া সার্বভৌম রসানুভূতির ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। এই দিক দিয়া কবিয়ালেরা আধুনিক বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী কবিগোষ্ঠীর পথপ্রদর্শক ও পূর্বসূরী। দ্বিতীয়ত, তাহারা প্রেমের লৌকিক দিকের বিস্তারিত কাব্যালোচনার দ্বারা বাঙলার সমাজ-জীবনে উহার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষ গীতিকবিতা বা গানের চর্চার দ্বারা তাহারা গানকে ধর্মের অনুচরত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই সমস্ত দিক দিয়াই বাংলা কাব্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু যাহারা এই পথরেখার প্রথম সূচনা করিয়াছিল তাহাদিগকে কুরুচি ও শিক্ষাহীনতার অপবাদ দিয়া তাহাদের প্রতি ঋণের বিষয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। কবিয়ালের যুগ আর ফিরিবে না। বঙ্কিমের ভাষায়, উহার ফিবিবার আর প্রয়োজনও নাই; কিন্তু যাহা একদা ছিল ও কাব্যধারাকে প্রবাহিত রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল তাহাকে ভুলিলে ইতিহাসকেই বিকৃত করা হইবে।"[২৬০] সত্যিই অষ্টাদশ শতাব্দীর হরুঠাকুর বা রাসু-নৃসিংহেব কয়েকটি পদ পড়লে বোঝা যায় 'বৈষ্ণব পদাবলীরই নতুনতর সংস্করণ' হযেছিল তাঁদের হাতে। ভক্তিভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে কাব্য-অর্ঘ্য রচনা করেছিলেন, তা সতিই আনন্দের সামগ্রী। দৃষ্টান্তস্বরূপ হরু ঠাকুরের নাম করা যায়। তাঁর 'সখীসংবাদ'-এর একটি পদে লাজ-ভয় শঙ্কিতা রাধাব অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে।

'শ্যাম শুন শুন যাও কেন রাখছে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ।।[২৬১]

পদটি যেন বৈষ্ণব কবিতারই নতুনতর সংস্করণ।

দু'একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত এই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ যুগের সংকট আর দৈন্যকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আর্থ-রাজনৈতিক জীবনের দুরারোগ্য ব্যাধির মধ্যেই তাকে অভিযান চালাতে হয়েছে। স্তূপীকৃত মালিন্য, অবক্ষয় আর ধ্বংসের বন্ধ্যা জমি থেকে তাকে আহরণ করতে হয়েছে জীবনরস। স্বভাবতই সুস্থ, বলিষ্ঠ কোনো প্রত্যয়ের হদিশ মেলেনি এই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক সীমানা থেকে।

উল্লেখপঞ্জী

১) K. K. Datta, Studies in the History of Bengal Subah, 1936, P.1.
২) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৫৬।
৩) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ: ৪৩৩।
৪) তদেব, পৃ: ৪৩৩।

৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১৯।

৬) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৪৬।

৭) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, ১৯৮১, পৃ: ৬৫।

৮) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ: ১৫৫-১৫৬।

৯) তদেব, পৃ: ৩১৪।

১০) তদেব, পৃ: ৩১৩।

১১) কাঞ্চন বসু সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, ১৯৯৫, পৃ: ৩৫।

১২) Abdul Karim, Murshid Quli Khan And His Times, 1963, P.241.

১৩) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৫২।

১৪) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল, ১৩২২, পৃ: ২০২।

১৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১৫-২০।

১৬) দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৮৯৬।

১৭) তদেব, পৃ: ৯০১।

১৮) তদেব, পৃ: ৯০১।

১৯) সনৎকুমার নস্কর, মুঘলযুগের বাংলা সাহিত্য, ১৯৯৫, পৃ: ১৬৬।

২০) তদেব।

২১) বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৯০২-৯০৩।

২২) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৪২৫।

২৩) দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৬, পৃ: ১৭৫৫।

২৪) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ১০৪০।

২৫) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১৪০।

২৬) তদেব, পৃ: ১৪১।

২৭) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ১১৫।

২৮) পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, ১৯৬৮, পৃ: ২৩৩।

২৯) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ১৬৯।

৩০) বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ১১৫।

৩১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৩২।
৩২) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ১৪।
৩৩) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৭১৯।
৩৪) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ১০৩৭।
৩৫) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯৮, পৃ: ১১৫।
৩৬) তদেব, পৃ: ১৫৯।
৩৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৯৭।
৩৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৩৯।
৩৯) তদেব, পৃ: ৩৩৯।
৪০) তদেব, পৃ: ৩৩৯।
৪১) তদেব, পৃ: ৩৩৯।
৪২) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দব, ১৩১৩, পৃ: ৮-৯।
৪৩) সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০, পৃ: ৯৩-৯৪।
৪৪) সুশীল কুমার দে, নানা নিবন্ধ, ১৩৬০, পৃ: ১১৫-১১৬।
৪৫) তদেব, পৃ: ১১৬।
৪৬) তদেব, পৃ: ১১৬।
৪৭) খোন্দকার মুজাম্মিল হক, মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, ১৯৮৭, পৃ: ২৩২-২৩৩।
৪৮) তদেব, পৃ: ২৭৯।
৪৯) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১২০-১২১।
৫০) তদেব, পৃ: ৫৫৮।
৫১) তদেব, পৃ: ১২৭।
৫২) তদেব, পৃ: ১২৭।
৫৩) তদেব, পৃ: ১৩৯।
৫৪) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ৪৸৶৹
৫৫) তদেব, পৃ: ৫১৯।
৫৬) তদেব, পৃ: ৫৩৮।
৫৭) তদেব, পৃ: ৪২৭।

৫৮) তদেব, পৃ: ৪০৮।
৫৯) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৪১।
৬০) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৪০।
৬১) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৪২-১৪৩।
৬২) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৪১-১৪২।
৬৩) তদেব, পৃ: ৪৪৫।
৬৪) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৫১।
৬৫) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৩৯।
৬৬) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ১৩৯।
৬৭) খোন্দকার মুজম্মিল হক, মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, ১৯৮৭, পৃ: ১৯।
৬৮) তদেব, ভূমিকা, পৃ: ২০।
৬৯) তদেব।
৭০) তদেব।
৭১) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৩৭০।
৭২) খোন্দকার মুজম্মিল হক, মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, ১৯৮৭, পৃ: ২৩৬।
৭৩) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১১৮।
৭৪) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৩৯৪।
৭৫) নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালা, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৩৮।
৭৬) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃঃ ১৩৬-১৩৭
৭৭) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৩৮৮।
৭৮) তদেব।
৭৯) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ১০১৭।
৮০) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৩৮৬।
৮১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২১৯।
৮২) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৭৩০।
৮৩) তদেব, পৃ: ৪২।
৮৪) তদেব, পৃ: ৪৩।
৮৫) দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ: ৯১১-৯১২।
৮৬) অতুল সুর, আঠার শতকের বাঙলা ও বাঙালী, ১৯৮৫, পৃ: ১০০।

৮৭) Alivardi and His Times, 1939, P.194.

৮৮) পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা, ১৯৮৫, পৃ: ৩৮।

৮৯) B. N. Banerjee, Begams of Bengal, 1942, P.40.

৯০) Studies in the history of Bengal Subah 1936, P.27-28.

৯১) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ: ৩০।

৯২) তদেব, পৃ: ৪৫।

৯৩) এইচ, শার্প সম্পাদিত 'Selections from Education Records Vol.I. 1781-1839, P.10.

৯৪) মানস মজুমদার, লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, ১৯৯৩, পৃ: ৮০-৮৯.

৯৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৮৬-৩৮৯।

৯৬) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৮৪।

৯৭) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৯৭-৩৯৮।

৯৮) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ২৯৮-২৯৯।

৯৯) বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৩১০।

১০০) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৬৫।

১০১) তদেব, পৃ: ৬০।

১০২) তদেব, পৃ: ৬১।

১০৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩০৩।

১০৪) তদেব, পৃ: ৩১২।

১০৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১৯৩।

১০৬) তদেব, পৃ: ২০১।

১০৭) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৭৯-১৮০।

১০৮) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৭০, পৃ: ৪৩৭।

১০৯) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১২২।

১১০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ১৬৫।
১১১) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ১৯৫।
১১২) তদেব, পৃ: ৩১২।
১১৩) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১৫০।
১১৪) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১১০।
১১৫) তদেব, পৃ: ৪৮১।
১১৬) তদেব. পৃ: ১৫০-১৫১।
১১৭) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫০০।
১১৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৩৮।
১১৯) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৭০, পৃ: ১২৩-১২৪।
১২০) তদেব, পৃ: ২৫৩।
১২১) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৭৯-১৮০।
১২২) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ১৯।
১২৩) প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, চতুর্থখণ্ড, ১৯৭২, পৃ: ৬৪-৬৫।
১২৪) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৪২৮।
১২৫) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৫৩৬।
১২৬) তদেব, পৃ: ৫০১।
১২৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৯২।
১২৮) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ২৩৯।
১২৯) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয়খণ্ড. ১৯৭০, পৃ: ৩৬৬।
১৩০) তদেব, পৃ: ১৫১।

১৩১) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৫৯।

১৩২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৩৩।

১৩৩) তদেব, পৃ: ৩৩৫।

১৩৪) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩২৫।

১৩৫) তদেব, পৃ: ৩১৭।

১৩৬) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগেব সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৪২৭।

১৩৭) তদেব, পৃ: ৪৩৩।

১৩৮) তদেব, পৃ: ৪৩২।

১৩৯) তদেব, পৃ: ৪৩৩।

১৪০) তদেব, পৃ: ৪৩১।

১৪১) তদেব, পৃ: ৪৩২।

১৪২) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৪৬৩-৪৬৪।

১৪২(ক) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৬০৩।

১৪৩) তদেব, পৃ: ৬০৩।

১৪৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৬২।

১৪৫) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১১০।

১৪৬) তদেব, পৃ: ৫৮২।

১৪৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩২৯।

১৪৮) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৫১৪-৫১৫।

১৪৯) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৪৯৪।

১৫০) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৮৫।

১৫১) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ৫২।

১৫২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৮১-৩৮২।

১৫৩) তদেব, পৃ: ২৩৫।

১৫৪) মানস মজুমদার, লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, ১৯৯৩, পৃ: ৮১।

১৫৫) তদেব, পৃ: ৮৩।

১৫৬) সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ: ৭৩-৭৪।

১৫৭) তদেব, পৃ: ৭৪।

১৫৮) তদেব, পৃ: ৭৪।

১৫৯) তদেব, পৃ: ৭৫।

১৬০) তদেব, পৃ: ৭৬।

১৬১) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বব রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৬০।

১৬২) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৩৩-২৩৫।

১৬৩) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৬৭।

১৬৪) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৯৪।

১৬৫) তদেব, পৃ: ৩৯৪।

১৬৬) সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, ১৯৯৬, পৃ: ১৯৯।

১৬৭) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৮৫।

১৬৮) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীব শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ:২২-২৩।

১৬৯) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৩৬৩।

১৭০) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৩৪।

১৭১) সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, ১৯৯৬, পৃ: ২২৭।

১৭২) তদেব।

১৭৩) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ২২৫।

১৭৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৯৭।

১৭৫) তদেব।

১৭৬) তদেব, পৃ: ১৯৯।

১৭৭) তদেব, পৃ: ২১২।

১৭৮) তদেব।

১৭৯) তদেব, পৃ: ২১৪।

১৮০) তদেব, পৃ: ৩৩৯।

১৮১) সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, ১৯৯৬, পৃ: ২৫১।

১৮২) তদেব।

১৮৩) সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত সৈয়দ হামজা বিরচিত মধুমালতী, ১৩৮০, পৃ: ১৪-১৫।

১৮৪) তদেব।

১৮৫) বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত প্রাচীন বাঙ্গালা মৈথিলি নাটক, ১৯০০, পৃ: ১৪-১৫।

১৮৬) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৩৩২।

১৮৭) সেলিম আল দীন। মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য। ১৯৯৬, পৃ: ৩১৪।

১৮৮) তদেব, পৃ: ৩১৭।

১৮৯) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৭৪, পৃ: ১৫০।

১৯০) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ: ১৪৩।

১৯১) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৮০।

১৯২) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৪১৭-৪১৮।

১৯৩) তদেব, পৃ: ১৬৭।

১৯৪) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩৩০।

১৯৫) তদেব, পৃ: ৩৩৫-৩৩৬।

১৯৬) তদেব, পৃ: ৩৫৩।

১৯৭) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৪২২।

১৯৮) তদেব, পৃ: ৪০৭।

১৯৯) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৭৬।

২০০) তদেব।

২০১) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, সপ্তম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃ: ২১৯।

২০২) আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, পৃ: ৩৭৭।

২০৩) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ:৪২৫।

২০৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩৩৩।

২০৫) দীনেশচন্দ্র সেন , বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ১৯১৪, পৃ: ২৫৭।

২০৬) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৬২।

২০৭) তদেব।

২০৮) তদেব, পৃ: ২৪৩।

২০৯) আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩, পৃ: ১০৬৫।

২১০) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ৩৬।

২১১) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৮৭।

২১২) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ:৫১-৫২।

২১৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩১৯।

২১৪) তদেব, পৃ: ১৮২।

২১৫) তদেব, পৃ: ৩৮৯।

২১৬) দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১৮৭।

২১৭) বরুণকুমার চক্রবর্তী, গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, ১৯৯৩, পৃ: ৭৫।

২১৮) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ৪৯৪।

২১৯) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ১৩৬৯, পৃ: ২০-২১।

২২০) তদেব, পৃ: ২১-২২।

২২১) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ:২৬২।

২২২) তদেব, পৃ: ২৬৬।
২২৩) তদেব, পৃ: ২৬৭।
২২৪) তদেব, পৃ: ২৭৪।
২২৫) তদেব, পৃ: ২৮২।
২২৬) তদেব।
২২৭) তদেব, পৃ: ২৮৩।
২২৮) তদেব, পৃ: ৭১৭।
২২৮(ক) তদেব, পৃ: ২৬৬।
২২৯) মাণিকরাম গাঙ্গুলী ও ধর্মমঙ্গল, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাদশ ভাগ, ১৩১২।
২৩০) বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০, পৃ: ২৬৩-২৬৪।
২৩১) পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০, পৃ: ৩৯৪।
২৩২) তদেব, পৃ: ৪৬৯।
২৩৩) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৪৫।
২৩৪) তদেব, পৃ: ৪৬।
২৩৫) হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ১৩২২, পৃ: ২৫৯।
২৩৬) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ৩২।
২৩৭) তদেব, পৃ: ১৯৯।
২৩৮) তদেব, পৃ: ৩২৫।
২৩৯) তদেব, পৃ: ২৬৫।
২৪০) প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬[illegible] পৃ: ৯৬।
২৪১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৬৯-২৭০।
২৪১(ক) তদেব, পৃ: ২৭১।
২৪২) শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র, ১৩৮১, পৃ: ৩৩৬।
২৪৩) পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মঙ্গল, ১৯৬২, পৃ:২৫৭।
২৪৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯, পৃ: ২৮৭।
২৪৫) তদেব।
২৪৬) ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ: ৫৫।
২৪৭) তদেব, পৃ: ২১।

২৪৮) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ৬৫।
২৪৯) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩, পৃ: ৬৩।
২৫০) তদেব, পৃ: ৭৪-৭৫।
২৫১) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল, ১৩২২, পৃ: ১৪।
২৫২) তদেব।
২৫৩) সংবাদপ্রভাকর ১লা ভাদ্র, ১২৬১।
২৫৪) বিশ্বকোষ, পঞ্চমখণ্ড, ১৯৫৮।
২৫৫) শতবার্ষিক রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ: ৭১০।
২৫৬) Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1962, P.316.
২৫৭) ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ: ৪১।
২৫৮) ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, ১৯৯৪, পৃ: ৪৮।
২৫৯) সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ১৩৬৯, পৃ: ১৩৭।
২৬০) নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭১, পৃ: ৫৪।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গভূমির ইতিহাস স্বর্ণপ্রসূ নয়। উদ্‌ভ্রান্তি, বিপন্নতা আর বিশৃঙ্খলার অবাধচারিতায় সুযোগ সন্ধানের উদ্দাম প্রতিযোগিতা সেখানে। আবার স্বদেশের ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ের ফাঁকে বণিকের কাছে বঙ্গভূমির বিকিয়ে যাবার বেদনাটুকুও এই শতাব্দীরই পাওনা। তাই এই শতাব্দীর ইতিহাস জীবন-সায়াহ্নে সর্বহারা।

সাহিত্যিক দেশ ও কালের প্রতিনিধিত্ব করেন। জীবনের নানান রূপ রঙে তাঁর বিশ্বাস। মানবিক আচরণ, মনস্তত্ত্ব ও নীতিজ্ঞানকে তিনি বুঝে নিতে চান। উন্মুখ হয়ে শোনেন সমকালের ধ্বনি। মনোগহনের জটিল স্তরে প্রবেশ করে নিরীক্ষণ করেন অন্তরাত্মাকে। আর তখনই সৃষ্টির মুক্তি, তার আনন্দ-কলাপ উন্মোচন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরাও এর ব্যতিক্রম নন। সেই ধূসর যুগের বিম্বিত দর্পণে ইতি-নেতির শরীরী আবেদনগুলো তাঁদের ভাবিয়েছে, মাতিয়েছে। নান্দনিক প্রেরণা জুগিয়ে সাহিত্যের জোড়কলমে যূথবদ্ধ করেছে। ফলতঃ সেই যুগের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আর্থ-সামাজিক শোষণ-পীড়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতি-পরাগতি কিংবা ধর্মীয় দ্বিধা-সংগতির কাহিনী সাহিত্যেকের ভূয়োদর্শনে চিরকালীন মূর্তি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মীমাংসা বাকি এখন একটাই প্রশ্নের। সেটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট অবস্থানজনিত।

সাধারণভাবে প্রত্যেক ঐতিহাসিক কালেরই স্বরূপটি দ্বৈত। একদিকে সে একটি বিশেষ লগ্নের, অন্যদিকে নির্বিশেষ কালপ্রবাহের। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভূমিকাও এমনই। অলৌকিক আর রহস্যময় চিত্রমালার প্রথাসর্বস্ব ঘেরাটোপের বাইরে তার অন্য একটি সত্তা আছে। বিবর্তনের নির্বিশেষ স্রোতপথ বেয়ে সে নিরেট ভবিষ্যতেরও প্রাসাদ রচয়িতা। দেবতা নয়, সে প্রাসাদের মালিক হল মানুষ। একদিকে প্রাক্-অষ্টাদশ মধ্যযুগীয় আবহাওয়া, অন্যদিকে অষ্টাদশ-উত্তর আধুনিকতা — এ দু'য়ের মধ্যবিন্দুতে অষ্টাদশ শতাব্দী পালাবদলের উদ্‌যোগ করেছে। সুতরাং ইতিহাসের নিরিখে এই শতাব্দী ক্লিষ্ট হলেও অনাগত ভবিতব্যের ভিত-স্রষ্টা হিসাবে সে সার্থক।

প্রাক্-অষ্টাদশ মধ্যযুগের প্রতীকরূপে সপ্তদশ শতাব্দীকে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ ধর্মচেতনা আর জীবনদৃষ্টির যে পশ্চাদ্‌পদতার কারণে মধ্যযুগ সবদিক দিয়ে অনাধুনিক, তার প্রায় অধিকাংশ লক্ষণই সপ্তদশ শতাব্দীতে মেলে। একদল অপরিশীলিত মানুষের সংঘবদ্ধ কুসংস্কার, অলৌকিকে আস্থাস্থাপন, যুক্তিতর্কবর্জিত অন্ধ আবেগ, গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তির মলিন দাসত্ব কিছুই বাদ নেই। আবার এই অন্ধকারের মধ্যে

জাতির ধর্মীয় জাগরণের মন্ত্রদাতা যিনি, সেই চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য প্রভাবের আচ্ছন্নতাতেও বুঁদ হয়ে থেকেছে সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। তবে আচ্ছন্নতাই সার। ফলে একঘেয়ে অভ্যস্ত চর্চায় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। তিনি বলেছেন— "সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের সামান্য পরিচয় লইলে দেখা যাইবে, ইহার পরিধি সুবৃহৎ, বিষয়বস্তু বিচিত্র, প্রকাশ ও অলঙ্করণ ঐশ্বর্যপূর্ণ। কিন্তু মৌলিকতা ও ভাববস্তু বিচার করিলে মনে হইবে, এই শতবৎসর ব্যাপী সাহিত্য কোন উল্লেখযোগ্য সিসৃক্ষার পরিচয় দিতে পারে নাই ....।"[১] তিনি আরো বলেছেন, "মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের চৈতন্য পর্ব অর্থাৎ সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী বাঙালী মানসে সোনার ফসল ফলাইয়া বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও আদর্শকে যে বিচিত্র বিকাশের পথে প্রেরণা দিয়াছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল বলিলেই চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে পাঠানশক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ও দ্রুত অবলুপ্তি ঘটিয়াছিল; কিন্তু চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য প্রভাব ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্লাবনের ফলে যে সূক্ষ্ম ভাব-গভীরতা ও জীবন-প্রত্যয় গৌড়বঙ্গের সারস্বত সাধনাকে সুপরিস্ফুট করিয়াছিল, পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘলযুগে তাহার যৌবনের ঐশ্বর্য ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিল। এই শতাব্দীতে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় মুঘল শক্তির সম্পূর্ণ অধীনে আসিয়াছিল। ইতিহাসের ঘটনা অনুবর্তন করিলে দেখা যাইবে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ মুঘল সুবাদারের নিকট শির নত করিল। দিল্লী-আগ্রার শাসনব্যবস্থা, অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে সংযোগসাধন, ব্যবসা-বাণিজ্যের অব্যাহত গতি, পাশ্চাত্ত্য বণিকদের আবির্ভাব ও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা গৌড়-বঙ্গের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা হ্রাস পাইলেও উত্তর চৈতন্যযুগের বাংলাসাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ কিয়দংশে মন্থর হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি আসিয়া বাংলা সাহিত্যে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছেন, চণ্ডীমণ্ডপে মঠে-মন্দিরে দেব-দেবীর লীলাকথা পয়ার-লাচাড়ী ছন্দে পাঁচালীর ঢঙে দিবারাত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। হিন্দু জমিদারগণের সভামঞ্চেও দেবদেবীর গায়েন-কবিগণ কোনও প্রকারে সঙ্কুচিত স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও গুণগত উৎকর্ষে তাঁহারা যে কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায়না। চৈতন্য প্রভাব বন্যাপ্রবাহের মতো পুরা এক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ও বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলকে প্লাবিত করিয়া পরবর্তী শতকের বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্যে সে প্লাবনের পলিমাটিতে বহু কবি সাধকের জন্ম দিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচুর্য সত্ত্বেও এ সাহিত্যের প্রাণধর্ম যেন ক্রমেই ক্ষীয়মান হইয়া আসিতেছিল। হয়তো চৈতন্যধর্মের মধ্যে যে পরিমাণে ভাবের উন্মাদনা ছিল, প্রেমভক্তির অতিরেক ছিল, সেই পরিমাণে সুদৃঢ় প্রাণশক্তি, পৌরুষবীর্য ও বাস্তব জীবনচেতনার প্রাচুর্য ছিলনা। ......"[২]

একদম খাঁটি কথা। কিন্তু এই প্রাণহীন নিস্তরঙ্গ পরিবেশেই প্রথম ব্যক্তিকণ্ঠ শোনা গেল। সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-বিচ্ছিন্ন মানুষকে নিয়ে কাব্য রচিত হল। 'সতীময়না' আর 'পদ্মাবতী' - জড়ত্ব আর তমসার সাহিত্য-রাজ্যে প্রাণের হিল্লোল তুলল। প্রথম সাহিত্যিক বিপ্লবের স্বাদ পাওয়া গেল। আরাকান রাজসভায়, পর্বত-নদীর সঙ্গমকেন্দ্রে বসে দৌলতকাজী আর সৈয়দ আলাওল প্রথাবহির্ভূতভাবে রক্তমাংসের জীবন সন্ধান করলেন। একান্ত ব্যক্তিগত সুকুমার প্রবৃত্তির অবদমিত অন্তস্তলটুকুকে সহানুভূতি দিয়ে যাচাই করতে চাইলেন। চমক এখানেই শেষ। কারণ বিপ্লবের রাশ টেনে রাখার যোগ্যতা এই শতাব্দীর আর কারোরই ছিল না। ফলে মূক-বধিরের নির্বোধ অনুসরণে বাকি বছরগুলো কেটেছে। সেই মঙ্গলকাব্য, সেই বৈষ্ণব পদাবলী, ধর্ম-থানে মাথা ঠোকাঠুকি।

কথায় আছে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়। হয়ত হয়। নতুবা অষ্টাদশ শতাব্দী আবার পুরোনো স্মৃতির জের টেনে পূর্ব-পুরুষের ঋণের বোঝা কমাতে ভগবানের দোহাই দিয়েই নিজেদের সুখ-অসুখের কথা পাড়বে কেন। ধর্ম-সর্বস্বতার মধ্যেও মনের কথা বলার অদম্য তাড়নায় প্রচলিত আদর্শের সঙ্গে লড়াই করবে কেন। দেবতা বনাম অস্মিতার লড়াই। যোদ্ধা আলোচ্য শতাব্দীর কবিরা; বিশেষ করে কবি রামেশ্বর, কবি ভারতচন্দ্র, কবি রামপ্রসাদ, আর একদল অশিক্ষিত পটুত্বের অধিকারী গীতিকা-রচয়িতা। সাহিত্যের ধর্মীয় আখ্যানরীতি ও পদরচনার মধ্যে শিল্পী আঁকলেন এতদিনের হেলায় হারানো জীবনের ছবি। নশ্বর মানবাত্মার বাক্যস্ফূর্তি হল। ধীরে ধীরে অধিকারবোধে দৃপ্ত হল কণ্ঠ - ঈশ্বরের কাছে এতদিনের অবহেলার জবাব চাইল সে। কল্পিত চরিত্র ঈশ্বরী পাটুনীই নয়, মনুষ্য চরিত্র রামপ্রসাদও চিন্ময়ী দেবীর কাছে তাই উদ্যত জিজ্ঞাসু —

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগচ্চিন্তা হরা মা ব্যাভারে তেমন দেখি।।
প্রভাতে দাও অর্থচিন্তা মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা।
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা বল মা তোরে কখন ডাকি।।
দিয়াছ এক মায়াচিন্তে ওমা সদাই করি তাই চিন্তে।
না পারিলাম তোমায় চিন্তে মা চিন্তাকূপে ডুবে থাকি।।
ওমা তুই তো পাষানীর মেয়ে পরম চিন্তামনি পেয়ে।
রইলি গো পাষানী হয়ে রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি।।[৫]

এই জীবন-জিজ্ঞাসা অষ্টাদশ শতাব্দীর মেঘাচ্ছন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। প্রথম অধ্যায়ে তাই ইতিহাসের সেই করাল মুহূর্তকে স্মরণ করেছি, অসংখ্য

পরস্পরবিরোধী ঘটনাসংঘাতে যে যুগ সংকটাচ্ছন্ন। শতাব্দী-সূচনায় কেন্দ্রীয় মুঘল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গভূমিতে সুবাদার মুর্শিদকুলির নবাবী প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে নবাবদের অন্তর্কলহের অবকাশে ব্রিটিশ কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপন। এরই মধ্যে একাদিক্রমে বর্গী-হাঙ্গামায়, অতিবৃষ্টি আর দ্বৈতশাসনে, সর্বোপরি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বঙ্গ-অর্থনীতির সমূহ বিপর্যয়। চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসা অশুভ দুর্যোগের আশঙ্কায় একশ বছর ধরে বঙ্গীয় ইতিহাসের রুদ্ধশ্বাস কাল যাপন।।

সমকালের এই মসীলিপ্ত পটভূমিতে নির্মিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্য কতখানি যুগসংবেদী - তার পরিচয় রয়েছে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে। যেমন দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের স্বরূপটি নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য পর্বের দ্বিমুখী প্রবণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে — ১) মধ্যযুগের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যপুষ্ট সাহিত্যরীতির অনুসরণ, এবং ২) পালাবদলের প্রস্তুতি। তাই ঐতিহ্যানুসারী মঙ্গল কাব্য, অনুবাদকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীর পাশাপাশি পাওয়া গেছে কবি-আখড়াই-খেউড় গান কিংবা মৈমনসিংহগীতিকা-পূর্ববঙ্গগীতিকার মত নবীন সাহিত্য শাখা।

তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন বিশ্লেষিত হয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত রাজনীতির টানাপোড়েনে রাজন্যবর্গ থেকে সাধারণ মানুষের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের ইতিবৃত্ত তদানীন্তন সাহিত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রামেশ্বর চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী থেকে রামপ্রসাদ সেন — সকলের সৃজিত সাহিত্যেই এই রাজনৈতিক অস্থিরতার ছবি সুলভ।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা। দুর্বল আর ভারসাম্যহীন অর্থনীতির প্রবল চাপে জনসাধারণের নাভিশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। প্রথমত দারিদ্র্য; কৃষি-সভ্যতার বিনাশের প্রাক্কালে কৃষিজীবী মানুষের খেয়ে পড়ে কোনক্রমে টিকে থাকার কাহিনী। কবি রামেশ্বর যার কথক। তারপর বর্গী আক্রমণ। লুন্ঠন আর নির্বিচার শোষণের পরিণামে বঙ্গ অর্থনীতির তিলে তিলে মৃত্যুবরণের কাহিনী। সাহিত্যের জগতে গঙ্গারাম দত্ত আর তারপর ভারতচন্দ্রের লেখনীতে তার বাস্তব গন্ধ। অবশ্য দারিদ্র্যের পাশাপাশি সমৃদ্ধি, দরিদ্র কৃষিজীবীর পাশে নবাবী জৌলুস কিংবা সম্পন্ন বৃত্তিভোগীর দু'একটা ছবিও ফুটে উঠেছে সমকালীন সাহিত্যের আশ্রয়ে। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং গীতিকা সাহিত্য এক্ষেত্রে প্রামাণ্য। শেষ পর্যন্ত শতাব্দীর অন্তিমে অনাহারের নরক যন্ত্রণার কাহিনী। মন্বন্তর, বুভুক্ষা, মৃত্যুর একাধিপত্যে জীবনের পরাভব। প্রসাদী সঙ্গীতে, ছড়ায়, চিঠিতে তার নির্মম আত্মপ্রকাশ।

পঞ্চম অধ্যায়টি ধর্মসংক্রান্ত। একদিকে মধ্যযুগীয় বাঙালীর দীর্ঘলালিত, ঐতিহ্যপুষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার; অন্যদিকে প্রথাবিরোধিতা, ঐতিহ্যভঙ্গ, সংশয় আর অবিশ্বাস। এই ঐতিহ্যমুক্তির প্রশ্নে আধুনিকতার আসন্ন আবির্ভাব সূচিত। ১৭১১ -তে রামেশ্বরের হাতে শিবের মৃত্তিকাভোগী জীবনাচরণে ঐতিহ্য-ভঙ্গের যে ক্ষীণ সুর শোনা গিয়েছিল, ভারতচন্দ্রের হাতে হাঘরে শিবের নিরঙ্কুশ অভাবচারিতায় তারই সকরুণ পরিণতি ঘটল। দেবতা, চাষী কিংবা ভিখারী - রায়ত ব্যবস্থায় বলি বাঙালীর দুটি রূপ। বোঝা গেল বুভুক্ষু দেবতার কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। সর্বহারা মানুষের মধ্যে দ্বিধার তরঙ্গ উঠল। প্রথমে দৈবী স্বপ্নাদেশ নিয়ে, তারপর দেব-অস্তিত্বে। আপ্তবাক্য মিথ্যা হতে বসল। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রবণতা বাড়ল। আর এই ঐতিহ্যরক্ষা ও ঐতিহ্যভঙ্গের টালমাটালের মধ্যে এক শান্ত-প্রসন্ন জীবনদর্শন, উত্তপ্ত উত্তাল জীবন প্রবাহে শান্তিবারির মত নেমে এল ধর্মসমন্বয় নাম নিয়ে। রামপ্রসাদ আর বাউল গায়কেরা শোনালেন সেই স্বস্তিবাণী। ঈশ্বরের সন্নিধানে জীবন-ভূয়িষ্ঠ আরাধনার সূত্রপাত করলেন তাঁরা। মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভবের ব্যর্থ চেষ্টার কথা জানা গেল সর্বপ্রথম। দেবতার সঙ্গে তাঁদের আলাপচারিতা বড় অন্তরঙ্গ, যার মীমাংসায় সুনিশ্চিত হল মানুষের জয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয়। শিক্ষাসত্র, শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাজীবীদের আনুকূল্যে বিকচোন্মুখ অথচ পশ্চাদ্‌পদ একটা শতাব্দী কিভাবে যুগ-অনুভবী হয়ে উঠলো তার স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে এখানে।

বোঝা যাচ্ছে নানা সংঘাতের বেদনায় মানুষ ক্রমেই জীবন-মুখী হয়ে উঠছে। সন্ধিক্ষণের সাহিত্যে সেই জীবনমুখিতার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হল, কবিদের ওপর সেই সময় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে ? সব কবিই কি সমকালকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন ? অবশ্যই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কবিই গড্ডলিকা প্রবাহের অংশীদার। অধিকাংশই মঙ্গল-কাব্যধারার গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দৈবী প্রশস্তির ফাঁকে একটু আধটু আত্মক্ষোভকে জায়গা দিয়েছেন। প্রচলিত চর্চার স্বাদ বদলাতে জীবনের কথা বলেছেন। যেমন রামানন্দ ঘোষ, যেমন রাধাকান্ত মিশ্র। আবার ছড়া-রচয়িতাদের ভূমিকা অন্যরকম। সমকালই তাঁদের একমাত্র আলোচ্য, কবিত্ব নয়। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর নির্ভেজাল ঐতিহাসিক ছবি তাঁদের কাছে পাওয়া গেলেও যুগান্তরের ছাড়পত্র তাতে আশাই করা যায়না। আশার আলো দেখিয়েছেন মাত্র কয়েকজন সত্যদ্রষ্টা কবি। সমকাল তাঁদের কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলেছে। এমনকি পালাবদলের সম্ভাবনার কথাও। ফলে তাঁদের সাহিত্য হয়েছে যুগের আয়না, শতাব্দীর চিন্তা-ভাবনার ফসল। সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির খুঁটিনাটি প্রক্ষেপ এঁদের কাব্যকে একদিকে যেমন যুগের প্রতি বিশ্বস্ত করেছে, অন্যদিকে আসন্ন রেনেসাঁসের মানবজমিন প্রস্তুতির

কাজও তাতে চলেছে সমানে। ফলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদ সেনের মাতৃ-পদাবলী, সুফী-বাউলের মরমীসঙ্গীত আর মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ প্রতিনিধি। ব্যক্তিগত অনুভবের ছোঁয়ায় মর্মস্পর্শী এই সব সাহিত্য-কীর্তি পরবর্তী শতাব্দীতে প্রবেশের নিঃসঙ্কোচ শপথ নিয়েছে নিঃশব্দে।

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর আবির্ভাব জীবনমুখী চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই। সূত্রপাত হয়েছে আধুনিক যুগের। প্রাচ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষার মেলবন্ধনে সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের রোমাঞ্চ লেগেছে। মহামন্ত্রের উদাত্ত আহ্বানে অজপা দেবতার ভাঙা দেউলে নেমেছে জনস্রোতের ঢল। মানুষ ছিনিয়ে নিয়েছে দেবতার আসন। ধর্মের পাত্র বদল হয়ে গেছে। এখন শুধুই জয়ের পালা। এতদিনের অবদমিত উচ্ছ্বাস সমাজ আর সাহিত্য সংস্কারের বিগলিত মাধুর্যে অঝোরে ঝরে পড়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বাঙালীর নবজাগরণে পাশ্চাত্যের অনিবার্য ভূমিকা নিয়ে দু'একটি কথা বলতেই হয়। কারণ পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া তা সম্ভব হত না। উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের দেওয়া সুপরিকল্পিত শিক্ষাগ্রহণে এবং ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে বাঙালীর প্রথম পরিচয় ঘটেছে। কোঁত, বেন্থাম, মিল, রুশো প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের মানবকল্যাণমুখী চিন্তাধারা বাঙালী মনীষীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। ভেদ-বৈষম্যহীন সুন্দর সমাজব্যবস্থা এবং শোষণ-পীড়ন মুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠনের যে মহতী বাণী সেদিন সাগরপার থেকে এসেছিল, আপামর শিক্ষিত বাঙালী তাকে অন্তর থেকে বরণ করে নিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর এই মানবকল্যান ব্রতের প্রধান ঋত্বিক ছিলেন তরুণ জ্ঞান তপস্বী ডিরোজিও। তাঁর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়ংবেঙ্গলগণ সংস্কারমুক্তির যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাতে নবভাবের আকস্মিক তাড়নায় ভাঙনের পালাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। আর তারই মধ্যে দিয়ে জেগে উঠেছিল সমৃদ্ধ বঙ্গ। পাশ্চাত্য প্রচারিত হিউম্যানিটি পূজায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যুগের বাঙালী তার ভেদ-বৈষম্য কণ্টকিত দেশেও জাতি-ধর্ম নিরপেক্ষ মানবমৈত্রীর বাণী প্রচার করেছে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোচাবার জন্য সে নারীপ্রগতির পক্ষে লড়াই করেছে। আবার পাশ্চাত্য মনীষীর গলায় গলা মিলিয়ে 'স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার' বলে সোচ্চার হয়েছে। এককথায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সমস্ত উন্নতি তথা আত্মবিকাশের মূলে পাশ্চাত্যের প্রভাব অনিবার্য।

প্রশ্ন অন্যখানে। বাঙালীর গ্রহণক্ষমতা নিয়ে। পাশ্চাত্যের মানবকল্যাণযজ্ঞে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী যেভাবে শামিল হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। এই স্পন্দন, এই আলোড়ন,

এই উচ্ছ্বাস — সে কি সম্পূর্ণই পাশ্চাত্যের প্রেরণাপ্রসূত ? মনে হয় না। কারণ, প্রাক্-উনবিংশে প্রতীচ্যের ভূমিকা আদৌ স্মৃতিসুখকর ছিলনা। আসলে বাঙালীর এই জ্ঞানান্বেষণের অন্তরালে তার মগ্নচৈতন্যের ভূমিকাটি বড় প্রবল। আর সেই চৈতন্যে মানবপ্রেম, মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার জমি তৈরী করে দিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দী। গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর খেলায় শত যন্ত্রণার মধ্যেও এই শতাব্দী তার উত্তর-পুরুষকে নবজীবন সম্ভাবনার আশ্বাস দিতে পেরেছে। নতুবা মরুভূমির উষর বুকে ফুলের এমন অঢেল সমারোহ কল্পনাও করা যেত না। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায়, "জাতির মগ্নচৈতন্যে যাহা ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাই কোনো যুগসন্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে, ব্যক্তিবিশেষে সংহত হইয়া সেই জাতিরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্যশক্তিরূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।"[৪] এই যুগসন্ধি — অষ্টাদশ শতাব্দী। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ আর গীতিকারচয়িতার প্রতিভা সেই মগ্নচৈতন্যস্ফুরণের কথাকার। পরিণতি — উনবিংশ শতাব্দী। সুতরাং প্রাচীন ভাবাদর্শের অবসান এবং নবীন যুগচেতনার মিলনভূমিরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থান সত্যিই অভিনব।

উল্লেখপঞ্জী

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথমপর্ব, ১৯৮০, পৃ: ১।

২) তদেব, পৃ: ২।

৩) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, ১৯৫৪, পৃ: ৩১৫।

৪) বঙ্কিমবরণ, ১৩৭১, পৃ: ২২।

।। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ।।

বাংলা

১) আকবরউদ্দীন, বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ), ১৯৭৪।
২) আল দীন সেলিম, মধ্যযুগেব বাঙলা নাট্য, ১৯৯৬।
৩) আলী ওয়াজেদ সম্পাদিত সত্যপীরের পুথি, ১৩৫৬।
৪) আহমদ ওয়াকিল, মধ্যযুগে বাংলা কাব্যেব রূপ ও ভাষা, ১৯৯৪।
৫) আহসান আলী সৈয়দ সম্পাদিত সৈয়দ হামজা বিরচিত মধুমালতী, ১৩৮০।
৬) ইসলাম সিরাজুল সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩।
৭) ইসলাম সিরাজুল সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৩।
৮) ইসলাম সিরাজুল সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড. ১৯৯৩।
৯) উমব বদরুদ্দীন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, ১৪০০।
১০) করিম আবদুল সম্পাদিত মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী, ১৩২৪।
১১) গাঙ্গুলী অনিলবরণ সম্পাদিত রামানন্দ ঘোষের চণ্ডীমঙ্গল, ১৯৬৯।
১২) গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, ১৯৮৮।
১৩) গুপ্ত ক্ষেত্র, প্রাচীন কাব্যঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, ১৩৬৬।
১৪) গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ, সাধক কবি বামপ্রসাদ, ১৯৫৪।
১৫) গোস্বামী মদনমোহন, ভাবতচন্দ্র, ১৯৮৪।
১৬) ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১৯৫৭।
১৭) চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার, শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, ১৩৬৩।
১৮) চক্রবর্তী পঞ্চানন সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, ১৪০০।
১৯) চক্রবর্তী নিরঞ্জন, উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৭১।
২০) চক্রবর্তী বরুণকুমাব, গীতিকাঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, ১৯৯৩।
২১) চট্টোপাধ্যায় তপনমোহন, পলাশির যুদ্ধ, ১৯৮১।
২২) চট্টোপাধ্যায় সতীন্দ্রমোহন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, ১৯৭৪।
২৩) চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার ও লাহা নরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৯।
২৪) চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, ১৯৮৮।
২৫) চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমানঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১।
২৬) জলিল মুহম্মদ আবদুল, মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, ১৯৮৬।
২৭) ঝা শক্তিনাথ, ফকির লালন সাঁই — দেশ কাল এবং শিল্প, ১৯৯৫।

২৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, ১৯৬৪।
২৯) ঠাকুর রাধামোহন সম্পাদিত ও রায় উমা সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্র, ১৩৯১।
৩০) দত্ত বিজিত কুমার সম্পাদিত প্রাচীন বাঙ্গালা মৈথিলি নাটক, ১৯৮০।
৩১) দত্ত বিজিত কুমার ও দত্ত সুনন্দা সম্পাদিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, ১৯৬০।
৩২) দত্ত ভবতোষ সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮।
৩৩) দত্ত রাজচন্দ্র সম্পাদিত ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা, ১৩২৩।
৩৪) দত্ত হারাধন সম্পাদিত গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্টা পুরাণ', ১৩৭৩।
৩৫) দাশগুপ্ত শশিভূষণ, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, ১৩৯৯।
৩৬) দাস গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬।
৩৭) দাস সজনীকান্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৬৯।
৩৮) দে সুশীলকুমার, নানা নিবন্ধ, ১৩৬০।
৩৯) দেব চিত্রা, পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা, ১৯৮৫।
৪০) দেব চিত্রা সম্পাদিত শঙ্কর কবিচন্দ্রের মহাভারত, ১৩৮৯।
৪১) নস্কর সনৎকুমার, মুঘলযুগের বাংলা সাহিত্য, ১৯৯৫।
৪২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৬৮।
৪৩) পাল প্রফুল্লচন্দ্র, প্রাচীন কবিওয়ালার গান, ১৯৯৪।
৪৪) পোদ্দার অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, ১৯৯৪।
৪৫) বন্দ্যোপাধ্যায় অনিলচন্দ্র, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, ১৯৮৬।
৪৬) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পর্ব, ১৯৮০।
৪৭) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৮৫।
৪৮) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬২।
৪৯) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৩।
৫০) বন্দোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩০৮।
৫১) বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, ১৯৮৬।
৫২) বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ সম্পাদিত রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ১৩১৩।
৫৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে, ১৩৬৯।
৫৪) বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১।
৫৫) বসু অরুণকুমার, শক্তিগীতি পদাবলী, ১৯৯২।
৫৬) বসু কাঞ্চন সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, ১৯৯৫।
৫৭) বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৯৮।
৫৮) বসু নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত তীর্থমঙ্গল, ১৩২২।

৫৯) বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ১৩২২।

৬০) বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র, ১৩৮১।

৬১) ব্রহ্ম তৃপ্তি, মরমী ব্যক্তিত্ব লালন ফকির, ১৯৯৪।

৬২) ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৬৪, ১৯৯৪।

৬৩) ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ১৩৬৪।

৬৪) ভট্টাচার্য যতীন্দ্রমোহন, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা, ১৯৮৪।

৬৫) ভট্টাচার্য শিবপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, ১৯৬৭।

৬৬) ভট্টাচার্য সুধীভূষণ, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ১৯৬৫।

৬৭) মণ্ডল পঞ্চানন, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথমখণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, ১৯৬৮।

৬৮) মণ্ডল পঞ্চানন, পুঁথি পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ১৯৫১।

৬৯) মণ্ডল পঞ্চানন, পুঁথি পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫৮।

৭০) মজুমদার বিমানবিহারী, চৈতন্যচরিতের উপাদান, ১৯৩৯।

৭১) মজুমদার মানস, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, ১৯৯৩।

৭২) মজুমদার মোহিতলাল, বঙ্কিম বরণ, ১৩৭১।

৭৩) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৯৮৭।

৭৪) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ১৯৮৭।

৭৫) মল্লিক কুমুদনাথ, নদীয়া কাহিনী, ১৩১৮।

৭৬) মহাপাত্র পীযূষকান্তি সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ১৯৬২।

৭৭) মুখোপাধ্যায় অণিমা, আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮৭।

৭৮) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, দু'শ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য পুঁথি, ১৯৭৮।

৭৯) মুখোপাধ্যায় সুখময়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ১৯৯৩।

৮০) মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার, প্রাক-পলাশী বাংলা, ১৯৮২।

৮১) মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ১৩৯১।

৮২) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, প্রথমখণ্ড, ১৯৬৯।

৮৩) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৭০।

৮৪) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, তৃতীয়খণ্ড, ১৯৭১।

৮৫) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, চতুর্থখণ্ড, ১৯৭২।

৮৬) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, পঞ্চমখণ্ড, ১৯৭৩।

৮৭) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, ষষ্ঠখণ্ড, ১৯৭৪।

৮৮) মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা, সপ্তমখণ্ড, ১৯৭৫।

৮৯) রহমান এস. এম. লুৎফর, লালন জিজ্ঞাসা, ১৯৮৪।
৯০) রহিম এম. এ., বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮২।
৯১) রায় অতুলচন্দ্র, ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ১৯৮০।
৯২) রায় কালিদাস, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ১৩৫০।
৯৩) রায় নিখিলনাথ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৮৮।
৯৪) রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১৪০২।
৯৫) রায় রজতকান্ত, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ১৯৯৪।
৯৬) শরীফ আহমদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩।
৯৭) শরীফ আহমদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭।
৯৮) সরকার জগদীশনারায়ণ, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ), ১৩৮৮।
৯৯) সরকার বিহারীলাল, বঙ্গে বর্গী, ১৩১৪।
১০০) সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ দুর্গাচরণ সম্পাদিত উপনিষদ, ১৯৮৩।
১০১) সুর অতুল, আঠার শতকের বাঙলা ও বাঙালী, ১৯৮৫।
১০২) সেন উমা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ, ১৯৭১।
১০৩) সেন ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল, ১৯৫৪।
১০৪) সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১।
১০৫) সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ১৯১৪।
১০৬) সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১৬।
১০৭) সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৩।
১০৮) সেন দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩।
১০৯) সেন প্রভাসচন্দ্র, বগুড়াব ইতিহাস, ১৯২৯।
১১০) সেন সুকুমার, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, ১৪০০।
১১১) সেন সুকুমার, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫০।
১১২) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৯১।
১১৩) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯১।
১১৪) সেন সুকুমার, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, ১৩৫২।
১১৫) সেন সুরেন্দ্রনাথ, প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন, ১৯৪২।
১১৬) হক মুজাম্মিল খোন্দকার, মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা, ১৯৮৭।
১১৭) হক মুহম্মদ এনামুল, বঙ্গে সূফী প্রভাব, ১৯৩৫।
১১৮) হক রিয়াজুল খোন্দকার, লালন সাহিত্য ও দর্শন, ১৯৭৬।
১১৯) হালদার গোপাল, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১৯৯৩।
১২০) হালদার শিবপ্রসাদ, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য, ১৯৮৩।

ইংরেজি

1) Banerjee Brajendranath, Begams of Bengal, 1942.
2) Dasgupta Sashibhusan, Obscure Religious Cults, Reprint - 1995.
3) Datta Kalikinkar, Alivardi and His Times, 1939.
4) Datta Kalikinkar, Economic Condition of the Bengal Subah, 1984.
5) Datta Kalinkar, Studies in the History of Bengal Subah, 1936.
6) De Susil Kumar, Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1962.
7) Karim Abdul, Murshid Quli Khan and His Times, 1963.
8) Khan A.M., The Transition in Bengal (1756-1775), 1969.
9) Khan Mohammad Mohsin, A Bengal District in Transition Murshidabad (1765-1793), 1973.
10) Marshall P. J., Bengal : The British Bridgehead, 1987.
11) Sardesai G. S., New History of Marahatas, 1948.
12) Sarkar Jadunath, History of Bengal, Vol.II, 1948.
13) Sarkar Jadunath, Bengal Nawabs, 1985.
14) Sinha N. K., The Economic History of Bengal, 1965.

।। সহায়ক পত্র-পত্রিকা পঞ্জী ।।

১) আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯০।
২) আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজাসংখ্যা, ১৩৬১।
৩) ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৮৯৯।
৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৯৭০।
৫) দেশ. ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৭।
৬) পল্লীর কথা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৮।
৭) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা. ১৯৮৪-৮৫।
৮) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় ভাগ, ১৩১৪।
৯) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ১৩১৫।

১০) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১৩১৬।
১১) সংবাদ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৭।
১২) সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১১।
১৩) সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩১১।
১৪) সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১১।
১৫) সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১২।
১৬) সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২।
১৭) সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বর্ষা সংখ্যা), ১৩৬৫।
১৮) সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (শীত সংখ্যা), ১৩৬৫
১৯) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ১৩০৪।
২০) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ১৩০৫।
২১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭ম ভাগ, ১৩০৭ ।
২২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১২শ ভাগ, ১৩১২।
২৩) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩শ ভাগ, ১৩১৩।
২৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, ১৩১৬।
২৫) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৩শ ভাগ, ১৩২৩।
২৬) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫০শ ভাগ, ১৩৫০ ।
২৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৮শ ভাগ, ১৩৫৮।

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

গ্রন্থনাম

